শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল চরিতামৃত

(আদি-মধ্য-অন্ত্য লীলা)

"শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজং ॥৩৪॥"

ভাঃ, ১ম স্কঃ, ৮ম অঃ।

শ্রীমৎ স্বামী ওঙ্কারানন্দ পরিব্রাজকাবধূত
সঙ্কলিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ
সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত

মহানির্ব্বাণমঠ,
পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া।
(পশ্চিমবঙ্গ)

নিত্যাব্দ ৯৮। সন ১৩৫৯ সাল।

Published by
Srimat Swami Nityamayananda Paribrajakabadhut,
Trustee, Mahanirvanmath,
Nabadwip, Nadia,
West Bengal, India.

প্রাপ্তিস্থান :—

ম্যানেজার,

(১) মহানির্ব্বাণমঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

(২) মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(৩) মেসার্স্ দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিক

(৪) শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ও

কলিকাতার অন্যান্য কতিপয় পুস্তকালয়।

Printed by
Sri Gour Pada Roy
At the Gouranga Printing Works,
Bazar Road,
Nabadwip, Dt. Nadia.

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল
(যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব)

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

মঙ্গলাচরণ

"যিনি পরম রূপবান্, চম্পক এবং গলিত সুবর্ণের ন্যায় যাঁহার সুন্দর কান্তি, যাঁহার মুখপদ্ম হইতে আনন্দ স্ফুরিত হইতেছে, যাঁহার মুখমণ্ডলে কোটি কোটি প্রভাকর বিনিন্দিত তেজঃপুঞ্জ প্রকাশ পাইতেছে, যাঁহার অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য ও নিরুপম মহাভাবের তুলনা নাই, যিনি জ্ঞানেশ্বর জ্ঞানানন্দ, সমস্ত দিব্য-ভাবই যাঁহা হইতে বিকাশিত হইয়া থাকে, যাঁহার নলীন নয়নদ্বয়ে কত কমনীয় জ্যোতিঃ বিলসিত রহিয়াছে, যিনিই মহা-নির্ব্বাণের কারণ, যাঁহার কৃপায় কত পতিত জীবও পরম ভক্ত হইয়াছে, যাঁহার দিব্য বিভূতি নিচয়ের মধ্যে পরাভক্তিও একটী বিভূতি, যিনি পরম প্রেমিক, সর্ব্বজীবে যাঁর প্রেম আছে, যিনি পরম দয়াল, যাঁহার অহেতুকী দয়া, যিনি নিত্যানন্দ ব্রহ্ম সনাতন, সমস্ত বিধিনিষেধ যাঁহার কিঙ্কর স্বরূপ, যিনি সর্ব্বশক্তিমান, যাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই, আমি সেই **পূর্ণ পর-ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দরূপী ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে** পাইবার জন্য তাঁহার চিণ্ময়ী মূর্ত্তি ধ্যান করি।"

ধ্যান

"ঈষৎসহাসমমলং শরদিন্দুনিভাননম্
কনকোজ্জ্বলকান্তিঞ্চ কারুণ্যাসিক্তলোচনম্ ;
বরাভয়করাম্বুজং গৈরিকবসনাবৃতম্
মহাভাবাব্ধিমগ্নং তং **নিত্যগোপালমা**শ্রয়ে।"

প্রণাম

"ওঁ নমস্তে গুরবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে।
জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ॥"

—:•:—:•:—

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

উৎসর্গ

যাঁহার অপার্থিব স্নেহ, আশীর্ব্বাদ ও করুণায় এই গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী
হইয়াছিলাম, আমার সেই পরমারাধ্য গুরুদেব
শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিত্যপদানন্দ অবধূত মহারাজের
পরমা প্রীতির বস্তু এই গ্রন্থখানি তাঁহার
শ্রীশ্রীকরকমলে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ
অর্পণ করিলাম।

দীন সেবক—

ওঙ্কারানন্দ।

শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিত্যপদানন্দ অবধূত মহারাজ।
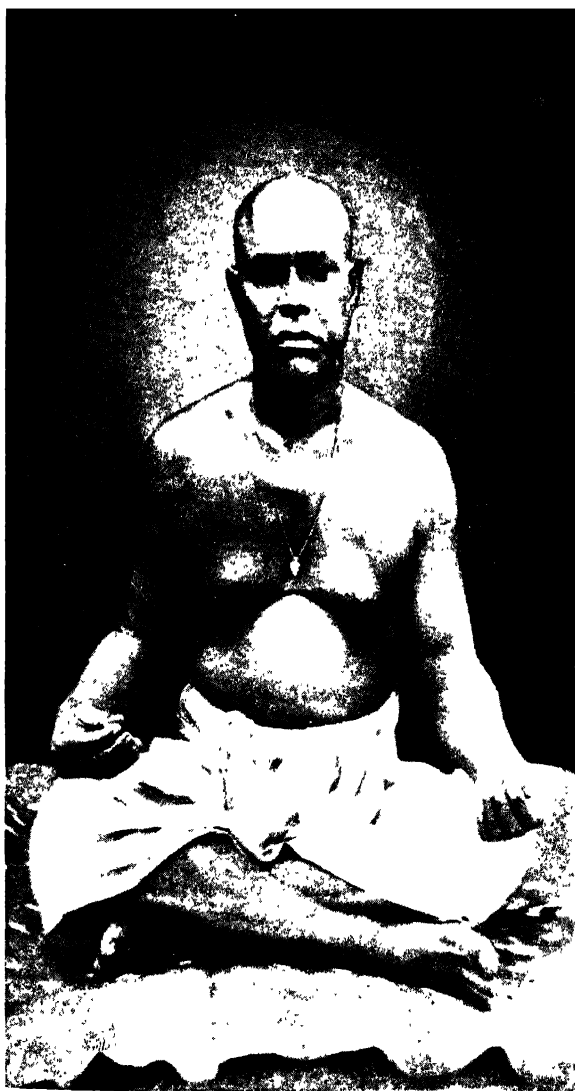
পরিচায়িকা

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক, বর্দ্ধমান এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগের ভূতপূর্ব্ব উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়-পরিদর্শক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও (বর্ত্তমানেও) ফেলো ও পরীক্ষক **রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর,** এম্-এ, লিখিত :—

শ্রীমৎ স্বামী ওঙ্কারানন্দ পরিব্রাজকাবধূত মহাশয়ের লিখিত শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল চরিতামৃতের একটী ভূমিকা লিখিবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থখানির অধিকাংশ আমি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি এবং মহানির্ব্বাণমঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আমার প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক যে ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা সানন্দে গ্রহণ করিয়াছি। কারণ লোকোত্তর চরিত্র মহাপুরুষগণের জীবনীর যতই অনুশীলন হয়, ততই সমাজের কল্যাণ হয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। শ্রীমন্নিত্যগোপাল…প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া বহু পরমার্থান্বেষী ব্যক্তির অপরিসীম হিত সাধন করিয়াছিলেন।…এই মহাপুরুষ কত নিরাশ্রয়কে অভয় দান করিয়াছিলেন, কত উন্মার্গগামীকে আলোকবর্ত্তি দেখাইয়া ফিরাইয়াছিলেন, কত সংশয়-জর্জ্জরিত আত্মাকে শান্তি ও সত্যের সন্ধান দিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। আজ তিনি পার্থিব দেহে বর্ত্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার জীবনের অমোঘ শিক্ষার দ্বারা তিনি হয়ত এখনও বহু ভ্রান্ত, ব্যথিত ও সংশয় নিপীড়িত প্রাণে সাহস, সান্ত্বনা ও সত্যৈষণা সঞ্চার করিতে পারিবেন।

শ্রীমন্নিত্যগোপাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক ছিলেন। এতদুভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের যে সংবাদ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা নানাদিক্ হইতে মূল্যবান্। অনেক বিষয়ে এই দুই মহাত্মার মধ্যে বেশ সাম্য দেখা

যায়। সেইজন্য উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের প্রসঙ্গও অত্যন্ত উপভোগ্য। পরমহংসদেবের ন্যায় শ্রীমন্নিত্যগোপালও সমন্বয়বাদী ছিলেন। 'যত মত, তত পথ' ইঁহারও সিদ্ধান্ত বটে।

বস্তুতঃ বর্ত্তমান কালের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মনে ইহাই একটী প্রধান সমস্যা—কঃ পন্থা? ধর্মের সহিত ধর্মের সংঘর্ষ, মতের সহিত মতের বৈষম্য, আচারের সহিত আচারের বিরোধ অনেক সময়ে মানুষের মনকে দিশাহারা, বিক্ষিপ্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে এই সকল পথ-প্রদর্শক মহাজনের অমূল্য সংকেত যে মানব সমাজের অশেষ কল্যাণ করে, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীমন্নিত্যগোপাল যেমন হরিসংকীর্ত্তন শুনিয়া সমাধি প্রাপ্ত হইতেন, কোরাণ-পাঠ শুনিয়াও তেমনি অবশ হইয়া পড়িতেন। মুসলমানই হউন, হিন্দুই হউন, আর খ্রীষ্টানই হউন, যদি তিনি ভগবানের ভজনাই ধর্মের সার কথা বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, তবে বিশ্বে বিরোধ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। যাঁহার যেরূপ পরিবেশ তিনি সেইরূপ বিশিষ্ট আচার ও নীতি প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহাতে আসল বস্তুর তারতম্য হইবে কেন? এই সমন্বয় বোধই শ্রীমন্নিত্যগোপালদেবের চরিত্রে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

তাঁহার চরিত্রে যে ভক্তিভাবের বিকাশ দেখা যায়, তাহা সেই প্রেমের ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীচৈতন্য জ্ঞান বৈরাগ্য ও প্রেমের যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন আমাদেরই সোনার বাংলায়, তাহারই সৌরভ আমাদের আকাশে বাতাসে বিস্তৃত হইয়া মহাত্মাগণের পূত চরিত্রে বিকসিত হইয়া উঠিতেছে।

মহাপুরুষগণের চরিত্র রহস্যময়, গম্ভীর ও অলোকসামান্য। সেইজন্য স্বামী ওঙ্কারানন্দ তাঁহার ইষ্টদেবের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অলৌকিক ঘটনাবলীতে পূর্ণ। এই সকল ঘটনা বিশ্বাসীর মনে পরম সান্ত্বনা আনয়ন করিবে এবং পরকালের পাথেয়-সঞ্চয়ে সহায়তা করিবে। আমাদের এই অদ্ভুত দেশে অলৌকিক ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে এবং বহু

লোকের পক্ষে তাহা দেখিবার সৌভাগ্যও ঘটে। প্রায় প্রত্যেকের জীবনে কোনও দৈব ঘটনা বা কোনও মহাপুরুষের কৃপা অলৌকিক ভাবে ঘটিয়া থাকে ; সেইজন্য আমাদের অন্তশ্চিত্ত সেই অলৌকিকের সন্ধানেই ঘুরিয়া বেড়ায়। নিত্য যাহা দেখি বা যাহা শ্রবণ করি, তাহা আমাদের আত্মাকে তৃপ্ত করিতে পারে না। তাহার কারণ আত্মাই যে অলৌকিক। আত্মা ত আমাদের দর্শনস্পর্শন শ্রবণের মধ্যে ধরা দেয় না। আত্মাকে ভুলিয়া থাকি বলিয়াই আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হইবার সুযোগ হয় না। সে জগতের সবই আমাদের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। মহাপুরুষের সংসর্গে আমাদের ভ্রান্তি দূর হয়, চঞ্চলতা ঘুচিয়া যায়, বাচালতা স্তব্ধ হয়। এইরূপ মহাপুরুষের জীবন কথা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

ভক্তচরণরেণুপ্রার্থী—

(স্বাঃ) শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

স্নেহ-লিপি

বেঙ্গল সংস্কৃত এসোসিয়েশনের সভ্য, সংস্কৃত সেট্ কাউন্সিলার্ (বর্দ্ধমান বিভাগ), তারকেশ্বর-পরীক্ষা-কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠাতা-ও-সম্পাদক ও হুগলী জেলার অন্তর্গত দ্বারহাট্টা জ্ঞানানন্দ বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ও কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি-বেদান্ত প্রভৃতির অধ্যাপক নিত্যভক্ত পণ্ডিতপ্রবর **শ্রীযুক্ত দাশরথি** বেদান্তশাস্ত্রী-কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ-বেদান্তভূষণ লিখিত :—

"শ্রীমান্ ওঁকারানন্দ, তোমার প্রেরিত শ্রীমন্‌নিত্যগোপাল চরিতামৃতের মুদ্রিত কিয়দংশ পাঠ করিলাম। নিবন্ধকারের মত সংগৃহীত ও একত্রীভূত করিয়া তুমি যে ইহার সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইয়াছ, এজন্য তোমার এই সাধু অধ্যবসায় সত্যই প্রশংসনীয়। ঠাকুর বলিতেন, "বাছার বাছা কোলে নাচা।" তাই, তোমাদের দেখিলে বা এইরূপ কার্য্য দেখিলে তোমাদের উপর তাঁহার যে স্নেহপূর্ণ করুণা-নয়ন সর্ব্বদাই নিপতিত আছে ; তাহা স্বতঃই মনে উদিত হয়। বর্ষার বারিপাত সর্ব্বসাধারণ, কিন্তু ফলোৎপত্তি অনন্যসাধারণ বা নিরপেক্ষ।. ভগবানের করুণাও তদ্রূপ। পরন্তু ক্ষেত্র বা পাত্রভেদে ফলগত তারতম্য হইয়া থাকে।···বিভূতি যথায় পুড়িয়া ছাই, সিদ্ধায় যথায় মাগয়ে ঠাঁই, ভাব ভাবনার কথাই নাই, ধ্যান ধারণায় সীমা না পাই, করুণাই যাঁহার পাইতে সাথী, চাঁদের জোছনায় চাঁদকে দেখি ; সেই ভাবাতীত, দ্বন্দ্বাতীত, পুঞ্জীভূত মানবতার মহাপ্রকাশ শ্রীনিত্যগোপাল দেব···আবরণাত্মিকা শক্তির সাহায্যে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা লোকনয়নকে আবৃত রাখিবার চেষ্টা করিলেও মেঘান্তরালে ক্ষণিক প্রকাশমান সূর্য্য-জ্যোতিঃর মত তাঁহার করুণায় সান্নিধ্যে স্থিত ভক্তগণের মধ্যে স্ব-স্বরূপ অনেক সময়ই কিছু কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িত ; অথবা কৃপাশ্রিত ব্যক্তি-গণের মধ্যে তাঁহার মহাভাববিলাস কখন কখনও ধরা পড়িত। তিনি

এইভাবে ধরা না দিলে—অনন্তকে সান্ত দিয়া, অসীমকে সসীম দিয়া ধরিতে যাওয়া প্রাংশুলভ্যে ফলে উদ্বাহু বামনের মতই অবস্থা হইত। এইটুকুই তাঁহার করুণা যে,—কেহ কেহ তাঁহার সান্নিধ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছিল এবং অদ্যাপি বঞ্চিত হইতেছে না।

ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রভাবে অনেক কিছু দেখাইয়া থাকে, ইন্দ্রও মায়াবলম্বনে বহু রূপ ধারণ করিতে পারে; কিন্তু শ্রীনিত্যগোপালের নিকট হইতে অত্যদ্ভুত অলৌকিক ঘটনা সকল যাহা প্রকাশ পাইত, তাহা ইন্দ্রজাল বিদ্যাদির মত ভঙ্গুর বা মিথ্যা নহে। তাহা চির সত্য! তিনি একদিন ভাবাবেশে বলিলেন,—"আমি নিত্য! আমার দেহ নিত্য!" সুতরাং নিত্য অপ্রাকৃত দেহ হইতে যে ভাববিলাস বা যোগজ বিভূতি কাদাচিৎকরূপে প্রকটিত হইত, সত্যই সে সকল সত্য এবং অদ্যাপি তাহা সুবিরত নহে; পরন্তু অবিরতই বটে। এইজন্য এককথায় বলিতে হয় যে,—দেব! (শুধু) অবাক্ হয়ে তাই তোমা পানে চাই (আমার) নীরবে প্রেমধারা বয়। তাই বলি তুমি শ্রীশ্রীদেবের চরিতপীযূষ পান করিতে সমুৎসুক হইয়াছ। পান কর! কত সংগ্রহ করিবে? এক এক-জন ভক্তজীবনে কতকত ঘটনাপুঞ্জ আছে, কতপ্রকারে কিভাবে ভাববিলাস করিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করা এক জীবনে দুঃসাধ্য এবং সাধ্য হইলেও কত বৃহৎকায় গ্রন্থ হইবে, কেহই তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না। এখনও অনেক ভক্ত আছে। যদি কেহ ইহা সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনি খুব বড় কায করিবেন বলিয়া মনে হয়। তোমার এ সংস্করণ পূর্ণ হৌক এবং তোমার ইচ্ছাও শ্রীশ্রীদেবের পাদকমলে অর্পিত হৌক!… কিমধিকমিতি"—

তোমাদেরই একজন

(স্বাঃ) শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় ।

ভূমিকা

"ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কেচন ॥"৩৪

ভাঃ, ১ম স্কঃ, ৮ম অঃ।

[কেহ কেহ বলেন—এই সংসারে যে সকল জীব অবিদ্যা বশে কামনা জালে জড়ীভূত হইয়া নানা কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সংসারে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে; তাহাদের অবিদ্যাবরণ উচ্ছেদ পূর্ব্বক দুঃখ নিবারণের জন্য শ্রবণ এবং স্মরণাদির উপযোগী লীলাসমূহের বিস্তারার্থেই তিনি জন্ম পরিগ্রহ করেন।]

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"৮॥

গীতা, ৪র্থ অঃ।

[হে অর্জ্জুন! যে যে সময়ে (সর্ব্ব) ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আবির্ভূত হই। আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও (সর্ব্ব) ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।]

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার উক্ত শ্লোকদ্বয় পাঠে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, শ্রীভগবানের অবতীর্ণ হইবারও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই এবং তাঁহার অবতারেরও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে :—

"অবতারাঃ হ্যসংখ্যেয়াঃ হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ"

অর্থাৎ "অদ্ভুতকর্ম্মা হরির অসংখ্য অবতার।" তাই যখনই প্রকৃত ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইয়া মানুষ উন্মার্গগামী হয়, তখনই ভগবান্ নিত্যসিদ্ধ শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। সর্ব্বধর্ম্মেরই এইরূপ গ্লানি বা হানি আরম্ভ হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। সেই সময় ভারতের সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনে এক নবযুগের আবির্ভাব হইল। পাশ্চাত্য-দেশ-বাসীগণ শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষাদির দ্বারা ভারতবাসীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইহাতে বিদ্যালয়ে, ব্যবসায়ে ও সামাজিক আলোচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যে বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। 'পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আচার ব্যবহার" শিক্ষার আদর্শ মনে করিয়া বহু শিক্ষিত ভারত সন্তান অবিচারে সেই সমস্ত অনুকরণ করিতে লাগিলেন। বিদেশীয়গণের বাক্যে মুগ্ধ হইয়া, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ-বংশীয় ভদ্রসন্তানগণ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। পরধর্ম্মের গ্রন্থাদি পাঠাভ্যাসে ও আলোচনায় বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া অনেক হিন্দু এই ঘোষণা করিতে লাগিলেন, "হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিকতাপূর্ণ ও অসার, গুরু-পুরোহিতগণ প্রবঞ্চক, ইত্যাদি।" এইরূপ ধর্ম্মের গ্লানি যখন হাটে, ঘাটে, প্রান্তরে, চতুর্দ্দিকে, গ্রাম গ্রামান্তরে পূর্ণ কোলাহলে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল, সেই সময় ধর্ম্ম-প্রাণ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্ম্মের সার "ব্রহ্মতত্ত্ব" লইয়া "ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম" প্রবর্ত্তন করিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবহারাদি এই ধর্ম্মযাজনের প্রতিকূল না হওয়ায় অনেকেই এই নূতন ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইলেন। যদিও ধীরে ধীরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল, তথাপি দেশের অন্তরস্থ সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সাধন পন্থাগুলির কোনই সংস্কার সাধিত হইল না। ঐ সকল সাধন-পথও বিবিধ কল্পিত মতে কণ্টকিত হইয়া পড়িয়াছিল। পতিত কলির জীবের পরম গতি, পরমোদার 'তন্ত্রের ধর্ম্ম' মারণ, উচাটন, বশীকরণাদি কতিপয় অভিচার কর্ম্মেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তান্ত্রিক বলিলে 'অতিরিক্ত কারণ-সেবী কোনও উপাসক বিশেষ'-কেই বুঝাইতে লাগিল। বৈষ্ণবতা কেবল বাহ্য চিহ্ন-ধারণমাত্রেই পরিণত হইল।

দেবীর প্রসাদ ও শিবের প্রসাদ বৈষ্ণবগণের ত্যজ্যরূপে পরিগণিত হইল। পরম-জ্ঞানের সিন্ধু অদ্বৈত তত্ত্বের আলোচনা কেবলমাত্র শুষ্ক তার্কিক-তাতেই পর্য্যবসিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মেও বিবিধ দলের সৃষ্টি হইল। দেশের যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময় সেই দয়ার সাগর নিত্য-সত্য-পূর্ণ-পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিভিন্ন ধর্ম্মমতের ঐক্য স্থাপন পূর্ব্বক পরমোদার সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়রূপ মহৎ তত্ত্ব জগতে সংস্থাপিত করিলেন।

"শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল চরিতামৃত" গ্রন্থখানি ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালদেবের অদ্ভুতবিবেক-অদ্ভুতবৈরাগ্য-অদ্ভুতজ্ঞান-অদ্ভুতভক্তি-অদ্ভুত-প্রেম-সমন্বিত অলৌকিক লীলা-কাহিনী। তিনি ছিলেন জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমের ঘনীভূত সত্ত্ব-মূর্ত্তি। সন ১২৬১ সালে ১৩ই চৈত্র রবিবার শুভ বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত পাণিহাটী নামক গ্রামে তাঁহার শুভ আবির্ভাব হয়। তিনি যে বংশে জন্মরূপ পরিবাদের অভিনয় করেন তাহা কলিকাতা মহানগরীর অন্তর্গত আহিরীটোলার বসু-বংশ নামে পরিচিত। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি পরমহংসাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ অবধূত মহারাজের নিকট হিন্দুর মহাতীর্থ কালীঘাটে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে ত্রিকোণেশ্বর শিব মন্দিরের সমীপবর্ত্তি স্থানে দীক্ষাগ্রহণ করেন। জগদ্বাসীকে প্রকৃত ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিবার নিমিত্তই তিনি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মের সকল আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিয়া চলিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের বিশিষ্টতা। তাঁহার মাতা গৌরীমণি দেবীরও বিশেষ লক্ষ্য ছিল যে, তাঁহার পুত্র চিরকুমার থাকিয়া যেন জগতে প্রকৃত ধর্ম্মপথ প্রদর্শন করেন। ধর্ম্ম-পরায়ণা জননীর এই সৎ সঙ্কল্প কালক্রমে বর্ণে বর্ণে পূর্ণ হইয়াছিল। শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব যৌবনের প্রারম্ভেই স্বীয় গুরুদেবের নিকট সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সংসারের বিপরীত পরম বৈরাগ্য-পথের পথিক হইলেন। যে সম্প্রদায়ে তিনি দীক্ষিত হন তাহা সর্ব্বজন-নমস্কৃত ঋষভপন্থী অবধূত সম্প্রদায় নামে খ্যাত। সন্ন্যাস গ্রহণান্তর

তাঁহার গুরুদেবের নির্দ্দেশানুসারে তিনি যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত নামে পরিচিত হইলেন। সম্ভবতঃ তিনি স্বীয় গুরুদেবের নিকট হইতে 'পরমহংসাচার্য্য' উপাধিটিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সমন্বয়াচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দদেবের জীবন অলৌকিক জ্ঞান, অপার্থিব প্রেম ও অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের ঘনীভূত মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। দীক্ষার পর হইতেই তিনি কয়েক বৎসর সর্ব্বদা এরূপ দিব্যোন্মাদ অবস্থায় ছিলেন যে, আহার বিহার সম্বন্ধে পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হইত। এই সময় কোন কোন দিন তিনি সম্পূর্ণ অনাহারে থাকিতেন; আবার কোন কোন দিন এত প্রচুর আহার করিতেন যে, তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইতেন। সেই সময় তিনি কখন কিভাবে কোথায় থাকিতেন তাহা কেহই জানিতে পারিত না। দুই বৎসর ছয় মাস বয়সের সময় তিনি নির্ব্বিকল্প-সমাধি-মগ্ন হইয়াছিলেন এবং প্রায় ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সন্ন্যাস গ্রহণান্তর সুদীর্ঘকাল অবধূত-বেশে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সমস্ত ঋতুতেই শতগ্রন্থিযুক্ত একখানি মাত্র ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক নগ্নপদে হিন্দুদিগের প্রায় সকল তীর্থেই পর্য্যটন করিয়াছিলেন। বিশেষ কারণ বশতঃ কেবল মাত্র শ্রীক্ষেত্রে যান নাই। এইরূপ ভাবে পার্থিবী-লীলার শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি পরম বৈরাগ্য-পথের আদর্শ পথিক হইয়া কালাতিপাত করিয়াছিলেন। জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমের অপূর্ব্ব সমন্বয়-মূর্ত্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব যখন হরিসংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতেন, তখন তাঁহার নয়নযুগল হইতে গঙ্গাযমুনার ন্যায় ধারা বহিয়া যাইত। তদ্দর্শনে মনে হইত, ইনি সাক্ষাৎ প্রেম-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ দেব। কিন্তু যখন তিনি নানা শাস্ত্র মন্থন করিয়া প্রকৃত অদ্বৈত তত্ত্ব মীমাংসা করিতেন, তখন মনে হইত, তিনি সাক্ষাত জ্ঞান-রূপী শঙ্কর। যখন যে ভাবের সঙ্গীত হইত, তখন তদ্ভাবেই ভাবিত হইয়া তিনি সেই রূপেই প্রকটিত হইতেন; এমন কি, বহু সময় বহু ভক্ত শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবকে নানা দেবদেবীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তাই, কোনও সময়ে জনৈক নিত্য-ভক্ত গর্ব্ব করিয়া

বলিয়াছিলেন, "যদি কেহ বলে, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবে সে ইষ্টরূপ দর্শন করে নাই, তবে সে মিথ্যাবাদী।" যাহাহউক, সেই সকল ভক্তের বিবরণ ও দর্শন এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বর্ণনা করা অসম্ভব। জনক-জননীর অকৃত্রিম বাৎসল্য, বন্ধুর অকপট প্রীতি এবং শ্রীশ্রীগুরুদেবের অদ্ভুত ধর্ম্ম-প্রেরণা ও অপূর্ব্ব ভক্তবৎসলতা যেন ঘনীভূত হইয়া সেই অবধূতরাজের শ্রীমূর্ত্তিতে সর্ব্বদা বিরাজিত থাকিত। সেই জ্ঞান-ঘন প্রেমময় নিত্যগোপাল মূর্ত্তি দর্শন করিলে, ভক্তগণের হৃদয়ে এত আনন্দ হইত যে, তাঁহারা আত্মহারা হইয়া দেহ-গেহ সব ভুলিয়া যাইতেন। তাই, পরম-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি এবং তাঁহার ভাব-মহাভাবাদি দর্শন করিয়া বহু মুমুক্ষু ব্যক্তি চিরতরে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

পরমোদার সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়বাদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব তাঁহার রচিত গ্রন্থাদিতে সকল ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমস্ত মতেরই যথোপযুক্ত স্থান প্রদান করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, "জগতে এরূপ কোন ধর্ম্ম নাই, যে ধর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয় না।" এই উক্তি সকল ধর্ম্মের লোকেরই সাম্প্রদায়িক ভাবের তুচ্ছতা জ্ঞাপন করিবে। তাঁহার মতের ঔদার্য্য যে কেবল তাঁহার গ্রন্থে সুপ্রকাশিত হইয়াছে তাহা নহে; তাঁহার আচরণেও তাহা প্রতীয়মান হইত। একদিকে যেমন গীতাগ্রন্থ পাঠ শ্রবণে তাঁহার মহাভাব-সিন্ধুতে তরঙ্গ উঠিত, অন্যদিকে তেমনই কোরাণ-বাইবেলাদি পঠিত হইলেও তিনি আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। শিবকালী-রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম কীর্ত্তনেও যেমন তিনি সমাধিস্থ হইতেন, তেমনই আল্লা-যীশুর নাম শুনিলেও তিনি গভীর ভাবে মগ্ন হইয়া যাইতেন। কিন্তু তাঁহার পার্থিবী-লীলা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সমস্ত অবস্থা তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ছিল। ইহা তাঁহাকে কোনও দিন সাধনা করিয়া লাভ করিতে হয় নাই।

এইরূপে বহু ধর্ম্ম-পিপাসু, বহু ভক্তগণকে প্রকৃত ধর্ম্মপথ প্রদর্শন করতঃ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব সন ১৩১৭ সালের মাঘী কৃষ্ণাসপ্তমী

তিথিতে হুগলী সহরস্থ তদীয় 'নিত্যমঠে' অনন্তসমাধিযোগে পার্থিবী-লীলা সংবরণ করেন। তাঁহার অপ্রাকৃত দিব্যদেহ তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে কলিকাতা মহানির্ব্বাণমঠে সমাহিত এবং উক্ত পরম পবিত্র সমাধিস্থল "শ্রীশ্রীগুরুপীঠ" নামে অভিহিত হয়। এতদ্ব্যতীত, শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামে আম্‌পুলিয়া পাড়াতে তিনি "অবধূত আশ্রম" নামে একটী আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালেও যাহাতে তৎপ্রবর্ত্তিত পরমোদার সমন্বয় মতের বহুল প্রচার ও সদনুশীলন হয়, এতদর্থে তাঁহার পার্থিবী-লীলা সংবরণের পর পরম পূজনীয় তদীয় সন্ন্যাসী শিষ্য মহাত্মাগণ নদীয়া জেলান্তর্গত নবদ্বীপ ধামে দেয়াড়াপাড়ায় মহানির্ব্বাণমঠ, বীরভূম জেলায় নলহাটীতে মহানির্ব্বাণমঠ, বৰ্দ্ধমান জেলায় কাল্‌নাতে জ্ঞানানন্দ মঠ, চব্বিশ পরগণা জেলায় শ্রীধাম পাণিহাটীতে (শ্রীশ্রীদেবের পরম পবিত্র জন্মস্থানে) কৈবল্যমঠ, নদীয়া জেলায় কালীগঞ্জে নিত্যানন্দ মঠ, নাভায় (পাঞ্জাবে) অবধূত মঠ এবং সুকচরে (২৪ পরগণা) গৌরীমঠ নামে কয়েকটী ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। ঐ মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত আমাদের জনৈক সন্ন্যাসী ভ্রাতা নদীয়া জেলার ভেড়ামারা গ্রামে মহানন্দ মঠ এবং অপর একজন সন্ন্যাসী ভ্রাতা কুমিল্লা জেলায় নিত্যনারায়ণমঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যবর্গ ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া জগতের কল্যাণার্থ তৎপ্রতিষ্ঠিত পরমোদার সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়বাদের বহুল প্রচারের দ্বার উন্মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

অদ্ভুত-কর্ম্মা পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের গভীর রহস্যময়ী পার্থিবী লীলা বিশাল সমুদ্রবৎ। মাদৃশ সাধন-ভজন-বিহীন দীনাতিদীনের পক্ষে উহা উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা বামনের চাঁদ ধরিবার এবং পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন করিবার প্রয়াসের ন্যায় হাস্যোদ্দীপক ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে শ্রীশ্রীগুরুদেবের (যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের সন্ন্যাসী শিষ্য ও নবদ্বীপ মহানির্ব্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমৎ স্বামী

নিত্যপদানন্দ অবধূত মহারাজের) অপার করুণায় তদ্বিষয় যতটুকু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি এবং শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের অন্যান্য সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্তবৃন্দের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী ও রচনা হইতে তাঁহার অমৃতময়ী লীলা সম্বন্ধে যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই অতি সহজ ও সরল ভাষায় সহৃদয়, ধর্ম্ম-প্রাণ পাঠকপাঠিকাগণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। ইহা পাঠে ধর্ম্মনিষ্ঠ পাঠকপাঠিকাগণ নিজ দয়াগুণে মাদৃশ ভাবহীন, ভাষাহীনের ত্রুটী মার্জ্জনা পূর্ব্বক সর্ব্বলোক-বরেণ্য ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের মাহাত্ম্য কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিলে আমার সেবা সার্থক হইবে। ইতি—

বিনীত—

গ্রন্থকার।

গ্রন্থ সম্বন্ধে কতিপয় সুচিন্তিত উক্তি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ও ইংরাজী বিভাগের হেড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ল'-কলেজের ভূতপূর্ব্ব লেক্‌চারার, ও কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব এড্‌ভোকেট্, ডক্টর্ শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্, পি-আর্-এস্, পি-এইচ-ডি, মহোদয় লিখিতেছেন :—

"শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল চরিতামৃত" বিখ্যাত সাধুপুরুষের জীবনী। ইহাতে তাঁহার সাধনা, ধর্ম্মপ্রচার ও লোকহিত প্রচেষ্টা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার লেখক শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের প্রশিষ্য; তিনি নিজে অধ্যাত্ম-সাধনায় ব্রতী এবং এই ধর্ম্মশিক্ষকের জীবনেতিহাসে বিশেষজ্ঞ। তাঁহার রচিত গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশের অনুরোধ আমার কাছে করায় বিশেষ সম্মানিত হইলেও, সত্যই বিপন্ন বোধ করিতেছি। কারণ ভারতীয় সাধনা ও ভক্তিতত্ত্বে আমার অধিকার নাই এবং শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধেও আমার উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব। কাজেই এ জীবন-চরিতের সমালোচনা করিবার চেষ্টা আমার পক্ষে অশোভন হইবে। পাঠককে ইহার সামান্য পরিচয় দিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব।

সাধু পুরুষের জীবন সর্ব্বদা ঘটনাবহুল হয় না। তথাপি ঘটনা পরিহার করিবারও উপায় নাই। এই চরিতামৃত সেইজন্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম ভাগে চারটি অধ্যায়ে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের জীবনের প্রভাত-কাল, দ্বিতীয় ভাগে ১১টী অধ্যায়ে উঁহার মধ্যাহ্ন ও তৃতীয় ভাগে ৬টী অধ্যায়ে তাঁহার জীবন-সন্ধ্যা চিত্রিত হইয়াছে। ১২৬১ সালের চৈত্র মাসে পাণিহাটী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি আহিরীটোলার

বিখ্যাত ও ঐশ্বর্য্যশালী বসু বংশের সন্তান, তাঁহার বংশ-পরিচয়,জন্ম,শিক্ষা, বৈষয়িক প্রচেষ্টা ও সন্ন্যাস গ্রহণ অর্থাৎ তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সূচনা প্রথম ভাগের বিষয়-বস্তু। দ্বিতীয় ভাগে তাঁহার তীর্থপর্য্যটন ও কতিপয় আশ্রম স্থাপনের বর্ণনা আছে। কর্ম্ম-জীবন বলিতে যাহা বুঝায় মোটের উপর তাহারই বিবরণ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। কালিঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের যাবতীয় তীর্থ তিনি দর্শন করেন ও পরে হিমালয়ের দুর্গম পুণ্যস্থান সমূহে ভ্রমণ করেন। কাশীধাম, বৃন্দাবন ও নবদ্বীপে তিনি কিছুদিন বাস করেন, যদিও ইহার মধ্যে কখন কখন কলিকাতায়ও আগমন করিতেন। এখানে ১৩০১ সালে মনোহরপুকুরে মহানির্ব্বাণ-মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাথে কয়েকবার ঠাকুরের দেখা হয়, এবং উভয়েই উভয়ের মাহাত্ম্য দর্শনে অভিভূত হইয়া পড়েন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের অন্ত্য জীবনের অনেকদিন নবদ্বীপে তাঁহার শিষ্যদের সঙ্গে কাটে। এ সময়ে তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয় ও কৃপালাভের আশায় বহুলোক তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসে। তিনি লোক শিক্ষায় এই সময়েই বেশী ব্যাপৃত হন। নবদ্বীপে গমনাগমনের সুবিধা না থাকায় কলিকাতা ও নবদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী হুগলী সহরে ১৩১২ সালে নিত্যমঠ স্থাপন করিয়া ঠাকুর কিছুকাল তথায় অবস্থান করেন। নবদ্বীপে থাকিতেই তাঁহার বহুমূত্র রোগ হয়। হুগলীতে উহা বৃদ্ধি পায়। ক্রমে দেহে একটী স্ফোটক দেখা দেয় এবং উহা পচনের উপক্রম হয়। ডাক্তারেরা যখন জানিতে পারিলেন, তখন অস্ত্র করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু করিয়াও কোন ফল হইল না। ১৩১৭ সালের ৭ই মাঘ ঠাকুরের পার্থিব জীবনের অবসান হয়। তাঁহার ···দেহ মহানির্ব্বাণ-মঠে সমাহিত করা হইয়াছে।

চরিতামৃতের শেষে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের উপদেশাবলী পৃথক্ ভাবে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মমতের উদারতা ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার গোড়ায় রহিয়াছে তাঁহার ধর্ম্মসমন্বয় চেষ্টা। অসংখ্য মতবাদের ও বহু ধর্ম্ম প্রচেষ্টার পশ্চাতে যে সার্ব্বজনীন এবং শাশ্বত সত্য

রহিয়াছে তাহাকে আয়ত্ত ও প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার ব্রত ছিল। তিনি বলিতেছেন, "পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় সকল মতে যখন তোমার সমান শ্রদ্ধা হইবে, তখনি তুমি প্রকৃত আস্তিক হইবে। এখন তুমি আস্তিকও নও, নাস্তিকও নও। অগ্রে বৈষ্ণবত্ব, শাক্তত্ব, শৈবত্ব, গাণপত্যত্ব, ব্রাহ্মণত্ব ভুলে এক হবে। পরে খৃষ্টানত্ব, মুসলমানত্ব ভুলে এক হবে। সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রের অগ্রে সামঞ্জস্য করে', পরে পৃথিবীর শাস্ত্র এক কর।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। দুই জনেই প্রথমে সাকার উপাসনা বা মূর্ত্তি-আরাধনার দ্বারা ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। শাস্ত্রানুযায়ী আসন, অর্চ্চনা, ধ্যান, ধারণা উভয়েই অভ্যাস করিতেন। ফলে উভয়েই আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয়েরই ব্রহ্মানুভূতি (Spiritual Intuition) ইহা ছাড়াইয়া বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছে। আচার (Rituals), যাগ, যজ্ঞ (Sacrifices), মূর্ত্তি (Images), প্রতীক, প্রতিরূপক (Symbols), জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির পশ্চাতে যে বিরাট সচ্চিদানন্দময় সত্তা আছে, ভারতীয় সাধক তাহারই সহিত সাযুজ্য, সারূপ্য ও সালোক্য চায়। এই দুই ধর্ম্ম শিক্ষকেরই জীবন চরিত হইতে এই শিক্ষা লাভ করা যায়।

গ্রন্থকর্ত্তা অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। যে সকল ঘটনা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিতে সময়ও যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছে। কোন একজনের নিকটই সমস্ত বিবরণ পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না, কাজেই বহু স্থানে বহু লোকের নিকটই অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে প্রায় ৩৫ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালে অনেক স্মৃতি মুছিয়া যাওয়াই সম্ভব। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীও এ জগৎ হইতে চির বিদায় লইয়াছেন। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এ জীবনী রচিত হইলে, রচয়িতার পরিশ্রমের যথেষ্ট লাঘব হইত।

গ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলা উচিত। ভাষা সরল ও অনাড়ম্বর। একরূপ সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, অনেক অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয়

কোন বিষয় বাদ যায় নাই। বিবরণের গুণে আখ্যান-বস্তু সরস হইয়াছে। ধর্ম্ম সাধনতত্ত্বের অনেক কথা এ গ্রন্থে সহজবোধ্য করিয়া লেখা হইয়াছে। এজন্য গ্রন্থকার ধন্যবাদার্হ।

৭২ নং বালিগঞ্জ প্লেস্,
কলিকাতা।
১৪ই আশ্বিন, ১৩৫২সাল

(স্বাঃ)
শ্রীমোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য।

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ, বেদান্তবাগীশ, এম্-এ, মহোদয় লিখিতেছেন ঃ—

শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দ পরিব্রাজকাবধূত মহাশয় লিখিত শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল চরিতামৃত গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী। মহাপুরুষগণের জীবনীর অনুশীলন যে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এইজন্য এরূপ গ্রন্থ পাঠ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।...

বৃথা বাক্যবিন্যাসে আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না, ...। কিমধিকমিতি।

(স্বাঃ) শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ
অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর কলেজ, নবদ্বীপ শাখা।

বর্দ্ধমান রাজ কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যাল্ শ্রীযুক্ত চণ্ডিচরণ মিত্র, এম্-এ, মহোদয় লিখিতেছেন:

বর্ত্তমানে নবদ্বীপের মহানির্ব্বাণ মঠের একজন সন্ন্যাসী আমার এক প্রাক্তন ছাত্রের সৌজন্যে শ্রীমৎ স্বামী ওঙ্কারানন্দ পরিব্রাজকাবধূত মহাশয়

দ্বারা সঙ্কলিত মহানির্ব্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের "অদ্ভুতবিবেক—অদ্ভুত বৈরাগ্য—অদ্ভুতজ্ঞান—অদ্ভুত ভক্তি—অদ্ভুত প্রেম-সমন্বিত অলৌকিক লীলাকাহিনী" পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

সকল দেশে, সকল যুগে মহাপুরুষ জীবনী পাঠের সার্থকতা স্বীকৃত হয়। শুধু তাঁহাদের উপদেশাবলীর দ্বারা নয়, তাঁহাদের নিজ জীবনের কার্য্যকলাপের দ্বারাও তাঁহারা যে আদর্শ স্থাপন করেন তাহা অমূল্য। দুঃখ শোক তাপে জর্জ্জরিত, লোভ মোহ দ্বারা প্রতারিত, বিঘ্নবিপদ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত মানব যখন দিশাহারা হইয়া কর্ত্তব্য পথ নির্ণয়ে অসমর্থ হয় তখন এই সকল মহাপুরুষ স্থাপিত আদর্শ পথপ্রদর্শকের কাজ করে এবং ভ্রান্ত মানবকে বিপথগামী হইতে দেয় না।

শ্রীশ্রীমন্নিত্যগোপাল দেবের প্রচারিত আদর্শের বৈশিষ্ট্য সঙ্কলনকারী মহাশয়ের উপরি-উদ্ধৃত উক্তি হইতে প্রতীয়মান হইবে। তাঁহার জীবনে ও তাঁহার উপদেশাবলীতে জ্ঞান ভক্তি প্রেমের অপূর্ব্ব সমন্বয় থাকায় এই আদর্শ সকলেরই গ্রহণীয় হইবে, কারণ "ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ।" আর এই আদর্শের মানবকে অনুপ্রাণিত করিবার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাতার পার্থিব দেহাবসানের সহিত লুপ্ত হয় নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মঠ ও আশ্রমের দ্বারা ও তাঁহার ভক্ত শিষ্য মণ্ডলীর প্রচেষ্টায় এই মহান আদর্শ একইরূপ বলবৎ রহিয়াছে এবং আশা করা যায় থাকিবে। কারণ ইহার কল্যাণময় সার্থকতা অসীম, বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান যুগে এবং আমাদের বর্ত্তমান সমাজে। যখন মানবে মানবে সামান্য মতভেদের জন্য প্রাণান্ত-কারী দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, যখন দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা চতুস্পার্শ্বের বায়ুকে কলুষিত করে তখন শ্রীশ্রীমন্নিত্যগোপাল প্রচারিত "যত মত তত পথ" এই শিক্ষা ও তাঁহার অপার্থিব দয়া, ক্ষমা, ভালবাসার আদর্শের মূল্য অস্বীকার করি কি করিয়া? আর পরমত সহনীয়তাই যদি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে নিম্নলিখিত শিক্ষা অতুলনীয়:—

"সবমে বসিয়ে, সবমে রহিয়ে, সব্‌কা লিজিয়ে নাম।
হাঁজী হাঁজী কর্‌তে রহো বৈঠে আপন ঠাম্‌।"

বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান ছাত্রসমাজের পক্ষে এইরূপ আদর্শ ও শিক্ষা অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মের বাঁধন হারাইয়া বর্ত্তমান ছাত্র সমাজ ক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হইতেছে, আপাত বিভিন্ন মত সমূহের ঐক্যের সন্ধান না পাইয়া অন্তর্দ্বন্দ্বে নিযুক্ত হইতেছে, সদুদ্দেশ্যে অসদুপায়ও অবলম্বনীয় এই মারাত্মক নীতিতে বিশ্বাসবান হইয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে—এই অবস্থায় শ্রীশ্রীমন্নিত্যগোপাল প্রচারিত আদর্শের বিশেষ উপকারিতা আছে বলিয়াই অনুমিত হয়। এই আদর্শের অনুসরণে তাহাদের মনে শান্তির প্রতিষ্ঠা হইবে, দৃঢ়চিত্ততা বৃদ্ধি পাইবে, কল্যাণময় কার্য্যকুশলতা প্রকাশ পাইবে এবং দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন হইবে—**ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।**

বর্দ্ধমান,
১৭ই আশ্বিন, ১৩৫২সাল

(স্বাঃ) শ্রীচণ্ডিচরণ মিত্র।
Principal, Burdwan Raj College.

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও (বর্ত্তমানে) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, ডক্টর্‌ শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ, পি-এইচ্‌-ডি, **মহোদয় লিখিতেছেন :—**

স্বামী ওঁকারানন্দ সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল চরিতামৃত" পরম আগ্রহের সহিত পাঠ করিলাম। পাঠ করিতে করিতে যেন এক নূতন অনুভূতির দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। এই অনুভূতির রাজ্যে বিচরণ করিতে

করিতে মন এক অভূতপূর্ব্ব হর্ষ-বিষাদে আপ্লুত হইল। হর্ষের কারণ এই যে হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান অধঃপতনের মধ্যেও নিত্যগোপাল দেবের ন্যায় অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিতে পারেন—যিনি নিজে সমস্ত জীবন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের নিবিড় আনন্দে বিভোর ছিলেন এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দকেও এই রোমাঞ্চকর অনুভূতির কণিকা আস্বাদন করাইয়া ধন্য করিয়াছিলেন। ক্ষোভের কারণ এই যে বঙ্গদেশে তাঁহার সমসাময়িক নর-নারীর মধ্যে অতি সামান্য অংশ মাত্র ঈদৃশ মহামানবের সহিত ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। অধিকাংশের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা তাঁহার অনুপম চরিত্রের আকর্ষণ অনুভব করিতে পারে নাই। তাঁহার ব্যক্তিত্ব হইতে বিচ্ছুরিত আলোকপ্রভায় তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয় নাই।

সাহিত্যিক আদর্শের দিক্ দিয়াও গ্রন্থখানিতে জীবনচরিতের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সফল হইয়াছে। লেখকের বর্ণনার প্রসাদগুণে ও উদাহৃত দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে নিত্যগোপালদেবের লোকোত্তর চরিত্রটী উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক দিকে ধ্যানতন্ময়, লীলা-বিভোর, অলৌকিক শক্তির বিকাশে দুরধিগম্য, অপর দিকে উদার, অনাসক্ত, স্নেহ-প্রবণ, ভক্তবৎসল—তাঁহার প্রকৃতির এই উভয় দিকের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় অনুভূত হয়। যে হিমালয় উত্তুঙ্গশৃঙ্গ ও অতলস্পর্শ গুহার সন্নিবেশে ভয়াবহ মহিমায় মানবের ধ্যান-ধারণার অতীত, তাহাই আবার দেহনিঃসৃত জাহ্নবী ধারার দ্রবীভূত স্নেহে আপামর সাধারণের একান্ত আত্মীয় ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের হেতু। লেখকের একান্ত ভক্তি ও আত্মসমর্পণশীল নিষ্ঠার জন্যই তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রটী এমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। যে ভক্তবৃন্দ প্রতিদিন নিত্যগোপাল দেবের সংস্পর্শে আসিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তাঁহার অলৌকিক শক্তির লীলাময় স্ফুরণে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির রাজ্যে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে তাঁহাকে সাক্ষাৎ অবতাররূপে পূজা করিবেন তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। যাঁহারা সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত,

পরোক্ষ বর্ণনার ভিতর দিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহার মধ্যে ঐশী শক্তির অপরূপ বিকাশে প্রায় অনুরূপ ভাবেই মুগ্ধ ও বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন।

গ্রন্থমধ্যে অনেক স্থলে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে ইহার আকর্ষণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। রামকৃষ্ণ ও নিত্যগোপাল এই দুই মহাপুরুষ আধুনিক জড় বাদের যুগে আবির্ভূত হইয়া ইহার আস্তিক্য বুদ্ধিকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল যে হিন্দুধর্ম্মের সারমর্ম্মের সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহা নহে; ইহার অধ্যাত্ম সাধনার প্রত্যেকটী স্তর, ইহার গুরুবাদ, প্রতিমা পূজা, উৎসব-অনুষ্ঠানের সমস্ত বিধি-নিষেধ যে ভগবদ্-উপলব্ধি ও আত্মজ্ঞানের অপরিহার্য্য সহায় তাহাও নিঃসংশয়িতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।............ আমরা ভক্তিপ্রণত চিত্তে উভয়েরই পদমূলে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া উভয়ের নিকটই আমাদের এই সংশয়-জড়িত, সমস্যাপীড়িত জীবনে পথ-নির্দ্দেশের প্রার্থনা জানাই।

ঐশী শক্তিসমন্বিত মহামানবের জন্ম সমাজের কল্যাণার্থ। ইহাঁদের আবির্ভাবের কল্যাণময় প্রভাব কেবল ইহাঁদের ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে, সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত সংক্রামিত না হইলে, ভগবান ইহাঁদিগকে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আজ শত শত পরিবারে হিন্দুধর্ম্ম প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষিত; আর সহস্র সহস্র পরিবারে ইহা কয়েকটী প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধ অনুবর্ত্তনে পর্য্যবসিত। খুব কম লোকই এই ধর্ম্ম হইতে উন্নততর জীবনযাপনের প্রেরণা লাভ করিয়া থাকে; খুব অল্প লোকের চিত্তেই ইহার আসল স্বরূপ উদ্ভাসিত হয় ও সাংসারিক কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের সহিত ভগবদ্-জ্ঞানলাভের আকাজ্ক্ষার সমন্বয় ঘটিয়া থাকে। আজ যে লক্ষ লক্ষ হিন্দুগৃহে ষোড়শোপচারে মহামায়ার পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা হইতে কয় জন প্রকৃত আধ্যাত্মিক শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি, জীবনকে আদর্শলাভে

পরিচালিত করিবার প্রেরণা লাভ করিতেছে? "বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি"—ভক্তহৃদয়ের এই উচ্ছ্বসিত প্রার্থনা কয়জনের ক্ষেত্রে অনুকূল প্রসাদ লাভে চরিতার্থ হইতেছে? বরাভয়দাত্রী মাতা আজ সন্তানকে বরদানে এত কৃপণা কেন? তবে কি আমাদের মধ্যে নিত্য-গোপাল-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব ব্যর্থ হইয়াছে? চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম যেমন সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া এক উদ্বেলিত ভাবাবেগের জাহ্নবী ধারায় আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকেই পূত করিয়াছিল, সকলের মনেই এক নূতন উদ্দীপনা জাগাইয়াছিল, এক সবল, সতেজ ধর্ম্মবোধের উন্মেষ, জীবনযাত্রার মধ্যে এক বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, তাঁহার পরবর্ত্তী মহাপুরুষদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মশিক্ষার অনুরূপ ব্যাপকতা, সেই সার্ব্বভৌম বিস্তার ও সেই দুর্ব্বার, কূলপ্লাবী শক্তি কোথায়? ভাগীরথীর পুণ্য প্রবাহ হ্রদ পরিপূরণের জন্য নহে; ইহা কোথাও অবরুদ্ধ হইবে না, প্রত্যেকের গৃহদ্বার বিধৌত করিয়া, প্রত্যেককে ইহার সুশীতল, শান্তিময় স্পর্শ অনুভব করাইয়া সাগর সঙ্গমের দিকে ছুটিয়া চলিবে। সেই-জন্য বঞ্চিত, বুভুক্ষু অজ্ঞ তমসাচ্ছন্ন জনসাধারণের পক্ষ হইতে আমি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের ভক্তসম্প্রদায়ের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে গুরু প্রসাদাৎ তাঁহারা যে অমৃতের আস্বাদন পাইয়াছেন, তাহার কণিকা মাত্র তাঁহারা সকলের মধ্যে বিতরণের জন্য উদ্যোগী হউন। জানি যে পাত্র অনুসারে এই অমৃতের পরিমাণের তারতম্য হইবে। যাহারা বিষয়-রুক্ত, জীবন-ব্যাপী সাধনায় যাহাদের শক্তি বা অবসর নাই, যাহারা সংসার-ত্যাগের উপযোগী আত্মসংযম ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার সম্বলহীন, তাহাদের মনেও বিন্দু বিন্দু প্রেরণার সঞ্চার করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যেও অধ্যাত্ম সাধনার আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে হইবে। তাহাদিগকেও মানবজীবনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন রাখিতে হইবে। সকলের দেহে-মনে মহা-পুরুষের পূতজীবনের স্পর্শ বসন্তপবনের ন্যায় হিল্লোলিত হউক ইহাই প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের অন্তরতম কামনা।

৵৹(ক) (স্বাঃ) শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কতিপয় সংবাদপত্রাদির সমালোচনা

(প্রথম সংস্করণ)

The Hindusthan Standard, Calcutta (4. 8. 46.). "...The book is a pen-picture in Bengali of the glorious earthly career of Sri Nitya Gopal (Yogacharya Abadhuta Jnanananda) Deva whose holy body lies interred at Mahanirvan Math, Rash Behary Avenue, Calcutta. It is a laudable attempt on the part of the author to depict, in a simple, elegant style, the life and wonderful achievement of a great person, which, but for this successful portrayal, would perhaps have remained a sealed book to the majority of the reading public. The Yogacharya has been represented, in the work, as the purifier of the fallen, nay, the very ocean of compassion and the embodiment of the universal religion. He stretched his generous hands even to the depressed, the down-trodden and men of loose character. He made a synthesis of the apparently conflicting standpoints of several schools, sects and communities and showered blessings upon all without the distinction of caste, creed and nationality. The book is sure to prove entertaining."

বসুমতী, কলিকাতা (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩) :"...শ্রীমন্নিত্যগোপাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক ছিলেন। প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত এই মহাপুরুষ বহু পরমার্থান্বেষী ব্যক্তির অপরিসীম হিতসাধন করেছিলেন কত নিরাশ্রয়কে অভয়দান ও কত উন্মার্গগামীকে আলোকবর্ত্তি দেখিয়ে

ছিলেন তাঁর সাধ্যা নেই। এই অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন লোকোত্তর সাধকের জীবনচরিত্র উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর ও দেবভাবে পূর্ণ। ... স্বামী ওঙ্কারানন্দ তাঁর ইষ্টদেবের যে কাহিনী আলোচ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, তা অলৌকিক ঘটনাবলীতে পূর্ণ। ... বইখানি, অবশ্য পাঠ্য ও আদরণীয় হবে, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে জানাচ্ছি। বইখানির বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।"

আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা ('২৬।৩।৫৩):

"... এই গ্রন্থখানি অলৌকিক যোগবিভূতিসম্পন্ন ... শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের জীবনী। ... শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের সহিত তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছিল এবং উভয়েই উভয়ের দিব্যভাব ও মাহাত্ম্যের অনুরাগী ছিলেন। পরমহংসদেবের ন্যায় নিত্যগোপালও সর্বধর্মসমন্বয়ের এক মূর্ত ... বিগ্রহ ছিলেন। 'যত মত তত পথ' ইহাই ছিল তাঁহার অন্তরের বাণী। অধুনাতন ভাব বৈষম্যের যুগে লোকোত্তর মহাপুরুষের এই জীবনী বহু অকিঞ্চনের হৃদয়ে আলোকসম্পাত করিবে সন্দেহ নাই। ভাষা প্রাঞ্জল ও বর্ণনাভঙ্গী মনোরম।"

রংপুর দর্পণ (৯।৩।৫৩): "...ভগবান্ নিত্যগোপালদেবের সম্ভাবনা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি নীরবে প্রচ্ছন্ন ভাবে লীলা করিয়া গিয়াছেন। ...তিনি নীরবতার ও প্রচ্ছন্নতার পক্ষপাতী কেন ছিলেন, তাহা আমরা জানি না। তবে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইলে এই দুইটী অবস্থা যে অপরিহার্য্য—তাহা অস্বীকার করা যায় না। ...এই লোকোত্তর মহাপুরুষের জীবন...প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। ...সে যুগে, যে কয়েকজন ধর্ম্মগুরুর আবির্ভাব হইয়াছিল, তন্মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থের নায়ক জগদ্গুরু শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল অবধূত মহারাজ অন্যতম।...শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল মহারাজ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাসাধক ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাব—তাঁহার জীবনের ঘটনা—তাঁহার তিরোভাব, সবকিছুই

অলৌকিক। শ্রীশ্রীঠাকুর…অপ্রকট হইলেও বহু অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি এখনও তাঁহার অযাচিত কৃপা ও করুণার জলন্ত দৃষ্টান্তের কথা জানিতে পারা যায়। …ঠাকুরের এই জীবনী উপন্যাসের ন্যায় মনোরম হইয়াছে। …—পাঠ করিতে বসিলে সমাপ্ত না করিয়া ছাড়া যায় না। গ্রন্থকারের সুন্দর রচনা শক্তি আছে। এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহার লেখনী জয়যুক্ত হউক। ওঁ তৎসৎ।"

হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ।

শিক্ষক, কলিকাতা (জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়, ১৩৫৬):"…এই পুস্তকে স্বামী ওঙ্কারানন্দ বাংলাদেশের একজন লোকোত্তর-চরিত্র মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। এই মহাপুরুষ ৯০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মান্বেষী ব্যক্তিগণের প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে বহু নিরাশ্রয়, ব্যথিত ও সংশয়-নিপীড়িত ব্যক্তি জীবনে অব্যক্ত ভগবৎ অনুভূতি জনিত আনন্দ লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছিলেন।

মহাপুরুষের জীবনী যত আলোচিত হয় ততই আমাদের লাভ। ধার্ম্মিক ব্যক্তি মাত্রই এই জীবনী পাঠে আনন্দ লাভ করিবেন।"

হিন্দুস্থান, কলিকাতা (৭।৫।৫৪): "…শ্রীমন্নিত্যগোপাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক ছিলেন। এতদুভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের যে সংবাদ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নানা দিক হইতে মূল্যবান্।… পরমহংসদেবের ন্যায় শ্রীমন্নিত্যগোপালও সমন্বয়বাদী ছিলেন।" গ্রন্থখানিতে এই…মহাপুরুষের জীবনী প্রাঞ্জল ভাষায় চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। …ধর্ম্মজিজ্ঞাসুরা পড়িয়া উপকৃত হইবেন।"

The Amrita Bazar Patrika, Calcutta (18. 8. 46.): "…Nityagopal had no worldly inclinations from his early boyhood. He lived a dedicated life and often lost himself in Super-consciousness and became one with the Infinite…Numerous followers gathered around him and he had a big community of disciples. We have no doubt that this detailed biography of the great man will provide useful guidance and incentives to all spiritual aspirants."

যুগান্তর, কলিকাতা (১৫।৫।৫৩): "…উক্ত গ্রন্থ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল (যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীঅবধূত জ্ঞানানন্দ) দেবের অদ্ভুত বিবেক, অদ্ভুত বৈরাগ্য, অদ্ভুত জ্ঞান, অদ্ভুত ভক্তি, অদ্ভুত প্রেম সমন্বিত অলৌকিক লীলা কাহিনী। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল, ভাবব্যঞ্জক ও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল… কত উন্মার্গগামীকে প্রকৃত ধর্ম্মপথে চালিত করিয়াছিলেন, কত সংশয়াত্মার চিত্ত জ্ঞান ভক্তির আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকলের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ শ্রবণেই তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। ভগবানের যে কোন নাম কীর্ত্তনেই তাঁহার চিন্ময় দেহে অষ্টসাত্ত্বিকভাবের প্রকাশ পাইত। গ্রন্থকারের বিবরণের গুণে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের লোকোত্তর চরিত্রটী উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা পাঠে পাঠকমাত্রই চমৎকৃত হইবেন ও পরম আনন্দ লাভ করিবেন বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদের এই বই ভাল লাগিবে বলিয়া আশা করা যায়।"

নিবেদন

(প্রথম সংস্করণ)

মদীয় পরমারাধ্য আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিত্যপদানন্দ অবধূত মহারাজের শ্রীশ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিবার পর তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত (তদীয় পরমপূজ্য গুরুদেব) ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল (যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ) দেবের অলৌকিক ও অপূর্ব্ব লীলা-কাহিনী শ্রবণ পূর্ব্বক এতই আনন্দ লাভ করিতাম যে, দিবানিশি মুহূর্ত্তবৎ অতীত হইয়া যাইত। ঐ লীলারস নিভৃতে আস্বাদন করিবার মানসে আমি সেই শ্রুত বিষয়গুলি সহজ ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম। ইহা আমার আচার্য্যদেব এবং কতিপয় পরমার্থ ভ্রাতা ব্যতীত অপর কেহই অবগত ছিলেন না; কিন্তু আমি গোপন করিলেও শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের ইচ্ছায় তাহা কালীঘাট মহানির্ব্বাণমঠের অনেকে অবগত হইলেন; এমন কি, একদিন পূজনীয় শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিত্যানন্দ অবধূত মহারাজ তাঁহার জনৈক পরমার্থ ভ্রাতার সহিত নিজ দয়াগুণে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আমার সংগৃহীত ঘটনাবলী শ্রবণ করিলেন। যদিও গ্রন্থ লিখন কার্য্য আমার জীবনে এই প্রথম প্রয়াশ এবং মাদৃশ মূঢ়ের পক্ষে নিত্য-চরিত্র লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা ধৃষ্টতামাত্র, তথাপি উক্ত স্বামী মহারাজ এবং তদীয় ভ্রাতা আমার রচনায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আমিও "মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং" উক্তি স্মরণ পূর্ব্বক এই দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকায় আমি এই সুমহৎ কার্য্য যথাসময় সমাধা করিতে পারি নাই।

আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, "শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল চরিতামৃত" গ্রন্থ প্রণয়নে পূজনীয় শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিত্যানন্দ অবধূত মহারাজ আমাকে

যথেষ্ট সাহায্য এবং উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিত্যগৌরবানন্দ অবধূত মহারাজের, শ্রীশ্রীমৎ স্বামী হরিপদানন্দ অবধূত মহারাজের, শ্রীযুক্তা গোলাপসুন্দরী দেবীর ও শ্রীযুক্তা নির্মলাবালা দেবীর গ্রন্থনিচয়, শ্রীযুক্ত ধর্মদাস রায় মহাশয়ের কড়চা, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ডায়েরি ও অন্যান্য নিত্য-ভক্তগণের রচনা হইতে আমি এই গ্রন্থ প্রণয়নে যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ স্বামী কেশবানন্দ, শ্রীশ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ, শ্রীশ্রীমৎ স্বামী হরিস্বরূপানন্দ, শ্রীশ্রীমৎ স্বামী কালীপদানন্দ, শ্রীশ্রীমৎ স্বামী শ্যামসুন্দরানন্দ, শ্রীশ্রীমৎ স্বামী মহেশ্বরানন্দ, শ্রীশ্রীমৎ স্বামী গুরুগৌরবানন্দ, শ্রীশ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ ও শ্রীশ্রীমৎ স্বামী [illegible]ানন্দ অবধূত মহারাজগণের নিকট হইতেও কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীনিত্য-লীলা[illegible] শ্রবণ করিয়া আমি এই গ্রন্থ রচনা কার্যে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহাদের সকলের শ্রীশ্রীপাদপদ্মে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এখানে আরও বক্তব্য এই যে, শ্রীতুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত পুস্তকখানিও উক্ত কার্য্যে আমার সহায়তা করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ইহাও জানাইতেছি যে, এই মহৎ কার্য্যে আমার যে সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী পরমার্থ ভ্রাতা-ভগিনী এবং বন্ধুবান্ধব আর্থিক, কায়িক ও মানসিক সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলোদ্দেশে ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি। স্থানাভাবে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না। সর্ব্বোপরি বক্তব্য এই যে, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের অহেতুকী কৃপায় যে "শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল চরিতামৃত" সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ লিখিতে সমর্থ হইয়াছি তজ্জন্য তাঁহার শ্রীশ্রীচরণকমলে কোটি কোটি প্রণাম জ্ঞাপন করিতেছি।

বর্ত্তমান সময়ে গ্রন্থ মুদ্রণ কার্য্য অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। তাহা সকলেই অবগত আছেন। সেইজন্য গ্রন্থ-মূল্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম। যাহাহউক, কাগজাদির মূল্য হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থ-মূল্যও হ্রাস করিবার ইচ্ছা রহিল।

নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যে মুদ্রণ কার্য্য সমাপন করিতে হইল। তাই, শুদ্ধিপত্রে নির্দ্দেশ সত্ত্বেও গ্রন্থে আরও ভুল-ভ্রান্তি থাকিবার সম্ভাবনা রহিল; কিন্তু আশাকরি, তাহাতে পাঠকবর্গের ভাব গ্রহণে কোন অসুবিধা হইবে না।

উপসংহারে আমি বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে, এই গ্রন্থের সর্ব্ব-সংস্করণের সর্ব্বস্বত্ব মদীয় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিত্য-পদানন্দ অবধূত মহারাজের ইংরাজী ১৯৪৪ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে সম্পাদিত দেবোত্তর দলিল অনুসারে নিযুক্ত ট্রাষ্টিবর্গের হস্তে সমর্পণ করিলাম। উহার আয় নদীয়া জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপ ধামস্থ দেয়ারা-পাড়ায় মদাচার্য্যদেবের প্রতিষ্ঠিত মহানির্ব্বাণমঠের শ্রীবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীশ্রীনিতগোপাল দেবের সেবায় সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হইবে।

মহানির্ব্বাণমঠ,
নবদ্বীপ ধাম (নদীয়া)।
মহালয়া।
নিতাব্দ ৯১।.সন ১৩৫২সাল,
তারিখ ১৮ই আশ্বিন, শুক্রবার।

বিনীত গ্রন্থকার—
শ্রীশ্রীমৎ স্বামী ওঙ্কারানন্দ
পরিব্রাজকাবধূত।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

নিবেদন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব অত্যন্ত গোপনভাবে থাকিতেন। মনে হয়, তাঁহার এই আদর্শে শ্রদ্ধাবান্ তদীয় সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও লোকসঙ্গ বর্জ্জনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্যই এক সময়ে জনপ্রবাদ শ্রুত হইয়াছিল যে, 'কলিকাতা-মহানির্ব্বাণমঠের সাধুরা কারু সাথে কথা বলেন না'; এবং এইজন্যই সম্প্রতি একদা জনৈক বিশেষ নিষ্ঠাবান্ নিত্য-ভক্ত জনৈক প্রশিষ্যের সহিত কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "ভেবেছিলাম, যাঁরা কারু সাথে কথা বল্‌বেন না তাঁরা যখন আপনাদেক্ আশ্রয় দিয়েছেন, তখন মনে করি, বিনা সাধন-ভজনে তাঁদের কৃপাতেই আপনাদের ধর্ম্ম-জীবনে উন্নতি লাভ হ'বে।" প্রকৃতপক্ষে, শ্রীশ্রীনিত্যদেবের শিষ্যবৃন্দ অগাধ, আদর্শ গুরু-ভক্তি ও অটল গুরু-বিশ্বাস প্রভাবে ধর্ম্ম-জীবনে যেরূপ উন্নত, যেরূপ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ও যেরূপ তত্ত্বদর্শী স্বল্পকাল মধ্যেই হইয়া উঠিয়াছিলেন* এবং তিনি দিব্যানুভূতি-প্রসূত, সমন্বয়-মূলক ও অতি-হৃদয়-গ্রাহী যে সকল অপূর্ব্ব-মীমাংসা-গ্রন্থ (অতি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া) রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে নিত্য-ভক্তগণ একটু সচেষ্ট হইলে স্বল্পায়াসে বা অনায়াসেই শ্রীশ্রীদেবের মাহাত্ম্যের বহুল প্রচার করিতে সমর্থ হইতেন। এতদ্ব্যতীত, উচ্চ-শিক্ষা-প্রাপ্ত ভক্তের সংখ্যাও এ সম্প্রদায়ে স্বল্প ছিল না বা এখনও নাই। তথাপি আত্ম-

*বলাবাহুল্য, শ্রীশ্রীদেবের অনেক সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ শিষ্য শ্রীনিত্যধামে গমন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কয়েকজন মাত্র আছেন। তাঁহারাও প্রায়শঃ বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

গোপনশীল, নির্জ্জন-বাস-প্রিয় বা লোক-সঙ্গ-বিমুখ ভক্তগণ উক্ত কার্য্যে পরাঙ্মুখ থাকায় শ্রীশ্রীনিত্যদেবের মাহাত্ম্য অদ্যাপিও অনেকেই অবগত নহেন। এই সমস্ত কারণে এই গ্রন্থ-মুদ্রণ-সময়ে ইহার প্রচার সম্বন্ধে আমার মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করতঃ এবং শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের ও তাঁহার অহৈতুকী করুণার উপর নির্ভর করিয়া 'ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য' পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম। বাস্তবিকই, তৎকৃপায় সহৃদয় ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিবৃন্দের বিশেষ সাহায্যে (সংবাদপত্রাদিতে সেরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করিলেও এবং নাটক-নভেলাদির পাঠকের তুলনায় এরূপ গ্রন্থের পাঠক অল্পসংখ্যক হইলেও) গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার অল্পকাল মধ্যেই ইহা সাগ্রহে ও সভক্তিতে নানাস্থানে গৃহীত হইতে লাগিল। পুস্তক-বিক্রেতাগণ পর্য্যন্ত বিক্রয়ার্থ ইহা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইজন্য গ্রন্থখানির নিঃশেষের পন্থা উন্মুক্ত হইল বটে; কিন্তু ভিক্ষা-জীবী আমরা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারায় ইহার দ্বিতীয়-সংস্করণ-মুদ্রণ-কার্য্য অনেকদিন বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। যাহাহউক, যাঁহার জীবনী তিনিই নিজ দয়াগুণে এই ভীষণ সমস্যার সময়েও অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থা করায় এই সংস্করণ ধর্ম্মপ্রাণ-পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিলাম।

এই গ্রন্থের প্রথম-সংস্করণ-পাঠে সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেও আমাদের সম্প্রদায়ের কাহারও কাহারও মতে হুগলী-লীলাতে আরও কতিপয় ঘটনা বিবৃত করা উচিত ছিল। তাই, তাঁহাদের অভিমত সম্মানপূর্ব্বক এই সংস্করণে 'আরও কতিপয় ঘটনা' সন্নিবেশিত করা হইল; এবং এই কার্য্যে নলহাটী-মহানির্ব্বাণমঠের শ্রীমৎ নিত্যপরমানন্দ ব্রহ্মচারী দাদার রচিত পুস্তকখানিও আমার সহায়তা করিয়াছে। এখন আমার বক্তব্য এই যে, পাঠকবৃন্দের মানস-পটে শ্রীশ্রীদেবের একখানি ক্ষুদ্র অথচ সমুজ্জ্বল প্রতিকৃতি অঙ্কনই আমার এই জীবনী-লিখনের উদ্দেশ্য। তাই,

ইহাতে ঘটনাবলী সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। সেইজন্য ইহাতে ভক্তবৃন্দের সমস্ত অনুভূতি প্রভৃতি* লিপিবদ্ধ করিবার ঐকান্তিকী ইচ্ছাকে অতি কষ্টে সংযত করতঃ আমাকে চলিতে হইয়াছে। আবার, ভক্ত-তারকা-বেষ্টিত 'শ্রীশ্রীনিত্যচন্দ্রে'র পূর্ণাঙ্গ প্রতিমূর্ত্তি একখানি পাঠকবৃন্দকে প্রদান করা কোনওক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না ; কেননা সমস্ত ভক্তের দর্শন-ও-সঙ্গ-লাভ আমার ভাগ্যে হইয়া উঠে নাই বলিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে স্ব স্ব দর্শন ও অনুভূতির বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আবার, নিত্য-ভক্তবৃন্দ প্রায়শঃ শ্রীনিত্য-ধামে গমন করিয়াছেন। বাস্তবিকই, কত ভক্তের জীবন-লীলা-সাঙ্গ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কত ঘটনাই যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এতদ্ব্যতীত, সমস্ত ভক্তের অনুভূত, দৃষ্ট ও পরিজ্ঞাত বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর হইলেও তাহা অতি বিরাট আকার ধারণ করিত, এবং মুদ্রিত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। এই সমস্ত কারণেও আমাকে শ্রীশ্রীদেবের জীবনেতিহাসের সংক্ষিপ্ত-বিবরণ-দানেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। এমন কি, এমন ভক্ত ছিলেন বা এখনও আছেন, যাঁহার নিজের পরিজ্ঞাত ঠাকুরের জীবনের সমস্ত ঘটনা

---

*বাস্তবিকই, নিত্য-ভক্তগণ নানা সময়ে শ্রীশ্রীদেবের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করা অবধি (কোন কোন স্থলে পূর্ব্ব হইতেও) এ যাবৎ (এবং শ্রীনিত্য-ধাম-গত ভক্তবৃন্দ আদেহরক্ষা) তন্মহিমা-ও-কৃপা কতবার ও কতভাবেই যে দর্শন ও অনুভব করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণভাবে (এমন কি, অংশতঃও) সংগ্রহ, বর্ণনা ও প্রকাশ করা কাহারও পক্ষে কোনও-ক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না। এ বিষয় সহজেই অনুমেয়। সম্ভবতঃ এমন অনেক ভক্ত ছিলেন, যাঁহারা এই সম্প্রদায়ে এক রকম অপরিচিতই ছিলেন। আবার, শ্রীশ্রীদেবের পরিব্রাজকতার সময় যাঁহারা তাঁহার কৃপা-লাভ করিয়াছিলেন (যতদূর জানি) তাঁহাদের সন্ধান কেহই রাখেনও নাই, (বলাবাহুল্য) এখনও রাখেন না। তাই তাঁহার পূর্ণাঙ্গ জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ হইতেই পারে না।

খিতে গেলেই একখানি অতি বৃহৎ গ্রন্থের সৃষ্টি হইতে পারে। এ
ন্তও আমার মনে হয় যে, অত্যধিক-ঘটনাবহুল জীবন-কাহিনী লিখনের
ষ্টা না করিয়া এমন ইতিহাস অঙ্কন করা প্রয়োজন যাহাতে নিত্য-চরিত্র
জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠে। এই গ্রন্থে তাহাই যাহাতে করিতে পারি তাহার
্য শ্রীশ্রীনিত্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে বিশেষভাবে প্রার্থনা করতঃ কর্ত্তব্য
পাদন করিয়াছি। এই সঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, অনেক নিত্য-ভক্ত
শ্রীদেবের মহিমা সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহাও
যাকে এই সংস্করণ প্রণয়নেও বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে।

বলাবাহুল্য, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ শ্রীযুক্ত
হিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণের
বিখ্যাত মনীষিদিগের গ্রন্থ সম্বন্ধে সুচিন্তিত উক্তি ও কয়েক-
। প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের ও মাসিক পত্রিকার সুসমালোচনা এই গ্রন্থ
র কার্য্যে আমার প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। ইহা সহজেই অনুমেয়
া বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা করে না।

বাস্তবিকই, যাঁহাদের বিশেষ সাহায্যে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ
শ করিতে সক্ষম হইলাম, তাঁহাদের সকলকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ
ন অসম্ভব বলিয়া আমি সমবেতভাবে সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা
ন করিতেছি এবং তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলার্থ শ্রীশ্রীদেবের শ্রীপাদপদ্মে
নোবাক্যে প্রার্থনা জানাইতেছি। আশা করি, এই সংস্করণের
কার্য্যেও পূর্ব্ববৎ সকলেরই সহানুভূতি ও সহায়তা বিশেষভাবেই লাভ
।

গ্রন্থ-মুদ্রণ-কার্য্যাদিতে ব্যয় বাহুল্য বশতঃ বর্ত্তমান সংস্করণেও গ্রন্থ-
াস করাও সম্ভবপর হইলই না; বরঞ্চ গ্রন্থে অনেক নূতন নূতন
সন্নিবেশিত করায়, কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় ও মুদ্রণ-কার্য্যে
পক্ষা অধিকতর ব্যয় হওয়ায় বাধ্য হইয়া ইহার মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি
ত হইল। বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক মুদ্রণ-কার্য্য সমাধা

সুতরাং করা হইয়াছে। তথাপি ভুল-ভ্রান্তি থাকিতে পারে। আশা করি, তাহাতে আখ্যান-বস্তুর ভাবগ্রহণে কোনও অসুবিধাই হইবে না। কিমধিকমিতি—

মহানির্ব্বাণমঠ,
নবদ্বীপধাম (নদীয়া)।
শ্রীশ্রীকালীপূজা।
নিত্যাব্দ ৯৮। সন ১৩৫৯সাল,
তারিখ ৩০শে কার্ত্তিক. রবিবার।

বিনীত গ্রন্থকার—
শ্রীমৎ স্বামী ওঙ্কারানন্দ
পরিব্রাজকাবধূত।

সূচীপত্র

আদি লীলা

বিষয় পৃষ্ঠা

মধ্য লীলা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

অন্ত্য লীলা

বিষয় পৃষ্ঠা

ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের
শুভ জন্ম-পত্রিকা

সন ১২৬১ সালের ১৩ই চৈত্র রবিবার বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে, শুক্লপক্ষে, আর্দ্রানক্ষত্রে, মিথুন রাশিতে, কুম্ভ লগ্নে ৩৬ দণ্ড ৮০ পল সময়ে যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত দেবের (ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের) আবির্ভাব।

শকাব্দা ১৭৭৬।১১।১২।৫৩।১০।০। ইং ১৮৫৫।২৫শে মার্চ্চ।

রাশিচক্র

শ ৪ চ ৩	শু ১ রা ২	র ২৬, ম ২৫ লং বৃ ২৩, বু ২৪
	কে ১০	

লগ্নপতি শনি কেন্দ্রে অবস্থান করতঃ লগ্নভাবে পূর্ণ দৃষ্টি করায় এবং লগ্নে বুধ ও বৃহস্পতি অবস্থান করায় পরম রূপবান্, সৌম্যমূর্ত্তি, শান্ত, মেধাবী, প্রিয়বাদী, উদার-স্বভাব, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানী এবং সুধী সজ্জনদের [illegible] ছিলেন।

"সুমূর্ত্তির্নিপুণঃ শান্তোমেধাবী চ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিদ্বান্ দয়াপরশ্চৈব শশিপুত্রে তনুস্থিতে॥
কবিঃ সুগীত প্রিয়দর্শনঃ শুচির্দাতা চ ভোক্তা নৃপপূজিতঃ সুখী।
দেববিজারাধনতৎপরোধনী ভবেন্নরোদেবগুরৌ তনুস্থিতে॥
দাতা ভোক্তা প্রচুরযুবতীনায়কো বিশ্ববন্ধু
ব্রহ্মজ্ঞানী বিনয়বশগঃ স্বামীদৃষ্টে বিলগ্নে॥" (কোঃ প্রঃ)

ধনপতি বৃহস্পতি লগ্নে কেন্দ্রস্থ এবং ধনভাবে অর্থাৎ বাক্যস্থানে দশম ও সপ্তম কেন্দ্র পতিদ্বয়ের একত্র অবস্থান জনিত সম্বন্ধ হওয়ায় ইনি মধুরভাষী হইলেও তেজস্বী, সুবক্তা, শাস্ত্র-মীমাংসায় সুপটু, অল্প কথায় লোকের সন্তোষ বিধান করতঃ অকাট্য যুক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে সর্ব্বমত অনায়াসে খণ্ডনপূর্ব্বক স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতে সুপণ্ডিত ছিলেন।

চতুর্থ পতি ও চতুর্থ ভাব স্ত্রী গ্রহ হওয়ায় এবং চন্দ্রের প্রতি স্নেহদৃষ্টি থাকায় ইনি কোমল-প্রাণ এবং স্নেহ মমতার বা দয়ামায়ার আধার ছিলেন। কিন্তু মঙ্গলের পূর্ণদৃষ্টি চন্দ্রের উপর পতিত হওয়ায় এই কোমলপ্রাণই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বজ্রাদপি কঠোর হইতেন।

বিদ্যাস্থানাধিপতি বুধ লগ্নে কেন্দ্রে মিত্র গৃহে একাদশপতি বৃহস্পতি সহ অবস্থান করায় ও বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি বিদ্যাস্থানে পতিত হওয়ায় এবং চন্দ্র বিদ্যাস্থানে অবস্থান করায় ইনি কোন স্কুল কলেজে না পড়িয়াও সর্ব্ব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অদ্ভুত জ্ঞানসম্পন্ন, সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং সর্ব্বধর্ম্ম মীমাংসায় সুদক্ষ ও যেকোন প্রতিকূল মতাবলম্বীকে স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে প্রতি-কূল মত অপসারিত করতঃ সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক সন্তোষ বিধানে সমর্থ ছিলেন।

শত্রুস্থানে শনির পূর্ণ দৃষ্টিহেতু ইনি অজাতশত্রু ছিলেন বা শত্রুতা করিয়া কেহ কখন কৃতকার্য্য হয় নাই।

পত্নী-স্থানাধিপতি রবি ও শুক্র পাপযুক্ত এবং পত্নীস্থানে রাহুর পূর্ণ দৃষ্টি পতিত হওয়ায় ইনি বিবাহ করেন নাই ও সংসারে অনাসক্ত, কঠোর

ত্যাগী বা অদ্ভূত বৈরাগ্য সম্পন্ন ছিলেন।

ধর্ম্মস্থানে ধর্ম্মপতির পূর্ণ দৃষ্টি পতিত হওয়ায় এবং ধর্ম্মস্থানদৃষ্ট ধর্ম্ম-কারক বৃহস্পতি শনি গৃহে অবস্থান করতঃ শনি কর্ত্তৃক পূর্ণ দৃষ্ট হওয়ায় ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শনি ও বৃহস্পতির আনুকূল্য ব্যতীত কেহ কখন ধার্ম্মিক হইতে পারেন না। শনির প্রব্রজ্যা দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বৃহস্পতির দশায় গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। পরন্তু এই সকল গ্রহের প্রভাবেই সর্ব্বধর্ম্মের ঐক্য বিধান করতঃ সুখ-দুঃখের অতীত পরমহংসাচার্য্য হইয়া কৈবল্যদায়ক ছিলেন।

"মীনে মেষে বৃষে চৈব তুলায়াং চ স্থিতেগ্রহে।
যোগঃ কনকদণ্ডাখ্যোদেবানামপিদুর্ল্লভঃ॥" (কোঃ প্রঃ)
"কারকে শুভরাশ্যংশে লগ্নাশংস্থে শুভগ্রহে।
পাপদৃক্ যোগরহিতে কৈবল্যং তস্যনির্দ্দিশেৎ॥" (পঃ সং)

আরও বিবিধ যোগাদি থাকায় সর্ব্বধর্ম্ম সংস্থাপন কর্ত্তা অতিমানব বা অবতার কল্পের সূচনা করিতেছে। বিস্তার ভয়ে প্রমাণ প্রয়োগাদি আরও উল্লেখ না করিয়া সংক্ষেপে বর্ণনাতীত পুরুষোত্তমের রাশিচক্র বিচার করা হইল।

সংশোধক ও বিচারক—
পণ্ডিত—শ্রীমদনমোহন গোস্বামী,
কাব্য-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ, তন্ত্রাচার্য্য, সামুদ্রিকরত্ন ইত্যাদি।
"কল্পদ-জ্যোতিষাগার,"
পোড়ামাতলা রোড, শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীনিত্যপঞ্চাক্ষরনামস্তোত্রম্

অজ্ঞানধ্বান্তনাশায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
নিকারায় নমস্তস্মৈ গুরবে নিত্যরূপিণে ॥
বিশুদ্ধবর্ণরূপায় জ্ঞানবিজ্ঞানদায়িনে।
ত্যকারায় নমস্তস্মৈ গুরবে নিত্যরূপিণে ॥
ব্রহ্মানন্দস্বরূপায় জগদুৎপত্তিকারিণে।
গোকারায় নমস্তস্মৈ গুরবে নিত্যরূপিণে ॥
ভক্তানাং প্রাণরূপায় সাধূনাং ত্রাণকারিণে।
পাকারায় নমস্তস্মৈ গুরবে নিত্যরূপিণে ॥
উমাসেবিতপাদায় শঙ্করায় পরাত্মনে।
লকারায় নমস্তস্মৈ গুরবে নিত্যরূপিণে ॥
সর্ব্বস্বগুরবে নিত্যগোপালায় চিদাত্মনে।
শ্রীমতে বিশ্বনাথায় মন্নাথায় নমো নমঃ ॥
পঞ্চাক্ষরমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্গুরুসন্নিধৌ।
ত্রিসন্ধ্যং বা পঠেত্তস্তু স লভেদ্ বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥

ওঁ তৎসৎ!

ওমিতি শ্রীশ্রীনিত্যপঞ্চাক্ষরনামস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীনিত্যগোপালদেবং ভজামি
শ্রীনিত্যগোপালদেবং স্মরামি।
শ্রীনিত্যগোপালদেবং বন্দামি
শ্রীনিত্যগোপালদেবং নমামি ॥

ওঁ তৎসৎ!

ওম্! ওম্!! ওম্!!!

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল চরিতামৃত

আদি লীলা

প্রথম অধ্যায়

জন্ম বৃত্তান্ত

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥"

গীতা, ৯ম শ্লোঃ, ৪র্থ অঃ।

[হে অর্জ্জুন, যিনি আমার স্বেচ্ছাকৃত জন্ম ও ধর্ম্ম-পালনরূপ অলৌকিক কর্ম্ম লোকানুগ্রহার্থ বলিয়া অবগত হন, তিনি শরীর পরিত্যাগ করিয়া পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হন।]

ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব কলিকাতায় আহিরীটোলার প্রসিদ্ধ বসু বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জন্মেজয় বসু। মহাত্মা জন্মেজয়ের পিতা পুণ্যাত্মা রামকানাই বসু। তাঁহার পিতামহ প্রসিদ্ধ দেওয়ান রামকান্ত বসু। তিনি একজন পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি নিজ নামে হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগরে রামকান্তেশ্বরী নামে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

জনৈক অবধূতের* শিষ্য মহাত্মা জন্মেজয় অতিশয় ধর্ম্ম-পরায়ণ

---

*অবধূত ও অবধূত লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১)

"ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী।
ন বীরো ন ধীরো ন বা সাধকেন্দ্রঃ॥

ছিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও ধার্ম্মিক-প্রবর জন্মেজয় নির্লিপ্তভাবে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতেন। তাঁহার তিন সহধর্ম্মিণী। কনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণীর নাম গৌরী দেবী। ইনিই শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের জননী। গৌরী দেবী সাক্ষাৎ উমা দেবীর ন্যায় রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না ও অতীব শুদ্ধান্তঃকরণা রমণী ছিলেন। দক্ষিণা কালীর পূজায় তাঁহার অতিশয় রতি ছিল। তাঁহার দুই কন্যা—প্রথমার নাম কৃষ্ণবিনোদিনী ও দ্বিতীয়ার নাম নিত্যকালী। কৃষ্ণবিনোদিনী অতি শৈশবেই মানবলীলা সংবরণ করেন। একমাত্র নিত্যকালীই পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনগণের নয়নরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥"

গীতা, ৬ষ্ঠ শ্লোঃ, ৪র্থ অঃ।

[আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর ও সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় শুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক স্বকীয় মায়াবলম্বনে সুনির্ম্মল জাজ্জ্বল্যমান সত্ত্ব-মূর্ত্তিতে স্বেচ্ছাবশতঃ জন্মগ্রহণ করি।]

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বঙ্গদেশের অন্তর্গত চব্বিশপরগণা জেলায় কলিকাতা হইতে প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ উত্তরে পাণিহাটী নামে একটী

ন শৈবো ন শাক্তো ন বা বৈষ্ণবশ্চ।
রাজতেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

["অবধূত যোগীর ন্যায় যোগ নিয়মের বশীভূত নহেন, বিষয়ীর ন্যায় ভোগ-পরায়ণ নহেন, জ্ঞানীর ন্যায় মোক্ষাকাঙ্ক্ষী নহেন, তিনি বীরের ন্যায় বল-প্রকাশক নহেন, ধীরের ন্যায় সংযমাভ্যাসী নহেন। তিনি শৈবও নহেন, শাক্তও নহেন, বৈষ্ণবও নহেন। তিনি কোন উপাসক-সম্প্রদায়ের নিয়ম-নিষেধের অনুগামী বা বিদ্বেষ্টা নহেন। তিনি পরমানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য বিরাজ করিয়া থাকেন।"]

প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। তৎকালে ইহা একটী সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল। ইহার পশ্চিম দিক্ দিয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথী প্রবাহিতা। গ্রামটী বৈষ্ণবদিগের একটী পরম তীর্থস্থান। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল হইতে প্রত্যাগমন কালে এই গ্রামেই পণ্ডিতপ্রবর রাঘব চূড়ামণিকে দর্শন দানে কৃতার্থ করেন। তদবধি ইহা রাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশীতে এই পাণিহাটী

---

(২)

"যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমান্ বর্ণান্ আত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্।
অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে॥"

["যে পুরুষ সমস্ত আশ্রম এবং সমস্ত বর্ণকে অতিক্রম করিয়া আত্মাতেই অবস্থান করেন, বর্ণাশ্রমের অতীত সেই যোগী 'অবধূত' বলিয়া উক্ত হন।"]

(৩)

"অক্ষরত্বাদ্ বরেণ্যত্বাৎ 'ধূত'-সংসারবন্ধনাৎ।
তত্ত্বমস্যর্থসিদ্ধত্বাৎ 'অবধূতো'ঽভিধীয়তে॥"

["যিনি বিষয় সন্নিধানেও নির্ব্বিকার হইয়াছেন, যিনি আধ্যাত্মিক জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছেন, যিনি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং যিনি 'তত্ত্বমসি' (অর্থাৎ 'তুমি সেই নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব ব্রহ্মাত্মা') এই মহাবাক্যের অর্থ সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া পরমার্থদর্শী হইয়াছেন, তিনিই 'অবধূত' বলিয়া অভিহিত হন।"]

(৪)

"উক্তাবধূতো দ্বিবিধঃ—পূর্ণাপূর্ণবিভেদতঃ।
পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ—পরিব্রাড়পর প্রিয়ে॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

["পূর্ণ ও অপূর্ণ ভেদে উক্তাবধূতগণ দুইভাগে বিভক্ত। হে প্রিয়ে। পূর্ণ-ভাবসম্পন্ন অবধূতগণ "পরমহংস" ও যাঁহারা সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করেন নাই তাঁহারা (অর্থাৎ সাধকাবধূতগণ) "পরিব্রাজক" বলিয়া বিখ্যাত।"]

গ্রামে বৈষ্ণব চূড়ামণি মহাত্মা রঘুনাথ গোস্বামীর "দণ্ড মহোৎসব" নামে একটী মহোৎসব হইয়া থাকে। এইস্থানে বহু ভদ্র পরিবার বাস করিতেন এবং অদ্যাপি করেন। তন্মধ্যে পুণ্যাত্মা সীতানাথ ঘোষ মহাশয় আমাদের শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের মাতামহ। ইহাঁরই সহধর্ম্মিণী দেবী আনন্দময়ীর গর্ভে যথাক্রমে ভক্তিমতী ছয় কন্যা ও এক গুণবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

(৫)

"অবধূতলক্ষণং বর্ণৈর্জ্ঞাতব্যং ভগবত্তমৈঃ।
বেদবর্ণার্থতত্ত্বজ্ঞৈর্বেদবেদান্তবাদিভিঃ॥
আশাপাশবিনির্ম্মুক্ত আদিমধ্যান্তনির্ম্মলঃ।
আনন্দে বর্ত্ততে নিত্যমকারস্তস্য লক্ষণম্॥
বাসনা বর্জ্জিতা যেন বক্তব্যঞ্চ নিরাময়ম্।
বর্ত্তমানেষু বর্ত্তেত বকারস্তস্য লক্ষণম্॥
ধূলিধূসরগাত্রাণি ধূতচিত্তো নিরাময়ঃ।
ধারণাধ্যাননির্ম্মুক্তো ধূকারস্তস্য লক্ষণম্॥
তত্ত্বচিন্তা ধৃতা যেন চিন্তাচেষ্টাবিবর্জ্জিতঃ।
তমোঽহঙ্কারনির্ম্মুক্তস্তকারস্তস্য লক্ষণম্॥"

অবধূত গীতা।

["ভগবত্তম বেদবর্ণার্থতত্ত্বজ্ঞ ও বেদবেদান্তবাদিগণ অবধূতের লক্ষণ বর্ণে বর্ণে বিদিত হয়েন। আশাপাশবিমুক্ত, আদিমধ্যে ও অন্তে অর্থাৎ সর্ব্বথা নির্ম্মলপ্রকৃতি, নিত্য আনন্দে বিরাজ করা অ কারের লক্ষণ। বাসনা বর্জ্জন। নিষ্পাপ ব্যাখ্যানে ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া বর্ত্তমান দশাতেই আনন্দপূর্ব্বক বিরাজ করা ব কারের লক্ষণ। যাঁহার গাত্র ধূলিতে ধূসরিত, যিনি নিরাময় ও ধূতচিত্ত ও যিনি ধারণা ও ধ্যানাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন—ইহাই ধূ কারের লক্ষণ। যিনি বিষয়-চিন্তা-চেষ্টা-বর্জ্জিত ও তত্ত্বচিন্তা যাহার সর্ব্বক্ষণ, যিনি তম ও অহঙ্কার বিমুক্ত, ইহাই ত কারের লক্ষণ। বর্ণে বর্ণে অবধূতের লক্ষণ বর্ণিত হইল।"]

কন্যা ছয়জনের নাম—গৌরী দেবী, তুলসীনারায়ণী দেবী, বিমলাসুন্দরী দেবী, শ্যামাসুন্দরী দেবী বা কমলকামিনী দেবী, কালীকুমারী দেবী ও কৈলাসকামিনী দেবী।* পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ ঘোষ। বলা বাহুল্য, ইনিই আমাদের গৌরী দেবীর একমাত্র ভ্রাতা এবং শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেবের একমাত্র মাতুল ছিলেন। ইনি শোভাবাজারের রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে পিতা সীতানাথ ঘোষ মহাশয় পরলোকগমন করিলে, বৃদ্ধা মাতা একমাত্র পুত্র নবীনকৃষ্ণকে লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন।

মাতা আনন্দময়ীর আকাঙ্ক্ষা জন্মিল যে, স্বীয় কন্যা গৌরীমণি একটী পুত্র সন্তান লাভ করেন। তিনি লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে, কাশীধামে শ্রীশ্রীবীরেশ্বর নামে অনাদি লিঙ্গ শিব অধিষ্ঠিত আছেন। কাশীখণ্ড মতে কেহ পুত্র কামনা করিয়া তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে, তিনি তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। আনন্দময়ী এই শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন-পূর্ব্বক গৌরী দেবীকে সঙ্গে লইয়া কাশীধামে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা প্রত্যহ গঙ্গা স্নানান্তে বিল্বদল ও গঙ্গাজল দিয়া দেবাদিদেব বীরেশ্বরকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিতে লাগিলেন এবং শেষ তিনদিন তিনটী স্বর্ণ বিল্বপত্র দ্বারা পূজা সমাপন করিলেন। আনন্দময়ী সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, গৌরী দেবীর একটী পুত্র সন্তান লাভ হইলে, তিনি

*গৌরী দেবী ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের জননী। তুলসী-নারায়ণী দেবী সিমলা (কলিকাতা) মধুরায়লেন-নিবাসী ভগবান্ শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ পরমহংস দেবের বিশিষ্ট ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জননী। বিমলাসুন্দরী দেবী নিঃসন্তান। শ্যামাসুন্দরী দেবী বা কমলকামিনী দেবী ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ভক্ত সিমলা-নিবাসী মনোমোহন মিত্র মহাশয়ের জননী। কালীকুমারী দেবী নিঃসন্তান। কৈলাসকামিনী দেবী স্বনামপ্রসিদ্ধ বেচুচাটার্জ্জিষ্ট্রীট্-নিবাসী খ্যাতনামা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের জননী।

বীরেশ্বর দেবকে সহস্রছিদ্র রৌপ্য কলসী দ্বারা স্নান করাইয়া অষ্টোত্তর শত বিল্বদলে হোম করাইবেন এবং জাত বালকের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া বীরেশ্বর দেবের প্রসাদিত অন্নে তাহার শুভ অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সমাপন করিবেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া একমাস পূজার পর, তাঁহাদের ব্রত উদ্‌যাপনের সময় সাক্ষাৎ বীরেশ্বর দেবের ন্যায় দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন জটাজুট-ধারী দীর্ঘকায় এক মহাপুরুষ তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া দেবী আনন্দময়ী ও গৌরী দেবী অতিশয় বিস্মিতা হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ আশীর্ব্বাদ করিয়া আনন্দময়ীকে কহিলেন, "দেবি, তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। তোমার কন্যা এক অসাধারণ গুণসম্পন্ন পুত্র সন্তান লাভ করিবে; কিন্তু তাঁহাকে কাহারও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করাইবে না, বামহস্ত দ্বারা প্রহার করিবে না এবং নিয়ত নারায়ণের ন্যায় শুদ্ধাচারে রাখিবে।" এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইবামাত্র এক দিব্যজ্যোতিঃ গৌরী দেবীর শরীরে প্রবিষ্ট হইল। অতঃপর আনন্দময়ী ও গৌরী দেবী হৃষ্টান্তঃকরণে ব্রত উদ্‌যাপনপূর্ব্বক কাশীধাম হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন এবং আনন্দময়ী স্বীয় কন্যা গৌরীমণিকে তথায় শ্বশুরালয়ে রাখিয়া পাণিহাটীতে স্বগৃহে গমন করিলেন।

ইহার কয়েক মাস পরেই, প্রতি বৎসরের ন্যায় সে বৎসরও চৈত্র মাসে পাণিহাটী গ্রামে শ্রীকণ্ঠচরণ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা। মা মহিষমর্দ্দিনীর আগমনে দেশমধ্যে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। এই আনন্দের দিনে মাতা আনন্দময়ীও স্বীয় কন্যা গৌরীমণিকে আপন আলয়ে আনিলেন। আজ পাণিহাটী গ্রামে পূজা উৎসবে সকলেই মগ্ন। সকলেই আনন্দে আত্মহারা।

গৌরী দেবী প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করিতেন। পবিত্র গঙ্গাঘাট তাঁহার পিতৃভবন হইতে বেশী দূরও নহে। গঙ্গায় যাইবার পথে তাঁহার বাল্যসহচরীর বাটী। ইনি দোলনকালী মন্দিরের পুরোহিত

দীননাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্নী ছিলেন। প্রতিদিনের ন্যায় 'বাসন্তী মহাষ্টমী'র অপরাহ্নেও গৌরী দেবী তাঁহার বাল্যসহচরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। তখনও সূর্য্যদেব অস্ত যান নাই; কিন্তু দেখিতে দেখিতে গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। দুইচারি ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। এমন সময় গৌরী দেবী গঙ্গার ঘাটে উপনীত হইলেন এবং স্নানের উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে গঙ্গায় অবতরণ করিলেন। অতঃপর গঙ্গাগর্ভে আকণ্ঠ নিমজ্জিতা হইয়া ভক্তি-গদগদকণ্ঠে গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে তিনি তন্ময় হইয়া গেলেন। ক্রমে তাঁহার বাহ্যচৈতন্য লোপ পাইল। এমন সময় গঙ্গার প্রবল বন্যা আসিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। এদিকে পুরোহিত-পত্নী বন্যার শব্দ শুনিয়া নিজ পুত্রকে সইয়ের অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। সইপুত্র গঙ্গার ঘাটে আসিয়া দেখিলেন যে, ঘাটে কেহই নাই; কেবল অদূরে গঙ্গাবক্ষে একগুচ্ছ কেশ ভাসিয়া যাইতেছে। কালবিলম্ব না করিয়া সইপুত্র উক্ত কেশগুচ্ছ তাঁহার সইমারই মনে করিয়া, সাহসের সহিত গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিলেন এবং অতি কষ্টে সেই ভাসমান কেশগুচ্ছ ধরিয়া তীরে আনিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারই সইমা গঙ্গার প্রবল বন্যাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন। অতঃপর বহু চেষ্টায় তিনি গৌরী দেবীর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তখন পরম কারুণিক শ্রীভগবান্‌কে শত শত ধন্যবাদ দিয়া তিনি গৌরী দেবীকে আপন আলয়ে লইয়া আসিলেন এবং জননীর নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া পুরোহিত-পত্নীর নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর পুরোহিত-পত্নী সত্বর গৌরী দেবীর আর্দ্র বস্ত্র উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে একখানি লাল কস্তাপেড়ে নূতন শাড়ী পরিধান করাইলেন এবং ললাটে এক উজ্জ্বল সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া নিজ পুত্রের সহিত তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। দেবী আনন্দময়ী পূজারী পুত্রের নিকট সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া, কন্যার জীবন রক্ষার জন্য যুগপৎ

জগদম্বাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে সিক্ত হইতে লাগিলেন।

এ দিকে রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঝড়বৃষ্টিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই বাসন্তী অষ্টমীর গভীর রাত্রে গৌরী দেবীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। গৌরীদেবীর গর্ভকাল তখন আট মাস নয়দিন মাত্র। এরূপ হঠাৎ যে প্রসবকাল উপস্থিত হইবে তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই; সুতরাং প্রসবাগার নির্ম্মিত না থাকাতে, ছাদে উঠিবার সিঁড়ির পার্শ্বের ঘরটিই গৌরী দেবীর প্রসবাগাররূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। আমরা শুনিয়াছি, ঐ ঘরটি তখন অভ্র ও নানা দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে সুসজ্জিত ছিল। প্রসব বেদনা উঠিবামাত্র দেবী আনন্দময়ী পুত্র নবীনকৃষ্ণকে সত্বর ধাত্রী ডাকিতে আদেশ করিলেন। তখন আকাশ ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ও বৃষ্টিধারায় গ্রামটী উৎপীড়িত হইতেছিল। কড়্‌কড়্‌ শব্দে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছিল। এই দৈব-দুর্ব্বিপাক্ উপেক্ষা করিয়া ভ্রাতা নবীনকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ ধাত্রী ডাকিয়া আনিলেন। ধাত্রী আসিয়া সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করিল। এমন সময় শ্রীকণ্ঠচরণ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে মঙ্গল আরত্রির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। এদিকে প্রসবাগারে গৌরী দেবীর কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ না হইয়া প্রভূত রক্তস্রাব হইতে লাগিল। এই ব্যাপার দর্শনে ধাত্রী একেবারে স্তম্ভিতা ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িল। দেবী আনন্দময়ী সূতিকাগৃহের বাহিরে বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ধাত্রীমুখে কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ না হইয়া, 'কেবল রক্তস্রাব হইতেছে' শুনিয়া তিনি শশব্যস্তে সূতিকাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং এই ব্যাপার দর্শনে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া "বীরেশ্বরের পূজা, মহাপুরুষের বাক্য সকলই ব্যর্থ হইল!" বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ বিলাপের পর অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, গৃহকোণে রক্ষিত রক্তসিক্ত বস্ত্রাভ্যন্তরে কি যেন একটা নড়িতেছে। আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই সকল বস্ত্রমধ্যে অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য-

সম্পন্না উজ্জ্বল-স্বর্ণকান্তি-বিশিষ্টা অর্দ্ধহস্তপরিমিতা এক কন্যা সন্তান দেখিতে পাইলেন। নব আবির্ভূত দিব্য শিশুর অপূর্ব্ব অঙ্গজ্যোতিঃতে সমস্ত গৃহটী উদ্ভাসিত হইল। "নবজাত শিশু কি এত সুন্দর ও নির্ম্মল হয়! এ শিশু নিশ্চয়ই সামান্য নহে!" ধাত্রী অবাক্ হইয়া মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে লাগিল। এদিকে গৌরী দেবী কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছেন দেখিয়া মাতামহী আনন্দময়ী বিশেষ আনন্দ লাভ করিতে পারিলেন না; কারণ তিনি গৌরী দেবীর পুত্র সন্তানের কামনাই হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। অনন্তর ধাত্রী শিশুর নাভিচ্ছেদ করিতে যাইয়া দেখিল যে, সেই অপূর্ব্ব দিব্য শিশুটী কন্যা নহে; উহা পুত্র সন্তান। বিস্ময়ে এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ধাত্রী আনন্দময়ীকে বলিল, "এ যে, মা, ছেলে! তুমি মিছে মিছি কাঁদছ কেন?" এই বলিয়া সে নাভিচ্ছেদান্তে সেই দিব্য শিশুকে মাতামহীর ক্রোড়ে স্থাপন করিল। মাতামহী দেখিলেন, যাঁহাকে তিনি কন্যারূপে দেখিযাছিলেন, তিনি এখন পুত্ররূপে তাঁহার ক্রোড়ে বিরাজমান। বিস্ময়ে, আনন্দে এবং স্নেহাতিশয্যে সেই অপূর্ব্ব দিব্য শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া মাতামহী বারংবার তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি সেই দিব্য শিশুকে গৌরী দেবীর অঙ্কে স্থাপন করিলেন। মাতা গৌরী দেবী প্রিয়দর্শন, গৌরকান্তি নবকুমারকে ক্রোড়ে পাইয়া, অনিমেষনয়নে তাঁহার মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিতে করিতে বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহাকে স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। মাতামহীর আনন্দ কোলাহলে একে একে বাটীস্থ সকলেই সূতিকাগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া গৌরী দেবীর ক্রোড়ে সেই অপূর্ব্ব-দিব্য শিশুকে দর্শন করিয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত পুরোহিত-পত্নীও সংবাদ পাইয়া, প্রিয় সখীর নবকুমারকে দর্শন-মানসে ছুটিয়া আসিলেন। নবকুমারের অদ্ভুদ্‌ভাবে আবির্ভাব সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে নানারূপ বাদানুবাদ হইতে লাগিল। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মোহিনী মায়ার বিচিত্র প্রভাবে প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, অবশেষে

সকলে স্ব স্ব বিশ্বাস অনুসারে নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া নিরস্ত হইলেন। প্রকৃত তথ্য নির্ণীত হইল না। যাহাহউক, এইরূপে সন ১২৬১ সালে ১৩ই চৈত্র রবিবার শুক্লা বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে, রাত্রির শেষ যামে শুভক্ষণে পূর্ণ পরমব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব অতি রহস্যময় জন্ম উপলক্ষ করিয়া পুণ্যভূমি পাণিহাটী গ্রামে মাতুল ভবনে আবির্ভূত হইলেন। অয়ি শুভে নিত্যাষ্টমী তিথি! তোমার উদ্দেশ্যে আমাদের কোটী কোটী প্রণাম!

"শ্রীনিত্য অষ্টমী তিথি! নমি তব পায়,
কৃপা করি ল'য়ে এলে শ্রীনিত্য ধরায়।
ধ্যানযোগে যোগিগণ নাহি পায় যাঁরে,
সে ধন আনিলে, দেবি, জীব তরাবারে।
পরম করুণাময়ি, বিতর করুণা,
নিত্যনাম গায় যেন সতত রসনা।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

শৈশবক্রীড়া

"যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

গীতা, ৩য় শ্লোঃ, ১০ম অঃ।

[যিনি আমাকে অনাদি, জন্মশূন্য ও লোকসমূহের মহেশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি মনুষ্য মধ্যে মোহশূন্য হইয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন।]

রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে গৌরী দেবীর সন্তান প্রসবের সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। এই শুভ সংবাদে পাণিহাটীবাসী নরনারী অপ্রাকৃত দিব্য শিশু দর্শন মানসে মাতুল নবীনকৃষ্ণের ভবনে দলে দলে আসিতে লাগিলেন। মাতা গৌরী দেবীর ক্রোড়ে সেই নবজাত শিশুর অপরূপ রূপ-লাবণ্য দেখিয়া, সকলেই মুগ্ধ হইলেন এবং একবাক্যে বলিতে লাগিলেন যে, এমন সুন্দর শিশু কেহ কখনও দেখে নাই। নবীনকৃষ্ণের গৃহে শুভ জন্মোৎসবের ধূম পড়িয়া গেল। নহবতের সুললিত স্বরে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইতে লাগিল। দলে দলে ব্রাহ্মণ, দরিদ্র, ভিখারী প্রভৃতি আসিতে লাগিল। সমাগত ব্যক্তিগণকে সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া অর্থ, অন্ন ও বস্ত্রাদি দিয়া পরিতুষ্ট করা হইল। কলিকাতা আহিরীটোলায় পিতা জন্মেজয় ভবনে এই শুভ সংবাদ পৌঁছিবামাত্র, সেখানেও মহা-সমারোহে শুভ জন্মোৎসব ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। আত্মীয়স্বজনবর্গও এ সংবাদ অবগত হইয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলেন। এইরূপে যথাসময়ে যথোচিতভাবে নবজাত শিশুর শুভ জাত কর্ম্মাদি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইল।

অতঃপর আত্মীয়স্বজনবর্গের আদরে, যত্নে ও ভালবাসায় শিশু শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া, ক্রমশঃ পঞ্চম মাসে উপনীত হইলেন। এই সময় একদিন তাঁহার মাতা, মাতামহী প্রভৃতি তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় শয্যায় রাখিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে বাতায়ন-পথে সূর্য্যরশ্মি গৃহে প্রবেশ করিয়া শিশুর সুন্দর মুখখানির উপর পতিত হইল। এমন সময় অকস্মাৎ, বিধি নির্দ্দেশেই যেন কোথা হইতে এক বৃহৎকায় সর্প আসিয়া প্রকাণ্ড ফণা বিস্তারপূর্ব্বক শিশুকে সূর্য্যাতপ হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে গৌরী দেবী কার্য্যোপ-লক্ষে সেই গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র পুত্রকে তদবস্থায় দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে মাতামহী এবং পরিবারস্থ অন্যান্য সকলে সেখানে উপস্থিত হইয়া, এই দৃশ্য দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

তাঁহাদের কাতর ক্রন্দন ধ্বনিতে শিশু জাগরিত হইয়া সেই কালসর্পের সহিত খেলা করিতে লাগিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া মাতামহী কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও কদলী সহ একটী পাত্র কালসর্পটীর সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক মনসাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য! সেই কালসর্প তৎক্ষণাৎ শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া উক্ত দুগ্ধ পান করতঃ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া মাতা, মাতামহী এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনবর্গ আনন্দে কোলাহল করিতে করিতে একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "এই শিশু সামান্য নহেন! ইনি কোন অসাধারণ পুরুষ হইবেন!" মাতা গৌরী দেবী পুত্রকে সর্পমুক্ত দেখিয়া, তাঁহাকে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করতঃ স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন।

অতঃপর অন্য এক দিবস গৌরী দেবী পুত্রকে স্তন্যপান করাইয়া, মাতা আনন্দময়ীর নিকট দোলনায় শোয়াইতে দিলেন এবং নিশ্চিন্তভাবে দক্ষিণা কালীর অর্চ্চনায় রত হইলেন। মাতামহীও তাঁহাকে দোলনায় শোয়াইয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি শিশুকে ক্রোড়ে লইতে গিয়া দেখিলেন যে, দোলনা শূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। তদ্দর্শনে অতীব ব্যস্ত হইয়া দেবী আনন্দময়ী ইতস্ততঃ শিশুকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কোথায়ও শিশুকে দেখিতে না পাইয়া, মাতামহী কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া গৌরী দেবীকে ডাকিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি পূজাগৃহ হইতে বাহির হইয়া আনন্দময়ীর মুখে শুনিলেন যে, শিশুকে পাওয়া যাইতেছে না। তৎশ্রবণে গৌরী দেবীও রোদন করিতে করিতে চারিদিকে হারাধনের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কোথায়ও শিশুকে দেখিতে না পাইয়া, তাঁহারা হতাশ হইয়া শোকে গভীর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর হঠাৎ দোলনা হইতে শিশুর ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা দোলনার নিকট গেলেন এবং দেখিলেন যে, ইতঃপূর্ব্বে যে দোলনা শূন্য ছিল সেই দোলনাতেই শিশু শুইয়া আছেন এবং ক্রন্দন করিতেছেন। তদ্দর্শনে মাতা গৌরী দেবী যেন মৃতদেহে পুনর্জীবন লাভ

করিলেন। অনন্তর তিনি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বারংবার তাঁহার মুখ-চুম্বন করিতে লাগিলেন। কে যে শিশুকে লইয়া গেল এবং কেই বা শিশুকে পুনরায় রাখিয়া গেল তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। কেহ বা ইহা ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া অনুমান করিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের এও এক বিচিত্র লীলা!

গৌরী দেবী এই সমস্ত দৈব-দুর্ব্বিপাকের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে শায়িত শিশুর অসামান্য সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছেন; এমন সময় হঠাৎ একটী প্রকাণ্ড হনুমান্ আসিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক বৃক্ষে আরোহণ করিল এবং পুনঃপুনঃ তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে গৌরী দেবী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন এবং ত্রস্তব্যস্ত হইয়া আনন্দময়ীকে সমস্ত বলিলেন। আনন্দময়ীর অতিশয় প্রত্যুৎপন্ন মতি ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ কয়েকটী সুপক্ক কদলী সেই বৃক্ষতলে রাখিয়া "রামদাস, রামদাস" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তখন হনুমান্‌টী শিশুকে লইয়া অতি সতর্কতার সহিত বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল এবং শিশুকে যথাস্থানে রাখিয়া কদলীগুলি লইয়া চলিয়া গেল। মাতা ও মাতামহী শিশুর কোন অনিষ্ট হয় নাই দেখিয়া শ্রীভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের শৈশব-লীলা এইপ্রকার নানা বিচিত্র ও বিস্ময়জনক ঘটনায় পরিপূর্ণ হইলেও, ধীরে ধীরে তিনি অষ্টম মাসে উপনীত হইলেন। সেই সময় মাতামহী তাঁহার শুভ অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে ও গৌরী দেবীকে লইয়া কাশীধামে গমন করিলেন। তথায় পৌছিয়া তিনি পূর্ব্ব সঙ্কল্প অনুসারে বীরেশ্বরদেবের স্নান, পূজা ও হোম কার্য্যাদি সুসম্পন্ন করিলেন। তদনন্তর বীরেশ্বর দেবের প্রসাদিত অন্নে শিশুর শুভ অন্নপ্রাশন হইল। এই উপলক্ষে বহু সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে পরম তৃপ্তিসহকারে ভোজন করান হইল। কিছুকাল কাশীধামে বাস করিবার পর, তাঁহারা পাণিহাটী প্রত্যাগমন

করিলেন এবং কুলপ্রথানুসারে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত পুনরায় শুভ অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান করিলেন। যথাবিধি যজ্ঞাদি কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর শিশুর নামকরণ হইল। মাতা গৌরী দেবীর ইষ্টদেবী 'দক্ষিণা কালী' বলিয়া, তিনি পুত্রের নাম "কালীকুমার" রাখিলেন এবং বীরেশ্বর দেবের কৃপায় তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন বলিয়া, অপর নাম রাখিলেন "বীরেশ্বর"। সদাসর্ব্বদা প্রসন্ন মুখ দেখিয়া, ইঁহার ছোট মাসীমা ইঁহাকে "প্রসন্নকুমার" নামে অভিহিত করিলেন। পুরোহিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় নাম দিলেন "বলভদ্র"। আর মাতামহী আনন্দময়ী শিশুর অলৌকিক জন্মকর্ম্ম দেখিয়া নাম রাখিলেন "নিত্যগোপাল"। অদ্যাপি তিনি এই নামেই সুপরিচিত।

এইরূপে শুভ অন্নপ্রাশন ও নামকরণ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইবার পর মাতামহী একটী পাত্রে গীতা, ভাগবত, ধান্য, মৃত্তিকা, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া শিশুর সম্মুখে ধরিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব আর কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া, অবিলম্বে গীতাগ্রন্থখানি লইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। ইহাতে মাতামহী ও অন্যান্য দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইলেন। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "ভবিষ্যতে এই শিশু অতিশয় ধার্ম্মিক হইবে"। প্রকৃতপক্ষে, তিনি যে ভবিষ্যৎকালে পরমোদার সমন্বয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন তাহার ইঙ্গিত অন্নপ্রাশন সময়ে এই গীতাগ্রন্থখানিকে বক্ষে ধারণ করাতেই পাওয়া যায়। উত্তরকালে তিনি এই সর্ব্বোপনিষদের সারস্বরূপ গীতাগ্রন্থ লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার রচিত "সর্ব্বধর্ম্ম নির্ণয়সার" নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন, "গীতা আমার সারাৎসার। গীতা কি সামান্য পুঁথি? গীতার টীকা পরম জ্ঞান; পরম জ্ঞান গীতার মহাভাষ্য। মাগো! গীতা কি সকলে বুঝ্‌তে পারে? তুমি যে মা নিজে গীতা।"

অন্নপ্রাশনোৎসব সুসম্পন্ন হইবার কিছুদিন পর গৌরী দেবী শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে লইয়া, আনন্দময়ীর সঙ্গে কলিকাতায় নন্দন-

বাগানে মাতুলালয়ে আগমন করিলেন। শিশু নিত্যগোপালের পিতৃরিষ্ট থাকায় মাতামহী তাঁহাকে আহিরীটোলায় পিতার নিকট পাঠাইতেন না। কিন্তু পতিপরায়ণা গৌরী দেবী এ বিষয় অবগত ছিলেন না। তাই তিনি একদিন পরিচারিকা দ্বারা পুত্রকে আহিরীটোলায় স্বামীসদনে পাঠাইয়া দিলেন। পিতা জন্মেজয় তৎকালে গৃহের ছাদে পাদচারণ করিতেছিলেন। দূর হইতে পরিচারিকার ক্রোড়স্থিত শিশু নিত্যগোপালের অলৌকিক রূপ-লাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া, তিনি পার্শ্বস্থিত স্বীয় ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটী কাহার পুত্র ?" 'পরিচারিকার ক্রোড়ে তাঁহারই পুত্র আসিতেছেন', ইহা ভগিনীর নিকট জানিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন। ইতিমধ্যে সুচতুরা পরিচারিকা আসিয়া পিতা জন্মেজয়ের হস্তে পুত্রকে অর্পণ করিলেন। তিনি আদর করিয়া পুত্রকে 'সেজবাবু' নামে অভিহিত করিলেন। অতঃপর পরিচারিকাকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়া পুত্রকে তাহার সহিত নন্দনবাগানে পাঠাইয়া দিলেন।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের পিতৃবিয়োগ হয়। সেই সময় তাঁহার বয়স মাত্র দুই বৎসর। তখন তিনি আগম মাতার সহিত পাণিহাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় গৌরী দেবী, আনন্দময়ী এবং অন্যান্য সকলেই অতিশয় শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া গৌরী দেবী কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক পতির পারলৌকিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিলেন; কিন্তু সেই নিদারুণ শোক যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার হৃদয় তিল তিল করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিল।

পিতৃ-বিয়োগের পর হইতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব স্বীয় মাতার সহিত পাণিহাটী গ্রামে মাতুলালয়েই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় বসবাসকালে যখন তাঁহার বয়স আড়াই বৎসর মাত্র, তখন তিনি একদিন মহাভাবে মগ্ন হন্। তদবস্থায় তিনি অস্ফুটভাবে কখন 'নারায়ণ', 'নারায়ণ', কখনও 'শিব', 'শিব'; কখনও বা 'দুর্গা', 'দুর্গা', 'কালী' 'কালী' ইত্যাদি

বলিতে লাগিলেন, কখনও বা আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন। স্নেহময়ী মাতা গৌরী দেবী, মাতামহী আনন্দময়ী ও আত্মীয়স্বজনবর্গ হঠাৎ তাঁহার এইরূপ অবস্থা দর্শনে যথার্থ বিষয় অবগত না হইয়া, মনে করিলেন যে, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব জ্বর-বিকারে নানারূপ প্রলাপ বকিতেছেন। তাঁহারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের সেবা-শুশ্রূষায় রত হইলেন। অতঃপর তাঁহার কণ্ঠশ্বাস ও নাভিশ্বাস রুদ্ধ হইল এবং নাড়ীর গতি পর্য্যন্ত স্থির হইল। ইহা একপ্রকার মৃত্যু দশাই বলিতে হয়। তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মৃত্যুজ্ঞানে গৌরী দেবী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মাতামহী ও আত্মীয়স্বজনগণ শোকে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে অবস্থায় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব হিমাঙ্গ হইলেও তাঁহার সমস্ত দেহ উজ্জ্বল দিব্য-জ্যোতিঃতে পরিপূর্ণ ছিল। এমত অবস্থায় তাঁহারা ইহাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা করিতে পারিলেন না। তবে তিনদিন পর্য্যন্ত একই ভাবে থাকিতে দেখিয়া, তাঁহারা ইহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ঠিক সেই সময় একজন জটাজুটধারী মহাপুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "মা, তোমরা বৃথা শোক করিও না; বালকের ইহা মৃত্যু নহে। ইহা যোগীশ্বরগণেরও দুর্ল্লভ নির্ব্বিকল্প সমাধি। ইনি শীঘ্রই ব্যুত্থান লাভ করিবেন। ইহাঁকে তোমরা সাধারণ বালক বলিয়া মনে করিও না।" এই বলিয়া সেই মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। বাস্তাবিক এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব ধীরে ধীরে ব্যুত্থান লাভ করিলেন। এইরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে বাহ্যচৈতন্যদশায় আসিলে মাতা, মাতামহী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনবর্গ সকলেই যেন পুনর্জীবন লাভ করিলেন।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের পিতা মহাত্মা জন্মেজয় বিপুল ধন-সম্পত্তি রাখিয়া দেহত্যাগ করেন; কিন্তু তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে এক কপর্দ্দকও না দিয়া বিষয় সম্পত্তির সমস্ত আয় আপনারাই

ভোগ করিতেন। মাতা গৌরী দেবীও এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের মেসো মহাশয় রাজেন্দ্র বাবু তাঁহাদের ধনসম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতি মাসে তাঁহাদের ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ উপযুক্ত অর্থ পাঠাইতে থাকেন। সেই অর্থ হস্তগত হইবার পর গৌরী দেবী দান, সাধুসেবা প্রভৃতিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা নিঃশেষ করিয়া, কেবলমাত্র শাকান্ন ভোজন করতঃ দিনাতিপাত করিতেন। একদিন নয়, দুইদিন নয়, মাসের পর মাস, তিনি এইরূপ কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করায়, ক্রমশঃ তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল

মাতা গৌরী দেবী দিবসের অধিকাংশ সময় জপ, ধ্যান, ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ প্রভৃতিতে যাপন করিতেন। দক্ষিণাকালী তাঁহার ইষ্টদেবী হইলেও, সমস্ত দেবদেবীর প্রতিই তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। তিনি শাক্তধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও, প্রত্যহ স্নানান্তে তুলসীতলা হইতে মৃত্তিকা লইয়া ললাটে তিলক ধারণ করিতেন এবং পুত্রের ললাটেও তিলক রচনা করিয়া দিতেন। এইরূপে শৈশব হইতেই শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব স্বীয় মাতৃ-সান্নিধানে সমন্বয়মূলক ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছিলেন। অনেক সময় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব পীড়িত হইলে, তাঁহার মাতা তাঁহাকে তুলসীতলায় লইয়া গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া দিতেন এবং সমস্ত দেবদেবীকে প্রণাম করাইতেন; এমন কি, খৃষ্টধর্ম্মস্থাপয়িতা যীশু ও ইস্লামধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদ পর্য্যন্ত বাদ যাইতেন না। এইরূপ চিকিৎসাতেই তাঁহার অসুখ অনেক সময় সারিয়া যাইত। গৌরী দেবীর ন্যায় ভগবদ্বিশ্বাসী রমণী জগতে অতি বিরল। তিনি যেন সাক্ষাৎ তপস্যার জ্বলন্ত প্রতিমা এবং শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব যেন সেই তপস্যার ফলস্বরূপ জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমের ঘনীভূত মূর্ত্তি।

গৌরী দেবী স্বীয় দেহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকায়, তিনি ক্রমশঃ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। মাতামহী আনন্দময়ী বহু চেষ্টাতেও

কন্যাকে রোগমুক্ত করিতে না পারিয়া, কলিকাতা মহানগরীর সিমলা নামীয় রাজপথের উপর একটী সুন্দর দ্বিতল বাসা ভাড়া করিলেন। অনন্তর কন্যা ও দৌহিত্র সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিলেন। 'বিমাতা-গণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের পাছে কোনও অনিষ্ট সাধিত হয়', এই ভয়ে আনন্দময়ী জন্মেজয়-ভবনে অবস্থান না করিয়া ভিন্ন বাটীতেই বাস করিতে লাগিলেন। যাহাহউক, সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া গৌরী দেবী অল্পকাল মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিলেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ যতদিন না হইলেন ততদিন তিনি সেইখানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সময় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের বয়স মাত্র তিন বৎসর। একদিন আত্মীয়স্বজনের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে গৌরী দেবী পরিচারিকার সঙ্গে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে লইয়া জন্মেজয়-ভবনে গমন করিলেন। প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ ক্ষেত্রনাথ যেখানে বিষয়কর্ম্ম তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব মাতার অজ্ঞাতসারে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গুরুগম্ভীর স্বরে কার্য্যাধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ক্ষেত্রনাথ, কৃষ্ণসর্প শিশু হ'লেও কি তাহার দংশন মারাত্মক নহে?" ক্ষেত্রনাথ বালকের গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া আসন হইতে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া আদরপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "কেন, সেজো বাবু, কি হ'য়েছে? আমাদের নিকট তুমি কি কোন খারাপ ব্যবহার পেয়েছ?" শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমাকে বঞ্চিত ক'রে, আমার পৈত্রিক বিষয়ের দ্বারা কেবলমাত্র আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণকেই প্রতিপালন করছেন কেন? আমার কি তা'তে কোনও দাবী নেই?" তৎশ্রবণে ক্ষেত্রনাথ বিনয়সহকারে বলিলেন, "সেজো বাবু, এখনও তুমি শিশু; কেমন ক'রে তুমি বিষয় বুঝে নেবে?" শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব শিশু হইলেও প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি

তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "কেন? আমার পক্ষ হ'তে আমার মা বিষয়সম্পত্তি বুঝে নেবেন।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর ক্ষেত্রনাথ স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এই বয়সেই এঁর এরূপ বুদ্ধি! না জানি, বড় হ'লে ইহা আরও কত প্রখর হ'বে।"

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের অলৌকিক স্মৃতিশক্তি ছিল। তিনি তাঁহার মাতা ও মাতামহীর নিকট যে সকল স্তবস্তুতি একবার শুনিতেন, তাহা অবিকল এবং অনর্গল বলিয়া তাঁহাদিগকে বিস্মিত করিতেন। তখন তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া পুনঃপুনঃ তাঁহাদের নয়নপুত্তলির মুখচুম্বন করিয়াও যেন তৃপ্ত হইতেন না।

শৈশবে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব সময়ে সময়ে এরূপ গুরুভাবের প্রকাশ করিতেন যে, তাহা দেখিয়া মাতা-মাতামহীর হৃদয়ে স্বাভাবিক বাৎসল্যভাব প্রশমিত হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যভাবের সঞ্চার হইত। কিন্তু সুচতুর শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব বিশ্ববিমোহন হাসি ও সুমধুর বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিতেন। একদিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে তিনি অকস্মাৎ গুরুভাব অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীশ্রীকপিল দেব যেমন তাঁহার মাতা দেবহূতিকে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ মাতা গৌরী দেবীকেও তিনি (শ্রীশ্রীনি ্যদেব) ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে উপদেশ দানে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। ইহাতে গৌরী দেবীর হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তিভাবের উদ্রেক হওয়ায়, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব যে তাঁহার পুত্র তাহা পর্য্যন্ত তিনি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। মাতার এই অবস্থা দেখিয়া, তিনি সেই গুরুভাব সম্বরণপূর্ব্বক মধুর হাসির দ্বারা স্বীয় জননীকে বিমোহিত করিয়া শিশুর ন্যায় তাঁহার স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। গৌরী দেবীও বাৎসল্যভাবে সমস্ত বিষয় ভুলিয়া পুনরায় অপত্যস্নেহে আপ্লুত হইয়া গেলেন।

আর একদিন মাতামহী আনন্দময়ী শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে ক্রোড়ে লইয়া, অঙ্গনে পাদচারণ করিতে করিতে সোহাগ করিতেছিলেন,

নিকটে চতুর্দ্দিকে আর কেহই ছিলেন না। এই সুযোগে শিশু শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব মাতামহীর কর্ণে তাঁহার ইষ্টমন্ত্রটি বলিয়া ফেলিলেন। মাতামহী দৌহিত্রের মুখে স্বীয় ইষ্টমন্ত্র শ্রবণ করিয়া, সবিস্ময়ে তাঁহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার স্নেহের গোপালের মূর্ত্তি গাম্ভীর্য্য এবং দিব্য-জ্যোতিঃতে পরিপূর্ণ এবং তাঁহার দেহের ভার এত অধিক হইয়াছে যে, তিনি শিশুকে আর ক্রোড়ে রাখিতে পারিতেছেন না। তিনি তাঁহাকে ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক অভূতপূর্ব্ব ভয়, ভক্তি এবং বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তখন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব মাতামহীর এবংবিধ দীনভাব লক্ষ্য করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে আপন ঐশ্বরিকভাব গোপনপূর্ব্বক সাধারণ শিশুর ন্যায় হাস্য করিতে লাগিলেন। মাতামহী তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া আপনার ভ্রান্তি অনুমান করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া পূর্ব্ববৎ সোহাগ করিতে করিতে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

মাতামহী শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে সদাসর্ব্বদা বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত রাখিতেন; কিন্তু তিনি তাহাতে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতেন। তবে মাতামহীর মনোকষ্ট হইবে ভাবিয়া সেগুলি খুলিবারও সুবিধা পাইতেন না। কলিকাতা বসবাসকালে একদিন শিশু শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেব সকলের অজ্ঞাতসারে রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে এক গলির মধ্যে যাইয়া পড়েন। এমন সময় এক তস্কর, বালকের অঙ্গস্থিত অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে, মিষ্টকথায় ভুলাইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তিনি অম্লানবদনে সেই তস্করের ক্রোড়ে উঠিয়া যাইতে লাগিলেন। তস্করের ইচ্ছা, কোন নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে। চতুরচূড়ামণি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব, 'তস্করকে আর বেশীদূর যাইতে দেওয়া উচিত নয়', ভাবিয়া পাহারা-ওয়ালাকে দেখিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন। গত্যন্তর না দেখিয়া তস্কর তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। তখন তিনি পাহারাওয়ালার

সাহায্যে স্বীয় আলয়ে পৌঁছিলেন। মাতামহী পাহারাওয়ালার ক্রোড়ে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে গবাক্ষপথ হইতে দেখিয়া অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া দিলেন। তখন তিনি পাহারাওয়ালার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, এবং শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া মুহুর্মুহুঃ মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। হারানিধি পাইয়া মাতামহী আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন এবং পাহারাওয়ালাকে বহুমূল্য বস্ত্র ও কিছু মুদ্রা পুরস্কার দিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু প্রহরী শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে ক্রোড়ে লইয়া এতই তৃপ্ত হইয়াছিল যে, সে আর পুরস্কার লইতে স্বীকৃত হইল না। সে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের অলৌকিক রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া, তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, আপন কার্য্যে গমন করিল। তদবধি মাতা ও মাতামহী, 'পাছে অলঙ্কারের জন্য শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেবকে হারাইতে হয়', এই ভয়ে তাঁহার অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া রাখিলেন। ইহাতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব অত্যন্ত শান্তিবোধ করিলেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক অপূর্ব্ব কান্তিও যেন অলঙ্কারাবরণমুক্ত হইয়া স্বরূপ প্রকাশ করিতে লাগিল।

শৈশব হইতেই শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের দয়ার তুলনা ছিল না। একদিবস রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে একজন বস্ত্রহীন ভিখারীকে দেখিয়া, তিনি তাঁহার পরিধেয় বহুমূল্য বস্ত্রখানি তাহাকে দিয়া উলঙ্গাবস্থায় গৃহে ফিরিলেন। মাতা ও মাতামহী তাঁহার উলঙ্গাবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অকপটে সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিলেন। শিশুর এইপ্রকার পরদুঃখকাতরতা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন।

একদা অপরাহ্নকালে প্রবল ঝটিকার সময় বহুলোক কোন আশ্রয়-স্থান না পাইয়া শ্রীশ্রীনিত্য-ভবনে উপস্থিত হইল এবং দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। তৎশ্রবণে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব অবিলম্বে মাতৃক্রোড় হইতে নামিয়া গিয়া দরজা খুলিলেন এবং তাহাদিগকে ভিতরে আশ্রয় দিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া মাতার নিকট জিজ্ঞাসা

করিয়া জানিলেন যে, গৃহে মাত্র তিনজনের উপযুক্ত অন্ন আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই তিনজনেব অন্ন দিয়া তিনি উপস্থি লোকগুলিকে পবম তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। শিশুব এতাদৃশ যোগৈশ্বর্য্য দর্শনে মাতা, মাতামহী প্রভৃতি সকলেই চমৎকৃত হইলেন ; কিন্তু মায়ামুগ্ধ হইয়া কিছুই উপলব্ধি কবিতে পারিলেন না।

কলিকাতায় অবস্থান কবিয়া মাতা গৌরী দেবী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে মাতামহী আনন্দময়ী স্বীয় কন্যা ও দৌহিত্র সমভিব্যাহারে পাণিহাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন কবিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবও তাঁহাব সহচবগণের সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া খেলাধূলা আরম্ভ করিলেন। সে খেলায় সুস্থান, কুস্থান, পবিত্র, অপবিত্র কিছুই বিচাব থাকিত না। এইরূপভাবে একদিন বালকসুলভ চপলতাবশতঃ খেলাধূলা কবিয়া কর্দ্দমাক্ত কলেবরে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব গৃহে ফিরিলেন। তদ্দর্শনে গৌরী দেবী ও আনন্দময়ী অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিলেন, কেননা তাঁহারা সতত তাঁহাকে অতি শুদ্ধাচারে রাখিতেন। সেইজন্য অন্যান্য দিবসের ন্যায় মাতা কোনও যত্ন না লইয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে শাসন করিবাব নিমিত্ত একটী অন্ধকার গৃহে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব সেই অন্ধকার গৃহে বালকোচিত ভূতেব ভয়ে ভীত হইলেন। তিনি জানিতেন যে, 'রাম নাম' জপ করিলে ভূতের ভয় চলিয়া যায়। তাই তিনি ভয়ে ভয়ে 'রাম নাম' জপ করিতে লাগিলেন। সহসা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সেই গৃহে আবির্ভূত হইলেন ; সঙ্গে সঙ্গে শিব, কালী, রাধাকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ এবং নারদাদি ঋষিগণ একে একে তথায় উপস্থিত হইলেন। অন্ধকার বিদূরিত হইয়া গৃহটী তখন দিব্যালোকে পরিপূর্ণ হইল। সমাগত দেবদেবীর মধ্যে জগজ্জননী 'আদ্যাকালী' শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। স্তন্যপান করিতে করিতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব আনন্দে বিভোর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।

এদিকে মাতামহী আনন্দময়ী স্থানান্তরে ছিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব যে অবরুদ্ধ আছেন তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। গোপালের উচ্চহাস্য শুনিয়া তিনি গৃহদ্বার খুলিয়া গোপালকে ভূমিতে উপবিষ্ট দেখিলেন। মাতামহী তাঁহাকে সাদরে ক্রোড়ে লইয়া উচ্চহাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব সমস্ত বিষয় সরলভাবে বিবৃত করিলেন। মাতা ও মাতামহী এই অলৌকিক ঘটনা শ্রবণ করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের উপর দেবদেবী-গণের শুভদৃষ্টি আছে জানিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বাল্যজীবন

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"

গীতা, ৩৪শ শ্লোঃ, ৯ম অঃ।

[মচ্চিত্ত, মদ্ভক্ত ও মদ্যাজী হও, আমাকে নমস্কার কর এবং এইরূপে মৎ-পরায়ণ হইয়া মন আমাতে নিযুক্ত করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।]

এদিকে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব পঞ্চমবর্ষে উপনীত হইলে দেখিয়া মাতামহী পুরোহিতকে ডাকিয়া শুভক্ষণে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের শুভ-বিদ্যারম্ভ ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিলেন। প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালাতেই পণ্ডিত হরচন্দ্র দেবশর্ম্মা মহাশয়ের নিকট শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিলেন। বিদ্যাশিক্ষাকালে তিনি একবার যাহা শুনিতেন তাহাই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন। সেইজন্য সহপাঠিগণের মধ্যে তিনি

শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন ; কিন্তু সময় সময় তাঁহার ব্যবহারে অত্যন্ত চঞ্চলতা প্রকাশ পাইত। ইহা তাঁহার শিক্ষক এবং সহপাঠিগণের বিশেষ বিরক্তির কারণ হইলেও, সকলেই তাঁহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া বিরক্ত না হইয়া বরং আনন্দিতই হইতেন। যাহাহউক, এইরূপে কিয়ৎকাল বিদ্যাভ্যাসের পর গৌরী দেবীকে ও শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে সঙ্গে লইয়া দেবী আনন্দময়ী আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে তাঁহার পিত্রালয় নন্দনবাগানে পুনরায় গমন করিলেন। এখানেও তিনি জনৈক মুখোপাধ্যায়ের নিকট পূর্ব্ববৎ বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

নন্দনবাগানে অবস্থান কালীন প্রত্যহ অপরাহ্নকালে গৌরী দেবী সমাগত মহিলাগণের নিকট ভক্তিগদগদকণ্ঠে শ্রীভগবানের অলৌকিক লীলা পাঠ করিতেন। তাহা শুনিয়া সকলেই ভক্তিরসে আপ্লুত হইতেন। পবিত্র হরিবাসরে একাদশীর দিন বহু মহিলা গৌরী দেবীর নিকট ভগবল্লীলা শ্রবণ করিতে আসিতেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের বয়স তখন অল্প হইলেও, তিনি বালকসুলভ চপলতা সংবরণ করিয়া তৎকালে অতি মনোযোগের সহিত লীলা শ্রবণ করিতেন। এইরূপ এক হরিবাসরে কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকায় সমাগত মহিলাবৃন্দের নিকট আসিতে গৌরী দেবীর বিলম্ব হইতে লাগিল। মাতার বিলম্ব দেখিয়া শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেব নানারূপ ক্রীড়াকৌতুক দ্বারা সকলের আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সহসা মহিলাগণ, "এ কি হইল ! দৃষ্টিভ্রম, না দিবাস্বপ্ন !" বলিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, তরুণ-অরুণ-কান্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব আজ নব-নীরদ-নিন্দিত শ্যামসুন্দররূপে তাঁহাদের সম্মুখে খেলা করিতেছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার কণিকের জন্য আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে গৌরী দেবী তথায় আগমন করিলে তাঁহারা স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে পুনরায় খেলা করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। তাঁহারা গৌরী দেবীর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। বাৎসল্যভাবে

শিভোরা গৌরী দেবী তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, বৃদ্ধাদের বোধহয় দৃষ্টিভ্রম ঘটিয়াছে। সেইজন্য সে কথায় মনোযোগ না দিয়া গৌরী দেবী ভগবল্লীলা প্রসঙ্গ দ্বারা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। রমণীবৃন্দ পাঠ শ্রবণান্তে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে পুনঃপুনঃ আদর ও চুম্বন করিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব মধ্যে মধ্যে সহচর বালকগণের আগ্রহাতিশয্যে তাহাদের সঙ্গে কপাটী খেলা ও ঘুড়ি উড়ান প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদে রত হইতেন। একদিন ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে তিনি গৃহের ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথা পান নাই।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব এইসকল বৃথা আমোদ-প্রমোদ করিলেও তিনি আদৌ উহা পছন্দ করিতেন না। তিনি ক্রীড়াসঙ্গীগণকে লইয়া দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, রাস, দোল প্রভৃতি পূজাভিনয়েই অনেক সময় রত থাকিতে ভালবাসিতেন। ইহাতে তাহাদেরও বিশেষ ধর্ম্মশিক্ষা লাভ হইত।

মাতা গৌরী দেবীর মাতুলালয় হইতে জামাতৃ-ভবন (নিত্যকালী দেবীর শ্বশুরালয়) অতি নিকটেই ছিল। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব প্রায়ই তথায় গমন করিতেন। একদা নিত্যকালী দেবীর শশ্রূমাতা উত্তম মৎস্য রন্ধন করিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে বিশেষ আদর সহকারে খাওয়াইয়া দিলেন। পাছে তিনি তাঁহার মাতৃদেবীকে মৎস্য ভক্ষণের কথা বলিয়া দেন, এই ভয়ে নিত্যকালী দেবীর শশ্রূমাতা তাঁহাকে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, তিনি যেন এ বিষয় গৌরী দেবীকে না বলেন; কেননা নিত্যকালী দেবীর শশ্রূমাতা জানিতেন যে, গৌরী দেবী শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে অতি সদাচারে রাখিতেন; তাহার উচ্ছিষ্ট, এমন কি, আমিষার পর্য্যন্ত তাঁহাকে

খাইতে দিতেন না। বলাবাহুল্য যে, স্বাভাবিক সরলতাবশতঃ শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেব মাতার নিকট আসিবামাত্র সমস্ত বিষয়ই বলিয়া দিলেন। ইহাতে গৌরী দেবী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হইলেন এবং অতি দুঃখের সহিত বলিলেন, "হায়! কে আমার এই শুভ সংকল্পে বাধা দিল! আমার চিরদিনের ইচ্ছা ছিল যে, আমার গোপালকে কুমার ব্রহ্মচারী অবস্থায় রাখ্‌ব!"

এইরূপে কিছুদিন নন্দনকাননে অতিবাহিত করিয়া মাতা ও মাতামহীর সঙ্গে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব পুনরায় বৈষ্ণবগণের প্রিয়তীর্থ পাণিহাটীতে আগমন করিলেন। তথায় একদিন তিনি সহচরগণের সহিত গঙ্গাতীরে জলক্রীড়ায় মত্ত আছেন, এমন সময় একজন অতি নিষ্ঠাবান্ বৃদ্ধ বৈষ্ণব তথায় জল আনিতে গমন করেন। অকস্মাৎ জলক্রীড়ায় মত্ত শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের অপরূপ রূপ-লাবণ্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র, বৈষ্ণবপ্রবর চিরবাঞ্ছিত স্বীয় অভীষ্ট দেবরূপে তাঁহাকে অনিমেষনয়নে দর্শন করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এমন সময় বৃদ্ধ বৈষ্ণব-সাধুকে কৃপা করিবার জন্যই যেন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব সহচরগণসহ গঙ্গাতীর আলোকিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সুযোগ বুঝিয়া সাধুটীও দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে গমন করতঃ তাঁহার চরণযুগল ধারণপূর্বক তাহা প্রেমাশ্রুজলে পুনঃপুনঃ ধৌত করিতে লাগিলেন। সেই সময় বৃদ্ধ বৈষ্ণবের দেহে সাত্ত্বিকভাব সমূহের প্রকাশ হওয়ায়, কিছুক্ষণের জন্য তিনি অভিভূত হইয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের সহচরগণ অবাক্ হইয়া এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিল। অতঃপর বৃদ্ধ বৈষ্ণবের অনুরোধে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব তাঁহার পর্ণ কুটীরে পদার্পণ করিয়া তাঁহাকে প্রসাদ দানে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। সেই অবধি যতকাল বৃদ্ধ জীবিত ছিলেন, ততকাল শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব তাঁহার কুটীরে যাইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিতেন।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব যাহার যেইভাব, সেইরূপ অনুসারেই

তাহার অভিলাষ পূরণ করিতেন। কাহাকেও গোপনে, কাহাকেও প্রকাশ্যে কৃপাদানপূর্ব্বক কৃতার্থ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার মাতা ও মাতামহী তাঁহাকে অতি শুদ্ধাচারে রাখিলেও এবং যেখানে সেখানে আহার করিতে না দিলেও, তিনি তাঁহার ধাত্রীমার বহু দিবসের সঞ্চিত আশা পূরণের জন্য হঠাৎ একদিন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, তাহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য পুনঃপুনঃ কিছু আহার করিতে চাহিলেন, কিন্তু ধাত্রীমা জানিত যে, গৌরী দেবী ও আনন্দময়ী শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে বিশেষ শুদ্ধাচারে রাখিতেন এবং যাহার তাহার অন্ন খাইতে দিতেন না। সেইজন্য শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের ক্ষুধার কথা শুনিয়া, বাৎসল্যভাবাপন্না ধাত্রীমার প্রাণ বিগলিত হইলেও, সে ভয়ে তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিতে না পারিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। এদিকে অযাচিত কৃপাসিন্ধু, অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব আবার কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "ধাত্রীমা, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে, তোমার ঘরে যা আছে, তাই আমায় খেতে দাও।" এবার ধাত্রীমা আর ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিল না। সে বলিল, "বাবা, আমি অতি গরীব—শাকান্ন ছাড়া আমার ঘরে আর কিছুই নেই।" তাহা শুনিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব পরমানন্দে বলিলেন, "আমায় তাই দাও, ধাইমা, আমায় তাই দাও।" গত্যন্তর না দেখিয়া ধাত্রীমা পরম যত্নে সেই শাকান্নই শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে আহার করিতে দিল। তিনি উহা সানন্দে অমৃতের ন্যায় ভোজন করিতে লাগিলেন এবং "আরও দাও, আরও দাও" বলিয়া চাহিতে লাগিলেন। সেই সময় অকস্মাৎ গৌরী দেবী পুত্রকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে ধাত্রী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল এবং হতবুদ্ধি হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। গৌরী দেবী তৎক্ষণাৎ পুত্রের হস্তধারণপূর্ব্বক ভৎর্সনা করিতে করিতে বাটীতে লইয়া গেলেন এবং ভবিষ্যতে আর যাহাতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব

এরূপ না করেন, সে বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেন। যাহাহউক, গৌরী মা অতীব দুঃখিত হইলেও, ভাবগ্রাহী এবং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেব ধাত্রীমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া অপার করুণারই পরিচয় প্রদান করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই প্রতি বৎসরের ন্যায় সেবারও পাণিহাটী গ্রামে জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে "দণ্ড মহোৎসব" নামে সুবিখ্যাত মহামেলা আরম্ভ হইল। তদুপলক্ষে সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগম হইল। বহু কীর্ত্তনের দলও আসিয়া কীর্ত্তনের ধ্বনিতে পাণিহাটী মুখরিত করিয়া তুলিল। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব শিশু হইলেও কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া সকলকে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন; এমন সময় একজন নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব সেই মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের উদ্দেশ্যে দুইটী মালসা ভোগ প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। মনে বড় ভয়, পাছে কোনও অনাচার হইয়া ভোগ নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিলেন। বৈষ্ণবকে কৃপা করিবার জন্যই তিনি মহা কৌতূহলে নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে পশ্চাৎ হইতে তাঁহার কৌপীনের ডোরে পা দিয়া এবং বামহস্তে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, দক্ষিণহস্তে মালসা মধ্য হইতে উক্ত ভোগের সামগ্রী খাইতে লাগিলেন। বিস্ময়ে ও দুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া বৈষ্ণব "হায়! হায়!" শব্দে নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। চতুরচূড়ামণি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব উদর পূরিয়া মালসা ভোগ ভোজন করতঃ অদূরে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন; এবং বৈষ্ণবকে তদীয় ইষ্টদেব "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু" রূপে দর্শন দানে কৃতার্থ করিলেন। বৈষ্ণব সেই অপরূপ গৌররূপ দর্শন করিয়া ভাবে পুলকিত হইলেন, এবং ভোগ নিবেদন না করিতেই "গোরা অহেতুকী কৃপা করিয়া স্বহস্তে ভোগ গ্রহণ করিলেন" ভাবিয়া আনন্দে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে সেই চিরবাঞ্ছিত ধনকে ধরিবার আশায় প্রধাবিত হইলেন; কিন্তু শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব ঈষৎ হাস্য করিয়া

কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বৈষ্ণব তাঁহার অদর্শনে 'হা গৌরাঙ্গ!' বলিয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গৌরী দেবী শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে শৈশব হইতে নানারূপ ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন। সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি একদিন তাঁহার প্রাণের গোপালকে তক্তপোষের উপর বীরাসনে বসাইয়া 'কালীনাম' জপ করিতে বলিলেন; এবং যাহাতে তিনি অধিকক্ষণ বসিয়া জপ করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহার চারিদিকে বালিশ সাজাইয়া দিলেন। বালক শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব গভীর ধ্যানপ্রভাবে শীঘ্রই সবিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। মাতামহী নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। গৌরী দেবী তাহাতে ভীতা না হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক সাবধানে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে রক্ষা করিতে লাগিলেন, যাহাতে কেহ তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে না পারে। বহুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের বাহ্যজ্ঞান লাভ হইল। তদ্দর্শনে মাতামহী আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে আদর যত্ন করিতে লাগিলেন।

এই সময় পাণিহাটীতে জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাটীতে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ বিগ্রহের সেবা হইত এবং তথায় প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইত। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের বয়স যখন অল্প, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইয়া পাঠ শুনিতেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং আদর করিয়া তাঁহাকে 'গোপাল' বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে 'দাদামশাই' বলিয়া ডাকিতেন। একদা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভোগ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ তাঁহার হৃদয়ের গোপালকে প্রসাদ গ্রহণের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। যথাসময়ে ভোগের পর শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অন্যান্য লোকজন সহ প্রসাদ পাইতে বসিলেন। ঘটনাক্রমে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব যখন অম্ল খাইতেছিলেন, তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ

জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল, বল দেখি, রাধাগোবিন্দ আজ কেমন খেয়েছেন।" গোপাল বলিলেন, "দাদামশাই, খেয়েছেন ত ভালই; কিন্তু আমটী হাড়ে টক্।" যেমন এইকথা বলা, অমনই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। অন্যান্য লোক যাঁহারা প্রসাদ পাইতে-ছিলেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে দোষ দিয়া বলিলেন, "বৈষ্ণবের নিকট অমন কথা বল্‌তে আছে? বল্‌তে হয়, 'আঁটিতে টক্'।" শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেব চুপ করিয়া রহিলেন। অতঃপর প্রসাদ পাইয়া যথাসময়ে হাতমুখ ধুইলেন এবং দাদামহাশয়ের নিকট যাইয়া বলিলেন, "দাদামশাই, আমি যে [illegible]কে ঠাট্টা ক'র্‌তে পারি। অমন খেতে খেতে রাগ ক'রে উঠে এলেন কেন? যা হোক্, যদি রাগ না করেন, তা'হলে, দাদামশাই, দু'একটা কথা ব'ল্‌তে চাই!" দাদামহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা, বল।" শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব বলিলেন, " 'আমি হাড়ে টক্' ব'লেছি; 'হাড়' বল্‌তে 'অস্থি' বুঝায়, তাহা 'আমিষ' অর্থবোধক। উহা উচ্চারণ ক'রেছি ব'লেই আপনার খাওয়া হ'ল না। আচ্ছা, বলুন দেখি, দাদামশাই, এ জগতে কোন্ জিনিষটা নিরামিষ? এই পৃথিবীকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়, অর্থাৎ 'ব্রহ্মের অণ্ড হ'তে এই পৃথিবীর উৎপত্তি', অণ্ড তো নিরামিষ নয়। তবে এই পৃথিবীজাত বস্তুসমুদয় কিরূপে নিরামিষ হ'বে? এই পৃথিবীর একনাম মেদিনী, অর্থাৎ 'মধু-কৈটভের মেদ হ'তে ইহার সৃষ্টি হ'য়েছে'। মেদ কি নিরামিষ? কখনও নয়; যে মেদ হ'তে এই পৃথিবীর সৃষ্টি, তা'র কোন্ বস্তু নিরামিষ? আপনার সমগ্র দেহ হাড়-মাংস-রক্তে গঠিত। যে মুখ দ্বারা, যে দন্ত দ্বারা আহার করেন, তা'ও মুখের হাড়-মাংস সংস্রবে মাংসচর্ম্মময় উদরে উপস্থিত হয়। তবে, দাদামশাই, আমি শুধু 'হাড়' শব্দ উচ্চারণ ক'রেছি ব'লে আপনার আহার বন্ধ হ'ল!" এরূপ যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া রহিলেন এবং বলিলেন, "তুমি বুঝি এইসব মত প্রচার কর্‌বে?" শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব বলিলেন, "না, না, দাদামশাই, আপনার আহার

তাগের জন্যই আমার এ সমস্ত ব'ল্‌তে হ'ল ; নতুবা আমি প্রচার ক'র্‌তে যাচ্ছি না।"

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব শৈশবে এইরূপ বহু অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য লীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক মাতা গৌরী দেবী, মাতামহী আনন্দময়ী ও গ্রামস্থ নরনারীকে কত যে আনন্দ দান করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত।

অতঃপর শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলে, মাতা গৌরী দেবী দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়িনী হইলেন। বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে রক্ষা করা গেল না। ক্রমশঃ তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল ; তিনি স্বীয় ইষ্টমূর্ত্তি চতুর্ভুজা দক্ষিণাকালী দর্শন করিতে করিতে নিত্যধামে প্রস্থান করিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবও সেই দিব্য কালীমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল সেই মাতৃবিয়োগ-জনিত দারুণ শোক সংবরণপূর্ব্বক যথাসময়ে মাতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর বিদ্যোপার্জ্জনের নিমিত্ত মাতামহী আনন্দময়ীর সহিত তিনি পুনরায় কলিকাতা আগমন করিলেন। তথায় এক বৎসর কাল অবস্থান করিবার পর তাঁহারই সহিত গয়াধামে গমনপূর্ব্বক 'শ্রীশ্রীগদাধরের' পাদপদ্মে পিতামাতার পিণ্ডদান ও তর্পণাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর মাতামহী কাশীবাস করিবার নিমিত্ত কাশী চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব তাঁহার মেসো ভুবনমোহন মিত্র মহাশয়ের নিকট অবস্থান করিয়া জেনারেল্ এসেম্‌ব্লী ইন্‌ষ্টিটিউস্নে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

মাতৃবিয়োগের পর হইতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব প্রায়ই গভীর আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। তথাপি তিনি পাঠাভ্যাসে কখনও অমনোযোগী হন নাই। অধ্যয়ন এবং আত্মচিন্তা তিনি সমভাবেই করিতেন। কিন্তু সমপাঠীগণ সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার অদ্ভুত ঔদাসীন্যভাব লক্ষ্য করিয়া বিশেষ দুঃখ বোধ করিত। জেনারেল্ এসেম্‌ব্লী ইন্‌ষ্টিটিউ-

সনের অধ্যক্ষও তাঁহার উপর অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ইংরাজ হইলেও বাঙ্গালা জানিতেন। যাহাহউক, একদিন জলযোগের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর, ছাত্রগণ যথারীতি নিজ নিজ ক্লাসে গেল। কিন্তু শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব উদ্যানের মধ্যে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া আত্মধ্যানে এরূপ বিভোর হইলেন যে, তাঁহার দেহস্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। তাঁহার বঙ্কিম গণ্ডস্থল বহিয়া পবিত্র প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইংরাজ অধ্যক্ষ বহুক্ষণ হইতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের মুখমণ্ডলের স্বর্গীয়ভাব দর্শন করিয়া নিঃশব্দে তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব বিস্ফারিত ও অরুণিত নেত্রে দৃশ্য পদার্থ সকল দেখিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অধ্যক্ষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতক্ষণ এখানে তুমি কি করিতেছিলে?" শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব সরলভাবে ইংরাজ অধ্যক্ষের নিকট তাঁহার আত্মচিন্তার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। নবম বর্ষীয় বালকের নিকট তাঁহার গভীর আত্মচিন্তার বিষয় অবগত হইয়া অধ্যক্ষ বলিলেন, "যে দেশে তোমার ন্যায় বালক জন্মগ্রহণ করে, সে দেশকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার প্রয়াস পাওয়া অপেক্ষা বেশী মূর্খতা আর কি হইতে পারে?" অতঃপর উক্ত ইংরাজ অধ্যক্ষ আচার্য্যের আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসু হইয়া সাধন-ভজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অনেক সময় ধর্ম্মচিন্তায় বিভোর থাকিতেন বলিয়া শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেব ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, বহু সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেন; কিন্তু তাঁহার অধ্যয়নের স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। সেইজন্য তিনি স্বাবলম্বী হইয়াই নানাবিধ গ্রন্থ, সমগ্র হিন্দু শাস্ত্র ও দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শন, এমন কি, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থাদিও পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ স্মৃতিশক্তি ছিল যে, উত্তরকালে তিনি কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই নানা গ্রন্থ হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া

অনর্গল বলিতে পারিতেন এবং প্রয়োজন হইলে, সেই সকল গ্রন্থের পৃষ্ঠা ও পংক্তি পর্য্যন্ত যথাযথভাবে উল্লেখ করিতেন। তাঁহার এইরূপ বহু অদ্ভুত ও অসামান্য শক্তি দর্শনে অনেকেই মুগ্ধ হইতেন।

বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব কিছুদিন গৃহেই অবস্থান করেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মেসো ভুবনমোহন মিত্র মহাশয়ের আগ্রহে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় তিনি ঢাকা সহরে একটী গভর্ণমেণ্ট আফিসে কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু বয়স অল্প হইলেও এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যটী তিনি বিশেষ যোগ্যতা ও সুখ্যাতির সহিত সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এই সময় একদিন আফিস বন্ধ হইলে কিছু টাকা জমা দিবার সুবিধা না হওয়ায়, উহা নিরাপদে রাখিবার জন্য শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব উক্ত টাকা লইয়া সন্ধ্যার সময় স্বীয় আবাস স্থলে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে জনৈক গুণ্ডার সর্দ্দার উক্ত টাকার লোভে তাঁহাকে আক্রমণ করে। বহুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেব তাহাকে লৌহ মুষ্টি দ্বারা প্রহারপূর্ব্বক ঢাকা সহরের ফরিদাবাদ লোহার পুলের নিকট গভীর নর্দ্দমার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, নিরাপদে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। আফিস হইতে তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া, তাঁহার মেসো মহাশয় ও মাসীমাতা ঠাকুরাণী বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার মুখে বিলম্বের কারণ শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এদিকে গুণ্ডার সর্দ্দার কথঞ্চিৎ সুস্থতালাভ করিয়া তাহার প্রহারকারীর অনুসন্ধান করিতে করিতে, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের সহিত দেখা করিয়া সে বলিল, "আজ হ'তে তুমি আমার দোস্ত (বন্ধু) হ'লে; কারণ আমার আক্রমণে বাধা দেয় এরূপ লোক সহরে নাই।" তাহার কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব হাসিতে লাগিলেন। গুণ্ডার সর্দ্দার তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

ইহার পর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের সহিত সম্পত্তি লইয়া

গোলযোগ আরম্ভ হয়। তাঁহার অন্যতম মেসো শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায্য অংশ আদায়ের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদুপলক্ষে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব শ্রীযুক্ত ভুবন বাবুর সম্মতিক্রমে এক মাসের ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। বলাবাহুল্য, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের মেসো মহাশয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবু এই মোকর্দ্দমায় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের হৃতসম্পত্তি পুনরায় উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাতৃবিয়োগের পর হইতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব প্রায়ই গভীর আধ্যাত্মিক ভাবে বিভোর থাকিতেন। তজ্জন্য তাঁহার মেসো মহাশয় নিজের কাছেই শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেবের অর্থাদি গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বিশিষ্ট ভক্ত এবং ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের মাসতুতো জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পূজ্যপাদ রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে বেনামী করিয়া ঐ অর্থ দ্বারাই কাঁকুড়গাছিতে একটী উদ্যানবাটী ক্রয় করা হয়। বর্ত্তমানে ইহাই কাঁকুড়গাছি "যোগোদ্যান" নামে খ্যাত হইয়াছে; এবং এই স্থানেই ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পরম পবিত্র অস্থি সমাহিত আছে। এই উদ্যানবাটী সম্বন্ধে যথাসময়ে কিছু উক্ত হইবে।

মেসো রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সাহায্যে ধনসম্পত্তি উদ্ধার হইলেও, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব বিষয়সম্পত্তির দ্বারা বিন্দুমাত্র সুখী হইতে পারিলেন না। তিনি বিষয়সম্পত্তিকে অতি তুচ্ছ মনে করিতে লাগিলেন এবং কিসে বিষয়-পাশ ছিন্ন করিতে পারিবেন, সেই সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব আত্মারাম। তথাপি তিনি যেন কাহার অপেক্ষায় এই সময় সর্ব্বদাই বিষণ্নমনে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

সন্ন্যাস গ্রহণ*

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

গীতা, ২১তি শ্লোঃ, ৩য় অঃ।

[মহৎ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোকে তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং তিনি যে যে প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, লোকেও তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে।]

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব কলিকাতা অবস্থান কালে প্রতিদিনই কালীঘাটে কালীমাতার মন্দিরে গমন করিতেন এবং সময় সময় নিকটবর্ত্তী কেওড়াতলায় শ্মশানের একপ্রান্তে বসিয়া আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন।

*আর্য্যশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস নামে চতুরাশ্রম আছে। তন্মধ্যে সন্ন্যাসাশ্রমকেই শেষ আশ্রম বলা হয়। ইহারই অপর নাম সিদ্ধাশ্রম। সদ্গুরুর কৃপায় শিষ্যের আত্মজ্ঞান ("আমিই আত্মা বা ব্রহ্ম" এই জ্ঞান) লাভ হয়। আত্মজ্ঞানই প্রকৃত সন্ন্যাস—আত্মজ্ঞানই স্বাভাবিক সন্ন্যাস। যাঁহার সংসারে সম্পূর্ণ বিরাগ হইয়াছে তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক—তিনিই যথার্থ চতুর্থাশ্রমী। (শ্রীশ্রীঠাকুর নিত্যগোপাল দেব যে "ঋষভপন্থী অবধূত সম্প্রদায়" উপলক্ষ করিয়া সমস্ত ধর্ম্মের ঐক্য সাধনোদ্দেশ্যে পরমোদার সমন্বয় ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন, সেই অষ্টমাবতার ভগবান্ শ্রীশ্রীঋষভদেবও নিজ আচরণের দ্বারা যে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা এই অধ্যায়ের শেষাংশ পাঠেই অবগত হওয়া যাইবে।) তাই, শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়াছেন, "সন্ন্যাসী স্বভাবে।......স্বভাবে ....। তুমি সন্ন্যাসী না হইতে পার, তবে তোমার কেবল বৈধি সন্ন্যাসে প্রয়োজন কি?

কালীঘাটে কালীমাতার মন্দির হইতে কিয়দ্দূর উত্তরে আদি গঙ্গার পূর্ব্বোপ-কূলে ত্রিকোণেশ্বর নামে বহু প্রাচীন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। সন্ন্যাসীর স্বভাব, বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, সরলতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও নির্লিপ্ততা প্রভৃতির সমষ্টি।"

প্রাচীন কালে সদ্‌গুরুর কৃপায় সাধন-ভজন দ্বারা শিষ্য স্বভাবতঃই আত্মজ্ঞান লাভ করিতেন। সেইজন্য তাঁহারা সন্ন্যাসীর অবস্থা লাভ করিয়া পরমাশান্তির অধিকারী হইতেন—নিত্যানন্দের অধিকারী হইতেন। কিন্তু এই অবস্থা বাস্তবিকই কাহার লাভ হইয়াছে এবং কাহার লাভ হয় নাই, তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। তাই, আর্য্যশাস্ত্রে বিবিদিষা সন্ন্যাসেরও বিধান আছে; কেননা, সন্ন্যাসোপনিষদে স্পষ্টভাবে "বিবিদিষা সন্ন্যাস" ও "বিদ্বৎসন্ন্যাস" নামে দুই প্রকার সন্ন্যাসেরই ব্যবস্থা দেখা যায়। ইহাই সমর্থন করিয়া ঠাকুরও বলিয়াছেন, "সন্ন্যাস দুই প্রকার—বৈধি সন্ন্যাস ও স্বভাব সন্ন্যাস।" প্রকৃতপক্ষে যিনি যে ভাবেই সন্ন্যাসাশ্রমী হউন না কেন তাঁহাকেই ত্রিগুণের অতীত হইতে হয়।

শাস্ত্র বিধান অনুসারে সদ্‌গুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণান্তর বিহিত-"কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ হইলে যে কর্ম্মত্যাগ হয়, তাহা 'সাধনরূপ ত্যাগ'। শাস্ত্রে এবংবিধ ত্যাগ 'বিবিদিষা সন্ন্যাস' নামে উক্ত হইয়াছে। আর জন্মজন্মান্তরীয় সাধন-সিদ্ধির প্রভাবে প্রথম হইতেই মনুষ্যের যে ফল-কামনায় ও কর্ম্মানুষ্ঠানে অনাসক্তি জন্মে তাহার নাম 'ফলরূপ ত্যাগ'। ইহাই শাস্ত্রে 'বিদ্বৎ সন্ন্যাস' নামে উক্ত হইয়াছে।" যাহাহউক, সদ্‌গুরুর কৃপায় যিনি যখন যেভাবে প্রকৃত সন্ন্যাসীর অবস্থা লাভ করেন, তিনিই মহান্—তিনিই আমার প্রণম্য।

আবার শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ॥" অর্থাৎ "যিনি ফলে বিতৃষ্ণ হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী; কিন্তু যিনি অগ্নি-সাধ্য ইষ্ট (যজ্ঞ-

তৎকালে এতদঞ্চলে* মনুষ্যবসতি অতি বিরল ছিল। লোকসমাগম একেবারেই ছিল না বলিলে চলে। স্থানটী অরণ্যের মত নির্জ্জন ছিল। বর্ত্তমানে উক্ত ত্রিকোণেশ্বর শিবালয়টী হিন্দুমিশন কর্ত্তৃক অতি সুন্দররূপে কর্ম্মাদি) ও পূর্ত্ত (পুষ্করিণী খননাদি) প্রভৃতি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসীও নন, যোগীও নন।" এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ফল-কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। তাঁহার মতে যিনি কর্ম্মফল-বাসনা ত্যাগ করিয়া বা কর্ম্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া বা তদর্থেই (অর্থাৎ ভগবদর্থেই) কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই (কর্ম্ম করিয়াও) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মতে সন্ন্যাসী ; কেননা এইরূপ নিষ্কাম-কর্ম্মী পুরুষের চিত্তশুদ্ধি হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ হয়। এই আত্মজ্ঞানই যে প্রকৃত সন্ন্যাস তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাহাহউক, প্রকৃত সন্ন্যাস লাভ সহজসাধ্য নয়! সেইজন্য ঠাকুর বলিয়াছেন, "তুমি ইচ্ছা করিলেই সন্ন্যাসী হইতে পার না। অবস্থায় যখন সন্ন্যাসী করিবে, তখনই সন্ন্যাসী হইতে পারিবে। তখনই গার্হস্থ্য স্বভাবতঃ পরিত্যক্ত হইবে।......প্রকৃত-বিবেক-বৈরাগ্য-প্রসূত যাঁহার সন্ন্যাস তাঁহার সন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস। তিনিই শান্তিলাভ করিয়াছেন। তিনিই নিত্যানন্দের অধিকারী।......কেবল সন্ন্যাসীর ভেক্ ধারণে, উপবীত ও শিখাত্যাগে জন্মমৃত্যু ও জাতিশূন্য সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। তাহা হইলে আর ভাবনা থাকিত না। তাহা হইলে সন্ন্যাসও সর্ব্বশ্রেষ্ঠাশ্রম হইত না।..... প্রকৃত সন্ন্যাসী জিতেন্দ্রিয়। তিনি লজ্জার অধীন নন। তবে তাঁহাকে সলজ্জ সমাজে ভিক্ষা করিতে হয় বলিয়া দীর্ঘ বস্ত্রের পরিবর্ত্তে সংকীর্ণ কৌপীন ব্যবহার করেন।......ঐ প্রকার আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসীর জানিবার আর অবশিষ্ট কিছু থাকে না।......সন্ন্যাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠাশ্রম নাই। প্রকৃত সন্ন্যাসীর শিবত্ব হয়।......স্বেচ্ছায় কেহ সন্ন্যাসী হইতে পারে না।...... কেবল সন্ন্যাসীর বেশধারী হইলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। কৃষ্ণের ন্যায় বেশ করিলে সে কি প্রকৃত কৃষ্ণ হয়?......"

সংস্কৃত হইয়াছে। তৎকালে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে মকর-সংক্রান্তি তিথিতে প্রসিদ্ধ গঙ্গাসাগর মহামেলায় যাতায়াত কালে বহু সাধু-সন্ন্যাসী কালীমাতা দর্শনান্তে এখানে কিছুদিন অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেবের এ সমস্ত স্থান অবিদিত ছিল না। তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে আসিতেন এবং সাধু-সন্ন্যাসী মহাত্মাগণের সহিত সদালোচনা করিতেন।

সন ১২৭৭ সালে পৌষ সংক্রান্তির পর, গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে শ্রীশ্রীঋষভাবতার পরমহংসাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত ব্রহ্মানন্দ স্বামী মহারাজ এই ত্রিকোণেশ্বর শিবালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি শিবালয়ের পশ্চিম পার্শ্বে এক ভস্মস্তূপের উপর আসনে সমাসীন হইয়া ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল হইতে দিব্য রমণীয় জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতেছিল। এমন সময় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব প্রতিদিনের ন্যায় কালীঘাট হইতে প্রত্যাগমন কালে তথায় উপস্থিত হইলেন। ধ্যানভঙ্গের পর তাঁহাকে দেখিবামাত্র শ্রীশ্রীপরমহংসাচার্য্য মহারাজ,* "বাচ্চা, ইধার্ আও," বলিয়া অতি মধুরস্বরে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে ডাকিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি সস্নেহে বলিলেন, "অস্নান্ কর্‌কে আও; তুম্‌হারা চীজ্ লে যাও।" শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী ভাগীরথীর পূতসলিলে স্নান করিয়া শ্রীশ্রীপরমহংসা-চার্য্য মহারাজের নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন। সেই শুভমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্ব্বক মহাবাক্য (ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য) বলিবামাত্র শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব মহাভাবে বিভোর হইয়া সমাধি-নিমগ্ন হইলেন। অতঃপর সমাধি হইতে ব্যুত্থান লাভ করিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব গুপ্তভাবে থাকিবার জন্য শ্রীশ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুমতি লইলেন। পরমহংসাচার্য্য

* ইনি বাঙ্গালী ছিলেন; কিন্তু সুদীর্ঘকাল হিঙ্গুলায় বাস করায় হিন্দি ভাষা বলিতেই বিশেষ অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমদবধূত ব্রহ্মানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে সন্ন্যাস-বিষয়ক* কিছু উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে বেলুচিস্থানের অন্তর্গত দেবীর

*এইস্থলে শ্রীশ্রীনিত্যদেবের "সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসীর মাহাত্ম্য" বিষয়ক উপদেশাবলীর স্বল্পাংশ সাধারণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইল :—"শ্রীকৃষ্ণ—"বরিষ্ঠো নাম-সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণেষু দশেষপি। শতেষু কর্ম্ম-সন্ন্যাসী জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতঃ। সর্ব্বলোকেষপি ত্যাগসন্ন্যাসী মম দুর্লভঃ॥" (অর্থাৎ) "যদি কেহ কেবল নাম-সন্ন্যাসী হয়েন, তথাপি তিনি দশ জন ব্রাহ্মণের তুল্য, যে ব্যক্তি কর্ম্ম-সন্ন্যাসী, সে ব্যক্তি শত ব্রাহ্মণতুল্য, যে সন্ন্যাসী আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই জ্ঞান-সন্ন্যাসী আমারই সমান এবং যে ব্যক্তি ত্যাগ-সন্ন্যাসী, তিনি আমারও দুর্লভ।"... ...যোগবাশিষ্ট—"যত্ত্যক্তং মনসা তাবৎ তত্ত্যক্তং বিদ্ধি রাঘব॥" (অর্থাৎ) "যাহা মন হইতে ত্যাগ করা যায়, তাহাই প্রকৃত ত্যাগ ; বাহিরের ত্যাগমাত্র প্রশস্ত নহে।"...... মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে—"অবধূতঃ শিবঃ সাক্ষাদবধূতঃ সদাশিবঃ॥ অবধূতী শিবা দেবি অবধূতাশ্রমং শৃণু॥ সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ। যৎ তদ্দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকাৎ। তীর্থব্রতপোদান-সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ॥" (অর্থাৎ) "মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "হে দেবি! অবধূত সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ও অবধূতী সাক্ষাৎ দেবী ভগবতী-স্বরূপা। গৃহস্থ তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জানিয়া পূজা করিবেন। তাঁহার দর্শনমাত্রেই গৃহস্থ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন এবং তীর্থ, ব্রত, তপস্যা, দান ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করিয়া থাকেন।"... কোন যতিকে বিদ্রূপ করিলে, কোন যতির নিন্দা করিলে, ভয়ানক অপরাধ হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তির নিন্দাই শ্রবণ করিতে নাই। বিশেষতঃ যতির নিন্দা শ্রবণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যথা যতির নিন্দা হয়, তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে হয় অথবা বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান বিধি।......সকল জাতীয় সকল শ্রেণীর সাধুকেই মান্য করি। সাধু, বিধাতার বিধিব্যবস্থা প্রচারক ; জীবের ন্যায় অন্যায়ের মীমাংসা

পীঠস্থান "হিঙ্গুলায়" গমন করিলেন। উক্ত স্থানে এক গুহাতে তাঁহার আসন ছিল। যাহাহউক, এইরূপে প্রায় ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে

কর্ত্তা। সাধুর অবমাননা করিলে ভগবানের অবমাননা করা হয়। রাজার কোন কর্ম্মচারীর অবমাননা করায় রাজারই অবমাননা করা হয়। ······শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে একজন যতিকে ভোজন করাইলে, সমস্ত ত্রৈলোক্যবাসীগণকে ভোজন করাইলে যে ফল হয়, তাহার সেই ফল হইয়া থাকে।······মহানির্ব্বাণ তন্ত্র প্রভৃতি মতে ··· অন্যান্য বহু শাস্ত্র মতেও যতি নারায়ণ। ধ্যানযোগবিচক্ষণ যোগী যে দেশে বাস করেন, সে দেশ পবিত্র হয়। অতএব সেই যতি যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কুল অবশ্যই পবিত্র হয়। সেই যতির দেহ যে পুরুষ প্রকৃতি হইতে তাঁহারা যে পরম পবিত্র সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? তাঁহার দেহ সম্পর্কীয় বান্ধবগণ যে পবিত্র সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে?····· মহাত্মা দক্ষের মতে এক মুহূর্ত্ত যদ্যপি কোন যতি কোন গৃহস্থের আশ্রমে বিশ্রাম করেন, তাহা হইলে সেই গৃহস্থের অন্য কোন ধর্ম্মাচরণের প্রয়োজন হয় না। তিনি তদ্দ্বারাই কৃতকৃত্য হন।····· গার্হস্থ্যাশ্রমে ধর্ম্মহানিকর অনেক উপকরণেরই সমাবেশ। সেইজন্য গৃহস্থের পক্ষে পূর্ণ ধার্ম্মিক হওয়াই কঠিন হয়। গৃহস্থকে অনেক প্রকার কর্ত্তব্যই পালন করিতে হয়। অনেক গৃহস্থই সে সমস্ত পালন করিতে সক্ষম হন না। অথচ সে সমস্ত পালন না করিতে পারায় তাঁহাকে পাপ-ভাগী হইতে হয়। কিন্তু তিনি যদ্যপি এক রাত্রি মাত্র নিজালয়ে কোন যতিকে ভক্তিভাবে বাস করাইতে পারেন, তাহা হইলে দক্ষ প্রজাপতির মতানুসারে তদ্দ্বারা তাঁহার আজন্ম-কৃত সমস্ত পাপেরই ক্ষয় হইয়া থাকে। সেইজন্য প্রত্যেক ধর্ম্মপরায়ণ শ্রেষ্ঠ গৃহীরই অন্ততঃ এক দিবসের জন্যও যতিকে নিজালয়ে ভক্তিভাবে বাস করান উচিৎ। ······অত্যন্ত মন্দ লোকও সাধুসঙ্গে সাধু হইতে পারে।······ সাধুসঙ্গে পাপীর পাপ থাকে না।······পাপী সংসর্গে পাপী পাপীই থাকে। পাপী সাধু সংসর্গে সাধু হয়।······"

আষাঢ়ী শুক্ল-পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ! ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥"

গীতা, ৭ম শ্লোঃ, ৪র্থ অঃ।

[হে ভারত-। যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি (আবির্ভূত হই)।]

ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব "শ্রীনিত্যধর্ম্ম পত্রিকায়" এক স্থলে লিখিয়াছেন "উপযুক্ত লোক দেখে গুরু করা কর্ত্তব্য ; তাহা না করিয়া হিন্দুদের বংশ পরম্পরা কুলগুরুর নিকট মন্ত্র লইয়া সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" এই সমস্ত ধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত করিবার জন্যই তিনি কুল-গুরু গ্রহণের চিরন্তন প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করিয়া, লোকশিক্ষার্থ উপযুক্ত সন্ন্যাসী গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। অবতার এবং মহাপুরুষগণ আদর্শ-ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার নিমিত্তই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সেইজন্যই ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব প্রভৃতি অবতারগণ এবং মহাপুরুষগণও কুলগুরুর অপেক্ষা না করিয়া জগতে প্রকৃত ধর্ম্মপথ দেখাইবার নিমিত্তই উপযুক্ত সন্ন্যাসী গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কুলার্ণব তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে :—"অনভিজ্ঞং গুরুং প্রাপ্য সংশয়চ্ছেদকারণং। গুরবন্তরন্তু গত্বা স নৈতদ্দোষেণ লিপ্যতে ॥ অভিজ্ঞশ্চোদ্ধরেন্মূর্খং ন মূর্খো মূর্খমুদ্ধরেৎ। শিলাং সন্তারয়েন্নৌ হি ন শিলা তারয়েৎ শিলাং ॥" "অনভিজ্ঞ গুরু প্রাপ্ত হইয়া সাধক যদি সংশয়-ছেদনকারী অন্য গুরু গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহাকে গুরুত্যাগের পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যেমন তরণী শিলাখণ্ডকে তটিনীর পরপারে লইয়া যাইতে সমর্থ, কিন্তু শিলাখণ্ড কদাপি অপর শিলাখণ্ডকে পারে লইতে সমর্থ নহে, তদ্রূপ জ্ঞানীই মূর্খকে উদ্ধার করিয়া থাকেন ; মূর্খ কখনও মূর্খকে উদ্ধার করে না।" এ সম্বন্ধে নিত্যতন্ত্রেও উক্ত আছে :—"সুধী

গুরু ন কর্ত্তব্যো ন তবেত্তু ন তারযেৎ।" এইসব কারণেই ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্যই লোক শিক্ষার্থ পরমহংসাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ অবধূত মহারাজের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'নিত্য গীতি" নামক গ্রন্থে সেই পরমহংসাচার্য্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—"হয বিপদভঞ্জন, সর্ব্ববিঘ্ন নিবারণ, "শ্রীব্রহ্মানন্দ দেবের" নাম উচ্চারণে। তিনি শ্রীঋষভদেব দেবেন্দ্রবন্দিত, "জ্ঞানানন্দ" প্রেমানন্দ তাঁহাতে স্ফুরিত॥"

দীক্ষা গ্রহণান্তর শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের ধর্ম্মোন্মাদ ভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেইজন্য মেসো মহাশয়ের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক সদাসর্ব্বদা আত্মভাবেই বিভোব থাকিতে লাগিলেন এবং একখানি মাত্র মলিন জীর্ণ বস্ত্র পবিধানপূর্ব্বক উদাস ভাবে যেখানে সেখানে ঘুরিযা বেড়াইতে লাগিলেন।

এই সময় একদিন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব মাতামহীব বিশেষ অনুরোধে কোন কার্য্যোপলক্ষে উকিলের বাড়ী যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে কলিকাতা বীডন্ স্কোয়ারের সৌন্দর্য্য দর্শনে বিশ্বস্রষ্টার সৌন্দর্য্যবিষযক চিন্তা তাঁহার অন্তরে উদিত হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি সেই উদ্যানস্থিত এক বেঞ্চের উপর বসিয়া ভগবদ্ভাবে এরূপ তন্ময় হইয়া পড়িলেন যে, উকিলের বাড়ী যাইবার কথা তাঁহার আর মনে রহিল না! সেই সময পাঞ্জাবী বেশধারী এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাব পার্শ্বে উপবেশন করিলেন; কিন্তু তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব বাহ্য দশায় ফিরিয়া আসিলে, সেই পাঞ্জাবী বেশ-ধারী ব্যক্তি তাঁহাকে মন্ত্র দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব বলিলেন, "আমার গুরুদেব আমাকে যে মন্ত্র দিয়াছেন, তা ভিন্ন আমি অন্য মন্ত্র জপ্ ব না।" এইরূপ আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সেই পাঞ্জাবী বেশধারী ব্যক্তি ছদ্মবেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। তখন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব জানিতে

পারিলেন যে, পাঞ্জাবী বেশধারী ব্যক্তি আর কেহই নহেন ; তাঁহারই 'শ্রীশ্রীগুরুদেব' স্বয়ং পরমহংসাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ অবধূত মহারাজ। অযাচিত এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে শ্রীশ্রীগুরুদেবের দর্শন লাভ করিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজও তাঁহার অবিচলিত গুরুনিষ্ঠা দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের পর হইতে শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বৈরাগ্যভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। শৌচক্রিয়াদির জন্ত অল্পক্ষণ মাত্র বাহিরে থাকিয়া সমস্ত দিন রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন। শীত নিবারণের জন্ত তাঁহার স্বহস্ত-প্রস্তুত সার্দ্ধ এক হস্ত পরিমিত প্রস্থ এবং সার্দ্ধ দ্বিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ একখানি কন্থা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। এই সময় তিনি একখানি মাত্র ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান করিতেন, সুতরাং স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্র তাঁহার শরীরেই শুকাইত। তিনি এরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন যে, প্রাণিজাত বলিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতের পরিবর্ত্তে তৈলাদি উদ্ভিজ্জাত পদার্থ দ্বারা হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিতেন। তাঁহার এরূপ আচরণ দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবর্গ তাঁহাকে অর্দ্ধোন্মাদ বলিয়া ধারণা করিতেন।

কিছুদিন এইরূপে অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব পুনরায় কাশীধামে গমন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর মাত্র। তথায় তৃতীয়বার তাঁহার শ্রীশ্রীগুরুদেব পরমহংসাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ অবধূত মহারাজের দর্শন লাভ হয়। সেই সময় তিনি তাঁহাকে গৈরিক বহির্ব্বাস, কৌপীনাদি দিয়া তাঁহাকে "যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত" নাম প্রদান করিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে অতিশয় ভালবাসিতেন বলিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রদত্ত বহির্ব্বাসাদি গ্রহণাস্তে তিনি বিনীতভাবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "প্রভো, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য ; কিন্তু কৃপাপূর্ব্বক আজ্ঞা করুন,

আমি যেন সুবিধামত এই গৈরিক বহির্ব্বাসাদি পরিধান করিতে পারি।" পরমহংসাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থনানুরূপ আদেশ প্রদান কবিলেন ; এবং শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে সন্ন্যাস আশ্রমের পরিচয় ও তীর্থ পর্য্যটনের অনুমতি দিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। সেই পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সম্প্রদায়	···	অবধূত সম্প্রদায়
শাখা	···	কেবলানন্দ-শাখা
পন্থী	···	ঋষভপন্থী
মঠ	···	মহানির্ব্বাণ মঠ
ক্ষেত্র	···	কাশীধাম
তীর্থ	···	উত্তর বাহিনী গঙ্গা
বেদ	···	সামবেদ
মহাবাক্য	···	তত্ত্বমসি
দেব	···	সদাশিব
দেবী	···	আদ্যাকালী
গুরু	···	ঋষভাবতার পরমহংসাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত ব্রহ্মানন্দ দেব
যোগপট্ট	···	যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব (ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব)

"ঈশ্বরপুরীর অনেক দ্বার। সেই পুরীর এক একটী দ্বার এক এক সাম্প্রদায়িক মত। ঈশ্বরপুরীতে প্রবেশ করিতে হইলে যে কোন সাম্প্রদায়িকরূপ দ্বার দ্বারাই প্রবেশ করিতে হয়।"

(চৈতন্য বা সর্ব্বধর্ম্ম নির্ণয়সার)।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাহা প্রাচীন অবধূত সম্প্রদায়। উক্ত অবধূত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অনেকগুলি শাখা প্রশাখা আছে। তন্মধ্যে তিনটীই প্রধান। ঐ তিনটীর মধ্যে

একটী 'কেবলানন্দ' শাখা, দ্বিতীয়টীর নাম 'দত্তাত্রেয়' শাখা, এবং তৃতীয়টীর নাম 'গোবিন্দ ভাগবত' শাখা।

প্রাচীন অবধূত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ঐ তিন শাখাই তিন মহাত্মার নামে প্রচলিত। তন্মধ্যে যে শাখা শ্রীশ্রীমদবধূত কেবলানন্দ দেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত তাহাই 'কেবলানন্দ' শাখা নামে প্রসিদ্ধ।

পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু নাভিরাজ-তনয়রূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অষ্টমাবতার ভগবান্ ঋষভদেব। তিনি রাজ্য পালনান্তে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্য-সমন্বিত পরমোদার 'পারমহংস্য-ধর্ম্ম' জগৎকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রব্রজ্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস* আশ্রমের নাম শ্রীশ্রীমৎ কেবলানন্দ অবধূত। তাঁহা হইতে অবধূত সম্প্রদায়ের যে

*শ্রীশ্রীঋষভদেবও (দত্তাত্রেয় ও জড়ভরতের ন্যায়) আচরণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, অবধূতাশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের অবস্থা হইলেই তাহা অবলম্বন করা যাইতে পারে। তিনিও আদর্শ সন্ন্যাসী বা অবধূতের জীবনযাপন করায় তাঁহা হইতেও জগৎ স্বভাব সন্ন্যাস বা বিদ্বৎ সন্ন্যাসের মহিমা অবগত হইবার বিশেষ সুবিধা পাইয়াছে। তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব বলিয়াছেন, "শ্রীমদ্ভাগবতে অবধূত দত্তাত্রেয় কাহার শিষ্য তাহার উল্লেখ নাই, শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষভদেব কাহার শিষ্য তাহারও উল্লেখ নাই, শ্রীমদ্ভাগবতে জড়ভরত কাহার শিষ্য তাহারও উল্লেখ নাই। ঐ গ্রন্থে বা অন্য কোন গ্রন্থে ঐ তিন অবধূতের পূর্ব্ববর্ত্তী অবধূতগণের উল্লেখ কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থেই পাওয়া যায় না এবং অবধূত সম্প্রদায়ের আদি কোন্ মহাত্মা তাহারও কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দত্তাত্রেয়ের, ঋষভদেবের ও জড়ভরতের বিধিপূর্ব্বক (অর্থাৎ শাস্ত্র-বিধান অনুসারে সদ্গুরুর নিকট বৈধি সন্ন্যাস গ্রহণান্তর সাধনা দ্বারা) অবধূত হইবার বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে কিম্বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ঐ তিন মহাত্মা অবধূত ছিলেন বটে। কিন্তু তাঁহারা অবধূত-

শাখা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাকেই 'কেবলানন্দ শাখা' বলা হয়। ঐ কেবলানন্দ শাখার অন্তর্গত সন্ন্যাসী মহাত্মারা 'ঋষভপন্থী অবধূত' বলিয়া পরিচিত। যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব (ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেব) উক্ত কেবলানন্দ শাখার অন্তর্গত 'ঋষভপন্থী অবধূত সম্প্রদায়' উপলক্ষ করিয়া সমস্ত ধর্ম্মের ঐক্য সাধনোদ্দেশ্যে পরমোদার

দিগের কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত তাহার কোন উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতে কিম্বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থেই নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত মতে দত্তাত্রেয় অবধূত, ঋষভদেব অবধূত, জড়ভরত অবধূত। ঐ গ্রন্থে অন্য একজন অবধূতের বিষয়ও আছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থে তাঁহার নাম নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ঐ কয়জনই প্রধান অবধূত।......"

আবার শাস্ত্রে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকগণ (অর্থাৎ সদ্গুরু বা জ্ঞানী গুরু বা সন্ন্যাসী গুরু আধ্যাত্মিক জগতে বিশেষভাবে উন্নত যে সমস্ত উপাসকগণকে (দিব্য দৃষ্টির দ্বারা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় সম্পূর্ণ যোগ্য দেখিয়া) নিরাকার ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকেন তাঁহারা) নিজ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শিখাচ্ছেদন করিলেই তাঁহাদের সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করা হয়। ইহা আমরা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের দুইটী শ্লোক পাঠে অবগত হই ; যথা—"ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং তত্ত্বজ্ঞানাং জিতাত্মনাম্। স্বমন্ত্রেণ শিখা-চ্ছেদাৎ সন্ন্যাসগ্রহণং ভবেৎ ॥২৬৭॥ ব্রহ্মজ্ঞানবিশুদ্ধানাং কিং যজ্ঞৈঃ শ্রাদ্ধপূজনৈঃ। স্বেচ্ছাচারপরাণান্তু প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ॥২৬৮॥" মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। অষ্টমোল্লাসঃ। অর্থাৎ "জিতেন্দ্রিয় ও তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকদিগের নিজ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শিখাচ্ছেদনেই সন্ন্যাসগ্রহণ করা হয় ; তাঁহারা স্বেচ্ছাচারপরায়ণ ; তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই।"

তবে শাস্ত্রের বিধান পাঠে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, (এই জন্মে বা পূর্ব্বজন্মে বা জন্মজন্মান্তরে) সাকার ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা বিশেষ উন্নতি লাভ না করিলে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় (অর্থাৎ পরব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্ন, সূক্ষ্ম, বাক্‌পথাতীত, স্বনির্ম্মল, নির্গুণ, পরমজ্যোতির্ম্ময়,

সমন্বয় ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হইয়া জগতের পরম কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীশ্রীমদবধূত কেবলানন্দের প্রধান শিষ্য সদানন্দ, সদানন্দের প্রধান শিষ্য চিদানন্দ, চিদানন্দের প্রধান শিষ্য স্বানন্দ, স্বানন্দের প্রধান শিষ্য শিবানন্দ, শিবানন্দের প্রধান শিষ্য অভেদানন্দ, অভেদানন্দের প্রধান শিষ্য শঙ্করানন্দ, শঙ্করানন্দের প্রধান শিষ্য বিমলানন্দ, বিমলানন্দের প্রধান শিষ্য মহানন্দ, মহানন্দের প্রধান শিষ্য আত্মানন্দ, আত্মানন্দের প্রধান শিষ্য যোগানন্দ, যোগানন্দের প্রধান শিষ্য ধ্যানানন্দ, ধ্যানানন্দের প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দের প্রধান শিষ্য অতুলানন্দ, অতুলানন্দের প্রধান শিষ্য নির্ম্মলানন্দ, নির্ম্মলানন্দের প্রধান শিষ্য অদ্বৈতানন্দ, অদ্বৈতানন্দের প্রধান শিষ্য শুদ্ধানন্দ, শুদ্ধানন্দের প্রধান শিষ্য বিপুলানন্দ, বিপুলানন্দের প্রধান শিষ্য ধর্ম্মানন্দ, ধর্ম্মানন্দের প্রধান শিষ্য অমৃতানন্দ, অমৃতানন্দের প্রধান শিষ্য অরূপানন্দ, অরূপানন্দের প্রধান শিষ্য প্রণবানন্দ, প্রণবানন্দের প্রধান শিষ্য তূর্য্যানন্দ, তূর্য্যানন্দের প্রধান শিষ্য অক্ষরানন্দ, অক্ষরানন্দের প্রধান শিষ্য সুধানন্দ, সুধানন্দের প্রধান শিষ্য বিশুদ্ধানন্দ,

---

সর্ব্বব্যাপক, নির্ব্বিকল্প, আরম্ভহীন, সচ্চিদানন্দময় এবং জগতের একমাত্র কারণীভূত রূপের বা স্বরূপের উপাসনার) অধিকার হয় না। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য এই:—"অনভিধ্যায় রূপন্তু স্থূলং পর্ব্বতপুঙ্গব। অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদ্দৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ। তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বমাশ্রয়েৎ; ক্রিয়াযোগেন তান্যেব সমভ্যর্চ্চ্য বিধানতঃ শনৈরালোচয়েৎ সূক্ষ্মরূপং মে পরমব্যয়ম্।" অর্থাৎ "হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! যাহা দেখিলে মুক্তিলাভ করা যায় সেই সূক্ষ্মরূপ দর্শনে অধিকার আমার স্থূলরূপ (অর্থাৎ সাকার ব্রহ্মের) ধ্যান না করিলে হয় না। অতএব, মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রথমে আমার স্থূল রূপের আশ্রয় লইবে। কর্ম্মযোগানুসারে যথাবিধি সেই সাকার রূপের অর্চ্চনা করিয়া ক্রমে আমার অবিনাশী পরম সূক্ষ্মরূপের (বা স্বরূপের), আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে।"

বিশুদ্ধানন্দের প্রধান শিষ্য অভয়ানন্দ, অভয়ানন্দের প্রধান শিষ্য সর্ব্বানন্দ, সর্ব্বানন্দের প্রধান শিষ্য পরমানন্দ, পরমানন্দের প্রধান শিষ্য অদ্ভুতানন্দ, অদ্ভুতানন্দের প্রধান শিষ্য মহাদেবানন্দ, মহাদেবানন্দের প্রধান শিষ্য ভবানন্দ, ভবানন্দের প্রধান শিষ্য দয়ানন্দ, দয়ানন্দের প্রধান শিষ্য মহেশ্বরানন্দ, মহেশ্বরানন্দের প্রধান শিষ্য ভূতানন্দ, ভূতানন্দের প্রধান শিষ্য সাধনানন্দ, সাধনানন্দের প্রধান শিষ্য বিষ্ণানন্দ, বিষ্ণানন্দের প্রধান শিষ্য অশোকানন্দ, অশোকানন্দের প্রধান শিষ্য সাধ্যানন্দ, সাধ্যানন্দের প্রধান শিষ্য রূপানন্দ, রূপানন্দের প্রধান শিষ্য অলোকানন্দ, অলোকানন্দের প্রধান শিষ্য ধীরানন্দ, ধীরানন্দের প্রধান শিষ্য গুণানন্দ, গুণানন্দের প্রধান শিষ্য অক্ষয়ানন্দ, অক্ষয়ানন্দের প্রধান শিষ্য সিদ্ধানন্দ, সিদ্ধানন্দের প্রধান শিষ্য করুণানন্দ, করুণানন্দের প্রধান শিষ্য দেবানন্দ, দেবানন্দের প্রধান শিষ্য বেদানন্দ, বেদানন্দের প্রধান শিষ্য সুশীলানন্দ, সুশীলানন্দের প্রধান শিষ্য বোধানন্দ, বোধানন্দের প্রধান শিষ্য অমলানন্দ, অমলানন্দের প্রধান শিষ্য জপানন্দ, জপানন্দের প্রধান শিষ্য জীবানন্দ, জীবানন্দের প্রধান শিষ্য জগদানন্দ, জগদানন্দের প্রধান শিষ্য ভূমানন্দ, ভূমানন্দের প্রধান শিষ্য আশানন্দ, আশানন্দের প্রধান শিষ্য নয়নানন্দ, নয়নানন্দের প্রধান শিষ্য বামনানন্দ, বামনানন্দের প্রধান শিষ্য দুর্গানন্দ, দুর্গানন্দের প্রধান শিষ্য রামানন্দ, রামানন্দের প্রধান শিষ্য নৃসিংহানন্দ, নৃসিংহানন্দের প্রধান শিষ্য সূর্য্যানন্দ, সূর্য্যানন্দের প্রধান শিষ্য উমানন্দ, উমানন্দের প্রধান শিষ্য পরমানন্দ, পরমানন্দের প্রধান শিষ্য আদিত্যানন্দ, আদিত্যানন্দের প্রধান শিষ্য দক্ষিণানন্দ, দক্ষিণানন্দের প্রধান শিষ্য শুভানন্দ, শুভানন্দের প্রধান শিষ্য নিয়মানন্দ, নিয়মানন্দের প্রধান শিষ্য কৃষ্ণানন্দ, কৃষ্ণানন্দের প্রধান শিষ্য হরানন্দ, হরানন্দের প্রধান শিষ্য নির্গুণানন্দ, নির্গুণানন্দের প্রধান শিষ্য কেশবানন্দ, কেশবানন্দের প্রধান শিষ্য রমানন্দ, রমানন্দের প্রধান শিষ্য তারানন্দ, তারানন্দের প্রধান শিষ্য ভুবনানন্দ, ভুবনানন্দের প্রধান শিষ্য গঙ্গানন্দ, গঙ্গানন্দের প্রধান শিষ্য গোবিন্দানন্দ, গোবিন্দানন্দের প্রধান

শিষ্য রাঘবানন্দ, রাঘবানন্দের প্রধান শিষ্য কমলানন্দ, কমলানন্দের প্রধান শিষ্য কালিকানন্দ, কালিকানন্দের প্রধান শিষ্য বগলানন্দ, বগলানন্দের প্রধান শিষ্য পরীক্ষিতানন্দ, পরীক্ষিতানন্দের প্রধান শিষ্য প্রকাশানন্দ, প্রকাশানন্দের প্রধান শিষ্য ধ্রুবানন্দ, ধ্রুবানন্দের প্রধান শিষ্য রামকৃষ্ণানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দের প্রধান শিষ্য যাদবানন্দ, যাদবানন্দের প্রধান শিষ্য নকুলানন্দ, নকুলানন্দের প্রধান শিষ্য হৃদয়ানন্দ, হৃদয়ানন্দের প্রধান শিষ্য অদ্বৈতানন্দ, অদ্বৈতানন্দের প্রধান শিষ্য ঋষভাবতার পরমহংসাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ অবধূত। ইঁহার চারিজন শিষ্য। তাঁহারা সকলেই সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বশেষ শিষ্য শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব। ইনি 'পরমহংসাচার্য্য নিত্যগোপাল স্বামী' নামেও অভিহিত হইয়াছেন। ইঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত। ইনি জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম-বৈরাগ্য-সমন্বিত 'ঋষভবিধান' বা 'পারমহংস্যধর্ম্ম'* জগতে

*"পরমহংস—'পরম' (প্রধান) যে 'হংস' (নির্লোভ যতি বা মুনি বা তপস্বী বা ভিক্ষু) তাঁহাকে "পরমহংস" (বা মহাযোগী) বলা হয়। যিনি নির্দ্বন্দ্ব ও নিরাগ্রহ হইয়া কেবল তত্ত্বমার্গে বিচরণ করেন, যিনি সদা শুদ্ধচিত্ত থাকিয়া কেবল প্রাণধারণোপযোগী দানমাত্র গ্রহণ করেন, লাভালাভ উভয়েই যাঁহার তুল্যজ্ঞান, যাঁহার নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় নাই, দেবপ্রাঙ্গণ, বৃক্ষমূল, নদীপুলিন প্রভৃতি সাধারণ ভোগ্যস্থানই যাঁহার আশ্রয়, কোনও বিষয়ে যাঁহার যত্ন বা মমতা নাই, যিনি পরাৎপর পরমেশ্বরে চিত্ত অর্পণ করিয়া কর্ম্মক্ষয়ার্থ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তিনিই পরমহংস।"…"যিনি অধ্যাত্মব্রহ্মজপ ও প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, সঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগসাধনের নিমিত্ত নিঃসঙ্গভাবে পর্য্যটন করেন, আত্মাতেই যাঁহার একমাত্র নিষ্ঠা, আপনাতেই আপনি সমাহিত এবং সর্ব্বপ্রকার ঝঞ্ঝাট যাঁহার মিটিয়া গিয়াছে তিনিই……ধ্যানভিক্ষু (পরমহংস) নামে পরিচিত। ……পরমহংস…শুভাশুভ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফল বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা আপনাতেই আত্মার বিচারণা করিতে থাকিবেন। লোকে তাঁহাকে

পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বধর্ম্মের সংস্কার করিয়া পরমোদার 'সমন্বয়-ধর্ম্ম' বিশেষরূপে স্থাপন করেন।

পরমহংস বলিয়া জানিতে পারে এমন কোন বাহ্যচিহ্ন রাখিবেন না। আত্মসমাহিত চিত্তে তিনি প্রচ্ছন্নবেশে বিচরণ করিবেন। যদি কেহ তাঁহার আদর বা পূজা করে, তবে সন্তুষ্ট এবং কেহ দ্বেষ বা অনিষ্ট করিলে তাহাতে মৎসরযুক্ত হইবেন না। ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল বিষয় বিদিত থাকিয়াও মূকের ন্যায় (মৌনী হইয়া) বিচরণ করিবেন। দেহরক্ষার্থ কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতীয়গণের গৃহে ভিক্ষা-গ্রহণ (প্রস্তুতান্ন ভোজন) করিবেন। লোকসমাজকে সর্পের ন্যায় ভয়ানক জানিয়া, ধন ও নারীকে ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য শববৎ বুঝিয়া যিনি তাহাদিগকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করেন, যিনি কর্ম্মফল কামনাশূন্য ও বৈরাগ্যবান্ ও যিনি বিষয়রাশিকে বিষের ন্যায় দূষিত মনে করেন, জগতে সেই পরমহংসই মুক্তিলাভের অধিকারী।"

"পরমহংস" সম্বন্ধে শাস্ত্র-বাক্যের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ উপরে প্রদত্ত হইল। তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের একটী সংক্ষিপ্ত উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

"......জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তাঁহার কিছুই অগোচর নাই। তিনিই পরমহংস। জ্ঞানী সম্পূর্ণ উদাসীন। সেই সম্পূর্ণ উদাসীনের পক্ষে অর্থের প্রয়োজন নাই, তাঁহার অযাচিত বৃত্তি। সুচিন্তা এবং কুচিন্তা উভয়ই যাঁহার গিয়াছে, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী, তিনিই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত পুরুষ বলা যাইতে পারে। নিশ্চিন্ত যিনি হইয়াছেন তিনিই নিত্যানন্দ লাভ করিয়াছেন। সকল বিষয়ে যাঁহার বৈরাগ্য তিনিই প্রকৃত নিরুদ্বিগ্ন হইয়াছেন। সুন্দরী যুবতী সংসর্গ ইচ্ছা মনে পর্য্যন্ত যাঁহার নাই তিনিই প্রকৃত সাধু মহাপুরুষ। যুবতীমণ্ডলীর মধ্যে থাকিলেও তাঁহার কোন ক্ষতি হয় না। বন্ধনই মহা অশান্তির কারণ। মুক্তিই পরমা শান্তির প্রসূতি। প্রকৃত পরমহংস জীবন্মুক্ত। জীবের

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের উপবি উক্ত দুই নাম ব্যতীত আরও অনেক মহাত্মা তাঁহাকে অনেক নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পরমার্থ ভ্রাতা তাঁহাকে 'প্রেমানন্দ' বলিযা ডাকিতেন। বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারী (জয়পুরের মহারাজার গুরুদেব) তাঁহাকে 'প্রেমবাবা' বলিতেন। কাশীর প্রসিদ্ধ শঙ্করশাস্ত্রী তাঁহাকে 'অবধূতানন্দ' বলিতেন।

যাহাহউক, পূর্ব্বোক্ত নামগুলির মধ্যে তিনি "শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব" ও "যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব" এই দুই নামেই সুপরিচিত হইয়াছেন। তিনি সাক্ষাৎ অবধূতশিরোমণি ছিলেন। সমস্ত কোন বন্ধনই তাঁহার বন্ধন হয় না। যিনি পরাধীনও নন্, যিনি স্বাধীনও নন্, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ। যাঁহার কোন মনোভাব ব্যক্ত করিতে ভয় হয় না, যাঁহার কোন মনোভাব ব্যক্ত করিতে লজ্জা হয় না, যাঁহার কোন মনোভাব ব্যক্ত করিতে সম্ভ্রম হানির আশঙ্কা হয় না, তিনি কোন সাধারণ মনুষ্য নন্। তিনি পরমহংস। পরমহংসের যে সমস্ত লক্ষণ সে সমস্ত লক্ষণ ব্যতীত কে পরমহংস হইতে পারে? কেবল বৈধসন্ন্যাসও পরমহংস হইবার কারণ নহে, কেবল উলঙ্গতাও পরমহংস হইবার কারণ নহে, অথবা ঐ উভয় সংযোগেও কেহ পরমহংস হইতে পারে না। নিত্যানন্দের যুবকের শরীরের ন্যায় শরীর ছিল। কিন্তু তাঁহার ভাব বালকের ভাবের ন্যায় ছিল বলিয়াই তিনি কত বালকের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেন। পরমহংস হইতে না পারিলে যৌবনে বাল্যভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সর্ব্বপ্রকার আশার যাঁহার নিবৃত্তি হইয়াছে তিনিই পরমহংস। পরমহংস সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তিনি কিছুতেই রত নহেন। আশা জীবের আছে। পরমহংস ত' কোনপ্রকার জীব নহেন। সেইজন্য তাঁহার কোন আশাও নাই। ......যখন যাহা ইচ্ছা হয় পরমহংসই করিতে পারেন। যখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিবার শক্তিও তাঁহার আছে। বিধি, নিষেধ উভয়ই তাঁহার কিঙ্করস্বরূপ। অসারে সার মিশ্রিত হইয়াছে। অসার পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই সার গ্রহণের ক্ষমতা কেবল পরমহংসেরই আছে।......

অবধূত* লক্ষণই তাঁহাতে বিশেষভাবে প্রকটিত ছিল। তিনি প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক প্রকৃত অবধূতের আচরণ শিক্ষা দিবার জন্যই সদাসর্ব্বদা নির্ম্মম ও নিরাশী হইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। সে অবস্থায় তিনি আত্মাতিরিক্ত অন্য কিছুই অনুভব করিতেন না—সর্ব্বদা আত্মানন্দেই তৃপ্ত থাকিতেন। ধূলিধূসরিত, পিঙ্গল-জটিল-কেশভার-শোভিত, উজ্জ্বল-স্বর্ণকান্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব মলিন বেশে গ্রহ-গৃহীতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেন। তাই, সাধারণ লোকে তাঁহাকে উন্মাদ মনে করিতেন। আত্মীয়স্বজনবর্গ তাঁহাকে 'নেতা-পাগ্‌লা' বলিতেন। আর, ভক্তগণ তাঁহাকে আপন আপন ইষ্টদেবরূপে দর্শন করিতেন এবং জ্ঞানসিদ্ধ মহাত্মাগণ তাঁহাকে "পূর্ণ পরমব্রহ্ম"-রূপে অনুভব করিতেন।

*অবধূত ও অবধূত লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি এই গ্রন্থের ১ম—৪র্থ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

মধ্য লীলা

পঞ্চম অধ্যায়

পর্য্যটন

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্তএব চ কর্ম্মণি॥"

গীতা, ২২তি শ্লোঃ, ৩য় অঃ।

[হে পার্থ, আমার কোনপ্রকার কর্ত্তব্য নাই; যেহেতু ত্রিভুবনের মধ্যে আমার অপ্রাপ্ত বলিয়া কিছুই প্রাপনীয় বস্তু নাই; তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করি।]

অনন্তর শ্রীশ্রীগুরুদেবের উপদেশানুসারে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব তীর্থ পর্য্যটনে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। মাতামহী আনন্দময়ী তখন কাশীবাস করিতেছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের তীর্থ পর্য্যটনের কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিশয় অধীরা হইয়া পড়িলেন। ইতঃপূর্ব্বে জনৈক মহাপুরুষের নিকট তিনি শুনিয়াছিলেন, "পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব তদ্দেহে মিশিয়া যাইবেন।" এক্ষণে সেই কথা স্মরণ হওয়ায় মাতামহী আরও বেশী অধীরা হইলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিলেন। অবশেষে গত্যন্তর না দেখিয়া আনন্দময়ী দেবী শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেবকে তীর্থ ভ্রমণের অনুমতি দিলেন। কিন্তু, "আমি জীবিত থাকিতে একেবারে গৃহত্যাগ করিবে না এবং তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিলেও পুরীধামে যাইবে না" এই দুইটী সত্য করাইয়া লইলেন।

এইরূপে মাতামহীর নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব কাশীধাম হইতে কলিকাতায় আগমন করিলেন। পূর্ব্বেই বলা

হইয়াছে, তাঁহার মেসো শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাঁহার অংশের পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তি তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তীব্র-বৈরাগ্যসম্পন্ন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব এই সময় তাঁহার অংশের ঘরগুলি ও যাবতীয় আসবাবপত্র তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগকে দান করিলেন। যে সমস্ত অর্থ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল তাহা সাধু, সন্ন্যাসী, গরীবদুঃখীদিগকে দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মেসো মহাশয় ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনবর্গ তাঁহার গুপ্ত সন্ন্যাসের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। সুতরাং এরূপভাবে বিষয়সম্পত্তি বিতরণ করায় তাঁহারা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের মস্তিষ্ক সমধিক বিকৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিলেন। সেইজন্য তাঁহার মেসো মহাশয়ের নিকট অবশিষ্ট যে অর্থ ছিল তদ্দ্বারা তিনি কয়েকখানি কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের মাসতুতো ভাই শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট রাখিয়া দিলেন, যাহাতে অর্থাভাব বশতঃ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের কোনরূপ অসুবিধা না হয়। এদিকে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব বিষয়কে বিষবৎ ও অর্থকে লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া দীনহীন কাঙ্গালের ন্যায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেই সময় তিনি একখানি মাত্র ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া ধূলিধূসরিত দেহে শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া আহার নিদ্রা সংযমপূর্ব্বক সর্ব্বদা আত্মভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। এরূপ আচরণে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনবর্গ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা অনেক প্রকারে তাঁহাকে বুঝাইলেন; অবশেষে দুর্ব্বৃত্তগণের দ্বারা প্রহারের ভয়ও দেখাইলেন; কিন্তু শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য গুপ্তভাবে অবতীর্ণ হইয়া তিনি ধর্ম্মের প্রত্যেকটী আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন পূর্ব্বক আদর্শ সমন্বয়-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন এবং জগতের মহান্ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

এইভাবে কিছুদিন কলিকাতায় বাস করিবার পর একদিন নিশা-যোগে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব একখণ্ড মাত্র মলিন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পদব্রজে তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। বৈরাগ্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব সেই গভীর রজনীতে ধীরে ধীরে প্রথমে কালীঘাটে কালীমাতার মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ ছিল। সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র দিব্য-রূপসম্পন্না মায়ের সঙ্গিনীগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টনপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ স্বামী বিমলানন্দতীর্থ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সঙ্গিনীগণ অন্তর্হিতা হইলেন। বিমলানন্দ-তীর্থ* শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের অলৌকিক প্রভাব অবগত হইয়া, তদীয়

*শাস্ত্রে (এই গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়ে উল্লিখিত "কুটীচক, বহূদক" প্রভৃতি নামীয় সন্ন্যাসী ব্যতীত আরও) কয়েক প্রকার যতি বা সন্ন্যাসীর উল্লেখ এইপ্রকারে আছে:—"তত্ত্বমসি (অর্থাৎ তুমি সেই পরব্রহ্ম) প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত ত্রিবেণীসঙ্গমতীর্থে যিনি স্নান করেন তাঁহার নাম "তীর্থ"। যিনি আশ্রম গ্রহণে সুনিপুণ ও নিষ্কাম হইয়া জন্মমৃত্যুবিনির্ম্মুক্ত হয়েন, তিনিই "আশ্রম"। যিনি বাসনাবর্জ্জিত হইয়া রমণীয় নির্ঝর নিকটবর্ত্তী বনে নিবাস করেন, তাঁহার নাম "বন"। যিনি অরণ্যব্রতাবলম্বী হইয়া সমস্ত সংসার ত্যাগ করিয়া আনন্দপ্রদ অরণ্যে চিরদিন বাস করেন, তিনি "অরণ্য"। যিনি সর্ব্বদা গিরিনিবাসপরায়ণ, গীতাভ্যাসতৎপর, যিনি গম্ভীর ও স্থিরবুদ্ধি, তিনি "গিরি" নামে খ্যাত। যিনি পর্ব্বতমূলে বাস করেন, যিনি ধ্যানধারণায় নিপুণ এবং যিনি সারাৎসার ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই "পর্ব্বত"। যিনি সাগরতুল্য গম্ভীর, বনের ফলমূলমাত্রভোগী ও যিনি নিজ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তিনি "সাগর"। যিনি স্বরতত্ত্বজ্ঞ, স্বরবাদী, কবীশ্বর ও সংসার-সাগর মধ্যে সারজ্ঞানী তিনিই "সরস্বতী"। যিনি বিদ্যাভার পরিপূর্ণ হইয়া সকল ভার পরিত্যাগ করেন, দুঃখভার অনুভব করেন না, তিনিই "ভারতী"। যিনি জ্ঞানতত্ত্বে পরিপূর্ণ ও পূর্ণ তত্ত্বপদে

পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "যদিও অশ্রুপাত সন্ন্যাসীর নিষিদ্ধ, তথাপি তুমি নারায়ণ— প্রকৃত পরমহংস—তোমাকে দেখিয়া প্রাণ উথলিয়া আপনি অশ্রু নির্গত হইতেছে।" শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার সহিত তীর্থ পর্য্যটন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর

অবস্থিত এবং সতত পরব্রহ্মে অনুরক্ত তাঁহার নাম "পুরি"। বলাবাহুল্য যে, এই স্থলে শাস্ত্রোক্ত শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

পূর্ব্বোক্ত "ত্রিবেণীসঙ্গম তীর্থের" ব্যাখ্যা অতি সরল ভাষায় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের রচিত "সাধক সুহৃৎ" নামক গ্রন্থের ১৫০—১৫১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। স্থানাভাব বশতঃ উহা এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভবপর হইল না।

বাস্তবিকই, সন্ন্যাসীর অবস্থা ও স্বভাব সহজে লাভ হয় না। প্রকৃত সন্ন্যাসের অধিকারী সেই ব্যক্তি "যে ব্যক্তি শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সুচারুরূপে অনুষ্ঠান করতঃ অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছেন; তাঁহার অন্তঃকরণ (বা চিত্ত) শুদ্ধি হওয়ায় ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানাধিকার লাভ হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-ধনাদিতে আদৌ আসক্তি থাকে না এবং অনাসক্তিপ্রযুক্ত সমস্ত বিষয় ভোগ হইতেই তাঁহার চিত্তবৃত্তি বিনিবৃত্ত হইয়াছে। তিনি দৃশ্য বিষয় সমূহে দোষদর্শন পূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া একমাত্র মুক্তিপদে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।...(এক কথায়) ফল-কামনাবর্জ্জিত অর্থাৎ ভগবদর্পণবুদ্ধিতে যিনি শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মসাধন করেন সেই কর্ম্মযোগীরই চিত্তবৃত্তি বিশুদ্ধ হইয়া থাকে এবং তিনিই সন্ন্যাসী হইয়া ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।"

"সন্ন্যাস" সম্বন্ধে শ্রীশ্রীদেবের (অতি মূল্যবান্) প্রভূত উপদেশ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার সন্নিবেশ কোনক্রমেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে হইতে পারে না। তাহার স্বল্পাংশ মাত্র প্রয়োজনবোধে স্থানে স্থানে ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর তাঁহাকে বিদায় দিয়া, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব নিকটস্থ শ্রীশ্রীকালীকুণ্ডের জল অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়া পিপাসা দূর করিলেন। ইহার পর তিনি কুণ্ডতীরে উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র দেখিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে নভোমণ্ডলস্পর্শী সর্ব্বাভরণভূষিতা নবীন-নীরদ-শ্যামা কালীমাতা অট্ট অট্ট হাস্যে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতেছেন। তদ্দর্শনে যুগপৎ অশ্রু, পুলক, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া, তিনি সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। সমাধি হইতে ব্যুত্থান লাভের পর উষা সমাগতা দেখিয়া তিনি পর্য্যটন মানসে ধীরে ধীরে দক্ষিণ দেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। লোকশিক্ষার নিমিত্ত পর্য্যটন কালে তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-দাহ, স্তুতি-নিন্দা, সুখ-দুঃখ রূপ দ্বন্দ্ব হাসিমুখে সহ্য করিয়া, শাক, পত্র, ফলমূল দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং অঞ্জলিপূর্ব্বক জলপান দ্বারা তৃষ্ণা দূর করিতেন। তাঁহার শয়নের স্থান পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল না। সময় সময় তিনি বিল্বপত্রের রস, দূর্ব্বার রস, বৃক্ষপত্র, পুষ্করিণীর পঙ্ক প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। এইরূপে কঠোর বৈরাগ্যের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত জগৎকে শিক্ষা দিয়া, তিনি দক্ষিণ ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণকালে সমুদ্রোপকূলে মহাত্মা বিভীষণকে দর্শন দানে কৃতার্থ করেন। এই সময় তাঁহার সহিত অশ্বত্থামা, হনুমান, নারদ, ব্যাসদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণের সাক্ষাৎ হয়। অনন্তর সিপ্রাতটে ভ্রমণকালে আমমাংস ভক্ষণে রত এক অঘোরাচারী সাধু তাঁহার দর্শন লাভ করেন। সেই সাধু তাঁহাকেও উক্ত আমমাংস ভক্ষণের জন্য প্রদান করেন। তাহাতে বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব দৃঢ় অথচ স্পষ্টভাবে বলেন, "ইহা তোমার ভোজ্য, আমার ভোজ্য হালুয়াপুরী।" তৎ-শ্রবণে অঘোরাচারী সাধু তাঁহাকে প্রহার করিবার নিমিত্ত চিম্‌টা উত্তোলন করিতেছেন দেখিয়া চতুরশিরোমণি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব নিমেষের মধ্যে মহাকাল মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন, "নদীর জলে জীবের তৃষ্ণা নিবারণও হয়। তাতে কত জীব ডুবেও মরে।

তমোগুণবিশিষ্ট সাধুসঙ্গ অতি সাবধানে করিতে হয়। তাঁহার দ্বারা ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়ই ঘটিতে পারে।"

অতঃপর দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের যাবতীয় তীর্থ পর্যাটনান্তর হিমাচল প্রদেশের দুর্গম তীর্থ সকল ভ্রমণ করিতে করিতে কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের দ্বারা বিশেষরূপে অভ্যর্থিত ও পূজিত হইয়া অবশেষে তিনি গৌরীকুণ্ডের তীরে উপনীত হইলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব হিমাচলের তুষারাচ্ছন্ন দুর্গম পথে আরও অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু "আর আসিও না" লেখা দেখিয়া, কোনও মহাপুরুষের নিষেধবাক্য মনে করিলেন এবং সেই বাক্যের সম্মানার্থই যেন তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন পথে যশোহর জেলার অন্তর্গত ঝিনাইদহের অন্তঃপাতি আন্দুলবেড়িয়া গ্রামনিবাসী রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি যৌবনে উদাসীন হইয়া জনৈক মহাপুরুষের সঙ্গে বহু তীর্থ পর্য্যটনের পর কেদারনাথ যাইবার পথে এই গৌরীকুণ্ডে আগমন করেন। মহাপুরুষ রসিক বাবুকে সেখানে কিছুদিন অবস্থান করিতে বলিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে; তুমি এইখানে আপন ইষ্টদেবের দর্শন লাভ করিবে।" এইরূপ বরদান করিয়া মহাপুরুষ স্থানান্তরে গমন করিলেন। এদিকে রসিক বাবু বহুদিন তথায় অবস্থান করিয়াও আপন ইষ্টদেবের দর্শন না পাইয়া তদ্বিষয়ে নিরাশ হইতে লাগিলেন। এমন সময় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব জ্যোতির্ম্ময় শ্যামসুন্দররূপে তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব ভাব সংবরণপূর্ব্বক মৃদুহাস্যে রসিক বাবুকে বলিলেন, "আমি শীগ্‌গিরই বঙ্গদেশে যা'ব; সেখানে আমার সঙ্গে তোমার দু'বার দেখা হ'বে। তুমি বাড়ী ফিরে যাও।" কপর্দ্দকহীন রসিক বাবু সেখান হইতে বাড়ী ফিরিবার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উদ্বেগ দেখিয়া অন্তর্য্যামী শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত দ্রব্যাদিসহ গৌরীকুণ্ডে ডুব দিতে বলিলেন। রসিক বাবুও দ্বিরুক্তি

না করিয়া তদাজ্ঞা পালন করিবামাত্র পরম দয়াল শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের অদ্ভুত কৃপাবলে সেই সুদূর হিমাচল হইতে একেবারে বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে উপনীত হইলেন। ভয়বিহ্বলচিত্তে রসিকবাবু ভাবিলেন, "শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেবের কৃপায় সমস্তই সম্ভব হইতে পারে!" আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তিনি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের অশেষ করুণা স্মরণপূর্ব্বক তদুদ্দেশ্যে বারংবার প্রণাম ও তন্মহিমা গান করিতে করিতে আপনার আত্মীয় ভবনে গমন করিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব পরিভ্রমণ সময়ে অনেক মুমুক্ষুকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিক সংখ্যকই লোকালয়ে প্রত্যাগমন না করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেবের এই পর্য্যটন লীলা ও অন্যান্য লীলার অধিকাংশই তিনি প্রসঙ্গক্রমে ভক্তগণের নিকট অনেক সময় প্রকাশ করিতেন*। সময় সময় আপন ঐশ্বর্য্যভাব গোপন রাখিবার নিমিত্তই ভক্তগণকে বলিতেন, "আমার মাথা খারাপ; কি জানি, কি বল্‌তে বা কি বলেছি।" কিন্তু সুচতুর ভক্তগণের নিকট তাঁহার এই আত্ম-সংগোপনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইত।

*অবতার-মহাপুরুষগণ জীবনের অনেক ঘটনা অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের নিকট অনেক সময় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নিজ দয়াগুণে এরূপ না করিলে আজ জগৎ সেই সমস্ত মহামূল্যবান্ বা অমূল্য ঘটনাবলী এত সহজে জানিয়া বিশেষভাবে উপকৃত হইত না। ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ নিজ মাহাত্ম্য পরমভক্ত ও সখা শ্রীঅর্জ্জুনের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব 'নিজের……প্রেমোন্মাদ কথা, নিজের অবস্থা, নিজের চরিত্র গল্পচ্ছলে' ভক্তবৃন্দের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন। ইহা শ্রীম কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পাঠে বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায়। সে সমস্ত সংক্ষেপেও এখানে উল্লেখ করা অসম্ভব। লর্ড যীশুখৃষ্টও "দুষ্ট পিশাচের (Evil Spirit-এর) সঙ্গে তাঁহার বিবাদ বা যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের ('খ্রীষ্টীয় সুসমাচার' নামক পুস্তক-চতুষ্টয়ের চারিজন লেখক বা 'Evangelists'-দিগের) নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবং

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব পর্য্যটন লীলায় সংখ্যাতীত ভাগ্যবান্‌কে নানাপ্রকারে কৃপা করিয়া অল্প কয়েক বৎসর মধ্যেই পুরীধাম ব্যতীত ভারতের যাবতীয় তীর্থস্থান ভ্রমণান্তে কাশীধামে প্রত্যাগমন করিলেন। কাশীধামে পৌঁছিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব তাঁহার মাতামহীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং সেখানে যোগানুষ্ঠানের নিমিত্ত একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতামহী স্বীয় দৌহিত্রের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষরূপে অবগত ছিলেন; সুতরাং তিনি তাঁহার নির্জ্জন বাসের কিছুমাত্র বিঘ্ন করেন নাই। প্রসন্নময়ী নাম্নী শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের এক দূরসম্পর্কীয়া মাতুলানী নির্জ্জন কক্ষে তাঁহার আহার্য্য পৌঁছাইয়া দিতেন। কথিত আছে যে, এই সময় প্রায়শঃ শ্রীশ্রীদেবের দৃষ্টিপথে শিবমূর্ত্তি প্রকটিত হইলেও, তিনি একশত তিপ্পান্ন প্রকারের গণেশ মূর্ত্তিও দর্শন করিয়াছিলেন। স্বাধ্যায়েও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছিল। কাশীধামে অবস্থান কালে তিনি একশত চুরানব্বই খানি তন্ত্র, নানা শাস্ত্র, এমন কি, কলাপ ব্যাকরণ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব এই সময় আহারাদি সম্বন্ধে অত্যন্ত কৃচ্ছ্রতা প্রদর্শন করিতেন। যিনি শৈশবে নির্ব্বিকল্প-সমাধি-মগ্ন হইয়াছিলেন, যোগসাধনা তাঁহার লীলা মাত্র। যাহাহউক, এই সময় তিনি হবিষ্যান্ন আহার করিতেন; আবার কখনও বা শুধু দুগ্ধ, আমলকী ও দুর্ব্বারস মাত্র খাইয়া দিনপাত করিতেন। অনেক সময় তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন থাকিতেন। এই অবস্থায় একাদিক্রমে দশ বার দিন পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইয়া যাইত। বলাবাহুল্য, তখন তাঁহার আহার, নিদ্রা এবং শৌচাদি ক্রিয়া সমস্তই বন্ধ থাকিত।

ঈশ্বরের সহিত একাকী থাকিবার উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক যে বিজন প্রদেশে নির্জ্জনতার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ও শরণ লইয়াছিলেন সেই প্রদেশে তল্লব্ধ অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও দর্শনাদির বিবৃতিও তিনি তাঁহাদের নিকট দিয়াছিলেন।”

এই সময় মাতামহী দৌহিত্র-বধূ দর্শনের ঐকান্তিকী আকাঙ্ক্ষার বশে একটী পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের বিবাহ স্থির করিয়া, কন্যাপক্ষীয়দিগকে পাত্র দর্শনের নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও মাতামহী তাঁহাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত করিলেন। সুচতুর গোপাল কিন্তু সেই পোষাককে শিবস্নানে পরিণত করিয়া ক্ষীণালোকবিশিষ্ট এক কক্ষে যোগীবরের ন্যায় দিব্যোন্মাদ অবস্থায় আসন করিয়া বসিয়া রহিলেন। কন্যাপক্ষীয়েরা পাত্র দেখিবার সময় তাঁহার উলঙ্গ বেশ দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'একি পাগল নাকি।" শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব হাসিয়া বলিলেন, "হুঁ"। ইহা শুনিয়া কন্যাপক্ষীয়েরা হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষুব্ধচিত্তে চলিয়া গেলেন। বিফলমনোরথ হইয়া মাতামহীও তদবধি দৌহিত্রের নিকট আর কখনও বিবাহের কথা উত্থাপন করেন নাই। এইরূপে সুচতুর শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব কৌশলপূর্ব্বক বিবাহ সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

অতঃপর একদিন তিনি মাধবশেঠের বাগানে বেড়াইতে যান। তথায় তখন কয়েক জন অতিথি ভোজন করান হইতেছিল। তাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের "বিবেক চূড়ামণি" নামক গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে 'বেদান্ত ভিন্ন সকলই মিথ্যা' প্রতিপন্ন করেন। তখন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব বলেন, "যিনি যে অবস্থায় যতটুকু প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি তা'র অধিক কিছুই বল্‌তে সক্ষম নন্। তা'র পরের অবস্থায় যিনি উপনীত হ'য়েছেন, তিনিই তৎসম্বন্ধে বল্‌তে পারেন।" হঠাৎ এই সময় ঠাকুরের মনে 'লয় কি প্রকারে হয়?' উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেখিলেন, যেন সমস্ত জগৎ কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া সব অদৃশ্য হইয়া গেল, পৃথিবী টলমল করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এমতাবস্থায় তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সেই সমাধি দুই তিন দিন পর্য্যন্ত ছিল এবং সকলে তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্য বোধে সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাশী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥"

গীতা, ২৫তি শ্লোঃ, ৭ম অঃ।

[আমি যোগমায়ায় প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকায় সকলের সমক্ষে কদাচ প্রকাশমান হই না; (কিন্তু ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত হই!) এইজন্য এই মূঢ় জীবগণ অজ (জন্মরহিত), অব্যয় (নিত্যস্বরূপ) আমাকে জানে না।]

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব কিছুদিন কাশীধামে অবস্থানের পর শীঘ্রই কলিকাতায় আসিলেন। তথায় আসিয়া রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাদিগের বাটীতে সময়ে সময়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই লোকসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক কখনও নিমতলার ঘাটে, কখনও কাশীপুর রতন বাবুর ঘাটে, কখনও বা বাগবাজারের পুল ও হাওড়া ব্রীজের নিম্নে, কখনও কখনও নিমতলা ও কেওড়াতলার শ্মশান-ক্ষেত্রে একখানি মাত্র শতগ্রন্থিযুক্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সমানভাবে কাটাইতেন। গঙ্গার ঘাটে অবস্থান কালে তিনি মধ্যে মধ্যে এরূপ তন্ময় হইয়া থাকিতেন যে, তাঁহার উপর দিয়া গঙ্গার জোয়ার ভাটা বহিয়া গেলেও তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইত না। এই সময় বাগবাজারের প্রসিদ্ধ নবীন ময়রা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে গঙ্গাঘাটে গমন করিতেন। তথায় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের কর্দ্দমাক্ত কলেবর দর্শন করতঃ তাঁহার মনে অতীব ভক্তির সঞ্চার হইত। তজ্জন্য তিনি পরম শ্রদ্ধার সহিত গঙ্গার জলে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের গাত্র ধৌত ও

পরিমার্জ্জিত করিয়া তাঁহাকে স্বীয় দোকানে আনিতেন এবং কিছু গরম দুগ্ধ পান করাইয়া পরমানন্দে তাঁহার সেবা করিতেন। এইরূপে অনেক সময় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব ভক্তগণের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতেন।

একদিন গভীর রজনীতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব নিমতলার শ্মশানের এক প্রান্তে উপবিষ্ট আছেন ; এমন সময় দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে বিকটদর্শন ভীষণ ভূতপ্রেতাদি গমনাগমন করিতেছে। ইতিমধ্যে সহসা দূরে একটী চিতাগ্নি হইতে শ্মশান-বাসিনী শ্যামা অট্টহাস্যে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহার নিবিড় কুন্তলরাশির প্রভায় ও শ্রীঅঙ্গের দিব্য-জ্যোতিঃতে শ্মশানভূমি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব সেই অপূর্ব্ব শ্যামামূর্ত্তি দর্শনে, যুগপৎ কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ্যাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবে অভিভূত হইয়া ক্রমশঃ মহাভাবে নিমগ্ন হইলেন। বহুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, তিনি ধীরে ধীরে সমাধি হইতে ব্যুত্থান লাভ করিলেন। এই সময় তাঁহার আরক্তিম নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হওয়ায় শ্রীমুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সেই অবস্থা দেখিলে সত্যই মনে হইত, তিনি কোন্ এক জগৎ হইতে ফিরিয়া আসাতেই তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে এইরূপ বারিধারা বিগলিত হইতেছে।

এই সময় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের দর্শনপথে স্বতঃই যেখানে সেখানে যেমন তেমন ভাবে বহু দেবদেবী আবির্ভূত হইতেন ; এমন কি, অনেক সময় কোন বস্তু স্মরণ করিবামাত্রই তাঁহার সম্মুখে তাহা উপস্থিত হইত। এইরূপে অলৌকিক বিভূতি সকল প্রায়ই তাঁহাতে প্রকাশিত হইত। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব কিন্তু আপনার মায়া দ্বারা আপনাকে সদাসর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন রাখিতেন। বাল্যবন্ধু বিপিনচন্দ্র মিত্র, মাস্‌তুতো ভাই রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন সকলেই তাঁহাকে উন্মনা ভাবে থাকিতে দেখিতেন ; কিন্তু কিছুই অবধারণ করিতে

পারিতেন না। অনেকেই তাঁহাকে উন্মনা মনে করিয়া "নেত্যা পাগ্‌লা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। যাহাহউক, শুদ্ধসত্ত্ব অবধূত শিরোমণি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব সর্ব্বদা শৌচ, আচমন, স্নান প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ নিয়মিত ভাবে পালন করিতেন না। পরম বিবেকী ও পরম জ্ঞানী হইয়াও অজ্ঞ লোকের ন্যায় আচরণ করিতেন এবং বাগ্মী হইয়াও মৌনী থাকিতেন। তাঁহার আচার ব্যবহার দেখিয়া তিনি ভক্ত কি ভগবান্, সাধক কি সিদ্ধ, অবধূত কি পরমহংস, ভোগী কি ত্যাগী, শাক্ত কি বৈষ্ণব অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, ধীমান্ কি উন্মাদ, অথবা আস্তিক কি নাস্তিক তাহা আত্মীয়স্বজন ও সর্ব্বসাধারণ কিছুই নিরূপণ করিতে পারিতেন না। ইহার কারণ এই যে, ইতঃপূর্ব্বে প্রকৃত অবধূত দর্শন না করায় তদবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির আচরণ সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল না। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের মোহিনী মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া তৎস্বরূপ নির্ণয় তাঁহাদের সাধ্যাতীত ছিল।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব যখন এইরূপ ভাবে কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ীতে বাস করিতেন। রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র প্রভৃতি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের আত্মীয়স্বজন শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের অলৌকিক আচরণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাতে অত্যন্ত অনুরক্ত হন। এইজন্য তাঁহারা প্রায়ই তদ্দর্শনে দক্ষিণেশ্বর গমন করিতেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের গুপ্ত সন্ন্যাসের* বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না; সুতরাং তাঁহার

*পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সন্ন্যাসীর অবস্থা সহজে লাভ হয় না। তাই, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব বলিয়াছেন, "যাহার সংসারে সম্পূর্ণ বিরাগ হইয়াছে, যাঁহার নিজের কিছু নাই, তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক, তিনিই যথার্থ চতুর্থাশ্রমী। ······তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছ। তুমি মাতাপিতা, পুত্রকলত্র প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনবর্গের সহিত নিঃসম্বন্ধ হইয়াছ। পরিচিত এবং বন্ধু-বর্গের সহিত তোমার সম্বন্ধ নাই। তুমি নিঃসঙ্গ বিদেহ হইয়াছ। দেহে

এইরূপ উদাস ভাব দেখিয়া, তাঁহাদের ন্যায় তাঁহারও যাহাতে শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের প্রতি অনুরাগ জন্মে, তজ্জন্য তাঁহাকে শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের উপদেশাবলী শ্রবণ করাইতেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব আত্মভাব গোপন রাখিবার নিমিত্ত সেই উপদেশসমূহ অলৌকিক বিচারশক্তি প্রভাবে খণ্ডন করিয়া বলিতেন যে, পর্যাটন কালে অনেক পরমহংসের সাক্ষাৎ লাভ করায় তাঁহার আর পরমহংস দর্শনের লালসা নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য শ্রবণে তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিতেন, "এঁকে বরং তাঁ'র সঙ্গে দেখা করান দরকার।" ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব বিনা বাক্যব্যয়ে ঈষৎ হাস্য সহকারে অন্যত্র প্রস্থান করিতেন।

"বেলঘরিয়ার নীলমণি বাবুর বাড়ীতে মহোৎসব উপলক্ষে গান ও

থাকিয়াও তোমার দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। তোমার দেহ শবতুল্য, তুমি ধন্য।...পিতামাতা সুতসুতা অনেকেরই নাই। তারা ত সন্ন্যাসী হইতে পারে নাই। বিবেকবৈরাগ্য ব্যতীত ঐ সকল না থাকিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। পিতামাতা সুতসুতা এবং পত্নী বিবেকবৈরাগ্যের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। কোন কোন ব্যক্তির ঐ সমস্ত আত্মীয় সত্ত্বেও বিবেকবৈরাগ্য হয়। তবে ঐ সমস্ত সত্ত্বে সন্ন্যাস হইবে না কেন? চৈতন্যের মাতা এবং পত্নী ছিলেন, তথাপি তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যও মাতা সত্ত্বে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু উভয়েই নিজ নিজ মাতার অনুমতিক্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।......যিনি উদাসীন হইয়াছেন, যিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, যাঁহার জন্মমৃত্যু নাই বোধ হইয়াছে, যাঁহার পিতামাতা নাই বোধ হইয়াছে, যিনি এক্ নিজের বিকাশ সর্ব্বত্রে দেখিতেছেন, এক্ ভিন্ন দ্বিতীয় যিনি দেখিতেছেন না. তিনি কাহাকে পিতা বলিবেন? তিনি কাহাকে মাতা বলিবেন? তিনি কাহার সঙ্গে কোন্ সম্বন্ধ পাতাইবেন? নিজের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ হইতে পারে না। অতএব তিনি নিঃসম্বন্ধ।......"

সঙ্কীর্ত্তন হ'বে" এই কথা বলিয়া একদিন রামচন্দ্র, মনোমোহন, সত্যগুপ্ত প্রভৃতি শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের ভক্তগণ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে সঙ্গে লইয়া অশ্বযানে গমন করিলেন। নিমন্ত্রণ বাটীতে আহারাদির দেরী হইবে ভাবিয়া রামচন্দ্র, মনোমোহন প্রভৃতি ভক্তগণ বহু প্রকারে শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেবকে সম্মত করাইয়া দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে লইয়া উপস্থিত হইলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ মাসতুতো ভাই মনোমোহনবাবু শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহিত তর্কাদি না করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করায়, হাসিমুখে তিনি তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ইহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর তাঁহারা সকলে তাঁহাকে শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের নিকট লইয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। ঠিক্ এই সময় ত্রৈলোক্য বিশ্বাস ও তাঁহার মাতার কালীবাড়ী দখল সম্বন্ধে বাহিরে একটা মহা দাঙ্গাহাঙ্গামা উপস্থিত হওয়ায় রামচন্দ্র, মনোমোহন প্রভৃতি বাহিরে গেলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে উদাসীন ভাবে সেইখানে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিলেন, "তুমি গেলে না?" শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব তখনও বিমনা ছিলেন; তাই তিনি উদাসভাবে উত্তর দিলেন, "দেহের ভিতরের হাঙ্গামাই মিটা'তে পারা যায় না; বাহিরের হাঙ্গামা আর কি দেখ্‌ব? সংসারী লোকের এমন হাঙ্গামা প্রায়ই ঘ'টে থাকে।" শ্রীশ্রীপরম-হংস দেব ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। এই সামান্য কথাবার্ত্তাতে শ্রীশ্রীপরমহংস দেব শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের স্বরূপ কথঞ্চিৎ অবগত হইলেন। অল্পক্ষণ পরে রামচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের নিকট ফিরিয়া আসিলে, তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "নিত্যটী অন্তঃ-সারবিশিষ্ট বর্ণচোরা আঁবের মত।" রামচন্দ্র, মনোমোহন প্রভৃতি ভক্ত-গণ শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের মুখে এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "ইনি এত মহান্! তা'ত আমরা কিছুই জান্‌তে পারি নি!" তদুত্তরে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিলেন, "নিত্য কত বড় পরে বুঝ্‌তে পার্‌বে।" অতঃপর তিনি কিছু মিষ্টান্ন লইয়া স্বহস্তে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে প্রেমরসে আপ্লুত হইয়া মুহুর্মুহুঃ পুলকিত হইতে লাগিলেন। প্রথম পরিচয়েই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব জ্ঞান ও প্রেমের ঘনীভূত মূর্ত্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের সৌম্য বদনমণ্ডলের অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দর্শনে এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে ভবিষ্যতে তথায় আনিবার জন্য ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের আনন্দবর্দ্ধনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব রামচন্দ্র, মনোমোহন প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ইহার পর হইতে শ্রীশ্রীপরমহংস দেব প্রায়ই রামচন্দ্রাদি ভক্তগণের নিকট শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তাহাতে একদিন রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "আপনি প্রত্যহই 'নিত্য, নিত্য' ক'রে থাকেন; নিত্যের কি হয়েছে?" এইরূপ প্রশ্নে শ্রীশ্রীপরমহংস দেব দুঃখিত না হইয়া বলিলেন, "নিত্য যে কুমার বৈরাগী। ওর মত দ্বিতীয়টী আর আমি দেখি নি।"

অন্য একদিন রামচন্দ্রাদি ভক্তগণ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে লইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের আহারের পর দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় সেদিনও শ্রীশ্রীপরমহংস দেব তাঁহাকে স্বহস্তে পরমান্ন প্রসাদ খাওয়াইয়া দিলেন। আহারান্তে শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের বিশ্রামের জন্য হৃদয় বাবু (পরমহংস দেবের ভাগিনেয়) সকলকে বাহিরে যাইতে বলায়, অবিলম্বেই সকলে বাহিরে আসিলেন। মনোমোহন বাবু প্রভৃতি পঞ্চমুণ্ডীতলায় বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেবও একটী নির্জ্জন প্রদেশে ভূপৃষ্ঠে উপবেশনপূর্ব্বক আত্মানন্দে নিমগ্ন হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। ধ্যানান্তে রাম বাবু প্রভৃতি শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেবের বাহ্যদশা কোনক্রমেই আসিল না দেখিয়া, তাঁহাকে ঐ

অবস্থাতেই স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। শ্রীশ্রীপরমহংস দেব শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের সমাধি দর্শনে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিবামাত্র তিনিও তদবস্থাপ্রাপ্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা উভয়ে সমাধি হইতে ব্যুত্থান লাভ করিয়া ভাবাবেশে এরূপ অলৌকিক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন যে, ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কেহই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। অতঃপর শ্রীশ্রীপরমহংস দেব বাহ্যদশায় আসিলেও শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে পূর্ব্বাবস্থায়ই থাকিতে দেখিয়া কেহ কেহ বলিলেন, "আপনার দর্শন ও কৃপা প্রভাবেই এঁর এরূপ সমাধি লাভ হ'য়েছে।" শ্রীশ্রীপরমহংস দেব* তখন জিব্ কাটিয়া

*শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের অনেক উপদেশাবলী যেমন নানা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তেমনই কলিকাতা মহানির্ব্বাণ মঠ হইতে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় মাসিক পত্রে"ও তাঁহার অনেক সারগর্ভ বাণী দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে (তল্লিখিত) শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের তৎসম্বন্ধীয় উক্তি ও শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতও কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বিষয় তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উক্ত মাসিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল (আর শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের তৎসম্বন্ধীয় উক্তি প্রভৃতি এই গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে): "...পরমহংস মহাশয়কে দর্শন করিলে সচ্চিদানন্দকে দর্শন করা হয়। ...পরমহংস দেবকে লোক যেদিন বুঝিবে সেদিন সচ্চিদানন্দকে বুঝিবে। ...প (শ্রীশ্রীপরমহংস দেব) নিজ প্রভাবে কে-র (শ্রীযুক্ত কেশব সেনের) নিকট প্রকাশিত হন। নিজ প্রভাবেই কে-দ্বারা আপনাকে জনসমাজে প্রচারিত করেন। তাঁহার বিশেষ স্বর্গীয় প্রভাব না থাকিলে কে হেন লোক তাঁর নাম জনসমাজে প্রচার কর্বেন কেন? আর কারো বা কর্‌বেন না কেন? ...সত্ত্বগুণে স্বভাবতঃ অল্পাহার হয়। কিন্তু মহাভাবের কোন এক অবস্থাতে চৈতন্য ও পরমহংস মহাশয় অত্যন্ত অসাধারণাহার করিতেন; উভয়কেই ত'

বলিলেন, "রাম! রাম! এ কথা মুখেও আনিস্ না। ও যে নিত্যসিদ্ধ, শম্ভু-স্বয়ম্ভু; নিত্য কা'রও কৃপার অপেক্ষা রাখে না।"

অনন্তর শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব অর্দ্ধ বাহ্যদশা হইতে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সমাধিস্থ হইলেন। শ্রীশ্রীপরমহংস দেব শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের গলদেশে বাহুবেষ্টনপূর্ব্বক আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিলেন, "নিত্য— শঙ্কর, পরমহংস, অবধূত। নিত্য ব'লেই এ অবস্থাতেও কোমরে কাপড় রাখ্‌তে পার্‌ছে।" বলাবাহুল্য, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব অনেক সময় ভাবাবিষ্টাবস্থায় নগ্ন হইয়া পড়িতেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীপরমহংস দেব আরও বলিলেন, "ওর এখন উন্মনা অবস্থা।" ইহা শুনিয়া রামচন্দ্রাদি ভক্তগণ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "এঁর এত উচ্চ ভাব! আমরা পূর্ব্বে ত' কিছুই জান্‌তে পারি নাই।" তখন শ্রীশ্রীপরমহংস দেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আর ইঁনি গোপন থাক্‌তে পার্‌বেন না—শীঘ্রই প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌বেন্।" এদিকে দিবা অবসানপ্রায় দেখিয়া সকলেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বহুক্ষণ হইল শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব সমাধিস্থ থাকাতে রামবাবু প্রমুখ ভক্তগণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব তাঁহাকে রাখিয়া যাইবার অথবা সেই অবস্থাতেই লইয়া যাইবার কথা বলিলেন। কিন্তু 'রাখিয়া গেলে মনোমোহন বাবুর মা দুঃখিত হইতে পারেন' ভাবিয়া, তাঁহারা ঐরূপ অবস্থাতেই শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে কাঁধে করিয়া নৌকাতে আনিলেন। শ্রীশ্রীপরমহংস দেব তাঁহার জন্য মাখন, মিশ্রী, কমলালেবু প্রভৃতি রামবাবু প্রভৃতির নিকট দিয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের সমাধি ভঙ্গ হইলে, ভক্তগণ তাঁহাকে উক্ত

সত্ত্বগুণী বিষ্ণুর অবতার বলা হয়। আমি অনেক সাধু ভক্ত দেখিয়াছি। পরমহংস মহাশয়ের মত কাহাকেও দেখি নাই। ⋯ দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মহাশয়ের পঞ্চরসাত্মক মহাভাবই আছে। বিশেষতঃ অধিক পরিমাণে বাৎসল্যরসাত্মকটী আছে।⋯"

দ্রব্যাদি যথাসম্ভব খাওয়াইয়া দিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে অবশিষ্ট-গুলি নিজেরা খাইলেন।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব ধর্ম্মের আড়ম্বর পছন্দ করিতেন না বলিয়া তাঁহার অলৌকিক বিভূতি সকল অতি যত্ন সহকারে প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু অগ্নিকে ভস্মাচ্ছাদিত রাখিলেও উহা যেমন ব্যক্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ তাঁহার দিব্য ঐশ্বর্য্যসমূহ ভগবৎ প্রসঙ্গে প্রকাশ হইয়া পড়িত। তাহাতে তিনি এরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িতেন যে, বালকের ন্যায় রোদন করিতেন। তাই শ্রীশ্রীপরমহংস দেব যখন উত্তরপাড়া-নিবাসী জয়কৃষ্ণবাবু প্রমুখ ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের অতি উচ্চ অবস্থার কথা বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীশ্রীপরমহংস দেব অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আর বল্‌তে পার্‌ব না; বল্লে নিত্য এখনই দেহত্যাগ কর্‌বে।" এইরূপে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব শ্রীশ্রীনিত্যগোপাপাল দেবের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন।

যাহাহউক, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত"*-রচয়িতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মাষ্টার

*"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে" শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবু শ্রীশ্রীনিত্যদেবের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ (তৎসম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ না করিয়া) নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"...শ্রীরামকৃষ্ণ (নিত্যগোপালের প্রতি)। ওখানে ?

নিত্য। আজ্ঞা হাঁ, দক্ষিণেশ্বরে যাই নাই। শরীর খারাপ। ব্যথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেমন আছিস্ ?

নিত্য। ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুই এক গ্রাম নীচে থাকিস্।

নিত্য। লোক ভাল লাগে না। কত কি বলে—ভয় হয়। এক একবার খুব সাহস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হবে বৈ কি। তোর সঙ্গে কে থাকে ?

মহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের নিকট হইতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে অবগত হইয়া, কোনও সময়ে কোনও সমারোহ

নিত্য। তারক; ও সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে; ওকেও সময়ে সময়ে ভাল লাগে না।

[শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষাল—বেলুর মঠের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট, শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ।]

..... বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। কিভাবে অবাক্ হ'য়ে রহিলেন। কিয়ৎপরে বলিতেছেন, "তুই এসেছিস্? আমিও এসেছি।" এ কথা কে বুঝবে? এই কি দেব-ভাষা?

.. ঠাকুর নিত্যগোপালকে দেখিয়া বলিতেছেন, "তুই কিছু খাবি?" ভক্তটীর তখন বালকভাব। বিবাহ করেন নাই, বয়স ২৩।২৪ হ'বে। সর্ব্বদাই ভাবরাজ্যে বাস করেন। ঠাকুরের কাছে কখনও একাকী কখনও রামের সঙ্গে প্রায় আসেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ভাবাবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে স্নেহ করেন। তাঁহার পরমহংস অবস্থা—এ কথা ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেন। তাই তাঁহাকে গোপালের ন্যায় দেখিতেছেন।

ভক্তটী বলিলেন, "খাব", কথাগুলি ঠিক বালকের ন্যায়।...

.. শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক (পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী) ...এক একটী কথা কহিতেছেন। ...মণিলাল। শিবনাথ নিত্যগোপালকে সুখ্যাতি করেন। বলেন বেশ অবস্থা।

...নিত্যগোপালকে দেখিয়া ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন—"এর বেশ অবস্থা।...".....নিত্যগোপাল বৃন্দাবনে আছেন। চূণীলাল কয়েক দিন হইল বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার কাছে নিত্যগোপালের সংবাদ লইতেছেন। ...তারক শ্রীবৃন্দাবন হইতে সবে ফিরিয়াছেন... তারক নিত্যগোপালের সহিত বৃন্দাবনে এতদিন ছিলেন।...

উক্ত শ্রীম-কথিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে"র সমস্ত খণ্ড সংগ্রহ করিতে না পারায় মদীয় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমৎ গুরুদেব শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিত্য-

উপলক্ষে তিনি ঠাকুরকে (শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে) তাঁহার বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ঐ সমারোহে আহূত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "এই যে ইহাঁকে দেখ্‌ছেন, ইনি পদানন্দ অবধূত মহারাজের রচিত শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের ইংরাজী জীবনীর ১৩৫—৩৬ পৃষ্ঠায় 'দি গস্পেল্ অভ্ শ্রীরামকৃষ্ণ' ('The Gospel of SriRamKrishna'; শ্রীমৎ স্বামী নিখিলানন্দকৃত শ্রীমকথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের ইংরাজী অনুবাদ) হইতে উদ্ধৃত বাক্যগুলির কতকাংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"...নিত্যগোপালের বক্ষঃস্থল (দিব্য) ভাবের স্ফীতি ও আতিশয্যে (উজ্জ্বল) রক্তিমাভাযুক্ত হইয়াছিল। ...তিনি সর্ব্বদাই ভাবোন্মত্তাবস্থায় থাকিতেন। তথায় তিনি নিঃশব্দে উপবিষ্ট ছিলেন। ঠাকুর (নিত্যগোপালের প্রতি, সহাস্যে)। "গোপাল! তুই সব সময়ই চুপ কোরে থাকিস্ কেন?" নিত্যগোপাল শিশুর (বা বালকের) মত উত্তর করিলেন, "আমি-জানি-না।..."...নিত্যগোপালও ভাবোল্লাসে উন্মত্ত ছিলেন।... নিত্যগোপালের হাব-ভাব (বা প্রকৃতি) মেয়েমানুষের ন্যায়। তাই, যখন তিনি দিব্যভাবে আবিষ্ট থাকেন, তখন তাঁহার দেহ বিকৃত হয় (বা ভিন্নাকৃতি ধারণ করে) এবং বাঁকিয়া যায় (বা আকুঞ্চিত হয় বা মোচড়াইয়া যায়); ইহা উজ্জ্বল রক্তিমাভায় দীপ্তিমান ও উল্লসিত হয়। ...মাষ্টার। "গোপালের মানসিক অবস্থা উন্নত। তাই না?...ভগবানের নামে এত ভাবোন্মত্ততা, এত কান্না ও এত উল্লাস!...ঠাকুর বল্‌তেন, "গোপালের পরমহংসাবস্থা।..." নরেন্দ্র। "...ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, "গোপালের আধ্যাত্মিক (পারমার্থিক) (সিদ্ধি বা) অনুভূতি সকল যে আছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐসব লাভ করতে হ'লে যে রকম উদ্যোগ (বা যে সব সাধন-ভজনাদি) করা দরকার সে তার কিছু না ক'রেই হঠাৎ একেবারে ঐসব লাভ করেছে।...

সদানন্দ পুরুষ।” তখন আত্মগোপনশীল, বিনয়ের খনি ঠাকুর নিজ মাহাত্ম্য গোপন করিবার জন্য হাসিতে হাসিতে ঈশ্বরচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, “গঙ্গার ঘাটে ‘ভাগীরথী’ নামে ষ্টীমার দেখা যায় এবং গঙ্গার নামও ‘ভাগীরথী’। শিব ‘সদানন্দ’ আর আমি ‘সদানন্দ’ তদ্রূপ।” ঠাকুরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, কেননা বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীশ্রীদেবের উক্তি সমর্থন করিয়াই যেন বলিলেন, “আমি যেমন বিদ্যাসাগর।” কিন্তু শ্রীশ্রীদেবের সঙ্গ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ আনন্দের কারণ হইয়াছিল। তাই, ইহার পরে ঈশ্বরচন্দ্র প্রায়ই ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ও নানাপ্রকার আলোচনা করিতেন।

শ্রীশ্রীপরমহংস দেব, ভক্ত রামচন্দ্রকে যাহা বলিতেন তাহা তিনি বেদবাক্যের ন্যায় বিশ্বাস করিতেন। এক সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “যাঁরে ধ্যানে পায় না মুনি, তাঁকে ঝাঁটায় ঝেঁটোয় রাণী। তোর ঘরে কি জিনিষ আছে, চিন্‌তে পার্‌লি নি। নিত্য যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! তা’কে নারায়ণের মত সেবা করিস্।” তখন হইতে ভক্ত রামচন্দ্র অতি সতর্কতার সহিত শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের সেবা ও যত্ন করিতে লাগিলেন।

এই সময় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব সর্ব্বদাই ভগবচ্চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতেন বলিয়া অনেক সময় তাঁহার বাহ্য খেয়াল পর্য্যন্ত থাকিত না। একদিন তিনি বাগবাজারের বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য বাহির হইলেন। কিন্তু তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই এরূপ ধ্যানাবিষ্ট হইলেন যে, বলরাম বাবুর বাটী যাইবার রাস্তা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলেন! অবশেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেখানে উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে লব্ সাহেবের গির্জ্জার ধর্ম্মসঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তিনি বহুক্ষণ তাহা শ্রবণ করেন। তদ্দর্শনে জনৈক পথিক তাঁহাকে বলেন, “আপনি কি খৃষ্টান?” শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব উত্তর করেন, “আমি খৃষ্টান বটি; বাহিরে নয়, ভিতরে ভাব আছে।” রাস্তা

ভুল করিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব কত কষ্ট পাইয়াছেন ভাবিয়া বলরাম বাবু অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। বাস্তবিকপক্ষে, সমন্বয়বাদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব তাঁহার প্রত্যেক আচরণে, এমন কি, অতি সামান্য বিষয়েও সমন্বয় ভাব জগতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাই, বলরাম বাবুর বাটীতে তিনি শাক, শুক্তা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বহুবিধ সামগ্রী পৃথক্ পৃথক আস্বাদন না করিয়া একত্র মিশাইয়া আহার করিলেন। ইহাতে বলরাম বাবুর তৃপ্তি হইল না বলিয়া তিনি পুনরায় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে অন্য একদিন আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সেদিন বলরাম বাবুর প্রীত্যর্থে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব প্রত্যেকটী দ্রব্য পৃথক্‌ভাবে আহার করিতে লাগিলেন। যাহাহউক, বলরাম বাবুর বাটীতে 'রবার্ট্' নামে একটী প্রিয় কুকুর ছিল। অকস্মাৎ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া রবার্ট্ আসিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের সঙ্গে আহার করিতে লাগিল। ইহাতে বলরাম বাবু ক্রোধে অন্ধ হইয়া রবার্ট্‌কে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, সর্ব্বত্রসমবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব বলরামবাবুকে নিরস্ত করিয়া রবার্টের সঙ্গে আহার করিতে করিতে অদ্বৈতভাবে বিভোর হইলেন এবং সর্ব্বজীবে সমভাব প্রদর্শন করিলেন। তদ্দর্শনে বলরামবাবু প্রভৃতি সকলেই অবাক্ হইয়া রহিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, একদিন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব প্রেমাবেশে বিভোর হইয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে গমন করিলেন। সেই অবস্থায় তিনি প্রত্যেক শিব মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক শিব লিঙ্গ আলিঙ্গন করতঃ অনেক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ পরমহংস দেব ভাবিলেন যে, এরূপ অবস্থায় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব বাহিরে গেলে পড়িয়া যাইতে পারেন। সেইজন্য শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব একটী শিব মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র শ্রীশ্রীপরমহংস দেব বাহির হইতে উহার তালা বন্ধ করাইয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের সেই ভাব প্রশমিত হইলে, তিনি মন্দির হইতে বাহির হইবার ইচ্ছা

করিবামাত্র মন্দিরের পশ্চিম দিকের প্রাচীর দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। অমনই তিনি তথা হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক নিম্নে অবতরণ করতঃ যথেচ্ছা গমন করিলেন। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের বহিরাগমনের পরই প্রাচীরটী পূর্ব্ববৎ রহিল। অতঃপর শ্রীশ্রীপরমহংস দেব দরজা খুলিয়া দেখেন যে, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব মন্দিরে নাই। তখন সর্ব্বজ্ঞ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব বুঝিলেন যে, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতে যাওয়া বিফল চেষ্টা মাত্র।

ইহার কিছুদিন পরে এক সময়ে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব উন্মনা অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীকালীমাতাকে দর্শন করিতে যান। সেদিন শ্রীশ্রীপরমহংস দেব তথায় ছিলেন না। কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। জগদম্বাকে দর্শনান্তর ঠাকুর মহাভাবের আবেশে ভীষণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে অজস্র শোণিতধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাঁহার সেই ভয়ঙ্করী দিব্য মূর্ত্তি দর্শনে কেহই তাঁহাকে ধরিতে সাহস পাইলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রতাপচন্দ্র হাজরা প্রমুখ উপস্থিত ভক্তগণ পরম ভক্তিসহকারে তাঁহার স্তবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান হইল।

এই সময় ষ্টার্ থিয়েটারে "চৈতন্য লীলা" মহাসমারোহে অভিনীত হইতেছিল। উক্ত থিয়েটারের কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় উহা দেখিবার জন্য ঠাকুরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তাঁহার অভিলাষ পূরণার্থ ঠাকুর একদিন সভক্ত তথায় গমন করেন। শ্রীভগবানের নাম শুনিবামাত্র যাঁহার দুই নয়নে গঙ্গা-যমুনার ধারা বহিত এবং যিনি ভাবে আত্মহারা হইয়া যাইতেন, তিনি কি আর ঐ অভিনয় দর্শনে স্থির থাকিতে পারেন? মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি মহাভাবে মগ্ন হইলেন এবং সমস্ত বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক ষ্টেজে উঠিয়া মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সে নৃত্য যে দেখিল সেই মুগ্ধ হইয়া গেল; এমন কি, নৃত্যাচার্য্য কাশীবাবু ও নেপালবাবু উহা অনুকরণ করিয়া পরবর্ত্তীকালে নৃত্যাভিনয়ে বিশেষ সুনাম

অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বহুক্ষণ পর ঠাকুর বাহ্যদশায় আসিলে অভিনেতৃগণ বিশেষ ভক্তিসহকারে তাঁহার শ্রম অপনোদনের জন্য একাগ্রচিত্তে সেবা-শুশ্রূষা করেন। অতঃপর তিনি তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে তথায় জলযোগ করিবার পর তাঁহাদিগকে প্রসাদ দানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সেই দিন ঠাকুর প্রায় ৫৲ পাঁচ টাকার পান খাইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি ষ্টার্ থিয়েটারের অভিনেতৃগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

সেই সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের স্বনামধন্য ভক্ত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দত্ত (শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ) লক্ষ্য করিলেন যে, শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেব সর্ব্বদাই প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় থাকেন—কখন কখন ভাবাবেশে একেবারে মগ্ন থাকেন; কিন্তু কাহারও সহিত বিশেষ বাক্যালাপ করেন না বা কাহারও সন্নিকটে উপদেশ গ্রহণ করেন না। ইহা দেখিয়া তিনি একদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে বলিলেন, "মহাশয়, নিত্যবাবুকে সদাই প্রেমোন্মত্ত বা ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দেখ্‌তে পাই। ইহা দ্বারা বোধহয় ইনি ভগবানের পরম ভক্ত। এঁর কোনও তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান আছে কিনা বুঝ্‌তে পারি না। তা' যদি থাক্‌ত, তা'হলে ইনি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে কখনও না কখনও একটী আধ্‌টী জ্ঞানের কথা বল্‌তেনই। তা' ত' কিছু বলেন না। কেবল দেখ্‌তে পাই, মনুষ্যসঙ্গ হ'তে দূরেই অবস্থান করেন। এতে মনে হয়, এঁর জ্ঞান কম।" এই কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব জিহ্বা কর্ত্তন পূর্ব্বক কহিলেন, "ওরে, নিত্য জ্ঞানী নয়, জ্ঞানের অবতার—নিত্য জ্ঞানী নয়, জ্ঞানের অবতার—নিত্য জ্ঞানী নয়, জ্ঞানের অবতার!" ভক্তপ্রবর নরেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থায় বোধহয় ধারণা ছিল যে, যাঁহারা ভগবানের প্রেমে সদাই মত্ত থাকেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ জ্ঞানের বিষয় কিছুই অবগত নহেন। পরমজ্ঞানী, সর্ব্বদর্শী শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের উক্ত বাক্যে তাঁহার সে সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছিল।

এই সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ* পরমহংস দেবের নিকট কেদারনাথ চ্যাটার্জ্জি নামক জনৈক উচ্চভাবসম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা ভক্ত আসিতেন। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এলাহাবাদে অবস্থান কালীন কোন কারণ বশতঃ তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়ায় একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি পর্ব্বতশিখর হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দেহত্যাগে উদ্যোগী হইলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই শ্যামবর্ণ একটী পরম সুন্দর বালক তাঁহাকে পশ্চাদ্দিক হইতে ধরিয়া এই আত্মহত্যারূপ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিলেন। যাইবার সময় বালক কেদারবাবুকে বলিয়া গেলেন, "বঙ্গভূমে পুনরায় আমার দেখা পা'বে।" এই ঘটনার পর হইতেই কেদারনাথের মনে শ্রীভগবানের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিভাবের উদয় হয়। তিনি বঙ্গদেশে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত আরম্ভ করেন। এইখানে কেদার-নাথ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিলেন, যে শ্যামবর্ণ বালককে তিনি পর্ব্বতশিখরে দর্শন করিয়াছিলেন, তিনিই এখন গলিত স্বর্ণকান্তি ধারণ করিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল রূপে বঙ্গভূমে আবির্ভূত হইয়াছেন। যাহাহউক, কেদারবাবু শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের গোপন-স্বভাব দেখিয়া এ কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন না; কিন্তু তিনি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে "ছোট ঠাকুর" এবং শ্রীশ্রীপরমহংস দেবকে "বড় ঠাকুর" সম্বোধনে তাঁহার প্রাণের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

---

*শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের সম্বন্ধে শ্রীশ্রীনিত্যদেব স্থানান্তরে বলিয়াছেন, "...পরম-হংস মহাশয় একস্থানে অবস্থান করতঃ নিজের (জ্ঞানালোকে) জ্ঞান-দীপালোকে বা নিজের জ্ঞানসূর্য্যালোকে ও ভক্তিচন্দ্রালোকে নিজেকে ও অন্যান্য ভক্তগণকে দেখাইতেছেন।..."

সপ্তম অধ্যায়

কলিকাতায় অবস্থান কালে

"মহাত্মানস্তু মাং পার্থ! দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥"

গীতা, ১৩ম শ্লোঃ, ৯ম অঃ।

[হে পার্থ! দৈবী প্রকৃতি আশ্রিত মহাত্মাগণ অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে সর্ব্বভূতের কারণ এবং নিত্যস্বরূপ জানিয়া ভজনা করেন।]

কলিকাতা বাসকালে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া বালকের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এইরূপে একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে মধ্যাহ্নকালে তিনি দক্ষিণেশ্বর যাইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তথায় যাইবার সময় তিনি এরূপ ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত ঘুরিয়াও তিনি দক্ষিণেশ্বরের রাস্তা ঠিক করিতে পারিলেন না এবং বিন্দুমাত্র জলগ্রহণ না করিয়া প্রখর আতপতাপে এই দীর্ঘপথ পরিভ্রমণে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে জগন্মাতা স্বীয় উজ্জ্বল শ্যামল অঙ্গছটায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া বালিকাবেশে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। ইহাতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব আরও আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। বালক যেমন মাকে পাইলে জড়াইয়া ধরিতে যায়, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবও সেইরূপ জগন্মাতাকে ধরিবার জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু যতই তিনি মাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই জগন্ময়ীও দ্রুতপদে দক্ষিণেশ্বরের পথে চলিতে লাগিলেন। এইরূপে বালিকাবেশে কালিকাদেবী শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের সহিত খেলা করিতে করিতে অল্পক্ষণের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে পৌছিবামাত্র অন্তর্হিতা হইলেন। তখন মাতৃহারা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব ভাবে অধীর হইয়া

উন্মাদের ন্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই অপরাহ্ণ কালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব আহার করিতে করিতে শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেবকে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে বাতাস করিবার নিমিত্ত জনৈক সেবককে আদেশ করিলেন। ভোজনান্তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে একটু সুস্থ দেখিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে ভাবাবেশে "হংস," "হংস" বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন! শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে হংসরূপে* দর্শন করতঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব হৃদয়াদি উপস্থিত ভক্তগণের সমক্ষে তাহা প্রকাশ করিলেন।

---

*এখানে "হংস" অর্থে "বিষ্ণু বা পরব্রহ্ম" বুঝিতে হইবে। তবে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অনুসারে 'নির্লোভ যতি'কে 'হংস' বলা যায়। উক্ত তন্ত্রে একস্থানে পাঁচ প্রকার 'সন্ন্যাসী'র উল্লেখ দৃষ্ট হয়ঃ—(১) কুটীচক, (২) বহূদক, (৩) হংস (৪) পরমহংস ও (৫) অবধূত।

(১) "কুটীচক সন্ন্যাসীগণ পুত্র, ঐশ্বর্য্য আদি জনিত সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিবেন ও পুত্র নিকটে থাকিতেও তৎপ্রতি কিছুমাত্র মমতা প্রকাশ করিবেন না। অন্যের গৃহে ভোজন করিবেন না। করিলে দোষভাগী হইতে হয়। পুত্রের জন্যও কখন কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, মিথ্যার বশবর্ত্তী হইবেন না। কিন্তু ভিক্ষার্থ ভ্রমণে অসমর্থ হইলে তিনি পুত্রের নিকট থাকিতে পারিবেন। কুটীচকের ইহাই শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ।"

(২) "যে সন্ন্যাসী বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়কুটুম্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিদণ্ড, ভিক্ষাপাত্র ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, যিনি প্রাণায়াম অভ্যাসে তৎপর থাকিয়া গায়ত্রীজপনিরত হয়েন, যিনি সংসারের একমাত্র পরমতত্ত্ব ভগবান্‌কে ধ্যান করেন, জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভগবদ্ধ্যানে কালাতিপাত করিতে থাকেন এবং এক খণ্ড গৈরিক বসন ধারণ করেন, তিনিই "বহূদক সন্ন্যাসী" নামে অভিহিত হয়েন।"

(৩) "যিনি পুত্র, কলত্র, গৃহ আদি পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মযোগাভ্যাস-

একদিন ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে পুষ্পদোল উপলক্ষে বহু ভক্ত আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে সেদিন শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেব ও শ্রীশ্রীপরমহংস দেব উভয়েই তাঁহার বাটীতে শুভাগমন করিলেন। তথায় সুললিত স্বরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সুমধুর কীর্ত্তন হইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব ভাবাবেশে উৎসব প্রাঙ্গণে এরূপ নৃত্য করিতে লাগিলেন যে, উপস্থিত সকলে নিনিমেষ নয়নে তাহা সন্দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। এইরূপ বহুক্ষণ নৃত্য বিলাসের পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব প্রাঙ্গণ মধ্যে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের সেই বিশ্ব-বিমোহন অপরূপ নৃত্য দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, "ঐ দ্যাখ্! কিশোরীর বঁধিয়ান (কিশোরীর প্রেমে বন্দী)।" এইকথা শ্রবণমাত্র ভক্তগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ইহাতে সুচতুর শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব স্বরূপ প্রকাশ আশঙ্কায় তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। ভক্তগণ মধ্যে কেহই তাঁহার অপূর্ব্ব লীলাচাতুরী অনুধাবন করিতে সক্ষম হইলেন না।

নিরত হন এবং চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও মনকে যিনি স্ববশে রক্ষা করেন, তিনিই "হংস" নামে অভিহিত হয়েন। ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির আশয়ে হংস কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ, তুলাপুরুষ বা অন্যান্য ব্রত পালনপূর্ব্বক শরীরকে শুষ্ক করিয়া ফেলিবেন। যজ্ঞোপবীত, দণ্ড ও গাত্রলগ্ন কীট-পতঙ্গাদি ঝাড়িবার বস্ত্র ভিন্ন আর কোন পদার্থ নিজ নিকটে রাখিবেন না।"

(৪) "পরমহংস" সম্বন্ধে এই গ্রন্থের ৪৯—৫১ পৃষ্ঠায় কয়েক পংক্তি লিখিত হইয়াছে।

(৫) "অবধূত" সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি এই গ্রন্থের ১ম—৪র্থ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

শাস্ত্রে আরও নানাপ্রকার সন্ন্যাসীর উল্লেখ আছে। এই সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাসে তাঁহাদের সকলের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব।

আর একদিন বাগবাজার-নিবাসী ভক্ত বলরাম বাবুর বাটীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে চৈতন্যরূপে দর্শন করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, "ঐ ত্থাখ্‌ 'চৈতন্য', 'চৈতন্য'।" এইরূপে মধ্যে মধ্যে শ্রীশ্রীপরমহংস দেব শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের স্বরূপ তত্ত্ব প্রায়ই ব্যক্ত করিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মুখে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের স্বরূপ তত্ত্ব শ্রবণ এবং তাঁহার অলৌকিক দিব্য ভাব সকল দর্শন করিলেও, শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের অধিকাংশ ভক্ত তাঁহাকে চিনিতে সক্ষম হইতেন না। তিনি গোপনে আসিয়াছিলেন এবং গোপনেই থাকিতে ভালবাসিতেন।

এই সময় শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-বংশোদ্ভব শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যৌবনের প্রারম্ভেই ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পর তিনি স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের প্রতি পর্য্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হন। কিছুকাল মধ্যেই শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হন। সমন্বয়াচার্য্য শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আভ্যন্তরিক ঐক্য অবগত ছিলেন বলিয়া কখন কখন ব্রাহ্মসমাজেও যাইতেন। এইরূপ একদিন তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া গৃহের একপ্রান্তে উপবিষ্ট রহিলেন। ব্রহ্মোপাসনা মন্দিরে সেদিন শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলার অজস্র নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসলীলার এবংবিধ নিন্দাবাদ শ্রবণে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "আজ যে বিজয়কৃষ্ণ পরিহাসসহকারে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার নিন্দা করিতেছেন, কবে এই রাসলীলা স্মরণে তাঁহার প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইবে?" বলাবাহুল্য, ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরাসলীলার নিন্দাবাদ শ্রবণে ব্যথিতহৃদয় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের মুখেই উক্ত লীলার ভূয়সী প্রশংসা শ্রবণের ইচ্ছা করিলেন এবং তাঁহার সে ইচ্ছাও ফলবতী হইয়াছিল। কিন্তু এই ইচ্ছা ফলবতী হইবার কারণস্বরূপ নিত্যসঙ্গ ও

সদুপদেশ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই, আজ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব রামচন্দ্র ও মনোমোহনাদি ভক্তবীরগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ করিয়া মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণকে সঙ্গ ও উপদেশ দানে তাঁহাকে ভ্রান্ত পথ হইতে অভ্রান্ত পথে লইবার জন্য দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিবামাত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব "হারানিধি পাইলাম" বলিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং তাঁহাকে পরমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। তারপর "তারা দুই ভাই এসেছেরে আজ নদীয়ায় ইত্যাদি" বলিয়া কীর্ত্তনীয়ারা সুমধুর কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের ভাব-সাগরে তুফান উঠিল ; কিন্তু নির্জ্জনতাপ্রিয় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব ঐ জনসমাকীর্ণ স্থানে কীর্ত্তনানন্দে যোগদান করিতে পছন্দ করিলেন না ; কারণ গোপনভাব ও জনশূন্য স্থানে বাস তাঁহার জীবনে পরম আদরের জিনিষ ছিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? ভাবনিধি নিত্যচাঁদের শ্রবণে ঐ সুললিত চিত্ত-বিনোদন কীর্ত্তন-ধ্বনি প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া ফেলিল। আজ দুইজনেই সেই নদীয়ার কীর্ত্তন-লম্পট ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া গেলেন। তাঁহাদের এই ভাব দেখিয়া দর্শকবৃন্দের অনেকের চিত্ত টলিয়া গেল। উক্ত স্থানে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের ইচ্ছাতেই যেন আজ মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণও শ্রীশ্রীপরমহংস দেব ও শ্রীশ্রীঅবধূত দেবের আচরণ দর্শনে স্থির থাকিতে পারিলেন না। এ দিকে বাহ্যদশায় উপনীত হইবার পরই শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব ঐ জনাকীর্ণ স্থানে লোকচক্ষুর কবল হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য নির্জ্জন পঞ্চবটীতে গমন করিয়া বিল্বমূলে উপবেশন করিলেন।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের চিত্ত-চকোর কিন্তু নিত্য-চাঁদ-সুধা-পানের নিমিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গোস্বামীজী কয়েকজন ভক্তের সহিত শ্রীশ্রীনিত্যপদানুসরণ করিলেন ; এবং শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের নির্জ্জন

বাস ভঙ্গ করিয়া স্বীয় চিত্তের সংশয় অপনোদনার্থ তাঁহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব অতি সরল ভাষায় অতি দুরূহ তত্ত্বের এমন সুমীমাংসা করিয়া দিলেন যে, তৎশ্রবণে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের চিত্তের ভ্রম দূরীভূত হইতে লাগিল। এ স্থানেও ক্রমে ক্রমে বহুলোক সমাগত হওয়াতে শ্রীশ্রীঅবধূত দেব নির্জ্জনতা লাভের জন্য গঙ্গাতীরে গমন করিলেন, কিন্তু তিনি গোস্বামীজীর হাত এড়াইতে পারিলেন না। গোস্বামীজী এখানেও তাঁহার সঙ্গে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্ম সাকার না নিরাকার ?" ইহাতে শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেব বলিলেন, "তিনি সাকার, আকার, নিরাকার ; এবং সাকার, আকার, নিরাকারের অতীত।" এখন মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ অতীব বিস্ময়াভিভূত হইলেন তিনি ভাবিলেন, তিনি ত এমন কথা কোনদিনই শুনেন নাই। তিনি পুনরায় বলিলেন, "সাকার, আকার, নিরাকারের অতীত আবার কি ?" শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব বলিলেন, "যিনি চিন্তার অতীত তিনিই তাহা।" ইহা শুনিয়া গোস্বামীজী তদুক্তি "অবাঙ্-মানসোগোচরম্" ইত্যাদি শাস্ত্রোক্তির সহিত মিলাইয়া লইয়া চমৎকৃত হইলেন। এই সময় হইতে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের জীবনে পরিবর্ত্তনের সাড়া পড়িল এবং এক অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানালোকে তাঁহার চিত্ত উদ্ভাসিত হইল।

ইহার অল্পদিন পরেই মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ সদ্গুরু লাভ করিয়া প্রকৃত পথ খুঁজিয়া পাইলেন। অনন্তর একদিন তিনি আপন গৃহে বসিয়া রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিতে করিতে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব বেড়াইতে বেড়াইতে মহাত্মা বিজয়-কৃষ্ণের গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী হইলে, সেই সুমধুর রাসলীলা পাঠ শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব যতই মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের ভক্তিরসাপ্লুত হৃদয়ের প্রাণস্পর্শী অপ্রাকৃত রাসলীলা পাঠ শুনিতে

লাগিলেন, ততই তিনি বিহ্বল হইয়া গভীর ভাবে মগ্ন হইলেন। তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণও* আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি সম্মুখস্থ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া ভক্তিগদগদ হৃদয়ে পুনঃপুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন! তাঁহার এইরূপ আর্ত্তিদর্শনে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব প্রেম সম্ভাষণে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন।

এই সময় ধীরে ধীরে লোকপরম্পরায় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের অদ্ভুত জ্ঞান, অদ্ভুত প্রেম এবং অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের বিষয় চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হওয়ায় তাঁহার নিকট বহুলোক সমাগম হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব লোকসঙ্গ পরিহারের নিমিত্ত বর্ত্তমান বালিগঞ্জ ষ্টেশনের নিকটস্থ ধাপার মাঠে একখানি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া একাকী বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যে সময় এইস্থানে ছিলেন, তখন ইহা জঙ্গলে সমাকীর্ণ ছিল। এখন সেখানে চামড়ার কারখানা এবং লোকবসতিও হইযাছে। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব যখন উক্ত নির্জ্জন কুটীরে বাস করিতেছিলেন, তখন একদা দৈবাৎ জনৈক অপরিচিত সঙ্গতিসম্পন্ন ভদ্রযুবক ঘোড়ার গাড়ীতে ঐ মাঠে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন, "আপনাকে আজ মা'র প্রসাদ পেতে কালীঘাটে যেতে হ'বে।" অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব

*ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের আশ্রিত নোয়াখালিজেলা-নিবাসী ভক্তবর শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ডাক্তারবাবু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে একদিন বলিয়াছিলেন, "প্রভুপাদ, আমাকে প্রেমভক্তি সম্বন্ধে উপদেশদানে কৃতার্থ করুন।" ইহাতে গোস্বামীজী আবেগের সহিত উত্তর দিয়াছিলেন, "আপনি সাগরে বাস ক'রে গোস্পদের নিকট প্রেমভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ চান কেন?"

প্রসাদের সম্মান রক্ষার্থ তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিলেন। তিনি উক্ত ভদ্রযুবকের সঙ্গে গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া দেখেন যে, তন্মধ্যে একজন স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। ইহাতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব বিস্মিত হইলেন। গাড়ী কালীঘাটস্থ কেওড়াতলার শ্মশানে আসিয়া থামিল। ক্রমে আরও কয়েকজন যুবক তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্মশানক্ষেত্রে ঘোর অমাবস্যা-রাত্রিতে কারণাদি আনিয়া তাঁহারা তন্ত্রোক্ত ভৈরবীচক্র সাধনার নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে (শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে) চক্রেশ্বর নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহারই সম্মুখে সকলে যাজ্ঞিক ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণ পরে প্রথমোক্ত যুবক শ্রীশ্রীঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি এই কারণাদি প্রসাদিত করিয়া আমাদিগকে বিতরণ করিয়া দিন।" এই চক্রের বিধানানুসারে চক্রেশ্বর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমে চক্রবিধি রক্ষণের জন্য সেই সুরা পান না করিয়া ললাটে তিলক ধারণ করিলেন এবং অন্যান্য সাধকগণকে বিতরণ করিলেন। সেইদিন কেবলমাত্র সেই যুবকই শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের কৃপায় তন্ত্রোক্ত সাধনায় সিদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাতে স্বীয় ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। যুবক বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে অন্যান্য যুবকগণ উন্মত্তভাবে যথেচ্ছাচার করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব মধুর বাক্যে সেই যুবককে আশ্বস্ত করিয়া সত্বর স্বীয় কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের অহেতুকী কৃপায় তান্ত্রিক যুবকের মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অনেক সময় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব একখানি মাত্র শতগ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন মলিনবস্ত্র পরিধান করিয়া অবধূতবেশে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সাধারণ দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া তিনি লোকালয়েও নির্জ্জন বাস করিতেন। এই সময় স্নান, আহার, শয়ন কিংবা মলমূত্র ত্যাগ সম্বন্ধে তাঁহার কোনও বিধিনিষেধ থাকিত না। এইরূপে একদিন ভাবাবেশে বিভোর অবস্থায় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব গঙ্গাভিমুখে গমন

করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে কতিপয় পরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে লইয়া নিকটস্থ বাগবাজারের বলরামবাবুর বাটীতে গেলেন। বলরামবাবুও শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে পাইয়া প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া গেলেন। মহানন্দে তাঁহাকে নারায়ণের সিংহাসনে বসাইয়া বলরামবাবু আত্মীয়বর্গকে লইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন।

অতঃপর আহারান্তে মুখপ্রক্ষালনের সময় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব কথঞ্চিৎ বাহ্যদশায় আসিলে, একটু অপ্রতিভভাবে বলিলেন, "আমার শৌচ হয় নাই।" অশুচি অবস্থায় তাঁহাকে নারায়ণের সিংহাসনে বসান হইয়াছে বলিয়া বলরামবাবুর বিন্দুমাত্র দুঃখ হইল না; বরঞ্চ তাঁহার অলৌকিক ভাব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া রহিলেন।

এইরূপে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব আত্মগোপনপূর্ব্বক ঘুরিয়া বেড়াইলেও এক দিবস কলিকাতা-নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি পাঁচ ছয় জন শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব সমস্ত দিন কিভাবে অতিবাহিত করেন জানিয়া তাঁহারাও তদনুসারে আত্মোন্নতি করিবেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনুসরণকারিগণ অতিশয় সুখী লোক; সুতরাং প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত অনবরত শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেবের বিন্দুমাত্রও ক্লান্তি বা ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ হইল না। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইলেও দেবেন বাবু প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না। অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব সঙ্গিগণের ক্লান্তি ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার বিষয় জানিতে পারিয়া পথিপার্শ্বস্থ একটী গৃহের দরজায় করাঘাত করিতে লাগিলেন। গৃহস্বামী দরজা খুলিয়া অতি পরিচিতের ন্যায় তাঁহাদিগকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন। তদনন্তর গৃহস্বামী বিনীতভাবে বলিলেন, "ভোগ প্রস্তুত, অল্পক্ষণ আগে সমস্ত নিবেদন ক'রে আপনাদের বস্‌বার জন্য আসন ঠিক ক'রে

রাখা হ'য়েছে।" দেবেন বাবু প্রভৃতি ভক্তগণ ইহা শুনিয়া অবাক্ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, গৃহস্বামী তাঁহাদের আগমন সংবাদ পূর্ব্বেই কি করিয়া অবগত হইলেন। যাহাহউক, তাঁহারা পরমানন্দে প্রসাদ পাইয়া গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইলেন। গৃহস্বামীও ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। অনন্তর শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব তথা হইতে অন্যত্র গমন করিলেন। দেবেন বাবু প্রভৃতি ভক্তগণ ভাবিলেন যে, অন্য একদিন আসিয়া ইহার প্রকৃত রহস্য জানিবেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহারা সেই রাজপথের বা গৃহের সন্ধান পাইলেন না।

'গোপনভাব' শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের চরিত্রের একটী বিশেষত্ব ছিল—যাহার জন্য তিনি নানাপ্রকার পন্থা অবলম্বন করিতেন। জনশূন্য স্থানে বাস তাহারই একটী লক্ষণ। তাই, তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর দিকে লক্ষ্য রাখিলে দেখা যায়, কলিকাতা নগরীতে বসবাস কালে তিনি নানাপ্রকারে নির্জ্জনপ্রিয়তা-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা করিতেন। এই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি এক সময় বাগবাজারস্থ শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালী মন্দিরের অনতিদূরে গঙ্গাতীরে এক নির্জ্জন কক্ষে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তথাপি তাঁহার নির্জ্জনবাস নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল না; কারণ চিরপ্রস্ফুটিত নিত্যকুসুমের সন্ধান শ্রীযুক্ত কেদারনাথ প্রভৃতি ভক্ত-অলির নিকট গুপ্ত থাকিবার উপায় ছিল না। সেইজন্য উক্ত ভক্তবৃন্দ নিত্যসঙ্গানন্দ উপভোগের ও নির্ম্মল ধর্ম্মোপদেশ লাভের জন্য মধ্যে মধ্যে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের নির্জ্জনবাসের বিঘ্ন ঘটাইতেন।

যাহাহউক, এই সময় একদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, ভক্তবর নরেন্দ্রনাথ (শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ) মা আনন্দময়ীর নিকট একটী ছাগশিশু বলি দিয়া উক্ত মহাপ্রসাদ একটী মৃৎপাত্রে রক্ষা করিয়া পূর্ব্বোক্ত নির্জ্জনকক্ষে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের নিকট গমন করিলেন। তথায় আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে উক্ত মহাপ্রসাদ নিরাপদে রাখিয়া

তিনি স্নানার্থ গঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইত্যবসরে প্রসাদ-মাহাত্ম্য রক্ষণের অপূর্ব্ব আদর্শ ভক্তের সম্মুখে যেন জাজ্বল্যমান করিবার নিমিত্তই, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব ঐ কাঁচা মহাপ্রসাদ সমস্ত ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। স্নান সমাপনান্তে ভক্তবীর নরেন্দ্রনাথ সঙ্কল্প করিলেন, "আজ মহাপ্রসাদ রান্না ক'রে মনের আনন্দে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে উৎসর্গ করব"; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মৃৎপাত্রে হস্তক্ষেপ করিবামাত্র তাহা শূন্য দেখিয়া বিস্ময়ে বিহ্বলচিত্ত হইলেন। তিনি সভয়ে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি (শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব) বলিলেন, " 'প্রসাদং প্রাপ্তিমাত্রেণ ভক্ষয়েৎ। নাত্র কালবিচারণা।' তাই, আমি মহাপ্রসাদ পাইবামাত্র ভক্ষণ করিয়াছি।" ইহা শ্রবণে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ অতীব চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু স্বীয় সঙ্কল্প অসিদ্ধ হওয়ায় তিনি কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নচিত্তে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের নিকট সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলেন। শ্রীশ্রীপরমহংস দেব ঐ অপূর্ব্ব ঘটনা শ্রবণে প্রেমাবেশে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া, গদগদবাক্যে ভক্তপ্রবর নরেন্দ্রনাথকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "নরেন, নিত্য খেলেই আমার খাওয়া হ'ল।"

ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সদাসর্ব্বদা লোকসঙ্গ পরিহারের জন্য শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব কখনও ধাপার মাঠে, কখনও কেওড়াতলার শ্মশানে, কখনও নিমতলার ঘাটে, কখনও বা অবধূতবেশে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় যেখানে সেখানে যেমন তেমন ভাবে দিনাতিপাত করিতেন। তিনি লোকশিক্ষার জন্য এইরূপ ভাবে সর্ব্বজন-নমস্কৃত অবধূতগণের আচরণ করিতেন এবং নির্জ্জনে অবস্থানপূর্ব্বক নানাবিধ সাধনার অনুষ্ঠান করিতেন। তাই, তাঁহার রচিত 'সাধক-সহচর' নামক গ্রন্থে আছে, "একজন মহাপণ্ডিতের একজন বালককে বর্ণপরিচয় পড়াইতে হইলে, যেমন ঐ বালকের ন্যায় তাঁহাকেও বর্ণগুলি উচ্চারণ করিতে হয়, অবতারগণও তদ্রূপ লোকশিক্ষার জন্য ভক্তিভাবের এবং নানাবিধ সাধনার অভিনয় করিয়া থাকেন।"

অষ্টম অধ্যায়

বৃন্দাবন গমন

"অবজানন্তি মা' মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

গীতা, ১১শ শ্লোঃ, ৯ম অঃ।

[আমি সকল ভূ' তব ঈশ্বব ; আমাব পবমতত্ত্ব অবগত না হইয়া, 'আমি মানুষ বিগ্রহ পা'গ্রহ কবিযাছি' বলিযা মূঢ ব্যক্তিরা আমাকে অবজ্ঞা কবে।]

শ্রীশ্রীনিত্যগে পাল দেব কলিকাতায় ভক্তসঙ্গে অবস্থান করিতেছেন; এমন সময ভক্ত বলবাম বসু মহাশয ও তাঁহার আত্মীয়বর্গ বৃন্দাবনে গমনেচ্ছু হইয়া, একদিন শ্রীশ্রীদেবেব নিকট আপনাদের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহাকেও সঙ্গে লইতে চাহিলেন। বলাবাহুল্য, পরম প্রেমিক শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবেব (ঠাকুবের) নিকট বৃন্দাবনধাম দর্শন কবিবার প্রস্তাবটী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তাই, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন কবিলেন। বৃন্দাবন ধামে যাইবার কথা ঠাকুরের কাছে কেহ বলিলে, তিনি আব অস্বীকাব কবিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি বলিতেন, "বৃন্দাবনও ভাল, বাধাকৃষ্ণও ভাল—তবে বাবাজীদের বড় গোঁড়াম, বড় গোঁড়াম !"

অতঃপর শুভদিনে তাঁহারা সকলে শ্রীবৃন্দাবনধামে যাত্রা করিলেন। সেখানে ঠাকুর ভক্তপ্রবর বলরামবাবুর সহিত কালাবাবুর কুঞ্জে বাস করিতে লাগিলেন। তথা হইতে তিনি ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনের দর্শনীয় স্থলসমূহ দর্শনে যাইতেন ; কিন্তু শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ পরম ভাগবত শ্রীগোপাল ভট্টের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহ দর্শন করিয়া

তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। বলরামবাবু ইহা সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন। তাই, নির্জ্জনতা-প্রিয় ঠাকুরকে অনেক সময়ে শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহ দর্শন করাইবার কথা বলিয়া তিনি অন্য স্থানে লইয়া যাইতেন। কালাবাবুর কুঞ্জটী ঠাকুরের যেন মনোনীত স্থান ছিল; কারণ তিনি নিশাকালে তথা হইতে বংশীবটে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দর্শন করিয়া প্রেমানন্দ লাভ করিতেন।

একদা বলরামবাবুর প্রস্তাবানুসারে তিনি সমস্ত লীলাস্থান দর্শনের নিমিত্ত বহির্গত হইয়া গোবর্দ্ধনে গমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলেন। তথায় পৌঁছিয়া ঠাকুরের ভাবসমুদ্রে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরলধারায় প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। ঠাকুরকে বিহ্বলচিত্ত দেখিয়া প্রেমময়ী রাধারাণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নীলাম্বর-পরিহিতা শ্রীরাধিকা কুণ্ডের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহার কনকোজ্জ্বল কান্তিতে সমস্ত কুণ্ড উদ্ভাসিত হইয়া গেল। ঠাকুর দর্শন করিলেন যে, সমস্ত কুণ্ড রাধাময়। আহা! রাধানাম শুনিলেই যাঁহার নয়নযুগল হইতে গঙ্গাযমুনার ধারা প্রবাহিত হইত, রাধাভাবের* সঙ্গীত শ্রবণমাত্রই যিনি মহাভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, এমন কি, স্ত্রীচিহ্ন

*"রাধাভাব 'মধুর ভাব'। সেই কৃষ্ণমোহিনী শ্রীরাধার কৃপায় জীবে এই ভাব সঞ্চারিত হয়; আবার এই ভাব সঞ্চারিত না হইলে 'মধুর ভাবের' সাধনাও সম্ভব হয় না। তাই বুঝি মহর্ষি নারদ কহিয়াছেন, "শ্রীরাধা-শ্রীপাদপদ্মং প্রার্থয়ে জন্মজন্মনি!" যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব জীবশিক্ষার ছলে স্বরচিত 'নিত্যগীতি' নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন, "সে ভাব রাধার ভাব; সে ভাব কেমনে পাব?" কি সাধক, কি সাধিকা, কি নর, কি নারী উভয়েই রাধাভাবে ভাবিত হইতে পারেন। মলিন জীব রাধার ভাবে ভাবিত হইয়া পরাশক্তিময় হন। যে পুরুষ বা প্রকৃতি পরম প্রেমযোগে পরাশক্তিময় হন, তিনি রাধার স্বভাবসম্পন্ন হন; যেহেতু রাধাই

পর্য্যন্ত যাঁহার অঙ্গে স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হইত, তিনি কি সেই কৃষ্ণ-মোহিনীকে দর্শন করিয়া, রাধাময় কুণ্ডে আর স্নান করিতে পারেন ? তাই তিনি তথা হইতে ললিতা কুণ্ডে গমন করিয়া স্নানাদি সমাপন করিলেন।

ঠাকুর যখন কালাবাবুর কুঞ্জে বাস করিতেছিলেন, তখন একদা নিশীথ সময় হঠাৎ একদল ঘাগ্‌রী-পরিহিতা, অলৌকিক-রূপ-যৌবন-সম্পন্না দিব্যরমণী ভাবাবেশে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যে যিনি রূপেগুণে সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন, তিনি ঠাকুরের হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিকুঞ্জ বনে লইয়া গেলেন। অনন্তর তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহারা তাঁহার সেবায় বিশেষভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে ঠাকুর আভাষে ভক্তমহোদয়গণকে কিছু কিছু বলিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব কালাবাবুর কুঞ্জ-ভবনে একটী দ্বিতল প্রকোষ্ঠে থাকিতেন এবং নিম্নতলে উৎসবানন্দ নামক একজন পশ্চিমদেশীয় ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। ব্রজললনাগণ ঠাকুরকে বাৎসল্যভাবে ফল, মূল, ছানা, মাখন ও নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য দ্বারা সেবা করিতেন। তাঁহারা

পরাপ্রকৃতি এবং পরাশক্তি। পরম প্রেমযোগে পুরুষ ও প্রকৃতি সেই শক্তিময় হইলে, তাঁহাদের পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার হইয়া থাকে। সে বিহার জৈব বিহার নহে। জৈব বিহার যাহা, তাহা সুশৃঙ্গার নহে ; তাহা কুশৃঙ্গার। সে শৃঙ্গারের সহিত কাম নামক বিকারের সম্পূর্ণ সংস্রব আছে। সুশৃঙ্গার যাহা, তাহা নিষ্কাম। সেইজন্য সে শৃঙ্গারের সহিত নির্ব্বিকারত্বের সংস্রব আছে। সেই সুশৃঙ্গার প্রভাবে সাধক রাধাময় হইয়া পরমপতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত একীভূত হন। ঐ ঐক্যই জীবাত্মা-পরমাত্মার ঐক্য। ইহাকেই যোগ কহে। এই যোগাশ্রয়েই রাধাকৃষ্ণ-একীভূত শ্রীগৌরাঙ্গ। জীবাত্মা পরমাত্মায় যখন প্রকৃত যোগ হয়, তখনই ঐরূপ অদ্বৈতবোধ অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বোধ স্ফুরিত হয়। অদ্বৈত বোধই অদ্বৈত জ্ঞান। অনেক প্রসিদ্ধ বেদান্তবাদীর মতে অদ্বৈত জ্ঞানই আত্মজ্ঞান।"

ব্রহ্মচারীর সম্মুখ দিয়াই সেই সমস্ত দ্রব্য লইয়া যাইতেন ; অথচ তাঁহার সেবার্থে কিছুই দিতেন না। ইহাতে উক্ত ব্রহ্মচারী অত্যন্ত দুঃখ বোধ করিতেন। এক দিবস তাঁহার সেই দুঃখের কথা তিনি জনৈক ভক্তকে অঙ্গভঙ্গি করিয়া বলিতেছিলেন, "বাংলাছে এক্ বাঙ্গালী বাবা আয়া ; মায়িলোক্ সব্ উন্‌কা রাব্‌ড়ী খিলাতা হ্যায়্, মালাই খিলাতা হ্যায়্, হালুয়া খিলাতা হ্যায়্, পুরী খিলাতা হ্যায়্ ; খাকে খাকে উন্‌কা বদন্ এয়্‌সা বন্ গয়া। হাম্‌কো কুস্ নেহি দেতা হ্যায়্।" সেই সময় ঠাকুর ছাদের উপর পাদচারণা করিতেছিলেন। দৈবাৎ তিনি সেই কথা শ্রবণ করিলেন ; পাছে ব্রহ্মচারী তাঁহাকে দেখিলে লজ্জা পান, তজ্জন্য তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে ছাদের অন্যদিকে গমন করিলেন। অতঃপর তিনি ব্রজাঙ্গনাগণকে বলিয়া দিলেন যে, তাঁহারা যেন ব্রহ্মচারীকেও কিছু কিছু আহারাদি প্রদান করেন। বলাবাহুল্য, ইহার পর হইতে তাঁহারাও তদনুসারে কার্য্য করিতেন।

শ্রীবৃন্দাবনের আয়তন পঞ্চক্রোশ। অনেক বৈষ্ণব ভক্তই এই পঞ্চক্রোশ প্রত্যহ পরিক্রমণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সময় যমুনার স্রোতে পরিক্রমণের রাস্তা দুই স্থানে ভগ্ন হইয়াছিল। তাই, ভক্তগণ অতি কষ্টে সন্তরণ পূর্ব্বক সেই দুই স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতেন।

একদা ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারীকে কৃপাদান ছলে শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমণে বহির্গত হইলেন। ব্রহ্মচারী প্রত্যহ বৃন্দাবন পরিক্রমণ করিতেন। ঠাকুর ব্রহ্মচারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী যমুনার স্রোতে ভগ্ন স্থান দুইটীর প্রথমটী অনায়াসে উত্তীর্ণ হইলেন ; কিন্তু ঠাকুর সন্তরণে অপটু ছিলেন বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় ব্রহ্মচারী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন যে, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছেন না। ব্রহ্মচারী পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং ঠাকুরকে ক্রোড়ে করিয়া পার করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, "মেরা গর্দী পর্ আ যাও।" ঠাকুর তাহাতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন ;

কিন্তু ব্রহ্মচারীর আগ্রহাতিশয্যে তিনি বাধ্য হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে আরোহণ পূর্ব্বক পার হইলেন। এই সময় ব্রহ্মচারীর হৃদয়ে ঠাকুরের প্রতি যে বিদ্বেষ ভাব ছিল, তাহা তদীয় সুপবিত্র অঙ্গস্পর্শে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া গেল এবং তৎপরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ প্রেমভাবের উদয় হইল। ব্রহ্মচারী এইরূপে দ্বিতীয় ভগ্ন স্থানেও ঠাকুরকে পার করিয়া দিলেন। অতঃপর ঠাকুর ও ব্রহ্মচারী উভয়ে মাঠে গোচারণ দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ঠাকুরের পূর্ব্বস্মৃতি হৃদয়ে জাগরিত হওয়ায় তিনি মহাভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। এই সমস্ত অবলোকন করিয়া ব্রহ্মচারী পুনঃপুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং কৃপা ভিক্ষা করিলেন। তদবধি তিনি (ব্রহ্মচারী) তাঁহাকে "প্রেমবাবা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বলাবাহুল্য, ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের অহেতুকী কৃপা লাভ করিয়া তৎপ্রতি ভক্তিভাবে আপ্লুত হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আরম্ভ হইলে, ঠাকুর ব্রহ্মচারীকে অনেক বেদান্ত গ্রন্থের বিষয় বলিলেন এবং কতিপয় পুস্তকের নামোল্লেখ পূর্ব্বক তিনি (ব্রহ্মচারী) ঐ সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে ব্রহ্মচারী উহা পাঠ করেন নাই জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে (ব্রহ্মচারীকে) কলিকাতায় যাইয়া ঐ সমস্ত গ্রন্থ পাঠাইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন এবং কার্য্যতঃও তাহাই করিয়াছিলেন। এই প্রকারে ঠাকুর ব্রহ্মচারীকে কৃতার্থ করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত ধর্ম্মভাবে ভাবান্বিত ও ধর্ম্মপথের পথিক করিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান কালে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব গৌরকিশোর দাস নামক প্রেমিক এবং সিদ্ধপুরুষ বলিয়া খ্যাত জনৈক বাবাজীকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। গৌরকিশোর একটী ত্রিতল প্রকোষ্ঠে দিবারাত্রি মশারির মধ্যে থাকিয়া ভগবদ্ ভজন করিতেন। লোকসঙ্গ তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। গৌরকিশোর তাঁহার সেবকবৃন্দের নিকট ঠাকুরের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তদীয়

মহিমা তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাই, তিনি বিশুদ্ধ সখ্য-প্রেম-রসে বিভোর হইয়া গেলেন এবং অবিলম্বে তৎসমীপাগত শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেবের কণ্ঠালিঙ্গন করতঃ মুহুর্মুহুঃ মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। সেই সময় গৌরকিশোরের নয়নযুগল হইতে অবিরল প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হওয়ায়, ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ অভিসিঞ্চিত হইতে লাগিল। অতঃপর গৌর-কিশোর স্বহস্তে ঠাকুরকে কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া দিলেন এবং প্রতিদিন তাঁহার দর্শন প্রার্থনা করিলেন। তিনিও গৌরকিশোরকে আশ্বাস দিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার পর বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ গৌরকিশোরকে বলিয়াছিলেন, "ইনি বৈষ্ণব-চিহ্ন-বিবর্জ্জিত। অতএব এঁর সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করা সমীচিন নহে।" তদুত্তরে ভক্তবর গৌরকিশোর বলিয়াছিলেন, "ইনি ভক্ত নহেন, জ্ঞানী নহেন এবং প্রেমিক নহেন; ইনি ঐ তিনের অতীত। এঁর স্বরূপ তত্ত্ব এখন বল্‌বার বিষয় নহে। তোমরা জেনে রাখ, ইনি ছদ্মবেশে অবস্থান কর্‌ছেন।"

সেই সময় গৌরকিশোরের নিকট হইতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের অলৌকিক প্রভাব বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সমাজে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। গৌর-কিশোরের গুরুদেব অশীতিপর বৃদ্ধ বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ দাসও তাহা শুনিয়াছিলেন। তদবধি তিনি তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তবৎসল ঠাকুর তাঁহার অভিলাষ পূরণের মানসে বলরাম বাবুর সহিত শ্রীশ্রীরাধারমণ দর্শন করিতে যাইবার পথে নিত্যানন্দ দাসের ভজন-কুটীরে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহার কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন জানিয়া, বৃদ্ধ কম্পিত-পাদবিক্ষেপে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ঠাকুর দ্রুতপদে গমনপূর্ব্বক বৃদ্ধকে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। শ্রীশ্রীদেবের দিব্য দেহস্পর্শে নিত্যানন্দ দাসের দেহে অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ পাইল। ঠাকুরও ভাবাবেশে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে বৃদ্ধ

নিত্যানন্দ দাস কিছু মিষ্টান্ন ও ফল আনয়ন করাইয়া উহা স্বহস্তে তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিলেন। অনন্তর ঠাকুর স্থানান্তরে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, বৃদ্ধ নিত্যানন্দ দাস তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মধ্যে একজন হ'বেন। দয়া ক'রে আপনার স্বরূপ আমার নিকট প্রকাশ করুন।" এই বলিয়া বৃদ্ধ ঠাকুরের পাদপদ্মে পতিত হইয়া দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ কবিলেন. তিনিও সুমধুর বাক্যে বৃদ্ধকে অভয়দান পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিলেন। বলাবাহুল্য, এই ঘটনার পর হইতে শ্রীবৃন্দাবনেব বৈষ্ণবসমাজে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা হইতে লাগিল। তাঁহারা তাঁহাব শ্রীঅঙ্গে বৈষ্ণব চিহ্নাদি না দেখিয়া এবং কালী, কৃষ্ণ, শিব প্রভৃতি শ্রীভগবানের নাম শ্রবণমাত্র তাঁহার অদ্ভুত প্রেমাবেশে বিভোর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, তথাকার খ্যাতনামা কোন কোন বৈষ্ণব বাবাজী তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহাবা ইহাও বলিযাছিলেন যে, "অবধূত ম'শায়ের ভাব ত ভালই ; তবে তাঁর ব্যভিচারী ভক্তি।" এই কথা ঠাকুরের কর্ণগোচর হইলে, তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদেব মধ্যে জনৈক বিশিষ্ট বাবাজীকে বলিলেন, "বাবাজী ম'শাই, কালী আমাব মা, শিব আমার বাবা, গণেশ আমার ভাই, কৃষ্ণ আমার পতি। আমি কলির বৌ হ'তে পারব না, বাবাজী ম'শাই, আমি কলির বৌ হ'তে পারব না।" এই বলিয়া তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি বাবাজী মহাশয়কে বুঝাইয়া বলিলেন, "কলির বৌরা যেমন পতিলাভ ক'রে পিতামাতার কথা ভুলে যায়, আমি সেরূপ হ'তে পারি নাই ব'লে কি আমার ব্যভিচাবী ভক্তি?" ইহাতে বাবাজী মহাশয় অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহার শ্রীমুখে অদ্ভুত সমন্বয়তত্ত্ব শ্রবণান্তর তাঁহার (বাবাজী মহাশয়ের) হৃদয় হইতে প্রকৃত ধর্ম্মলাভেব অন্তরায় গোঁড়ামি ভাব অপসৃত হইল এবং শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার বিশুদ্ধা নিষ্ঠা-ভক্তি জাগ্রত হইল।

ঠাকুর এইরূপে বহু ভক্তকে যাঁহার যেই ভাব সেই ভাবে কৃপা-

দানপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবন ধামে বহু লীলাস্থল দর্শনান্তে, ভক্তগণের সহিত কাশীধামে মাতামহীর নিকট আগমন করিলেন।

নবম অধ্যায়

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥"

গীতা, ২১তি শ্লোঃ, ৭ম অঃ।

[যে যে ভক্ত দেবতারূপা মদীয় যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, অন্তর্য্যামী আমি সেই সেই ভক্তের (সেই সেই মূর্ত্তি বিষয়ক) সেই সেই শ্রদ্ধাই দৃঢ় করিয়া থাকি।]

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব মাতামহীর অনুরোধে কাশীধামে কিছুদিন বাস করিয়া কলিকাতায় পুনরাগমন করিলেন। কেদারনাথ, রামচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণ বহুদিন পরে পুনরায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন। তদনন্তর একদিন বলরাম, মনোমোহন প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। শ্রীশ্রীপরমহংস দেব সুদীর্ঘকাল পরে তাঁহাকে পাইয়া, "আহা! হারানিধি ফিরে পেলাম!" বলিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। প্রেমাবেশে তাঁহার লৌকিক আচরণ এবং বিচারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। বয়সে অনেক বড় হইলেও তিনি সাষ্টাঙ্গে ঠাকুরকে প্রণাম করিবামাত্র শিষ্টাচারের প্রতিমূর্ত্তি ঠাকুর নতজানু হইয়া তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ প্রতিনমস্কার করিয়া বিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করিলেন। তখন প্রেমানন্দে শ্রীশ্রীপরমহংস দেব কিছু মিষ্টান্ন লইয়া

নিজহস্তে ঠাকুরকে খাওয়াইতে, খাওয়াইতে ভাবাবেশে মত্ত হইয়া কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র কটিদেশ হইতে খসিয়া পড়িলেও, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। ঠাকুরের মুখপ্রক্ষালনপূর্ব্বক তাহা মুছাইয়া দিবার জন্য তিনি পরিহিত বস্ত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব জানিতে পারিলেন যে, তিনি উলঙ্গ অবস্থায় রহিয়াছেন এবং ব্যস্ততাসহকারে ভূমি হইতে স্খলিত বস্ত্রখানি উত্তোলনপূর্ব্বক পরিধান করিলেন। রামচন্দ্র, বলরাম, মনোমোহন প্রভৃতি ভক্তগণ অবাক্ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীপরমহংস দেব একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ও বয়োজ্যেষ্ঠ হ'য়েও আমাকে প্রণাম কর্‌লেন কেন?" ইহাতে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব উত্তর করিলেন, "তুই যে প্রত্যক্ষ নারায়ণ; তোকে—" বলিতে বলিতেই উচ্ছ্বসিত-ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরও আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া সমাধি-মগ্ন হইলেন। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব ব্যুত্থান লাভ করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে বলিতে লাগিলেন, "নিত্য পরমহংস, নিত্য নিত্যসিদ্ধ। তোরা একে খুব যত্নে রাখিস্; এর সর্ব্বদাই অন্তর্মুখী অবস্থা। আমি জান্‌তে পেরেছি এ কে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আরও বলিতে লাগিলেন, "নিত্য, তুই কে ব'লে দেব?" তৎশ্রবণে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব একটু বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "তা'হ'লে আমি আর এখানে আস্‌ব না।" তখন শ্রীশ্রীপরমহংসদেব একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না, না, বল্‌ব না; না, না, বল্‌ব না।" এই কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব অনেকটা শান্তি লাভ করিলেন।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় উপস্থিত হইলে, ঠাকুর ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সভক্ত আহার করিতে বসিলেন। পুনরায় দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া পরস্পর পরস্পরকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। এই সকল দেখিয়া ভক্ত-রামচন্দ্র দেহসম্পর্কে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবকে বলিলেন,

"তোমাদের উভয়ের এত ভালবাসা ; কিন্তু কাশীতে থাক্‌বার সময় একখানা চিঠি দিয়েও তো শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের খবর নিলে না !" তদুত্তরে ঠাকুর মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "চিঠি ভিন্ন এমন একটী উপায় আছে যা' দিয়ে উভয়ে উভয়ের খবর নিয়ে থাকি !" এইরূপ উত্তর শুনিয়া রামচন্দ্রের মুখে আর বাক্য নিঃসরণ হইল না।

অন্য এক দিবস শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব সমীপে গমন করেন। শ্রীশ্রীপরমহংস দেব তাঁহাকে দেখিয়াই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। হৃষ্টচিত্তে তিনি তাঁহার (শ্রীশ্রীনিত্যদেবের) বিশেষ অভ্যর্থনা করতঃ তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রী-রামকৃষ্ণদেব আদর্শচরিত্রা, পতি-সেবাপরায়ণা, অতীব ভক্তিমতী, সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সারদা দেবীকে* বলিলেন, "তুই আজ নিজের হাতে নিত্যকে খাইয়ে দে।" আজ্ঞামাত্র তিনি শ্রীশ্রীনিত্যদেবের সেবায় রত হইলেন

*শ্রীশ্রীনিত্যদেব বলিয়াছেন, "সাধনার এক অবস্থায় ধন, সম্ভ্রম ও যুবতী অনিষ্টের কারণ হইতে পারে। সিদ্ধ মহাপুরুষের ঐ তিন কিছুতেই অনিষ্ট করিতে পারে না ! সিদ্ধ পুরুষের ঐ তিন কোন মতেই প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। যিনি আত্মাতে রমণ করেন তাঁহার সামান্য ললনাতে রমণ করিবার ইচ্ছা হ'বে কেন ? প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ যে জিতেন্দ্রিয়, তিনি ঊর্দ্ধরেতা। তাঁর কি যুবতী প্রতিবন্ধক হইতে পারে ? যে সিদ্ধপুরুষের মন দাস হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত মনোবৃত্তিরূপ শক্তিরাও দাসী হইয়াছে। তিনি কি মন আর মনোবৃত্তিদের ভয় করেন ?···পরমহংস সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তিনি কিছুতেই রত নহেন।···যুবতী মণ্ডলীর মধ্যে থাকিলেও তাঁহার কোনও ক্ষতি হয় না।···" শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের জীবনের নানা ঘটনা শ্রীশ্রীনিত্যদেবের ঐ (এবং এই গ্রন্থের ৫০—৫১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত "পরমহংস"-বিষয়ক) উক্তির সমর্থক। (সাধারণ (অজ্ঞান) জীবের ন্যায় সেই দয়ার সাগর আত্মারাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাত্মবুদ্ধি, মনোমালিন্য, মনো-বিকার, ভেদজ্ঞান ও ভেদদৃষ্টি ছিল না বলিয়াই) বহু পুরুষ ভক্তও যেমন

এবং পরম ভক্তিসহকারে তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম প্রেমের বস্তু শ্রীশ্রীনিত্যদেবকে নিজ হস্তে খাওয়াইয়া দেওয়ায়, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং উল্লাসের সহিত তন্নিষ্ঠিতচিত্তা, পূতাত্মা শ্রীযুক্তা সারদাদেবীকে বলিলেন, "আজ তোর জন্ম সার্থক হ'ল!" যাহাহউক, তথায় কিছুক্ষণ থাকিবার পর ঠাকুর কলিকাতায় প্রত্যাগমনের জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব সেদিন তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিরমুক্ত, স্বেচ্ছাচারপরায়ণ, আত্মারাম শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব সে সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরমজ্ঞানী শ্রীশ্রীপরমহংসদেব তাহাতে দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট

অকুতোভয়ে তাঁহার (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের) সংস্রবে আসিতে পারিতেন, অনেক স্ত্রী-ভক্তও তেমনই নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) সঙ্গ করিতে পারিতেন। তাঁহার কৃপাবারি সকলের উপরই সমভাবে বর্ষিত হইত। তাহা না হইলে তিনি আজ অবতার বলিয়া পূজিত হইতেন না। বাস্তবিকই, শ্রীযুক্তা সারদা দেবী বিশেষভাবে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন সেবার অধিকার লাভ করিলেও সর্ব্বত্রসমদৃষ্টিসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহিত অন্য অনেক স্ত্রী-ভক্তও 'সর্ব্বপ্রকারে ও অবাধে মেলামেশা করিতে পারিতেন।' তাহা আমরা শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দের লিখিত ও মাইলাপুর-মাদ্রাজের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত 'দি বেদান্ত কেশরী' নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকার ১৯৩২-এর অক্টোবর সংখ্যার ২০২—২০৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটী প্রবন্ধ পাঠেও অবগত হই। তাহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"...যে সমস্ত মান্য-গণ্য ভদ্রপরিবারের মহিলাগণ কখনও কোথায়ও গাড়ী বা পাল্কী ব্যতীত ভ্রমণ করিতেন না তাঁহারাও ঠাকুরের (শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের) আদেশে কোন কোন সময় দ্বিধাবোধ না করিয়া দিনের বেলায় তাঁহার (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) সহিত পদব্রজে সদর রাস্তা দিয়া

না হইয়া ভক্তগণকে বলিলেন, "নিত্য মনমুখী, আমার কথাও সে গ্রাহ্য করে না।" তৎশ্রবণে ঠাকুরের মহিমা সম্বন্ধে অজ্ঞ জনৈক ভক্ত বলিলেন, "আপনি শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের অনুরোধও রক্ষা করলেন না! তিনি আপনার ভক্তি নষ্ট ক'রে দেবেন।" ইহাতে ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর দিলেন, "আমি এমন ভক্তি লাভ করতে চাই না যা' অপরের ইচ্ছায় থাকতে পারে অথবা নষ্ট হ'তে পারে।" এইরূপ উত্তর শুনিয়া সেই ভক্তপ্রবর স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সমাধি হইলে, অনেক সময় তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়বাবু তাঁহার বক্ষে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর একদিন দক্ষিণেশ্বরের প্রাঙ্গণে সমাধিমগ্ন হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। তদ্দর্শনে হৃদয়বাবু শ্রীশ্রীপরমহংসদেব তদবস্থ হইলে যেরূপ করিতেন সেইরূপ করিতে গেলে, তাঁহার জিহ্বা অর্দ্ধহস্ত পরিমিত বাহির হইয়া পড়ে। ইহাতে ভক্তগণ ভীত হইয়া শ্রীশ্রীপরমহংস-

---

গঙ্গার পার্শ্ব পর্য্যন্ত গমনান্তর নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর-কালী-মন্দিরে আগমন করিতেন।...যেইমাত্র তাঁহারা (দুই জন বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা) তাঁহার (শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের) নিকট আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, সেই মাত্র ঠাকুর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) ছোট খাট হইতে নামিয়া তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত স্ত্রী-ভক্তটীর পাশে বসিলেন। যখন তিনি (উক্ত ভদ্রমহিলা) লজ্জাবশতঃ এক পাশে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন, তখন তিনি (শ্রীশ্রীপরমহংস দেব) তাঁহাকে (স্ত্রী-ভক্তটীকে) বলিলেম, "এ লজ্জা কিসের জন্য? লজ্জা-ঘৃণা-ভয় থাকতে কিছুই লাভ হয় না। ...তুমিও যা' আমিও তাই।..."

একদিন অন্য এক জন ভদ্রমহিলা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "...আমরা বাটীর ভিতরে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলাম যে, ঠাকুর (শ্রীশ্রীপরম-হংসদেব) একটী ছোট ঘরে একটী ছোট খাটের উপর বসিয়া আছেন। নিকটে কেহই ছিল না। তিনি (শ্রীশ্রীপরমহংসদেব) আমাদিগকে

দেবকে সংবাদ দিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে দেখিলেন যে, সে সময় ঠাকুর নৃসিংহভাবে সমাধিস্থ আছেন। তাই তিনি ভক্তগণকে নৃসিংহস্তব পাঠ করিতে বলিলেন এবং হৃদয়বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার বুকে হাত দিস্ ব'লে, ওর বুকেও হাত দিয়েছিলি। এখন বোঝ্ কেমন মজা!" যাহা হউক, তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহারা উক্ত স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন এবং হৃদয়বাবুর জিহ্বা মুখাভ্যন্তরে ক্রমশঃ প্রবেশ করিল। অতঃপর তিনি স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। বলাবাহুল্য, ঠাকুরও বাহ্যদশায় আসিয়া উদাসভাবে তথায় বসিয়া রহিলেন।

এইরূপে বলরাম প্রভৃতি ভক্তগণের অনুরোধে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবও তাঁহার ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া ঠাকুরের সহিত মিলিত হইতেন। দেখিবামাত্র হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে কি কোরে এখানে (কলিকাতা-কম্বুলিয়াটোলায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মাষ্টার মহাশয়ের বাসায়) এলে?" আমরা তাঁহাকে ভক্তিভরে (সাষ্টাঙ্গে) প্রণামপূর্ব্বক সব কথা খুলিয়া বলিয়া দিলাম। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আমাদিগকে ঘরের ভিতরে বসিতে বলিলেন এবং আমাদের সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন যে, তিনি (শ্রীশ্রীপরমহংসদেব) কোনও স্ত্রীলোককে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে বা তাঁহার নিকটে যাইতে দিতেন না। আমরা যখন ইহা শুনি, তখন হাসি আর ভাবি, 'আমরা এখনও মরি নি।' তাঁহার যে কি করুণা ছিল তাহা কে জানে! তাঁহার চক্ষে পুরুষ ও স্ত্রীলোক সমান ছিল।..."

বাস্তবিকই, অবতার এবং সাধুমহাপুরুষগণের আচরণ জন্ম জন্ম জড়ে নিবদ্ধদৃষ্টি অন্ধ মানব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সে নিজস্ব মাপকাঠিতে তাঁহাদের চরিত্র বিচার ও সমালোচনা করতঃ নিজের ও অপরের অকল্যাণই সাধন করিয়া থাকে।

তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল যে, তাহা লক্ষ্য করিয়াই এক সময় শ্রীশ্রীপরমহংসদেব ভক্তগণ সমক্ষে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবকে বলিয়াছিলেন, "নিত্য, তুইও এসেছিস্? আমিও এসেছি।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের এই উক্তি শ্রবণান্তর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মাষ্টার মহাশয় বলিয়াছিলেন, "এ কথা কে বুঝ্বে ? এই কি দেব-ভাষা ?"

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব যখন রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় এক দিবস সেবক লাটু্য* আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "একজন সাহেব আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বাহিরে অপেক্ষা কর্‌ছেন।" ঠাকুরের আদেশে লাটু্য তাঁহাকে ভিতরে আনিলেন। উইলিয়ম্ নামধারী একজন ইংরাজ সেই কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক ঠাকুরকে তাঁহার অভীষ্টদেব যীশুখৃষ্টরূপে দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "Here is my Jesus (ইনিই আমার যীশু)!" এই বলিয়া তিনি ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইয়া প্রেমাশ্রুতে তাঁহার চরণযুগল বিধৌত করতঃ পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। পরম দয়াল যীশুখৃষ্টে উইলিয়ম্

*ইনি শ্রীশ্রীদেবের নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের উক্ত বাটীতে অবস্থান কালে অতীব নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবায় রত ছিলেন। শ্রীশ্রীদেবের নিষেধবশতঃ লাটু্য যে তাঁহার শিষ্য ছিলেন একথা তিনি বিশেষভাবে গোপন রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইনি ঠাকুরের কৃপায় সাধন-জীবনে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং অতি সরল ভাষায় পারদর্শিতার সহিত তত্ত্ব-মীমাংসা করিতে পারিতেন। পরে ইহাঁর নাম হইয়াছিল—স্বামী অদ্ভুতানন্দ। শ্রীশ্রীদেবের উক্ত আদেশ পালন করিলেও ইহাঁর নিত্যনিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছিল; এমন কি, কাশীর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠের দ্বিতল প্রকোষ্ঠের উপর যেখানে তদ্ব্যবহৃত খাটিয়া ও পাদুকা সুরক্ষিত ছিল, তাহারই পাশে কুলঙ্গীর ভিতরে শ্রীশ্রীদেবের একটী প্রতিমূর্ত্তি সযতনে স্থাপিত ছিল—ইহা আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম।

সাহেবের অচলা নিষ্ঠাভক্তি ছিল। সেইজন্য সর্ব্বভাবের ভাবুক শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব খৃষ্টরূপেই তাঁহাকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিলেন।

উইলিয়ম্ মালা জপ করিতেন। তাঁহার ঐকান্তিকী ইচ্ছায় ঠাকুর উহা স্পর্শ করিয়া পবিত্র করিয়া দিলেন। নানা কথাবার্ত্তার পর শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালদেব-প্রদত্ত প্রসাদিত মিষ্টান্নাদি গ্রহণপূর্ব্বক উইলিয়ম্ সানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি সাশ্রুনয়নে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অনেক সময় রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীতে ঠাকুর ভক্তগণকে লইয়া নিশীথকাল অবধি কীর্ত্তনানন্দে বিভোর থাকিতেন। তাহাতে প্রতিবেশীদের ঘুমের ব্যাঘাত হইত। তাই, তাঁহারা বিরক্তি বোধ করিতে লাগিলেন। সেইজন্য রামচন্দ্র কীর্ত্তনের সুবিধার্থে কলিকাতার সন্নিকটে একটী নির্জ্জন স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কাঁকুড়গাছীর বাগান-বাটী বিক্রয় করিবার কথা হওয়ায়, তিনি ঠাকুরের অনুমতিতে তাঁহারই অর্থে উহা নিজ নামে ক্রয় করিলেন। বাগানটী যোগ-সাধনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া ঠাকুর উহার নাম রাখিলেন 'যোগোদ্যান'। পরবর্ত্তী-কালে উহা "কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান অতিশয় নির্জ্জন বলিয়া ঠাকুর কখনও একাকী, কখনও বা ভক্তসঙ্গে তথায় কালযাপন করিতেন। এই সময় এক দিবস ঠাকুরের অশেষ কৃপায় তথাকার উড়িয়া মালী তাঁহাকে স্বীয় ইষ্ট শ্রীচৈতন্যরূপে দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে থাকে। এইরূপে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব মালীকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার পতিতপাবন নাম সার্থক করিলেন। সেই অবধি ঠাকুরের দর্শনমাত্র সে "চৈতন," "চৈতন" বলিয়া ভাবাবেশে নৃত্য করিত।

এই সময় কলিকাতা-নিবাসী অনেক যুবক ভক্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব জিলাপী খুব ভালবাসিতেন জানিয়া, তিনি একদিন

অতি যত্নসহকারে কিছু জিলাপী আনিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব দিব্যজ্ঞান প্রভাবে যুবকের কুলশীল অবগত হইয়া উহা গ্রহণ ত করিলেনই না; অধিকন্তু যে স্থানে যুবক জিলাপী রাখিয়াছিলেন তথাকার মাটী পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিয়া সেইস্থানে গোবর ও গঙ্গাজল দ্বারা পরিষ্কার করিতে বলিলেন। অবতার মহাপুরুষগণের আচরণ গভীর রহস্যময়। যে পরমহংসদেব পূর্ণ জ্ঞানী ছিলেন, যিনি প্রকৃত ভক্তিমান্ লোকের কুলশীল দেখিতেন না, তিনি যে কেন ঐ যুবকের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। যাহাহউক, পরমহংস-দেবের নিকট এইরূপে উপেক্ষিত হইয়া, যুবক প্রাণ বিসর্জ্জনের জন্য কৃত সংকল্প হইয়া গঙ্গাভিমুখে গমন করিতেছিলেন; এমন সময় অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব কোথা হইতে সহসা আসিয়া তাঁহার পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে বাধা দিলেন। তৎপর তাঁহাকে তিনি আশ্বাস দানপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি চিন্তা ক'রো না; আমি তোমায় আশ্রয় দিচ্ছি।" ঠাকুরের অপ্রাকৃত ভুবনমোহন রূপ দর্শনে এবং তাঁহার অমিয়-মাখা বাক্য শ্রবণে যুবকের সকল দুঃখ দূরীভূত হইয়া, তাঁহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দ স্ফুরিত হইল। এইভাবে অহৈতুকী কৃপা লাভ করিয়া সেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পরিত্যক্ত, পতিত যুবক অশ্রুসিক্ত নয়নে ঠাকুরের অযাচিত করুণার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর ঠাকুর তাঁহাকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার পতিতপাবন নাম সার্থক করিলেন। ইঁহার সন্ন্যাসের নাম ছিল শ্রীমৎ স্বামী কৃষ্ণানন্দ অবধূত। এক দিবস শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের নিকট এই বিষয় উত্থাপন করিয়া তদীয় ভক্তগণ বলিলেন, "আপনার পরিত্যক্ত মহাপাপীকে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-দেব অবলীলাক্রমে আশ্রয় দান ক'রেছেন।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তদুত্তরে বলিলেন, "নিত্যর সে শক্তি আছে। আমি নেব বেছে বেছে, আর নিত্য পচা গোবরে ঘুঁটে দেবে।" তাই, শ্রীশ্রীনিত্যদেবের শিষ্য, সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (গিরিশ বাবুর পুত্র দানীবাবু)

মহাশয়* এক ব্যক্তির নিকট শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের পরিচয় দিবার সময় বলিয়াছিলেন, "পরমহংসদেবের হাতে টাকা দিলে তাঁ'র হাত বেঁকে যেত; কিন্তু ইহাঁর ট্যাঁকে টাকা থাক্‌তেও ইহাঁকে সমাধিস্থ হ'তে দেখেছি।" বাস্তবিক, বস্তুবোধ থাকিতে বিধি-নিষেধ অতিক্রম করা যায় না। কিন্তু শ্রীশ্রীপরমহংসদেব লোকশিক্ষার্থ ঐরূপ আচরণ করিতেন—ভিন্ন ভিন্ন অবতারের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকলাপ দেখা যায়—ইহা যে গভীর রহস্যময় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবকে কেহ গুরুপদে বরণ করিতে চাহিলে, তিনি অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতেন এবং তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করিতে ত্রুটী করিতেন না। যশোহর জেলার অন্তঃপাতি সাধুহাটী-গ্রাম-নিবাসী অনাদিনাথ নামক জনৈক ভক্ত একদিবস শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেব সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহাতে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, "শালারা আমার সর্ব্বনাশ করতে এসেছে। ওসব আমার কাজ নয়; উহা নিত্য করবে।" এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া সেই অনাদিনাথ ম্রিয়মাণ হইলেন এবং নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যন্ত দীনভাব দেখিয়া শ্রীশ্রীপরমহংসদেব দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন, "আমি নেব বেছে বেছে,

---

*সুপ্রসিদ্ধ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রীনিত্যদেব ও শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দেখাইয়া তাঁহার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ইহাঁদের মধ্যে তোমার কাহাকে ভাল লাগে?" তাহাতে দানীবাবু বলিয়াছিলেন, "নিত্যবাবুকে।" তদনন্তর তিনি শ্রীশ্রীনিত্যদেবের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি নূতন কোনও অভিনয় করিবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার পাঠটুকু শ্রীশ্রীদেবকে শুনাইতেন এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া ষ্টেজে নামিতেন। সেইজন্য তাঁহার পাণ্ডিত্য না থাকিলেও, শ্রীশ্রীদেবের কৃপায় তিনি অভিনেতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

নিত্য পচা গোবরে ঘুঁটে দিয়ে যাবে। সে সামর্থ্য তা'র আছে। তুই তা'র নাম নিয়ত স্মরণ করিস্।" ইহার পর অনাদিনাথ গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সেই গুরু জ্ঞানানন্দ নাম নিয়ত স্মরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব তদীয় শিষ্য শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস রায়কে অনাদিনাথের নাম ও ঠিকানা দিয়া ইষ্টলাভের জন্য তাঁহাকে অবিলম্বে নবদ্বীপে আসিবার কথা লিখিয়া দিতে বলিলেন। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব ও শ্রীশ্রীনিত্যদেব দূরে অবস্থান করিলেও যেন এক অভাবনীয় শক্তিপ্রভাবে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হইত। যাহাহউক, শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব তখন নবদ্বীপে ছিলেন। যথাসময়ে অনাদিনাথ পত্রে লিখিত ঠিকানা অনুযায়ী শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের বাড়ী গিয়া ধর্ম্মদাসবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর অনাদিনাথ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের কৃপালাভ করিয়া স্বীয় ইষ্টরূপে তাঁহাকে দর্শন করেন। অনাদিনাথ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের কথা অনুসারে ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করিয়া চিরতরে নিশ্চিন্ত হইলেন।

ঠাকুরের কলিকাতায় অবস্থান কালে বাগবাজারের বলরাম বসু মহাশয় মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে স্বীয় আলয়ে আনয়নপূর্ব্বক কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইতেন। এই সময় ঠাকুরের দিব্যভাব সন্দর্শনে ভক্তগণ আত্মহারা হইয়া নিশীথকাল অবধি কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিতেন! সেইজন্য বলরামবাবুর পিতৃব্য শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর বসুর নিদ্রার ব্যাঘাত হইত বলিয়া তিনি শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেব ও ঠাকুরের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। অনেক সময় তিনি বলরাম বসু মহাশয়ের নিকট তাঁহাদের বিরুদ্ধে নানারূপ নিন্দাসূচক কথা লিখিতেন। বলরামবাবুও সেই সকল পত্র ঠাকুরকে শুনাইতেন। তৎশ্রবণে তিনি হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "পরমানন্দ, পরমানন্দ।" যাহাহউক, ইহার কিছুদিন পর একদিবস বলরামবাবুর গৃহপ্রাঙ্গণে ঠাকুর কীর্ত্তনরসে মত্ত হইয়া ভাবাবেশে মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভক্তগণও প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া কীর্ত্তন করিতে থাকেন। সেই সময়

ঘটনাচক্রে বিশ্বম্ভরবাবু কীর্ত্তনাঙ্গণে আসিয়া পড়িলেন এবং ঠাকুরের অদ্ভুত নৃত্য দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। অতঃপর ঠাকুর অঙ্গণ মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া ধীরে ধীরে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। বিশ্বম্ভর বাবু সমাধির বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। সুতরাং তিনি তদবস্থাপন্ন শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের হিমাঙ্গ দর্শনে চিন্তান্বিত হইলেন।

তখন বিশ্বম্ভর বসুর পরিচিত একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক ঘটনাক্রমে তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বম্ভরবাবুর অনুরোধে তিনি ঠাকুরের দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তৎশ্রবণে বিশ্বম্ভরবাবু শোকাকুল হইয়া পড়িলেন; কিন্তু কিছুক্ষণ পর ঠাকুরের বাহ্যচৈতন্য ফিরিয়া আসিলে ভক্তগণের আনন্দের সীমা রহিল না।

যাহাহউক, এই ঘটনার পর হইতে বিশ্বম্ভর বসু মহাশয় ঠাকুরের ও তদীয় ভক্তগণের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। বলাবাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের প্রতিও তদবধি তাঁহার আর কোন বৈরীভাব রহিল না।

অতঃপর একদিবস বিশ্বম্ভরবাবু তারকেশ্বর-শিব দর্শন করিতে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। বলরামবাবু এবং (ভাই) ভূপতিবাবু প্রভৃতি ভক্তবৃন্দও তাঁহার সহিত যাইতে সম্মত হইলেন। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসদেব তথায় আসিলেন। তখন তাঁহার গলক্ষতের কেবল সূত্রপাত হইয়াছে। বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনি আমাদের সহিত তারকেশ্বরে গেলে বিশেষ আনন্দের কারণ হয়।" শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিলেন "আমার অসুখ; আমি যেতে পারব না।" এমন সময় শতগ্রন্থিযুক্ত একখানি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, ধূলিধূসরিত-গাত্রে, ভাববিহ্বলচিত্তে, সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালদেব দিব্যজ্যোতিঃতে চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীযুক্ত তারক ঘোষাল মহাশয় (শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামী)*

*এই সময় শ্রীশ্রীদেব কোন নির্দ্দিষ্ট আশ্রম বা মঠে বাস করিতেন না।

তাঁহার সহিত ছায়ার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যাহাহউক, শ্রীশ্রীপরমহংস-দেব ঠাকুরের দর্শনমাত্র বিশ্বম্ভরবাবুকে বলিলেন, "তোমরা নিত্যকে সঙ্গে নিয়ে যাও না কেন ?" তৎশ্রবণে বিশ্বম্ভর বাবু তাঁহাকে বলিলেন, "তিনি আমাদের সঙ্গে গেলে ভালই হয়। আপনার উপদেশ অপেক্ষা তাঁ'র উপদেশ আমাদের নিকট অতি সরল ব'লে মনে হয়।" তদুত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিলেন, "হাঁ, নিত্যের কণ্ঠে সরস্বতী কিনা—সে যা ধর্‌বে তা কাঁাচ্ কাঁাচ্ ক'রে কেটে দেবে।" অতঃপর বিশ্বম্ভরবাবু শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবকে তাঁহাদের সহিত তারকেশ্বরে গমন করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের ঐকান্তিক অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তারকেশ্বরে উপনীত হইয়া সভক্ত শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি তারকেশ্বরকে স্পর্শ করিলেন এবং ভক্তগণকে তাঁহার পূজা করিতে বলিলেন। এদিকে তিনি ভাবাবেশে মন্দির পরিক্রমণ করিতে করিতে মন্দির পার্শ্বস্থ স্নান-জল-কুণ্ডের সন্নিকটে বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম কুণ্ডমধ্যে নিমজ্জিত ছিল। ভক্তগণ পূজা সমাপন করিয়া মন্দির পরিক্রমণ করিবার সময় তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন

শ্রীযুক্ত তারক ঘোষাল মহাশয় তাঁহার নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া সদাসর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন। লোক-সমাগম হইবে ভয়ে নির্জ্জনতা-প্রিয় ঠাকুর বিশেষ করিয়া তৎকালে অন্যান্য শিষ্যের ন্যায় তাঁহাকেও আদেশ করিয়াছিলেন যে, তিনি (ঘোষাল মহাশয়) তাঁহার (শ্রীশ্রীদেবের) কথা কাহাকেও যেন না বলেন। শ্রীশ্রীদেবের এই আদেশ তারকবাবু বিশেষভাবে পালন করিয়াছিলেন। তবে, তাঁহার বেলুড়মঠের প্রেসিডেণ্ট্ পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেও এবং পরেও তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ ও অন্যান্য অনেকে এ বিষয় বিশেষভাবে অবগত হওয়ায়, কোন কোন লিপিতে ইহা উল্লিখিত দেখা গিয়াছে। বলাবাহুল্য, তারক বাবু পরে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

দর্শনপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ তাঁহার চরণামৃত পান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার বাহ্যচৈতন্য ফিরিয়া আসিলে, ভক্তগণের এইপ্রকার আচরণ দেখিয়া তিনি অপ্রতিভ হইয়া গেলেন।

যাহাহউক, ভক্তগণ তারকেশ্বর দর্শনপূর্ব্বক ঠাকুরের সহিত পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের গলক্ষত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হওয়ায়, তিনি চিকিৎসার্থ কাশীপুরের উদ্যানবাটিকায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহরক্ষার সময় নিকটবর্ত্তী জানিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-দেব ঐ বাগান-বাটিকায় গমন করিলেন। অতঃপর তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের প্রকোষ্ঠে উপনীত হইয়া তাঁহার শিরপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ঠাকুরকে দর্শনপূর্ব্বক পরমহংসদেবের অতিশয় আনন্দ হইল। তখন তিনি ভক্তগণকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। ভক্তগণ বহির্গমন করিলে, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব নির্জ্জনে ঠাকুরকে বলিলেন, "নিত্য, আমি আর এ দেহ রাখ্‌ব না।" তৎশ্রবণে ঠাকুর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আপনি দেহরক্ষা কর্‌লে, বহুজীব আপনার কৃপা হ'তে বঞ্চিত হ'বে।" শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণপরমহংসদেবের সহিত আরও যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা অতিশয় গুহ্য বলিয়া ঠাকুর ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "আর যে সমস্ত কথাবার্ত্তা তাঁর সঙ্গে হ'য়েছিল, তা' আর তোমাদের নিকট ব'ল্‌ব না।" এইভাবে উভয়ে নানারূপ কথোপকথনের পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথের (শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের) নিকট কিছু ফুলচন্দন চাহিয়া লইয়া তাঁহাকে বাহিরে অবস্থান করিতে বলিলেন। ভক্তবর নরেন্দ্রনাথ বহির্গমন করিলে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই সচন্দন পুষ্প লইয়া সাশ্রুনয়নে অঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের অর্চ্চনা করিলেন। শ্রীশ্রী-নিত্যগোপালদেবও অশ্রুপূর্ণনয়নে তদর্পিত পুষ্পসমূহ লইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শ্রীঅঙ্গে প্রত্যর্পণ করিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এইরূপে শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালদেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনার পরদিনই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তিম সময় উপস্থিত

হইলে, ভক্তগণ শোকে ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ক্ষীণস্বরে তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। তিনি মৃদুস্বরে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবকে নিকটে আহ্বান করিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যদেব ভাববিহ্বল-চিত্তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমীপে দণ্ডায়মান হইবামাত্র তাঁহার শরীর হইতে একটী অপূর্ব্ব দিব্যজ্যোতিঃ আসিয়া ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে মিশিয়া গেল। বিশেষ ভাগ্যবান্ ব্যতীত অন্য কেহ এই অপূর্ব্ব বিস্ময়কর দৃশ্য দর্শনপূর্ব্বক নয়ন সার্থক করিতে পারেন নাই। শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালদেবের সহিত শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের যে এক অতি ঘনিষ্ঠ অথচ নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল, তাহা ঐ গভীর রহস্যময় ব্যাপার হইতেও অবধারণ করা যায়।

সাধুমহাপুরুষগণের শরীর চিরপবিত্র। তাই, তাঁহাদের দেহে অগ্নি-সংস্কার করিবার বিধান নাই। শাস্ত্রে বিধান আছে যে, দেহত্যাগের পর তাঁহাদের দেহের মৃৎ অথবা জল সমাধি প্রদান করিতে হয়। কিন্তু শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ভক্তগণ তাহা না করিয়া গৃহস্থাশ্রমের বিধানানুসারে তাঁহার পরম পবিত্র দেহের অগ্নি-সংস্কারের ব্যবস্থা করিলেন। যাহাহউক, শ্মশান-যাত্রার সময় ঠাকুরও শ্মশানযাত্রিদের সঙ্গে ছিলেন। পথিমধ্যে 'বসুমতী' সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রবাবুকে একটী বিষধর সর্প দংশন করিবামাত্র তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর অগ্রবর্ত্তী হইয়া উপেন্দ্রবাবুর সেই সর্পদষ্ট স্থানটী স্পর্শ করিবামাত্র তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। শ্মশানযাত্রিগণ ঠাকুরের এইরূপ অদ্ভুত প্রভাব দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের চিতাভস্ম ও অস্থি সমাধি দিবার জন্য একটী কলসীর মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু রাণী-রাসমণি-স্থাপিত দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব বাস করিলেও, তথায় বা অন্য কোথায়ও সেই কলসী সমাধি দিবার কোনরূপ সুবিধা হইল না। অবশেষে ভক্তবর রামচন্দ্র ঠাকুরকে

বলিলেন, "অস্থিভস্মপূর্ণ কলসী সমাধি দিবার স্থান আমাদের নাই। যদি তুমি তোমার 'যোগোদ্যান' আমাদের দাও, তা' হ'লে সেইখানে আমরা উহার সমাধি দিতে পারি। অবশ্য তোমার জায়গার মূল্য দিয়ে দিব।" এই কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তথায় উহার সমাধি দিবার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়* প্রফুল্লমনে ভক্তবর নরেন্দ্রের (শ্রীমৎ স্বামী

*আর্য্যশাস্ত্রে ভক্তাপরাধ অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবও নিজ আচরণের ও উপদেশের দ্বারা এ বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন। তাহা আমরা এইসঙ্গে বর্ণিত একটী ঘটনা হইতেও অবগত হই, পূর্ব্বোক্ত লাটু মহারাজ ভক্তবর রামচন্দ্র দত্ত মহারাজের অধীনে চাকরী করিতেন; তাই, প্রভু যেমন ভৃত্যকে অনেক সময় তিরস্কারাদি করিয়া থাকেন, রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও লাটু মহারাজের সহিত সেইরূপ অপমানজনক ব্যবহার করিতেন। ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যদেব দেখিলেন, লাটু মহারাজকে ভর্ৎসনাদি করায় রামবাবু তাঁহার নিকট অপরাধী আছেন—সে অপরাধ লাটু মহারাজ মার্জ্জনা না করিলে, রামবাবুর অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে (কেননা ভক্তাপরাধ ভক্ত মার্জ্জনা না করিলে, শ্রীভগবান্‌ও তাহা ক্ষমা করেন না)। তাই, শ্রীশ্রীদেব তদীয় শিষ্য লাটু মহারাজকে ঐ সম্বন্ধে যে কয়েকটী উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"প্রহ্লাদের পিতা তাঁহাকে এত যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, এত নির্য্যাতন করিয়াছিলেন; ভগবান্ নৃসিংহদেব তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে, তিনি বলিলেন, "ভগবন্, তোমাকে দেখিলাম; আমার অপর কোন্ বরের প্রয়োজন আছে? তবে পিতাকে ক্ষমা কর এবং তাঁহার যেন সদ্গতি হয়।" লাটু, রামবাবুকে তুমি পিতা বল—তিনি তোমাকে বহু তিরস্কার ও অপমান করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও।"

বিবেকানন্দের) নিকট সেই ভস্মঅস্থিপূর্ণ কলসী কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে সমাধি দিবার জন্য চাহিলে, তিনি উহা দিতে অস্বীকার করিলেন ; কারণ তাঁহাদের মধ্যে কিছু মনোমালিন্য ছিল। ভক্তবর রামচন্দ্র মর্ম্মাহত হইয়া ঠাকুরকে সমস্ত বিষয় সবিশেষ নিবেদন করিলেন। ভক্তবর নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশেষ সম্মান করিতেন ; সুতরাং রামবাবু ঠাকুরকে বলিলেন, "নরেন ত আমার কথা শুন্‌ল না। তুমি তা'কে একটু বল না কেন? সে তোমাকে ত খুব মানে, দেখি।" তখন রামবাবুর বিশেষ অনুরোধে ঠাকুর ভক্তবর নরেন্দ্রনাথের নিকট ঐ বিষয় প্রস্তাব করিলেন। তিনিও বিনা বাক্যব্যয়ে উহা রামবাবুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। এইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মঅস্থিপূর্ণ কলসী ভক্তবর রামচন্দ্র মহাসমারোহে কাঁকুড়গাছীতে সমাধিস্থ করিলেন। তখন ভক্তবর রামচন্দ্র জানিতে পারিলেন, এই কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সমাধি হইবে জানিতে পারিয়াই ভবিষ্যদ্দর্শী শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব এই বাগান-বাটী নিজ অর্থে রামবাবুর নামে বেনামী করিয়া ক্রয় করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের অস্থি সমাধির পর কিয়ৎকাল ঠাকুর যোগোদ্যানেই বাস করেন। সেই সময় কলিকাতা-নিবাসী অনেক ভক্তিমান্ ব্যক্তি তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহার অমূল্য উপদেশাদি শ্রবণে এবং শ্রীভগবানের নামলীলা কীর্ত্তনে তাঁহার দিব্যভাব ও অপূর্ব্ব সমাধি-মণ্ডিত রূপদর্শনে তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে আকৃষ্ট হইবার বিশেষ কারণও ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বদাই ধূলিধূসরিত-গাত্রে অবধূতবেশে অবস্থান করিতেন। পরিধানে একখানি মাত্র মলিন বস্ত্র—তাহাও শতগ্রন্থিযুক্ত ; সকল ঋতুতে সমভাবে উহার অঞ্চলভাগ দ্বারা গলদেশ পরিবেষ্টিত ও রক্তাভ বক্ষঃস্থল আচ্ছাদিত থাকিত ; তথাপি তাঁহার অপ্রাকৃত কনকোজ্জ্বল অঙ্গের আভায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইত। অরুণ অধরে মৃদু মধুর হাসি, অমল-কমল শ্রীমুখমণ্ডলের অপরূপ শোভা বৃদ্ধি করিত। আকর্ণবিস্তৃত প্রেমবিহ্বল অরুণিত ঢুলুঢুলু নয়নযুগল

হইতে প্রেমাশ্রু-ধারা বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিত। এতদ্ব্যতীত শ্রীমুখ সুললিত-বচন-সুধা-বর্ষণ করিত। আজানুলম্বিত বাহুযুগলে অঙ্গুলিসমূহ চম্পক-কলিকাবৎ শোভা পাইত। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশসমন্বিত, রক্তোৎপল-বিনিন্দিত পদে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় যখন ধীর গতিতে শ্রীশ্রীঠাকুর চলিতেন, তখন তাঁহার সুকোমল সুঠাম অঙ্গের সৌষ্ঠব দর্শন করতঃ সকলেই অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। এই অপূর্ব্ব রূপ যিনি একবার দর্শন করিতেন, তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তাই, অনেক ভক্ত তাঁহার রূপে ও গুণে মোহিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাখালবাবু (শ্রীমৎস্বামী ব্রহ্মানন্দ), নরেনবাবু (শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ), উপেনবাবু প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আসন গ্রহণের নিমিত্ত শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঠাকুর তদুত্তরে তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা যাঁ'কে গুরু ব'লে বরণ ক'রেছ, তাঁর আসনে আর কা'কেও বসিয়ো না। তাঁর উপরই ভক্তিশ্রদ্ধা রেখে, যখন যা'তে তাঁর প্রচার হয়, তখন তা'ই ক'রো।" কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা কিছুতেই প্রবোধ না মানায় তিনি তাঁহাদের মঙ্গলার্থে অনতি-বিলম্বে কাশীধামে প্রস্থান করাই স্থির করিলেন। যাহাহউক, লোকশিক্ষার্থে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ভক্তগণের গুরুভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। প্রকৃত ধর্ম্মাচার্য্যগণ এইরূপ করিয়া থাকেন—ইহাই তাঁহাদের মাহাত্ম্য।

একদিন গিরীশবাবু তাঁহার ভ্রাতা অতুলবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি নিত্যবাবুকে এত শ্রদ্ধাভক্তি কর কেন এবং মাতাঠাকুরাণীকে (শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের স্ত্রীকে) একবারও দেখ্‌তে যাও না কেন ?" তদুত্তরে অতুলবাবু বলিয়াছিলেন, "বল্‌তে কি ? নিত্যবাবু জগন্নাথ ও পরমহংসদেব বলরামের অবতার এবং মাতাঠাকুরাণী তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া সুভদ্রার মত টিম্‌টিম্ কর্‌ছেন।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষালমহাশয় নামে জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীনিত্যদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিতেন। তিনি সুদীর্ঘ ছয় বৎসর এরূপভাবে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এক সময় তারকনাথ ঘোষালমহাশয়ের ইচ্ছা হইল যে, তিনি শ্মশানে বসিয়া জপ করেন ; কিন্তু একাকী যাইতে সাহস হইল না। একদিন তিনি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের সহিত নিমতলার ঘাটে গিয়া জপ করিতে বসেন। ঠাকুর তারকবাবুর দশ বার হাত অন্তরে বসিয়া রহিলেন। তারকবাবু কিছুক্ষণ জপ করিবার পর ঠাকুরকে কহিলেন, "ওগো, তুমি এসো গো! আমার গা ঘেঁসে কে যেন চ'লে যাচ্ছে।" শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব কহিলেন, "আমি এখানে আছি ; ভয় কি? জপ কর।" তারকবাবু ভয়ে বিহ্বল হইয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়া কহিলেন, "না, না, চলুন ; এখান হ'তে চলুন।" ঠাকুর কহিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে শ্মশানে জপ করতে নিষেধ ক'রেছিলাম।" যাহাহউক, ঠাকুরের পাশে বসিয়াই তিনি নিরুদ্বিগ্ন হইলেন।

এক সময়ে ভক্তবর গিরীশচন্দ্র ঘোষমহাশয় ধ্যান করিতে বসিলেই শ্রীশ্রীনিত্যদেবের মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি কোনওক্রমেই শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের মূর্ত্তি হৃদয়ে আনিতে পারিলেন না। কেবলমাত্র দেখিলেন, দূর হইতে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে বাধ্য হইয়া আসন হইতে উঠিয়া সহোদর অতুলবাবুকে তিনি বলিলেন, "আজ কি ভূতের উৎপাৎটাই হয়েছিল! কিছুতেই ধ্যান করতে পারলাম না!" তিনি বলিলেন, "সে কি! ভগবানের নামে ভূত পালায়, আর তুমি কিনা বলছ যে, তাঁর নামের সময় ভূতের উৎপাৎ! কি হ'য়েছিল?" গিরীশবাবু আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিলেন। তাহা শুনিয়া অতুলবাবু বলিলেন, "তোমার ইহা বুঝা উচিত ছিল—শ্রীশ্রীপরমহংসদেব অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে বলছিলেন, 'এতদিন তুমি যে আমাকে ধ্যান ক'রেছ,

তার সিদ্ধিস্বরূপ তোমার হৃদয়ে আজ নিত্যচন্দ্রের উদয় হ'য়েছে।" অতুলবাবুর কথা শুনিয়া গিরীশবাবুর ভ্রম অপনীত হইল। ইহার পর গিরীশবাবু একদিন প্রত্যক্ষ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের চরণ ধরিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি যত গোপন থাকুন, আমার নাম গিরীশ ঘোষ; আমি জেনেছি আপনি কে!" এইকথা শ্রবণমাত্র শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব বলিলেন, "আর আমার নামও নিত্যগোপাল। পরে দেখা যা'বে কি জেনেছিস্ আমাকে!" তদবধি শ্রীশ্রীনিত্যদেবের মহিমা তিনি আরও সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তাই, স্বীয় পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষমহাশয়কে ও কন্যাপ্রভৃতিকেও শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণপূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

এই সময় গিরীশবাবুর জনৈক বাল্যবন্ধু (পরাণবাবু) একদিন গিরীশবাবুকে বলিলেন, "তোমরা সকলে ত আশ্রয়ে গেলে; আমি কোথায় দাঁড়াই, বল দেখি!" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "তুমি নিত্যবাবুর শরণাপন্ন হও। তিনি ব্যতীত তোমাকে আশ্রয় দিতে অন্য কেহ সক্ষম নন্।" গিরীশবাবু যেমন গাঞ্জকা, সিদ্ধি ও মদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, পরাণবাবুও তদপেক্ষা কোন অংশে কম ছিলেন না; বরং অনেক বিষয়ে তিনি তাঁহাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ব্যঙ্গ করিয়া অনেক সময় তিনি "Great goose"-এর (বড় (পরম) হংসের) দল পর্য্যন্ত বলিতেন; কিন্তু অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু, অধমতারণ, পতিতপাবন শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের হৃদয় পতিতের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল। তাই, পরাণবাবুর ন্যায় পাতকীর প্রার্থনা তিনি উপেক্ষা না করিয়া স্বীয় রাতুলচরণে তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করতঃ তাঁহার পাপকালিমা একেবারে বিধৌত করিয়া দিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের কৃপাপ্রভাবে তিনি অচিরেই পরমসাত্ত্বিক সাধকের চরম লক্ষ্য যে সন্ন্যাসধর্ম্ম, তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক 'শ্রীমৎস্বামী গোবিন্দানন্দ পরিব্রাজক' নামে অভিহিত হইলেন। অতঃপর তিনি পদব্রজে সমস্ত তীর্থভ্রমণপূর্ব্বক ঠাকুরের অপার

মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়াচার্য্য ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব সমস্ত ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। এক দিবস তিনি ফৌজ্‌দারী বালাখানার মস্‌জিদের নিকট দিয়া গমন করিবার সময় কোরাণপাঠ শ্রবণ করিয়া মস্‌জিদভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু হিন্দু বলিয়া মুসলমানেরা তাঁহাকে মস্‌জিদে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায়, তিনি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া কোরাণ-পাঠ-শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কোরাণের দুই একটী পবিত্র ঈশ্বরবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ঠাকুর তথায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে সমবেত জনমণ্ডলী বলিতে লাগিলেন, "ইনিই প্রকৃত মুসলমান্।" শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব বলিতেন, 'জগতের সমস্ত ধর্ম্মমতই সত্য ; প্রত্যেক মতেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তমহাশয়ের বাটীতে আগমনের কিছুকাল পরে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া একেবারেই উত্থানশক্তি রহিত হইলেন এবং চিকিৎসকগণ পর্য্যন্ত তাঁহার আরোগ্য লাভ সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন ; কিন্তু সেই মুমূর্ষু অবস্থাতেও এক গভীর রজনীতে যখন রাজপথ হইতে কীর্ত্তনধ্বনি হঠাৎ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তখন কোথায় গেল তাঁহার দুরারোগ্য ব্যাধি, আর কোথায় গেল তাঁহার উত্থানশক্তি-রাহিত্য। তিনি ভাবাবেশে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইলেন এবং পরে সমাধিস্থ হইলেন। ইহাতে ভক্তগণ তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভগবল্লীলা মানব-বুদ্ধির অগোচর, কেন না এই ঘটনার পর হইতে তিনি ভক্তগণের বিশেষ সেবা-শুশ্রূষায় অল্পকাল মধ্যেই কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি কাশীধামে যাত্রা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভক্তগণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব তাঁহাদিগকে মধুর সম্ভাষণে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কাশীধামে গমন করিলেন।

দশম অধ্যায়

কাশীধামে পুনরবস্থান

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥"
গীতা, ১৫শ শ্লোঃ, ৭ম অঃ।

[মূঢ়, নরাধম ও দুষ্কর্ম্মকারীগণ মায়ার দ্বারা অপহৃত-জ্ঞান, ও আসুরভাব (দম্ভদর্পাভিমানাদি) প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা করে না।]

কাশীধামে গমনান্তর শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব বৃদ্ধা মাতামহীর আগ্রহাতিশয্যে গণেশ-মহল্লায় তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় প্রসন্নময়ী-নাম্নী তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয়া মাতুলানী তাঁহার মাতামহীর সঙ্গে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিলেন।

তথায় অবস্থানকালে তিনি একটী নির্জ্জন কক্ষে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতেন। মাতামহী নিয়মপূর্ব্বক উক্ত কক্ষে তাঁহার আহার্য্য রাখিয়া আসিতেন। তিনি সুবিধামত আহার করিতেন। এই সময় ঠাকুরের বিনা অনুমতিতে অন্য কেহই তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। তিনি অধিকাংশ সময় তথায় এরূপ ভাব-বিহ্বল অবস্থায় অতিবাহিত করিতেন যে, প্রায়ই নির্দ্দিষ্ট কালে তাঁহার আহারাদি হইত না। সময় সময় তিনি এরূপ সমাধি-মগ্ন হইয়া থাকিতেন যে, দশ বার দিন জলপান পর্য্যন্ত করিতেন না। সেই নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে অবস্থানকালে

তিনি 'সর্ব্ববর্ম্মসমন্বয়ের' ভিত্তিস্বরূপ বহু অমূল্য গ্রন্থ জগতের কল্যাণার্থ রচনা করিয়াছিলেন।

এই সময় শিবসুন্দরী-নাম্নী জনৈকা উচ্চবংশীয়া বিধবা রমণী তথায় বাস করিতেন। তিনি শ্রীশ্রীনিত্যধনের সন্ধান পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীযুক্তরাম দত্তমহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রী-রামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীনিত্যদেবকে তিনি দর্শন করেন। তখন শ্রীশ্রীমদবধূত-দেব এরূপ ভগবৎ-প্রেমে বিভোর থাকিতেন যে, তাঁহার বাহ্যচৈতন্য পর্য্যন্ত থাকিত না। তদ্দর্শনে তিনি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবকে বাৎসল্য-ভাবে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন।

উক্ত শিবসুন্দরীর ডাক্তার শ্রীযুক্তপ্রিয়লাল বসু নামে এক ভগিনী-পুত্র ছিলেন। তাঁহারই সহায়তায় ডাক্তারবাবু শ্রীশ্রীনিত্যসঙ্গ লাভ করিয়া ঠাকুরের সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই সময়েই শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র পাণ্ডা নামে রাণীগঞ্জ-নিবাসী জনৈক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণও ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। তাঁহারা উভয়ে তদীয় উপদেশ লাভে ও অনেক সময় তাঁহার মহাভাব ও নির্ব্বিকল্প-সমাধি দর্শনে কৃতার্থ হইতেন। এইরূপে আরও বহু ভক্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তদীয় মধুর উপদেশ শ্রবণে অতীব তৃপ্তিলাভ করিতেন।

ঠাকুর নির্জ্জন কক্ষে একাকী অবস্থান করিলেও সময় সময় ভক্ত-গণের আগ্রহাতিশয্যে বাহিরে আসিতেন। ভক্তগণ তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শ্রবণে পরমশান্তি লাভ করিতেন এবং তাঁহার সদ্যপ্রস্ফুটিত-কমল-সদৃশ উজ্জ্বল বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। তাঁহাদের সহিত ভগবৎ-প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে, তিনি সময় সময় এরূপ সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহার দেহবোধ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইত। ইহা অবগত হইয়া ক্রমে ক্রমে বহু ভক্ত তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন। তাঁহার এরূপ মুহুর্মুহুঃ সমাধি দর্শনে কোন কোন ভক্তের সংশয় উপস্থিত হইল। এই সংশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া ডাক্তার

প্রিয়বাবু একদিন ঠাকুরের সমাধি-অবস্থায় একখণ্ড জলন্ত অঙ্গার তাঁহার সুকোমল অঙ্গে চাপিয়া ধরিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোমল অঙ্গ দগ্ধ হইলেও সমাধিমগ্ন শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের কিঞ্চিন্মাত্র চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হইল না! তাঁহার মুখমণ্ডলে কষ্টের চিহ্নমাত্র পরিদৃষ্ট হইল না; তাহা পূর্ব্ববৎ উজ্জ্বল রহিল। তদ্দর্শনে ডাক্তারবাবুর অনুতাপের ও লজ্জার সীমা রহিল না। তিনি সেই জলন্ত অঙ্গার-খণ্ড শ্রীশ্রীনিত্যদেহ হইতে অপসৃত করিয়া কৃতকর্ম্মের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব সমাধি হইতে ব্যুত্থান লাভ করিবার পর তদীয় দেহের সেই ক্ষতস্থান সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রসন্নমুখে ভক্তগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এরূপ পাপাচারীর প্রতি তাঁহার অশেষ করুণা দর্শনে প্রিয়বাবু-প্রমুখ পরীক্ষকগণ অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। একদিন ঠাকুর তৈলমর্দ্দনের সময় ডাক্তার প্রিয়বাবুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "দেখ ত, প্রিয়বাবু, ও জায়গাটায় কি হ'য়েছে? বেদনা বোধ হ'চ্ছে কেন?" এই প্রশ্নে প্রিয়বাবু মরমে মরিয়া গেলেন এবং স্বীয় নিষ্ঠুর আচরণের বিষয় পূর্ব্বাপর সমস্ত প্রকাশ করিয়া কাতরতার সহিত বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরমদয়াল ঠাকুর প্রিয়বাবুকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "প্রিয়বাবু, তুমি এতে কিছুমাত্র দুঃখ ক'রো না। তুমি নিমিত্তমাত্র, পরমকারুণিক পরমেশ্বর তোমাকে দিয়ে আমার তিতিক্ষার পরীক্ষা কর্‌লেন। তাঁহার কৃপায় আমার কিঞ্চিন্মাত্র কষ্টবোধ হয় নাই।" প্রিয়বাবু তাঁহার এই ঘোরতর দুষ্কর্ম্মের অহেতুকী ক্ষমা লাভ করিয়া চিরকৃতজ্ঞ রহিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কোন কোন সংশয়াত্মা ঠাকুরের ভাবাবেশ অবস্থায় সেই দিব্যদেহে সূচি বিদ্ধ পর্য্যন্ত করিত।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের গণেশ-মহল্লায় অবস্থানকালে বাঁকুড়া-

জেলা-নিবাসী, নিত্যপদাশ্রিত, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্তনগেন্দ্রনাথ সেনমহাশয়ের ঠাকুরই ধ্যান ও জ্ঞান ছিলেন। তিনি বাটীতে থাকা-কালীন অনেক সময় উদাস দৃষ্টিতে আকাশপানে চাহিয়া ঠাকুরের ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। সময় সময় পশ্চিমদিকে গতিশীল মেঘ দর্শনে, "ঐ মেঘ কাশী পানে যায়!" বলিয়া ঠাকুরের বিরহে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতেন। আবার কাশীধাম হইতে লিখিত শ্রীশ্রীনিত্যদেবের পত্র পাইলে পিওনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুরস্কৃত করিয়া বিরহানল কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিতেন। এরূপ প্রেম জগতে বিরল; কেবলমাত্র বৃন্দাবনের আদর্শ-চরিত্রা, কৃষ্ণগত-প্রাণা ব্রজ-ললনাগণের মধ্যেই দেখা যাইত। শ্রীযুক্তনগেনবাবুর গুরু-নিষ্ঠা-পরিচায়ক আরও দুইটী ঘটনা এই সঙ্গে লিপিবদ্ধ হইল। এক সময় শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের পরমপবিত্র পাদুকাযুগল নগেনবাবু নিজ মস্তকদ্বারা স্পর্শ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জনৈক ভক্ত তাহাতে কর্কশ ভাষা প্রয়োগপূর্ব্বক বাধা দিয়াছিলেন। ইহাতে নগেন-বাবুর প্রাণে এরূপ আঘাত লাগিয়াছিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ কাশী-যাত্রা করেন। তথায় যাইয়া তাঁহার আরাধ্যতম-ইষ্টদেব-ঠাকুরকে সকাতরে বলিয়াছিলেন, "কৃপা ক'রে পাদুকাসহ আপনার শ্রীচরণ আমার মস্তকে এইক্ষণেই স্থাপন করুন।" ইহা শুনিয়া অন্তর্য্যামী ঠাকুর হাস্য করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন।

অন্য একদিন জনৈক নিত্য-দ্বেষী ব্যক্তি নগেনবাবুর নিকট তাঁহার পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের অন্যায়ভাবে নিন্দা করেন। ইহা শুনিবামাত্র নগেনবাবু ঐ নিন্দাকারীর দিকে পিছন ফিরিয়াছিলেন এবং জীবনে আর তাহার মুখ-দর্শন করেন নাই। এই উদাহরণ প্রত্যেক শিষ্যেরই অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। বলাবাহুল্য যে, সুবিধা পাইলেই নগেনবাবু শ্রীশ্রীনিত্য-পদারবিন্দের মধুপান করিতে গমন করিতেন। নিত্য-গৃহের দ্বার তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। তাই, তিনি একদা নিশীথকালে শ্রীশ্রীমদবধূতদেব কাশীধামে যে কক্ষে অবস্থান করিতেন সেই কক্ষে প্রবেশ

করিয়া দেখেন যে, শ্রীঅঙ্গ হইতে নির্গত দিব্যালোকে কক্ষটি উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং এক অপূর্ব্ব দিব্যগন্ধ চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে। ঈদৃশ দিব্যদর্শন ও দিব্যানুভূতিতে নগেনবাবু বিস্ময়াভিভূত, এমন কি, আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে ঠাকুর জাগরিত হইয়া নগেন্দ্রনাথের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও যথোচিত উত্তর প্রদান করিয়া ঐ দিব্যগন্ধাদির বিষয় জানিতে চাহিলেন। তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "তোমার উপর শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা আছে; তাই, তোমার ঐ সমস্ত দর্শন ও অনুভূতি হ'য়েছে। যা'হোক, এ সমস্ত অনুভূতির বিষয় যা'কে তা'কে বল্‌তে নাই।" এইরূপ বাক্যালাপের পর তিনি নগেন্দ্রনাথকে বিশ্রাম করিতে বলায়, নগেন্দ্রনাথও তদনুসারে শয়ন করিতে গমন করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের মাতামহী আনন্দময়ী দেবীর গুরুতর পীড়া হইল। ক্রমশঃ তাঁহার মুমূর্ষু দশা উপস্থিত হইল দেখিয়া, শ্রীশ্রীনিত্যদেব নিকটে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে তারকব্রহ্ম নাম করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা সজ্ঞানে কহিলেন, "মা অন্নপূর্ণা, বাবা বিশ্বেশ্বর এসেছেন; গোপাল, তুমি আমাকে স্পর্শ ক'রে আছ—মহাপ্রস্থানের এই সুবর্ণ সুযোগ—বাবা গোপাল, আমায় বিদায় দাও।" এই বলিতে বলিতে আনন্দময়ী ১২৯১ সালের ২৬শে পৌষ বুধবার সন্ধ্যাকালে শুক্লাষ্টমী তিথিতে মানব-লীলা সংবরণ করিলেন। পরমজ্ঞানী, সংসার এবং তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ও বিধিনিষেধের অধীশ্বর হইলেও, মাতামহীর ইচ্ছাপূরণার্থ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব তাঁহার পারলৌকিক কার্য্যাদি যথারীতি সুসম্পন্ন করিলেন।

মাতামহীর নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির পর মাতুলানী প্রসন্নময়ী সাগ্রহে নিত্য-সেবায় আত্মসমর্পণ করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তৎকালে ঠাকুর নির্জ্জন কক্ষে একাকী অবস্থানপূর্ব্বক ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া, সুললিত ভাষায় পরমোদার, সমন্বয়মূলক, গম্ভীর-ধর্ম্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যাপৃত

থাকিতেন। আহারাদি বিষয়ে পর্য্যন্ত সে সময় তিনি একেবারে উদাসীন ছিলেন। সেইজন্য সময় সময় প্রসন্নময়ী জানালার ভিতর দিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতেন।

অতঃপর শিবসুন্দরী-নাম্নী জনৈকা পুত্রশোকাতুরা, বিধবা রমণী (যাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) তথায় আগমন করেন। তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিবামাত্র পুত্রশোক ভুলিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। স্নেহাধিক্য বশতঃ ঠাকুরের সেবাশুশ্রূষার জন্য তিনি মাতুলানী প্রসন্নময়ীর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি ঠাকুরকে কখনই চক্ষুর অন্তরাল হইতে দিতেন না। এমন কি, ঠাকুর যখন স্নানের জন্য গঙ্গায় যাইতেন, তখনও তিনি তাঁহার অনুসরণ করিতেন। একদা শ্রীশ্রীনিত্যদেব স্নানের নিমিত্ত দশাশ্বমেধ ঘাটে গমন করিলেন। তথা হইতে তিনি রাজঘাটের দিকে ভাববিহ্বল-চিত্তে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন। তদ্দর্শনে শিবসুন্দরী অগত্যা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। পরমকারুণিক ঠাকুর, শিবসুন্দরী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন বুঝিতে পারিয়া, স্নানার্থ গঙ্গায় অবতরণ করিলেন। তাহাতে শিবসুন্দরী শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া স্নেহাধিক্য বশতঃ তাঁহার প্রতি কপট ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-স্বভাব ঠাকুর তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্নানসমাপনান্তে তিনি তীরে দণ্ডায়মান হইলে, জনৈকা অপরিচিতা ব্রাহ্মণপত্নী পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার চরণযুগল গঙ্গাবারিতে ধৌত করিয়া দিলেন। এদিকে ঠাকুরের অপূর্ব্বরূপ-সম্ভার ও ক্রিয়াকলাপ সন্দর্শনে একজন নিষ্ঠাবান্ সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে গণেশ-মহল্লায় ঠাকুরের বাসস্থানে গমনপূর্ব্বক স্বহস্তস্থিত পুষ্প ও গঙ্গাবারি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। তদনন্তর কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন তাঁহাকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে কয়েক বৎসর কাশীধামে অবস্থান করিবার পর অনাদি নামক জনৈক পাণ্ডিত্যাভিমানী কুতার্কিক প্রেম-ভক্তি-জ্ঞানের ঘনীভূত মূর্ত্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের অদ্ভুত ভাব-মহাভাবের বিষয় অবগত হইলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। ঠাকুরের সহিত তর্ক করিবার মানসে কপটতাপূর্ণ, বিনয়-নম্র বচনে তিনি প্রিয়বাবুর নিকট শ্রীশ্রীমদবধূতদেবের সহিত সাক্ষাৎকারের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ভক্ত প্রিয়লাল তাঁহার সহিত বাক্যালাপে মুগ্ধ হইয়া ঠাকুরকে অনাদির বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। করুণাময় ঠাকুর তাঁহার অনুরোধে অনাদিকে দর্শন দিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর শ্রীমুখনিঃসৃত-উপদেশামৃত-পানে ভক্তগণ বিভোর হইয়া আছেন, এমন সময় অনাদিনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের সৌম্য, গম্ভীর, তেজঃ-ব্যঞ্জক বদনমণ্ডল দর্শনে তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং স্বীয় কু-অভিসন্ধির কথা একেবারেই বিস্মৃত হইলেন। অনন্যমনে তিনি কেবল ঠাকুরের উপদেশাবলী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর অন্তর্য্যামী শ্রীশ্রীমদবধূতদেব স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অনাদির অভীষ্ট বিষয়গুলির প্রবর্ত্তন করিলেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রসমূহ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। ইহাতে অনাদির পাণ্ডিত্যাভিমান চিরতরে বিদূরিত হইল। তিনি ঠাকুরের কৃপায় অপূর্ব্ব ভক্তিভাবে বিগলিত হইলেন এবং প্রকৃত ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাণীগঞ্জ-নিবাসী নিত্যভক্ত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র পাণ্ডামহাশয়ের বিনয়ী ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, বেদান্ত-শিক্ষার্থী শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক আত্মীয় ঠাকুরের দর্শনাভিলাষে পাণ্ডামহাশয়ের সহিত তদীয় বাসভবনে গমন করেন। তখন শ্রীশ্রীমদবধূতদেব প্রসারিত হস্তে সমাধিমগ্ন ছিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীযুক্ত পাণ্ডামহাশয় শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথকে তাঁহার ক্রোড়দেশে স্থাপন করিলেন। ইহাতে শম্ভুবাবুর আনন্দের সীমা রহিল না। ঠাকুরের কৃপায় তিনিও সমাধিমগ্ন হইয়া গেলেন। অনন্তর ঠাকুরের

ইচ্ছায় শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ভক্তবর অত্যন্ত মনোদুঃখে শ্রীশ্রীমদবধূতদেবকে বলিলেন, "আমি ত বেশ আনন্দে মগ্ন ছিলাম। আমাকে আবার এই দুঃখের মধ্যে আন্‌লেন কেন?" অতঃপর ঠাকুর তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক সেদিনের জন্য ভক্তগণকে বিদায় দিলেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঠাকুরের অপূর্ব্ব লীলা-কাহিনী লোকপরম্পরায় অনেকেই অবগত হইতে লাগিলেন। তন্মধ্যে চিন্তামণি নামক একজন শ্রদ্ধাবান্ যুবকেরও তাহা কর্ণগোচর হইল। তিনি ঠাকুরের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু চতুরশিরোমণি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-দেব ভক্ত চিন্তামণির গভীর ব্যাকুলতা জগতে প্রকাশ করিবার নিমিত্তই যেন তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে অনিচ্ছা দেখাইতে লাগিলেন। উমেশ, প্রিয়লাল প্রমুখ ভক্তগণ তাঁহার এই অভিনব-লীলা-মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, ভক্ত চিন্তামণি যাহাতে ঠাকুরের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হন, তজ্জন্য একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ঠাকুর যে গৃহের মধ্য দিয়া গঙ্গাস্নানার্থ গমনাগমন করিতেন, তাঁহারা ভক্ত চিন্তামণিকে তথায় উপবিষ্ট থাকিতে বলিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভক্ত-বরের সম্মুখ দিয়া ঠাকুর কয়েকদিন গঙ্গায় গমনাগমন করিলেও তিনি তদ্দর্শনে সমর্থ হইলেন না! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অন্যান্য ভক্তগণ সেই সময় ঠাকুরের দর্শন ও সঙ্গসুখ লাভ করিলেও, একই সময় একই স্থানে অবস্থান সত্ত্বেও ভক্ত চিন্তামণির নিকট তিনি অদৃশ্য রহিলেন! এই ঘটনার পরের দিন ঠাকুর ভক্ত চিন্তামণির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কত পরিচিত বন্ধুর ন্যায় তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন। তথাপি ভক্ত চিন্তামণি বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনিই তাঁহার বাঞ্ছিত ধন। অবশেষে তাঁহার ব্যাকুলতার মাত্রা সীমা অতিক্রম করিয়া গেল; তখন তাঁহার আকুল ক্রন্দনে দয়াপরবশ হইয়া পরমকারুণিক ঠাকুর একদিন তাঁহাকে নিজেই দর্শন দিয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিলেন।

ঘটনাক্রমে বিন্ধ্যাচল-নিবাসী জনৈক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ঠাকুরের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে কাশীধামে আগমন করেন। ঠাকুর প্রিয়বাবুর মুখে সেই কথা শুনিয়া তাঁহা দ্বারা ভক্তবরকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, বিন্ধ্যাচলেই তাঁহার দর্শন লাভ হইবে। বলা-বাহুল্য, ভক্তবর সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, বিন্ধ্যাচলে প্রত্যা-বর্ত্তনান্তর গঙ্গাতীরে একটী নির্জ্জন স্থানে অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কিছুদিন সাধনা করিতে করিতে, তিনি একদা অকস্মাৎ দিব্যজ্যোতির্ম্ময় নিত্য-রূপ দর্শন করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইলেন। তাঁহার এই দিব্যদর্শনের বিষয় পূর্ব্বনির্দ্দেশ অনুসারে তিনি প্রিয়বাবুকে পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু যেদিন যে সময় বিন্ধ্যাচল-নিবাসী ভক্তবর ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, সেইদিন সেই সময় ঠাকুর কাশীতেই উপস্থিত ছিলেন। অদ্ভুত-কর্ম্মা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের এই অপূর্ব্ব লীলা শ্রবণ করিয়া প্রিয়বাবু প্রমুখ ভক্তগণ আনন্দে ও বিস্ময়ে যুগপৎ অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

অতঃপর ঠাকুর কতিপয় দিবস দুর্গাবাড়ীর সমীপবর্ত্তী একটী গৃহে বাস করিতেছিলেন; সেই সময় ভূপতিবাবু নামক জনৈক ভক্ত আরও কয়েকজন ভক্ত সমভিব্যাহারে ঠাকুরের দর্শন লালসায় তথায় গমন করেন, এবং বেলা দ্বিপ্রহরের পর তাঁহার দর্শন লাভ হইল। তন্মধ্যে জনৈক ভক্ত মধুর সঙ্গীত দ্বারা ঠাকুরের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরও কালী, কৃষ্ণ, শিব ও দুর্গা প্রভৃতি নানা নামের ও নানাভাবের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সেই সেই ভাবে ভাবান্বিত হইলেন; এমন কি, তাঁহার কনকোজ্জ্বল বর্ণ পর্য্যন্ত উক্ত দেবদেবীর বর্ণে পরিণত হইতে লাগিল। ঠাকুরের এই অপূর্ব্ব যোগৈশ্বর্য্য দর্শনে ভক্তগণ মুগ্ধ হইয়া রহিলেন।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব অতীব ভক্তবৎসল ছিলেন। তাঁহার প্রিয় ভক্ত উমেশচন্দ্র পাণ্ডামহাশয়ের পুত্র চারি বৎসর বয়ঃক্রম-কালে কলেরা রোগে শয্যাশায়ী হইলে, ডাক্তারগণ তাহার জীবনের আশা

ত্যাগ করেন। তৎশ্রবণে শোকাকুল-চিত্তে ভক্তপ্রবর শম্ভুনাথ ব্যাকুল হৃদয়ে তাহার আরোগ্য প্রার্থনা করিতে করিতে ঠাকুরের সমীপে গমন করিলেন। অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঅবধূতদেব জানালার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া শোকার্ত্ত শম্ভুনাথকে বলিলেন, "উমেশবাবুর পুত্রের জীবন নিশ্চয় রক্ষা হ'বে, কোনও ভয় নাই।" ইহাতে আশ্বস্ত হইয়া শ্রীযুক্ত শম্ভুবাবু পাণ্ডা-মহাশয়ের গৃহে গমনান্তর দেখিতে পাইলেন যে, বাস্তবিকই বিনা চিকিৎসায় তাঁহার পুত্র ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছে।

অন্য একদিন ডাক্তার প্রিয়লালবাবুর স্ত্রী স্বামীর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হন এবং অত্যধিক অভিমান বশতঃ আত্ম-হত্যা করিবার সঙ্কল্প পর্য্যন্ত করেন। তাই, তিনি গভীর রজনীযোগে একটী নির্জ্জন কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া উদ্বন্ধনের সমস্ত আয়োজন করিলেন। অতঃপর রজ্জুটীর দ্বারা গলদেশ বেষ্টন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; এমন সময় অকস্মাৎ রুদ্ধ-দ্বারের অর্গল স্বতঃই স্থান-চ্যুত হইল এবং তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন ভক্তবৎসল, পরমদয়াল ঠাকুর। এই সময় ঠাকুর অন্যত্র বাস করিলেও, সর্ব্বতোগামী, সর্ব্বদর্শী শ্রীশ্রীনিত্যদেব প্রিয়বাবুর পত্নীকে মহাপাপাচারে উন্মুখ দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাই, তিনি ভক্তবরের গৃহে ঐ নিশীথ সময় উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকোষ্ঠের রুদ্ধদ্বার হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন। তৎক্ষণাৎ উহা উদ্‌ঘাটিত হইল। আচম্বিতে ঠাকুরকে সম্মুখে দর্শন করিবামাত্র, প্রিয়বাবুর স্ত্রীর হস্ত হইতে উদ্বন্ধন-রজ্জুটী পতিত হইল। তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূতা হইলেন এবং লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন। যাহাহউক, ভক্তবৎসল ঠাকুর সুমধুর বচনে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। তিনি প্রকৃতিস্থা হইলে, শ্রীশ্রীনিত্যদেব তাঁহাকে লইয়া প্রিয়বাবু যে প্রকোষ্ঠে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। ঠাকুরের আহ্বানে প্রিয়বাবু চকিত হইয়া উঠিলেন। সেই নিশীথ সময় শ্রীশ্রীদেবের আকস্মিক আগমনের হেতু তিনি বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। যাহাহউক, শ্রীশ্রীদেব সমস্ত বিষয় তাঁহার

নিকট বিবৃত করিলেন এবং উভয়কে নানাপ্রকার সদুপদেশ দানে আশ্বস্ত করিলেন। এইভাবে ভক্তদম্পতি অপবাদ, কলঙ্ক, ভীষণ বিপদ্ ও মহাপাপ হইতে শ্রীশ্রীদেবের অশেষ কৃপায় আশ্চর্য্যরূপে রক্ষিত হওয়ায়, যুগপৎ বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় তাঁহাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। তাঁহারা বেশ বুঝিলেন, শ্রীশ্রীদেব বাস্তবিকই তাঁহাদের বিপদ্বন্ধু ও নিত্য-শুভাকাঙ্ক্ষী। নানাপ্রকারে অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীশ্রীদেবের যোগৈশ্বর্য্যের বিশেষ পরিচয় পাইলেও, 'এই গভীর রজনীতে ঠাকুর তাঁহাদের বিপদের কথা কি করিয়া জানিলেন, কি করিয়াই বা তিনি তাঁহাদের গৃহে ও রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রবেশ করিলেন ইত্যাদি' ভাবিয়া তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন।

এইঘটনার কিছুদিন পর ঠাকুর শ্রীযুক্ত প্রিয়বাবুর বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ (শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ) প্রভৃতি বহু ভক্তও তথায় গমন করিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। সেইজন্য সে সময় ভক্তসেবার্থ প্রিয়বাবুর প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত। কিন্তু ডাক্তার প্রিয়বাবুর তখন সাংসারিক অবস্থা তত সচ্ছল ছিল না ; শ্রীভগবানের কৃপায় কোনপ্রকারে দিন কাটিয়া যাইত। একদিন তাঁহার বড়ই অর্থের অভাব হইল ; এমন কি, তিনি কপর্দ্দক-শূন্য হইয়া পড়িলেন। এরূপ অবস্থায় তিনি রাত্রিকালে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-চিত্তে শয্যোপরি এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন। নিদ্রা লাভের জন্য বহু চেষ্টা করিলেও, তাঁহার নিদ্রা হইল না। যে কক্ষে তিনি শয়ন করিয়াছিলেন, সেই কক্ষে ঠাকুর ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন ; অথচ সেই সময় অকস্মাৎ এক দৈববাণী ডাক্তারবাবুর কর্ণগোচর হইল। তিনি শুনিতে পাইলেন, "প্রিয়বাবু, ভগবানের কৃপায় ভক্তসেবা নির্ব্বিঘ্নে চ'লে যা'বে ; বৃথা ভাবনা ক'রো না।" কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহার মনে হইল যেন ইহা তাঁহার নিত্যবাবুরই কণ্ঠস্বর। তথাপি তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি কেহ আমাকে কিছু ব'লেছেন ?" তাঁহারা সকলেই "না" বলিলেন। তদনন্তর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন, "আমি ত শু'য়ে আছি।

আমি কখন কি বল্লাম্ ?" কিন্তু ডাক্তারবাবু উপলব্ধি করিলেন, ইহা তাঁহার নিত্যবাবুরই অভয়বাণী। রজনী অবসান হইলে, ভক্তগণ প্রাতঃ-কৃত্যাদি সমাপন করিলেন ; কিন্তু ডাক্তারবাবু সেই দৈববাণীর বিষয়ই একমনে ভাবিতে লাগিলেন। অতঃপর একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে চিকিৎসার্থ আহূত হইয়া তিনি যে অর্থ লাভ করিলেন, তদ্দ্বারা তিনি সাধুসেবা সুসম্পন্ন করিলেন। ইহাতে প্রিয়বাবুর আনন্দের সীমা রহিল না। বাস্তবিকই তখন প্রিয়বাবু উপলব্ধি করিলেন যে, ঐ অভয়বাণী আর কাহারও নহে—উহা তাঁহার পরমবন্ধু শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের।

ডাক্তার প্রিয়বাবু ঠাকুরকে সখ্যভাবে ভালবাসিতেন ; সুতরাং তিনি তাঁহার সহিত তদনুরূপই ব্যবহার করিতেন। কিন্তু সময় সময় ঠাকুরের ঐশ্বর্য্য-লীলা-দর্শনে ডাক্তারবাবুর মনে হইত যে, ভক্তিভাবের অভাব বশতঃই তিনি ঠাকুরের চরণধূলি লইতে পারিতেন না। একদিন তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি ঠাকুরকে অকপটচিত্তে নিজের মনোবেদনা জ্ঞাপন করিলেন। সেই কাতর উক্তি শ্রবণ করিয়া ঠাকুর স্মিতমুখে মধুর বাক্যে বলিলেন, "প্রিয়বাবু, তোমার এই ভাবই আমার বড় ভাল লাগে।" এই মধুর বাক্য শ্রবণান্তর প্রিয়বাবুর হৃদয়ে আর তিলমাত্র দুঃখ রহিল না। ভগবদ্ভাবে বিভোর অবস্থায় ঠাকুরের যোগৈশ্বর্য্য প্রকাশ পাইলেও, বাহ্যভাবে আসিলে তিনি ভক্তগণের সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেন যে, তাঁহারা সমস্তই বিস্মৃত হইতেন এবং মনে করিতেন যে, ইহা তাঁহাদের স্বপ্ন। ভক্তগণের প্রতি করুণা বশতঃ তিনি ঐশ্বর্য্যভাব গোপনপূর্ব্বক মাধুর্য্যপূর্ণ লীলা করিতেন ৷৷

অতঃপর এক শনিবারে নিমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর ডাক্তার প্রিয়বাবুর সহিত জনৈক ভক্তগৃহে গমন করেন। সেই সময় একজন ডাকপিওন প্রিয়বাবুর নামে একটী মণিঅর্ডার লইয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল। ঠাকুর বাটী হইতে বাহির হইয়া পিওনকে

বলিলেন, "প্রিয়বাবু নিমন্ত্রণে গিয়েছেন।" অনন্তর তিনি স্বয়ং মণিঅর্ডার্-ফর্মে বকলম স্বাক্ষর দিয়া টাকা লইবার অভিপ্রায় জানাইলেন। পিওনও ব্যস্ততা-সহকারে তাঁহার স্বাক্ষর লইয়া মণিঅর্ডারের টাকাগুলি তাঁহাকে দিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য, সেদিন টাকা না পাইলে প্রিয়বাবুকে অত্যন্ত বিব্রত হইতে হইত। এদিকে আফিসে ফিরিয়া ফর্ম্‌টীর কেবল এক স্থানে স্বাক্ষর লওয়ায় উপরতন কর্ম্মচারী পিওনকে অতিশয় ভর্ৎসনা করিলেন। তাই সোমবার দিবস সে পুনরায় প্রিয়বাবুর বাটীতে ফর্মের অপর স্থানে সহি লইবার জন্ম গিয়া ঠাকুরের অনুসন্ধান করে। পিওনকে দেখিবামাত্রই তিনি হাসিতে হাসিতে অপর স্থানে সহি করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু এই ব্যাপার আর প্রিয়বাবুর নিকট গোপন রহিল না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই দিবস ঠাকুর প্রিয়বাবুর সহিত নিমন্ত্রণ-স্থলে উপস্থিত থাকিলেও, তাঁহার বাটীতে মণিঅর্ডার্-ফর্মে স্বাক্ষর দিয়া তিনি টাকা লইয়াছিলেন! ইহা ভাবিয়া প্রিয়বাবু বড়ই বিস্মিত হইলেন। ঠাকুরকে এই ব্যাপারের সত্যতা প্রকাশ করিয়া বলিতে অনুরোধ করায় তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব রহিলেন। যাহাহউক, এইরূপে পরমদয়াল ঠাকুর নিমন্ত্রণ-স্থলে উপস্থিত থাকিয়াও বিভিন্ন দেহে ভক্ত প্রিয়বাবুর অভাব মোচন করিলেন। ঠাকুরকে ডাক্তার প্রিয়বাবু সখ্যভাবে দেখিলেও, এই অলৌকিক ঘটনার পর হইতে তিনি তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন।

একসময়ে কাশীধামে সত্যানন্দ নামে জনৈক তথাকথিত অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী এক সাধারণ সভাতে সাকারবাদীদিগের ধর্ম্মমতের বিশেষভাবে নিন্দা করিতেছিলেন। এমন কি, তিনি তথাকার অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিবার কথা উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ইহাতে সাকারবাদী ভক্তগণ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, এরূপ অশাস্ত্রীয় উক্তির কিরূপে প্রতিবিধান করা যায়। এমন সময় ঘটনাক্রমে উক্ত স্থলে বহু-লোকের সমাগম দেখিয়া ঠাকুরও তথায়

উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অসাধারণ রূপ-লাবণ্য তৎক্ষণাৎ সমবেত জনমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি অন্য কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া একেবারে বক্তার সমীপে গেলেন। তাঁহার দিব্যকান্তি-দর্শনে স্বামী সত্যানন্দের সবল হৃদয়েও দৌর্ব্বল্যের সঞ্চার হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কস্ত্বম্ ?" ইহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আপনি অদ্বৈতবাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া এরূপ অজ্ঞানমূলক প্রশ্ন কর্‌ছেন কেন ? ইহাতে মনে হয়, আপনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ কর্‌তে পারেন নাই ; কেবলমাত্র শিক্ষার অভিমান লইয়া বক্তৃতা দিতে এসেছেন।" সভাস্থ সকলে তাঁহার সবল-যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। ইহাতে বক্তা অতিশয় ভীত ও লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। তদনন্তর ঠাকুর সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার বাক্যে আপনি অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ কর্‌তে চাচ্ছেন ? যিনি ঐ কথা বল্‌ছেন, তিনি কি নিরাকার ? তাঁর ন্যায় আকার বিশিষ্ট জীবের এরূপ উক্তি শোভা পায় কি ? যাহাহউক, আকার যিনি মিথ্যা বলেন, তাঁর আকার দেহ বিষয়ে জ্ঞান আছে কিনা, দেখ্‌তে চাই।" এই বলিয়া ঠাকুর একটা জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি সত্যানন্দের দিকে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আপনার শরীরে ইহা একটু স্পর্শ করাইয়া দেখ্‌ব, আকার সত্য কি মিথ্যা ?" তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যানন্দের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তখন ঠাকুর দৃঢ়তার সহিত কহিতে লাগিলেন, "ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আকার-দেহ অবলম্বন ক'রেই ত অদ্বৈতবাদ প্রচার ক'রেছিলেন। বর্ত্তমানেও অনেকে আকার-দেহ ধারণ ক'রে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ ক'রে থাকেন ও নিরাকারবাদ প্রচার ক'রে থাকেন ; সুতরাং আকার মিথ্যা বলি কি প্রকারে ?" ইহা শুনিয়া বক্তা দুঃখে ও ক্ষোভে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। সভামণ্ডপে এক বিপুল আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। এইরূপে সত্যানন্দের ভ্রান্তি দূর করিয়া তিনি তড়িৎগতিতে সেই সভাস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ গন্তব্যস্থানে গমন করিলেন। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও কেহ আর

তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

সাম্প্রদায়িক-ভাবে অন্য ধর্ম্মমতের নিন্দা করিতে হয় বলিয়া ঠাকুর তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি দ্বৈতবাদীর মুখে অদ্বৈতবাদের এবং অদ্বৈতবাদীর মুখে দ্বৈতবাদের নিন্দা শুনিয়া এরূপ ব্যথিত হইতেন যে, সত্যানন্দের বক্তৃতাতে স্থির থাকিতে পারিয়াছিলেন না। এই উভয় মতবাদের দ্বন্দ্ব নিরাকরণার্থ তিনি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ও অন্যান্য প্রামাণিক অদ্বৈতবাদ-বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে যে দ্বৈতবাদ এবং ভক্তি-ভাবাত্মক গ্রন্থাবলীর মধ্যে যে অদ্বৈতবাদ নিহিত আছে, তাহা প্রদর্শনের নিমিত্তই 'সিদ্ধান্তদর্শন', 'ভক্তিযোগ দর্শন' প্রভৃতি কয়েকখানি সমন্বয়মূলক অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

একদিন কাশীধামে একটী গৃহের দ্বিতলস্থ বারাণ্ডাতে জানালা ধরিয়া ঠাকুর মুসলমান্‌দিগের কোরাণ-পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে ভাবাবেশে বিভোর হইয়াছিলেন! সে সময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান একেবারে লোপ পাইয়াছিল। তাই, পরিধেয় বস্ত্র কটিমুক্ত হইয়া পড়িয়া গেলেও, সে বিষয়ে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। হঠাৎ জনৈক ভক্ত তাঁহাকে ঐরূপ ভাববিহ্বল অবস্থায় দর্শন করতঃ তাড়াতাড়ি বস্ত্র পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

কাশীতে অবস্থান-কালে ঠাকুর জনৈক ভক্তের বাড়ীতে বাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তৎশ্রবণে ভক্তটিও হৃষ্টান্তঃকরণে তথায় তাঁহাকে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হন। ঠাকুর একটী ছোট ঘর দেখাইয়া উহাতে তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিতে বলেন। ইহা শুনিয়া ভক্তবর সভয়ে বলেন, "ও ঘরে ভূতের ভয় আছে—ও ঘরে কি আপনাকে থাকতে দিতে পারি?" তাহাতে ঠাকুর বলেন, "তবে ত আমাকে ঐ ঘরেই থাকতে হ'বে।" ভক্তগণের বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও সম্পূর্ণ-স্বতন্ত্র-স্বভাব ঠাকুর ঐ ঘরেই বাসের ব্যবস্থা করিলেন। যিনি ভূতনাথ, তিনি যদি ভূতের মধ্যে না থাকেন, তাহা হইলে আর ভূতের

গতি কে করিবে? যাহাহউক, ঠাকুর ঐ ঘরে বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন। কিন্তু ঘরটী ছোট বলিয়া তিনি দরজায় আড়াআড়ি-ভাবে পা রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন। মধ্যরাত্রে তিনি অনুভব করিলেন যে, লোহার ন্যায় শক্ত হাত দিয়া কে যেন তাঁহার পা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে। ঠাকুর বিরক্ত হইয়া তাহাতে পদাঘাত করিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তৎপরক্ষণেই তিনি বোধ করিলেন যে, একটী সুকোমল হস্ত তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল। এই ঘটনা শুনিয়া ভক্তবর বলিলেন, "আপনার পদাঘাতেই ভূতটী উদ্ধার হইয়া গেল।" সুখের বিষয় এই যে, ইহার পর আর কোনও দিন ঐ ঘরে ভূতের উৎপাৎ হয় নাই।

ঠাকুর দীর্ঘকাল কাশীধামে অবস্থান করিবার পরে, কলিকাতার ভক্ত-বৃন্দের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের জন্য পুনঃপুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক প্রার্থনায় কলিকাতায় পুনরাগমনের উদ্যোগ করিয়া, ঠাকুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়দ্বয়কে উহা জ্ঞাপন করিলেন। তৎশ্রবণে তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

একাদশ অধ্যায়

কলিকাতায় পুনরাগমন

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥"

গীতা, ১১শ শ্লোঃ, ৪র্থ অঃ।

[যাহারা আমাকে যে ভাবেই ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারেই আমার ভজন-মার্গের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।]

অনন্তর সন ১২৯৯ সালের মাঘ মাসে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক হোগলকুঁড়ে বিপিনচন্দ্র মিত্রমহাশয়ের বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। বিপিনবাবু তাঁহার বাল্যবন্ধু ছিলেন। কয়েকদিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই তাঁহার শুভাগমন-বার্ত্তা ভক্তগণ অবগত হইয়া, বিপিনবাবুর বাটীতে তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় ভক্তবর পতুবাবুর সহপাঠী বালাজী নামে একজন মহারাষ্ট্রীয়-ব্রাহ্মণ-যুবক তাঁহার সঙ্গে আসিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করেন। ঠাকুর আদর করিয়া তাঁহাকে "pet lad" (অর্থাৎ "আতুরে বালক") বলিতেন। পরবর্ত্তীকালে ইনি বরদা-রাজ্যের বিচারপতি হইয়াছিলেন। এই সকল ভক্ত লইয়া ঠাকুর কখনও কখনও কীর্ত্তনানন্দে এরূপ বিভোর হইয়া থাকিতেন যে, পুলকাবলীতে তাঁহার তপ্তকাঞ্চন-সদৃশ দেহ কণ্টকিত হইয়া যাইত; নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গত হইয়া পরিধেয় বসন পর্য্যন্ত সিক্ত করিয়া ফেলিত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল কখনও বা হ্রাস-প্রাপ্ত কখনও বা দীর্ঘতা-প্রাপ্ত হইত। কখনও বা তিনি এরূপ কম্পিত

হইতে থাকিতেন যে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে খট্‌খট্‌ শব্দ হইত। কখনও বা দন্তে দন্তে ভীষণ ঘর্ষণের ফলে কোন কোনটী চূর্ণ হইয়া যাইত, কোন কোনটী বা ভগ্ন হইত। কখনও বা তিনি গভীর-সমাধিমগ্ন হইয়া পড়িতেন। কখনও বা তাঁহার অঙ্গকান্তি শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল প্রভৃতি নানা বর্ণ ধারণ করিত। ইহাতে ভক্তগণ তাঁহাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও প্রেমের ঘনীভূত মূর্ত্তিরূপে দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন। সময় সময় ঠাকুর নানাবিধ পৌরাণিক উপাখ্যান ও মহাত্মাগণের পবিত্র জীবনচরিত ভক্তগণ সমীপে বর্ণনা করিতে করিতে ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। তৎশ্রবণে তাঁহারা পরমানন্দ লাভ করিতেন।

ঠাকুর সকল ধর্ম্মমতই সমানভাবে আদর করিতেন এবং সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরিক ঐক্য-সম্বন্ধে সুমধুর উপদেশাবলী অতি সরল, সহজ ভাষায় ভক্তগণকে প্রদান করিতেন। যিনি তাহা একবার মাত্র শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই সকল ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক ঐক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরমোদার সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-বাদের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ভক্তবৃন্দ সমীপে সমন্বয়-তত্ত্ব বলিতে বলিতে অনেক সময় তিনি বলিতেন, "সব্‌মে বসিয়ে, সব্‌মে রহিয়ে, সব্‌কা লিজিয়ে নাম। হাঁজী হাঁজী কর্‌তে রহো বৈঠে আপন ঠাম্‌।" সাম্প্রদায়িক ভাবের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক তিনি আরও বলিতেন—

"এক অবতার ভজে না ভজয়ে আর।
কৃষ্ণ-রঘুনাথে করে ভেদ ব্যবহার॥
বলরাম শিব প্রতি প্রীতি নাহি করে।
ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এ সব জনারে॥"

আবার, সাকার-নিরাকার সম্বন্ধে তিনি বলিতেন—

"নির্গুণ পিতা হামারি সগুণা মাতারি।
কাঁকো নিন্দো কাঁকো বন্দো দুনো পাল্লা ভারি॥"

প্রকৃতপক্ষে তিনি মৌখিক উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না।

তাঁহার আচরণেও সেই সকল এরূপভাবে ফুটিয়া উঠিত যে, ভক্তগণের হৃদয়ে সাম্প্রদায়িক ভাব তিলমাত্র স্থান পাইত না। বাস্তবিক, তিনি শিব, কালী, রাধা, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, রাম, রহিম, আল্লা, যীশু, বুদ্ধ প্রভৃতি শ্রীভগবানের যে কোন নাম শুনিতেন, তাহাতেই অশ্রু, কম্প, পুলকাদি অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। তদ্দর্শনে ভক্তগণের হৃদয় হইতে সাম্প্রদায়িক ভাব বিদূরিত হইয়া, তাঁহাদের অন্তরে এক অপূর্ব্ব সমন্বয় ভাবের উদয় হইত। তাঁহার সমন্বয়-মূলক উপদেশ অপেক্ষা সমন্বয়-জ্ঞাপক দিব্য-ভাব দ্বারা ভক্তগণ পরমোদার সমন্বয়বাদ অধিক উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

সন ১৩০০ সাল ফাল্গুন মাসে ত্রৈলোক্যবাবু ও রামদয়ালবাবুর বিশেষ অনুরোধে তাঁহাদের সহিত ঠাকুর নবদ্বীপধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হোর্‌মিলার্‌ কোম্পানীর এজেন্ট্‌, শ্রীপতিবাবু, রামদয়ালবাবুর বন্ধু ছিলেন। সুতরাং যাহাতে তাঁহাদের কোনরূপ কষ্ট না হয়, তজ্জন্য শ্রীপতি-বাবু নবদ্বীপের ষ্টেশন-মাষ্টার অঘোরবাবুর নামে একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই ষ্টীমারের সারঙ্গ মতিবাবুর সহিত তাঁহাদের পরিচয় হইল। মতিবাবু মুসলমান্‌ হইলেও ঠাকুরের অপরূপ রূপ-লাবণ্য-দর্শনে এবং সমন্বয়-মূলক-অপূর্ব্ব-ধর্ম্মকথা-শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। মধ্যাহ্নকালে ষ্টীমার নবদ্বীপঘাটে পৌঁছিল। শ্রীপতিবাবুর পত্র পাইয়া নবদ্বীপ-ঘাটের ষ্টেশন-মাষ্টার অঘোরবাবু তাঁহাদিগের বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তথায় বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া গঙ্গাস্নানপূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু-দর্শনের নিমিত্ত গমন করিলেন। ঠাকুর মহাপ্রভুর অঙ্গণে উপনীত হইয়া, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি-দর্শনে ভাববিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বহু কষ্টে সেই ভাব সংবরণ করিয়া হরিসভার শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ-দর্শনের নিমিত্ত গমন করিলেন। হরিসভায় প্রবেশ করিয়াই তিনি প্রেমাবেগে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি টলিতে টলিতে চলিতে লাগিলেন—নয়নযুগল হইতে অবিরলধারে

অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে 'ঠাকুর পড়িয়া যাইবেন' মনে করিয়া ত্রৈলোক্যবাবু ও রামদয়ালবাবু দুই দিক্ হইতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের উভয়ের সাহায্যে তিনি নাট্যমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। এই সময় শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যাহ্নকালীন ভোগরাগাদি সমাপনপূর্ব্বক ভক্তপ্রবর বৃদ্ধ মথুরাবাবু শ্রীমন্দিরের বারান্দায় বসিয়া একাগ্রচিত্তে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ব্যজন করিতেছিলেন। গৌরভাবে আবিষ্ট শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব তথায় পদার্পণ করিবামাত্রই, বৃদ্ধ নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহার অপার্থিব ভুবন-মোহন রূপ দর্শন করতঃ "আবার কি গৌর এলি রে!" বলিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে মথুরাবাবু প্রকৃতিস্থ হইয়া ঠাকুরের চরণতলে পতিত হইলেন। তাহাতে ঠাকুর অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এ কি! আপনি কা'কে গৌরাঙ্গ বল্‌ছেন? আমি যে নিত্যগোপাল।" বাষ্প-রুদ্ধকণ্ঠে বৃদ্ধ আর কিছু বলিতে পারিলেন না। ঠাকুর নানাবিধ মধুর বাক্যে তাঁহার সেবা-পূজাদির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। লজ্জাবনত মুখে মথুরাবাবু ব্যস্ত হইয়া শ্রীমন্দিরের দ্বার খুলিতে গেলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিশ্রাম করিতেছেন জানিয়া, ঠাকুর মথুরাবাবুকে সেবার নিয়ম ভঙ্গ করিতে নিষেধ করিলেন। ইহাতে মথুরাবাবু বলিলেন, "মহাপ্রভু মহাপ্রভুকে দর্শন কর্‌বেন; এতে আর বিধিনিষেধ কি?" মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত হইলে, ঠাকুর ভক্তগণসহ শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। অতঃপর মথুরাবাবু তাঁহাদিগের সেবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন; কিন্তু ষ্টেশন-মাষ্টার অঘোরবাবু আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন জানিয়া, মথুরাবাবু অগত্যা পরদিন তাঁহাদের সেবার প্রস্তাব করিলেন। "সুবিধা হ'লে ইচ্ছা রইল," বলিয়া ঠাকুর মথুরাবাবুর নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

অতঃপর ঠাকুর অঘোরবাবুর বাটীতে আসিয়া শুনিলেন যে, কাটোয়া হইতে একখানি স্পেশাল ষ্টীমার আসিতেছে। তৎশ্রবণে তিনি

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল
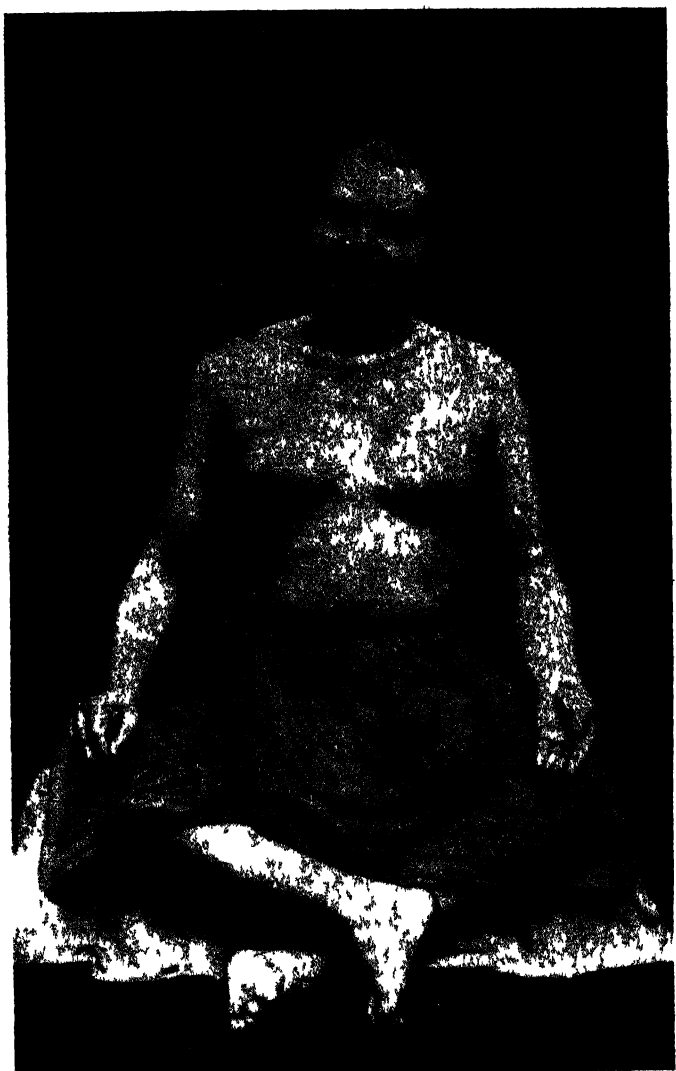
(যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব)

সেই ষ্টীমারেই কলিকাতা প্রত্যাগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহা শুনিয়া অঘোরবাবু আহারের জন্য তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঠাকুর আহারের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই ষ্টীমার ঘাটে লাগিবামাত্র সঙ্গীদিগকে লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। বলাবাহুল্য, বিনয়ের খনি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব মধুর বাক্যে অঘোরবাবুকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। এইরূপে মতি সারজ, অঘোরবাবু, মথুরবাবু প্রভৃতি ভক্তবৃন্দকে কৃপা করিয়া অল্পকালের মধ্যে ঠাকুর কলিকাতায় বিপিনবাবুর বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। দেখিতে দেখিতে তথায় এরূপ ভক্ত সমাগম হইতে লাগিল যে, বিপিনবাবুর গৃহ-প্রাঙ্গণেও তাঁহাদের স্থান হয় না। বহু ভক্ত ঠাকুরের দর্শন না পাইয়া বাধ্য হইয়া রাজ-পথে দণ্ডায়মান থাকিতেন। এই সময় সাংসারিক কার্য্যাদির জন্য গৃহে গমন করিলেও, ভক্তগণ ঠাকুরের অপার স্নেহ ও ভালবাসার কথা তিলেকের জন্য ভুলিতে পারিতেন না। কতক্ষণে তাঁহার সঙ্গসুখ লাভে পুনরায় সেই বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন তজ্জন্য সর্ব্বদা তাঁহারা উন্মনা হইয়া থাকিতেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ভক্ত স্নান-আহারাদির সময় ব্যতীত ঠাকুরের সঙ্গ ত্যাগ করিতেন না। বিপিনবাবুর বাটীতে অতিরিক্ত শয়ন-ঘর ছিল না; কিন্তু সেই মাঘ মাসের দারুণ শীতের মধ্যেও তাঁহারা বারান্দায় রাত্রি যাপন করিতেন। এত কষ্ট সহ্য করিয়াও তাঁহারা নিত্য-সন্নিধানে পরমানন্দে থাকিতেন। ভক্তগণের ঈদৃশ কষ্ট দেখিয়া এবং বিপিনবাবুর অসুবিধার কথা ভাবিয়া ঠাকুর কালীঘাটে জোড়াবাড়ীর পার্শ্বে একটী বাড়ী ভাড়া করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে তথায় নানা অসুবিধা বশতঃ তিনি আদি গঙ্গার উপকূলে কালীঘাট-পাথুরিয়া-পটীতে সন ১৩০০ সালের ১৫ই ফাল্গুন তারিখে ২৭ নং অভয় মজুমদারের বাটী ভাড়া লইলেন। সেইসময় তাঁহার সঙ্গে বহু ভক্ত অবস্থান করিতেন। ঠাকুরের সেবা-পূজাদি ভিন্ন তাঁহাদের আর অন্য কোন বাসনা ছিল না;— সুতরাং এই স্থানে তাঁহাদের আর কোন অসুবিধা

হইল না। তৎকালে ঠাকুর কখনও উদার-ধর্ম্মোপদেশাবলী দ্বারা ভক্তগণের চিত্তবিমোহন করিতেন—কখনও বা তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠ শ্রবণ করিতেন—কখনও বা কীর্ত্তনে এরূপ বিভোর হইয়া মহাভাবসিন্ধুনীরে ডুবিয়া যাইতেন যে, সমস্ত রাত্রি সেইভাবেই কাটিয়া যাইত।

কালীঘাট-পাথুরিয়া-পটীতে অবস্থানকালে ঠাকুর একদিন গঙ্গাস্নান করিতে ঘাটে গিয়াছিলেন। সেই সময় একটী কুক্কুর তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ভক্তবৎসল ঠাকুর উহার মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম স্থাপনপূর্ব্বক তাহার আর্ত্তি দূর করিয়া দিলেন। সে তখন শান্ত হইয়া তাঁহার পদলেহন করিতে লাগিল। নীচ পশুকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও কুকুরটী শ্রীশ্রীনিত্যদেবের কৃপা লাভ করিল এবং তাঁহারই কৃপায় ভরা গঙ্গার প্রবল স্রোত অনায়াসে অতিক্রম করিয়া অপর পারে চলিয়া গেল। বাস্তবিক, শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের কৃপাদান কেবলমাত্র মনুষ্য-দেহধারী জীবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। অতি নীচ পশু-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতিও তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া জন্ম সার্থক করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এই সময় মেদিনীপুর-জেলার অন্তর্গত আম্‌নাগুড়া-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্তঅক্ষয়কুমার গুঁই নামে জনৈক দরিদ্র সন্তান তাঁহার প্রতিবেশী এক নিত্য-ভক্তের নিকট শ্রীশ্রীদেবের ঐশ্বর্য্য-ও-মাধুর্য্যপূর্ণ পার্থিবলীলা-কাহিনীর কিয়দংশ শ্রবণান্তর হঠাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়েন। তৎপর স্বপ্নযোগে এক শুভ্রকায়, জ্যোতির্ম্ময়, দিব্য-কান্তি পুরুষ কতকগুলি প্রক্রিয়া করতঃ তাঁহাকে মন্ত্রদান করিলেন; অতঃপর তিনি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-লেপন করিয়া দিলেন। অনন্তর সেই মহাপুরুষের আদেশক্রমে জনৈক ভক্ত অক্ষয়বাবুকে প্রসাদ আনিয়া দিলেন। এই ঘটনার পর হইতেই গুঁই-মহাশয়ের নিত্য-দর্শনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে। তাই, তিনি পথের ক্লান্তি ও দুঃখ-কষ্টকে সাদরে বরণ করিয়া কালীঘাট-পাথুরিয়া-পটীতে আগমন করিলেন এবং ২৭নং বাটীটী দর্শনান্তর ভাবাবেশে অচৈতন্য হইয়া

পড়িলেন। তৎপর তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর পরিচর্য্যায় তিনি চৈতন্ত-লাভের পর শ্রীশ্রীদেবের শ্রীচরণ-দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যখন অক্ষয়বাবু তৎসমীপে নীত হইলেন, তখন তিনি ঠাকুরকে তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট শ্বেতবর্ণ, দিব্যকান্তি পুরুষরূপে দর্শন করতঃ বিস্ময়ে ও আনন্দে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, অক্ষয়-বাবুর নিত্যালয়ে পৌছিবার পূর্ব্বে ভক্ত-বৎসল অন্তর্য্যামী ঠাকুর স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া তাঁহার আগমনের কথা গুঁইমহাশয়ের সুপরিচিত ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কিন্তু অক্ষয়বাবু পত্রাদিসহ লোক মারফৎ এ সংবাদ প্রেরণ না করায় ঠাকুর কোন সন্তোষ-জনক উত্তর পান নাই। যাহাহউক, পূর্ব্ব-বর্ণিত রূপ-দর্শনের কিছুক্ষণ পর গুঁইমহাশয় দেখিতে পাইলেন যে, ঠাকুর যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই স্থানেই সেই শুভ্রকায় মহাপুরুষের পরিবর্ত্তে এক দিব্য-কান্তি, গৌরমূর্ত্তি সস্নেহে তাঁহাকে আশ্বাস-বাণী প্রদান করিলেন। এতদ্দর্শনে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

অনন্তর ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে পরদিন অক্ষয়বাবুর দীক্ষা-লাভ হইল। ঠাকুর স্বপ্নযোগে যে প্রক্রিয়া অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাকে যে মন্ত্র দান করিয়া-ছিলেন, জাগ্রত অবস্থায় তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইল না। মন্ত্র-দানের পর বিভূতি-লেপন-কার্য্যটী মাত্র করিলেন-না। অক্ষয়বাবু অতঃপর অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, ঠাকুর বিভূতি-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহ তাহা আনিয়া দিতে পারেন নাই। শ্রীশ্রীদেবের ঈদৃশ স্নেহ, দয়া ও কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে অক্ষয়বাবুর মনে হইল, "ইনি সেই গোলকবিহারী হরি, সেই শ্মশান-বাসী শিব, সেই সর্ব্বমঙ্গলা কালী!"

সন ১৩০০ সালের ফাল্গুন মাসে অতি প্রত্যুষে জনৈক ভক্তকে সঙ্গে লইয়া একদা ঠাকুর কালীঘাটে ভ্রমণ করিতেছেন; এমন সময় দেখিলেন যে, একটী লোক নর্দ্দামার মধ্যে পড়িয়া আছে এবং দুইজন ভদ্রলোক তাহাকে রাস্তার উপর টানিয়া তুলিয়া গালাগালি করিতে করিতে বলিতেছেন,

"চল্, বেটা, মাতাল; আজ তোকে পুলিশে না দিয়ে ছাড়্‌ব না।" মাতাল সভয়ে তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, নিত্যভক্তটী তাঁহাদের অধীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, মশাই, এঁকে পুলিশে দিতে যাচ্ছেন?" তাঁহারা বলিলেন, 'মশাইগো, এ লোকটা বেজায় মাতাল; রোজ রোজ মদ খেয়ে রাত্রে গোলমাল করে; দোর ঠেলে, না হয় কারো দরজায় কি নর্দ্দামায় প'ড়ে থাকে। বেটা নিদ্রার ব্যাঘাত ক'রে স্বাস্থ্য ভঙ্গ কর্‌ছে; একে পুলিশে দিতেই হ'বে।" "চল্, বেটা, চল্," বলিয়া দুইজনে মাতালটীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। নিত্য-ভক্তটী অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া মাতালকে তাঁহাদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া দিলে, ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি এঁকে স্নান করিয়ে এঁর বাড়ী দিয়ে আস্‌তে পার্‌বে?" "যে আজ্ঞা" বলিয়া নিত্যভক্তটী মাতালের সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কাররূপে ধৌত করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিলেন। তখন সেই মাতাল স্বীয় কটিদেশ হইতে উপবীত বাহির করিয়া জপ করিতে লাগিলেন। নিত্যভক্ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ!" তখন ব্রাহ্মণ স্নানান্তে শুচি হইয়া সাশ্রুনয়নে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "সত্য বলুন, আপনার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি কে? যিনি আমায় কলঙ্ক হ'তে রক্ষা কর্‌লেন তিনি কে? আমার উপনয়ন সময়ের অধীত বিদ্যা, যাহা আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ বিস্মৃত ছিলাম* আজ হঠাৎ যিনি আমার মস্তকে পদাঘাত ক'রে স্মরণ করিয়ে দিলেন, তিনি কে? যিনি আমার অনাহত-পদ্মে দিব্যমূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন, তিনি কে? যিনি পুণ্যতোয়া-ভাগীরথী-গর্ভে জ্যোতির্ম্ময়রূপে আমার

*কলিকাতায় (এক সময়ে) প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ কে, মিশ্র একদা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি কলিকাতা-মেডিক্যাল্ কলেজে পড়্‌বার সময় শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে রাধানাথ মল্লিক লেনে দর্শনান্তর চিরবিস্মৃত-ও-পরিত্যক্ত (ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম) গায়ত্রীজপে পুনঃ প্রবৃত্তি লাভ করেছিলাম।"

হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার কর্লেন, তিনি কে? নচেৎ এই মুষ্ট্যাঘাতেই (দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া) আপনার মুণ্ড-পাত্ ক'র্ব।" ভক্ত সতীশবাবু রোমাঞ্চিত হইয়া মৃদুভাবে বলিলেন, "তা' আপনি কর্তে পারেন, বটে!" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, "আপনি কি কা'কেও ভয় করেন না'?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এই মুহূর্ত্তে কা'কেও নয়; ইহার পূর্ব্বে আমার গৃহলক্ষ্মীকে ভয় কর্তাম্।" সতীশবাবু বলিলেন, "আর কালীঘাটে কালীমাকে ভয় ক'র্তেন্ না?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "না, আমি যে সেই মা'র ছেলে—মা'র কাছে ছেলের আদর বেশী—তিনি আমাকে কখনও লালচক্ষু দেখান্ নাই!" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ব্রাহ্মণ শূন্যস্থিত-মাংসপিণ্ডবৎ ধপ্ করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন। সতীশবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। তখন ঘাটে ভীড় দেখিয়া ঠাকুর স্থানান্তরে গমন করিলেন। সতীশবাবু ও ব্রাহ্মণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অতঃপর নির্জ্জনে একটী বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া, তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি থাক কোথায়?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "আমার বাড়ী ভিন্ন জেলায়। কর্ম্মোপলক্ষে ভবানীপুরে বাসা। উপস্থিত সাতদিন ঐ অবিদ্যা-মন্দিরে ছিলাম; আপনার কৃপায় আপনার শ্রীপাদপদ্মে পৌছেছি। প্রভো, আমায় রক্ষা করুন; আপনি আমার ভবকর্ণধার; আমি আপনার শরণ নিলাম।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ, অগতির গতি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের শ্রীপাদপদ্ম-ধারণ করিলেন। "তোমার ভয় নাই," বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে শ্রীচরণে আশ্রয় দান করিলেন।

এই সময় ঠাকুর একদিন কালীঘাট-নিবাসী মধুসূদন ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের বাটীতে গিয়াছিলেন। সেখানে "গৌরী-নাম্নী" অনৈকা বিশেষ ভক্তিমতী স্ত্রীলোক ছিলেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অগাধ বাৎসল্যভাব ছিল। সেদিন সিদ্ধচৈতন্য-দাস-বাবাজীমহাশয়ের শিষ্য শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ-দাস-বাবাজী তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঠাকুরের সহিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-

সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন এবং তাঁহার নিকট তত্ত্বকথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। পরে বাবাজীমহাশয় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার বিবাহ হ'য়েছে?" ঠাকুর উত্তর করিলেন, "হাঁ"। "তোমার সন্তান হ'য়েছে?" ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ, একটী পুত্র ও একটী কন্যা।" এমন সময় তৎসমীপে দণ্ডায়মানা গৌরী-মা বলিলেন, "বাবা, গোপাল আমার ছেলে মানুষ; ওকে ওসব কথা কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না। গোপাল আমার বিবাহ করে নাই এবং সন্তানাদিও কিছু হয় নাই।" বাবাজীমহাশয় প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য ঠাকুরকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সন্তানগুলির ও গৃহধর্ম্মিণীর নাম কি?" ঠাকুর বলিলেন, "পুত্রটীর নাম জ্ঞান, কন্যাটীর নাম ভক্তি; আর ঘটক-শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তিনি যে পরমা সুন্দরী স্ত্রীরত্ন পেয়েছেন, তাঁকে তিনি হৃদয়-কন্দরে সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষা করেন।" বাবাজীমহাশয় এই গূঢ় রহস্য অবগত হইয়া ঠাকুরকে 'বাল-ব্রহ্মচারী' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। পরে ভক্তগণ ঠাকুরকে উক্ত স্ত্রীর নাম জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিয়াছিলেন, "গুরুকৃপাময়ী সাধনার নাম ঘটক এবং স্ত্রীর নাম সিদ্ধি।"

যে সময় পূজনীয়া সারদাদেবী* (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের

---

*বলাবাহুল্য, শ্রীযুক্তাসারদা দেবী ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের অত্যধিক কৃপা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সেবায় তাঁহার বিশেষ রতি-মতি ও নৈপুণ্য দৃষ্ট হইত। এবিষয় ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য-রচিত "শ্রীশ্রীসারদা দেবী" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি বলিয়াছেন, "...শ্রীশ্রীঠাকুরের (শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের) বিশ্রাম-কালে তিনি (শ্রীযুক্তাসারদা দেবী) পদসেবা করিতেছেন; স্নানের পূর্ব্বে তেল মাখাইয়া দিতেছেন; আবার, ঠাকুরের দেহের অবস্থা বুঝিয়া যখন যেটি রুচিকর ও পুষ্টিকর হইবে বলিয়া বুঝিতেছেন, তখন সেইটিই প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। সেবা করিয়া ঠাকুরকে সন্তুষ্ট করিতে তাঁহার মত কেহই সক্ষম ছিলেন না, ...ঐশ্বরিক ভাবে সদা নিমগ্ন, বালকের অবস্থাপন্ন

সহধর্ম্মিণী) দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সেবায় একান্ত রত ছিলেন, সেই সময় শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবকে সর্ব্বদা উন্মনা—আহ্‌খেয়ালশূন্য—বালক-ভাবাপন্ন দেখিয়া, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব তাঁহার পরমভক্ত, পূজনীয়া (পূর্ব্বোক্ত) গৌরীদেবীকে বলিয়াছিলেন, "ওরে গৌরী, তুই যদি নিত্যের তত্ত্বাবধান না করিস্, তবে নিত্যের দেহরক্ষা হ'বে না।" এ সম্বন্ধে স্বয়ং গৌরীদেবী (ইনি 'গৌরী-মা' বলিয়াই বিশেষ পরিচিতা) নিত্যভক্ত শ্রীযুক্তাঅম্বিকাসুন্দরী দেবীকে (ফরিদপুর-জেলার অন্তর্গত পালং-গ্রাম-

---

ঠাকুরকে শ্রীশ্রীমা শিশুর মত ভুলাইয়া আহারাদি করাইতেন,···ঠাকুরের অন্য খাবার সইত না, তাই মাছ জিয়ানো থাকত। শিকের উপর শিকে, তার উপর শিকে।···তাঁহার মত ঠাকুরের অবস্থাভিজ্ঞও অন্য কেহ ছিলেন না; একবার মা তিনদিন ঠাকুরকে রাঁধিয়া দেন নাই।···সেই সময়টা অন্যের হাতে খাইয়া ঠাকুরের শরীর অসুস্থ হইল।···শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার পরস্পর এই দিব্য সম্বন্ধ ও আচরণ সাধারণ মানবের বুদ্ধিগম্য নহে।···"

প্রকৃতপক্ষে, অবতার ও সাধু-মহাপুরুষগণের (যে কোনও) আচরণ সাধারণ জীবের নিকট 'লৌকিক' বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহা 'অলৌকিক'। এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রকৃত সাধু-মহাপুরুষেরও "···শ্রীভগবানের সহিত একত্ব নিরূপিত হইয়াছে। সেই একত্ববশতঃ তিনি ভগবতীশক্তি-সম্পন্ন হন।···তাঁহার মায়ার সহিত সম্বন্ধ নাই।···তাঁহার ত্রিগুণের সহিতও সম্বন্ধ নাই।···তাঁহারা কর্ম্মসকল স্বীয় ইচ্ছায় সম্পন্ন করেন না। শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে যাহা করান, তাঁহারা তাহাই করিয়া থাকেন। যেরূপ সময়-নিরূপক যন্ত্রকে চালাইলে তবে সে চলে, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে কর্ম্ম করাইলে তবে তাঁহারা কর্ম্ম করেন। কাষ্ঠ অগ্নি-সংযোগে অগ্নিত্বপ্রাপ্ত হইলে, সেই অগ্নি-সংযুক্ত কাষ্ঠের দ্বারা দাহাদি কার্য্য হইলে, প্রকৃত কথায় সেই দাহাদি কার্য্যকে অগ্নির কার্য্য বলিয়াই পরিগণিত করিতে হয়। যিনি···ভগবানে সংযুক্ত হইয়া ভগবানত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাতে থাকিয়া তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ভগবান্ যে সমস্ত

নিবাসী ও ভূতপূর্ব্ব বরিশাল-জজ্ কোর্টের ট্রান্স্‌লেটর ৺অন্নদাপ্রসাদ সেন-মহাশয়ের কন্যাকে) ভাব বিহ্বল চিত্তে বলিয়াছিলেন, "তোর ঠাকুর যখন সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত অবস্থায় থাক্‌ত, তখন আমিই তা'র রক্ষণাবেক্ষণ ক'র্‌তাম্। তোর ঠাকুর সর্ব্বদা সমাধিস্থ থাক্‌ত। আমি তা'র আহারাদির ব্যবস্থা কর্‌তাম্। হাতে গ্রাস্ তুলে খেতে পার্‌ত না। আমি তা'কে খাইয়ে দিতাম্। কচি খোকাটির মত কখন কখন আমার কার্য্য করেন, সে সমস্ত তাঁহার কার্য্য নহে। সে সমস্ত ভগবানেরই কার্য্য। সেইজন্য সে সমস্ত কার্য্যের মধ্যে কোন কার্য্যই অসৎ কার্য্য নহে। ভগবান্ নিজে সৎ, সেইজন্য তৎকর্ত্তৃক যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয় সে সমস্তই সৎ।...জলে কর্পূর মিশ্রিত হইলে জলও সেই কর্পূর-গন্ধবিশিষ্ট হয়। সৎ-সংস্রবে অসৎ-কর্ম্মও সদ্রূপে পরিণত হয়। অপ্রাকৃত-সৎ-সংস্রবে প্রাকৃত-অসৎ-কর্ম্মও অপ্রাকৃত সৎ-কর্ম্মরূপে পরিণত হয়।..."

যাহাহউক, প্রকৃত ভক্ত সদাই অতৃপ্ত। তাই বোধহয় শ্রীযুক্তাসারদা দেবী একদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলিলেন, "আমি এমন বস্তু চাই, যা'তে মন নিষ্ঠিত রেখে জীবনটা সদ্ভাবে কাটাতে পারি—তুমি যেন কামনা-বাসনার অতীত; আমি কি করি?" এই সময় তৎসমীপে উপবিষ্ট, মহাভাবে মগ্ন ঠাকুরের উপর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি ঠাকুরকে তদবস্থায় আনিয়া শ্রীযুক্তাসারদা দেবীর ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন, "এই তোমার সদ্ভাবে জীবন কাটাবার সুবিধা কোরে দিলাম—গোপালকে নাও—এর সেবা কর, তা হ'লেই জীবন বেশ্ কাট্‌বে।" আদর্শ-চরিত্রা সারদাদেবীর মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া গেল—ঐ দিব্যদেহ-স্পর্শে তাঁহার হৃদয়ে ঠাকুরের উপর পরম-বাৎসল্য-ভাবের উদয় হইল। অতঃপর তিনি অনেক সময় বাৎসল্য-প্রেমে আবিষ্ট হইয়া স্নেহময়ী জননীর ন্যায় ঠাকুরকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতেন। মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের সেবার জন্য কালীঘাট-মহানির্ব্বাণমঠে টাকা পাঠাইয়া দিতেন এবং শ্রীশ্রীদেবের প্রতিকৃতি ভবিষ্যতে নয়ন ছাড়া করিতেন না।

পিছনে পিছনে ছুটাছুটি করত। ওরে, সে কি জিনিষ তোকে কি বল্‌ব? মূর্ত্তিমান্ দু'জন (নিত্যগোপাল ও রামকৃষ্ণ) যেন গৌর-নিতাই ও কৃষ্ণ-বলরাম। সে কি আনন্দের দিনই আমাদের গিয়েছে! এক একদিন স্নান করতে যেয়ে (নিত্যগোপাল) আর উঠ্‌ত না—অথচ ভাবস্থ—যেন সে ব্রজের জলখেলা—আমি যখন কোনক্রমেই তা'কে জল থেকে তুল্‌তে পার্‌তাম্ না, তখন বাধ্য হ'য়ে লাঠি নিয়ে তাড়া করতাম্। তখন খিল্‌খিল্ ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে কখনও বা আরও দূরে চলে যেত—কখনও বা মা'র শাসনে ভীত বালকটীর মত কাতরে আমার দিকে তাকিয়ে থাক্‌ত এবং উঠে আস্‌ত। আমি অতি সন্তর্পণে তা'র ভিজা কাপড় ছাড়িয়ে শুক্‌নো কাপড় পরাইতাম্। আর কা'রও কথা গ্রাহ্য করত না। দ্যাখ্, মা অম্বিকে, তুই অতি রক্ষাশ্রিতা—তোর ঠাকুর ছিল প্রেমিক, প্রেমের অবতার। ওরে অম্বিকে, তুই যে আমাকে পাগল্ কোরে দিবি, কার্য্যাক্ষম কোরে দিবি! ওরে, আর নয় রে; ওরে নিত্যের পাগ্‌লী, এখন যা ঘুমগে—ওরে পাগল্, তোদের গুরু নিত্যগোপাল গেছে কোথায়? তারা যে বর্ত্তমান—খুঁজে দ্যাখ্, প্রাণের মাঝেই তারে পাবি।"

যাহাহউক, এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, ঠাকুর তাঁহার দেহ-সম্পর্কীয় আত্মীয় প্রমদাচরণ মিত্রমহাশয়ের অনুনয়-বিনয়ে কৃপাপরবশ হইয়া, তাঁহার বাগান-বাটীতে কিছুদিন অবস্থান করেন। সে সময় তথায় একজন অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীও বাস করিতেন। তিনি প্রায়ই "আমি ব্রহ্ম," "আমি ব্রহ্ম" বলিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র অনুভূতি ছিল না। ঠাকুর বিরক্ত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে প্রমদাবাবু বাগান-বাটীতে ঠাকুরকে না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি মনকষ্টে চতুর্দ্দিকে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে লোকালয় হইতে দূরে এক অতি নির্জ্জন স্থানে তাঁহার দর্শন পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রমদাবাবু

অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। অনেক কষ্টে তিনি অশ্রুবেগ ধারণ করতঃ বলিতে লাগিলেন, "নিজ গুণে আমার অপরাধ ক্ষমা ক'রে বাগান-বাটীতে চলুন।" তৎশ্রবণে ঠাকুর তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আপনার বিন্দুমাত্র অপরাধ হয় নাই। তবে সন্ন্যাসীর পক্ষে উত্তম আহার্য্য প্রত্যহ গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। তারপর সেখানে যে সন্ন্যাসী থাকেন, তিনি প্রায়ই "আমি ব্রহ্ম," "আমি ব্রহ্ম" উচ্চারণ করেন। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে, তিনি উহা উচ্চারণ করলে জগতের কল্যাণই সাধিত হ'ত। কিন্তু সেই ব্রহ্মাদ্বৈতাবস্থা* লাভ না ক'রে কেবলমাত্র মুখে উহা উচ্চারণ করায় উহা দ্বারা জগতের বিশেষ অকল্যাণ হ'য়ে থাকে। ঐ প্রকার সাধুর সঙ্গ করা অবৈধ ব'লে আমি আপনার বাগান-বাটী হ'তে চলে এসেছি। ইহাতে আপনি দুঃখ ক'রবেন্ না।" এই কথা শুনিয়া প্রমদাবাবু করুণ-স্বরে বলিলেন, "আপনি কৃপা না ক'রলে আমাদের কি গতি হ'বে?" তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "যা'কে কৃপা করা হ'বে, সে পর্ব্বতের গুহাতে থাকলেও তা লাভ করবে। সেজন্য আপনি ভাব্‌বেন্ না।"

*ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "...তস্মাদহং ব্রহ্মাস্মীত্যেতদবসানা এব সর্ব্বে বিধয়ঃ সর্ব্বানি চেতরাণি প্রমাণানি..." অর্থাৎ "অতএব বিধি-নিষেধ প্রভৃতি শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সমস্তই 'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞানোৎপাদনে পরিসমাপ্ত; সুতরাং ঐ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সত্য বা প্রমাণ।" "জ্ঞাতব্য ব্রহ্মাত্মা বিজ্ঞাত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই অজ্ঞান প্রযুক্ত 'অহংপ্রত্যয়' বা 'অহংভাব'রূপ জীবাত্মার কর্ত্তৃত্বাদি ব্যবহার হইয়া থাকে; আর জ্ঞাত হইবার পর অহংজ্ঞানাপন্ন জীব পাপ-দোষাদি-রহিত পরমাত্মা হয়। তাই ব্রহ্মাদ্বৈতবোধ না হওয়া পর্য্যন্তই লৌকিক ও বৈদিক প্রমাণ-প্রমেয়াদি ব্যবহার সত্য বলিয়া গণ্য থাকে।" অতএব অদ্বৈতজ্ঞান লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাধকের শাস্ত্র-বিধান অনুসরণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য; তাহা না করিলে প্রত্যবায়ই হইয়া থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়

নবদ্বীপ যাত্রা ও তথায় অবস্থান

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"

গীতা, ১৪শ শ্লোঃ, ৭ম অঃ।

[এই অলৌকিকী গুণময়ী আমার মায়া নিতান্ত দুরতিক্রম্যা ; তথাপি যাহারা আমাকেই (অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা) ভজনা করে, তাহারা আমার এই সুদুস্তর মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমার স্বরূপ জানিতে পারে।]

কিয়দ্দিবস এইরূপে অবস্থানপূর্ব্বক সন ১৩০০ সালের ২৯শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব কলিকাতা গমন করতঃ ২রা চৈত্র জনৈক ভক্তের সহিত নবদ্বীপ যাত্রা করেন। ষ্টীমার বিভ্রাটবশতঃ তাঁহাকে কাল্না হইতে নৌকাযোগে তথায় যাইতে হয়। সেই নৌকায় দ্বারিকানাথ গোস্বামী প্রমুখ যশোহর-নিবাসী কয়েকজন ভদ্রসন্তান ছিলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া গোস্বামীমহাশয় বলিলেন, "মশাই, আপনি মালা পরেন না কেন?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি মালা পর্‌বার্ উপযুক্ত হই নাই। তবে অন্ত কেহ পর্‌লে আমার আপত্তি নাই ; বরং আনন্দ পাই।" কিছুক্ষণ পরে এই প্রকারের কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের দিব্যভাবাবেশ দেখিয়া গোস্বামী-মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, "একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি অর্থাৎ আপনি জগতের চন্দ্র-স্বরূপ ; অপরাপর সকলে নক্ষত্রবৎ।" তিনি সঙ্গীগণকে আরও বলিলেন, "আর নবদ্বীপে যা'বার প্রয়োজন নাই—সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গদেবকে যখন দেখ্‌ছি।" ইহা শুনিয়া সকলের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

সকলে একদৃষ্টে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের অপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন।

এই সময় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম-মহোৎসব উপলক্ষে নবদ্বীপে মহাধূম পড়িয়া গিয়াছিল। যখন ঠাকুর তথায় গমন করেন, তখন আমেদপুরের জমিদার শ্রীপদ চৌধুরীমহাশয় তাঁহার জন্য ষ্টেশন-মাষ্টার কালীবাবুর নিকট অনুরোধ-পত্র দিয়াছিলেন। ইহাই কালীবাবুর সহিত ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ হইলেও, কালীবাবু বলিয়াছিলেন, "কখনও দেখি নাই, অথচ আমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, এরূপ আলাপ করলেন, যেন কত পরিচিত। আমার ক'টী সন্তান, পত্নীর মূর্চ্ছারোগ প্রভৃতি যেন তিনি সমস্তই জানেন।" সে রাত্রি ঠাকুর ষ্টেশনেই ছিলেন। তাঁহার সহিত কথা বলিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারমহাশয় এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, পরদিন বেলা ৯টা পর্য্যন্ত কথা হইতে লাগিল। তারপর যখন সরকারী কাজ আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন মাষ্টারমহাশয়ের চমক ভাঙ্গিল। শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব সভক্ত সেদিন তাঁহার বাসাতেই আহারাদি করেন। তৎপর দিবস রামরাজাতলা-পাড়া (শ্রীবাস-অঙ্গন) রোডে রামচন্দ্র সাহামহাশয়ের বাটীতে বাসা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় ঠাকুর তথায় গেলেন।

এদিকে নবদ্বীপ-বাসী প্রসিদ্ধ যাত্রাদলপতি শ্রীযুক্তমতিলাল রায়-মহাশয়ের স্বনামধন্য পুত্র শ্রীযুক্তধর্ম্মদাস রায়মহাশয়ের বয়স যখন অষ্টাদশ বৎসর, তখন তিনি শীতকালের এক রাত্রিতে নিদ্রা যাইবেন বলিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং লেপদ্বারা মুখটী আচ্ছাদিত করতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। অতঃপর তাঁহার মনে হইল যেন ঘরে একটী উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। ক্রমে ক্রমে উহা যেন তাঁহাকে এক দিব্যপুরী দর্শন করাইল। এই আলোর কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার এত উত্তাপ বোধ হইল যে, তিনি আর গায়ে লেপ রাখিতে পারিলেন না। চক্ষু উন্মীলন করিলেন; উক্ত আলো অসহ্য হইয়া উঠিল; তাই তিনি আর চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু নয়ন মুদ্রিত হইলেও, তাঁহার মনে হইল যেন তিনি

আর একটী চক্ষু প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দ্বারা তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে অপূর্ব্বরূপধারী তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণানগরের গৌরাঙ্গ-বিগ্রহের ন্যায় দিব্যকান্তি এক পুরুষ; তৎপশ্চাৎ নানা সম্প্রদায়ের মাল্য-বিভূষিত এক জটাধারী পুরুষ ও তৎপশ্চাৎ এক দণ্ডী—মস্তকমুণ্ডিত, হস্তে কমণ্ডলু। সর্ব্বাগ্রে যিনি দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি সিন্দুরে-অঙ্কিত-বীজমন্ত্রসহ একটী তুলসীপত্র ধর্ম্মদাসবাবুর হস্তে অর্পণ করিলেন। অনন্তর সেই তিন মূর্ত্তিই অন্তর্হিত হইলেন। এই সময় ধর্ম্মদাসবাবু এরূপ চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার পিতামহী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাহাহউক, সংজ্ঞা লাভ করিবার পর তাঁহার মনে হইল যে, যদি তাঁহার হস্তে তুলসীপত্রটী থাকে, তবে ঘটনা মিথ্যা নয়। এই ভাবিয়া তিনি পিতামহীকে আলো জ্বালিতে বলিলেন। আলো জ্বালা হইলে, তিনি দেখিলেন যে, অযাচিত কৃপার নিদর্শন তুলসীপত্রটী তাঁহার হস্তেই রহিয়াছে!

প্রভাতে উঠিয়া ধর্ম্মদাসবাবু স্বর্ণ-মাদুলীর মধ্যে ঐ তুলসীপত্র রক্ষা করিলেন এবং দক্ষিণ বাহুমূলে উহা ধারণ করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে ধর্ম্মদাসবাবুর সদাসর্ব্বদা অন্যমনস্ক-ভাব। সেই অপূর্ব্ব দর্শনের অলৌকিক মূর্ত্তি-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি আছেন কিনা, তাঁহার অন্বেষণ করাই হইল এখন তাঁহার প্রধান কার্য্য। যাহাহউক, একদিন প্রভাতে তাঁহার বিশেষ বন্ধু চারিচারাপাড়া-নিবাসী ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার দেখা হইল। দেবেনবাবু বলিলেন, "এক অদ্ভুত মানুষ এসেছেন—তিনি যে বাড়ীতে আছেন, আজ বিকালে সেখানে যাওয়া যা'বে।" দেবেনবাবু সংক্ষেপে সেই অদ্ভুত মানুষের রূপ-গুণ কিছুকিছু বর্ণনা করিলেন। তাঁহার দর্শন লাভের জন্য ধর্ম্মদাসবাবু অতীব উৎসুক হইলেন। দেবেনবাবু আনাহার সমাপন করিয়া বেলা তিন ঘটিকার সময় ধর্ম্মদাসবাবুর নিকট আসিলেন। উভয়ে আনন্দে ও উৎসাহে সেই অদ্ভুত মানুষ দর্শনের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত রামচন্দ্র সাহামহাশয়ের বাটীতে গমন করিলেন।

দেবেনবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধর্ম্মদাসবাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, গৃহের পশ্চিমপ্রান্তে মৃগচর্ম্মাসনে জনৈক ভদ্রলোক উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার পরিধানে কালাপেড়ে কাপড় এবং নিকটে একজোড়া মৃগচর্ম্মের চটি। তাঁহার বক্ষঃস্থল বস্ত্র দ্বারা আবৃত। দেবেনবাবু তাঁহাকে প্রণাম করিলেন দেখিয়া ধর্ম্মদাসবাবুও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তর তাঁহারা দেখিলেন যে, সেই মহাপুরুষের মস্তক হইতে জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতেছে। সেই জ্যোতিঃ দেখিয়া ধর্ম্মদাসবাবু নির্জ্জনগৃহে অন্ধকারের মধ্যে যে আলো দেখিয়াছিলেন, তদ্বিষয় তাঁহার স্মরণ হইল। এখন তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেন সেই দ্বিজমূর্ত্তি। তিনি সবিস্ময়ে একদৃষ্টে সেই মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মহাপুরুষ তখন বামহস্তমুষ্টি দ্বারা স্বীয় অধরোষ্ঠ আবৃত করিয়া সহাস্যে ধর্ম্মদাসবাবুকে বলিলেন, "ধামাই, আমি সেই।" বলিতে বলিতেই সেই অদ্ভুত মানুষ সমাধিস্থ হইলেন। ধর্ম্মদাসবাবুর প্রতি লোমকূপ হইতে অজস্র ঘর্ম্ম বহির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার দৃষ্টি সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে বদ্ধ হইয়া রহিল। বলাবাহুল্য, সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আর কেহই নন্—তিনি আমাদের জীবন-সুহৃৎ ঠাকুর শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব। কিছুক্ষণ পরে তিনি সমাধি হইতে ব্যুত্থান লাভ করিয়া, কত পরিচিতের ন্যায় ধর্ম্মদাসবাবুকে পুনরায় বলিলেন, "ধামাই, তুলসীপত্রটীর আর প্রয়োজন হ'বে না।" তারপর ঠাকুর ভক্তগণের নিকট বলিতে লাগিলেন, "এই ধামাই বাল্যকাল হ'তে লক্ষ্মীপূজা কর্‌তে ভালবাসে; আর এমন আল্‌পনা দিতে পারে যে, স্ত্রীলোকেও তেমন পারে না।" ইহা হইতে ধর্ম্মদাসবাবু বেশ বুঝিলেন যে, ঠাকুর সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার মধুর বাক্যাবলী শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন এ জগতে এতদিন এরূপ মধুর ভাষা আর কখনও শুনেন নাই। রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল; তথাপি তাঁহার গৃহে ফিরিবার কথা স্মরণ হইল না। ঠাকুর ধর্ম্মদাসবাবুর মনের কথাসকল বলিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি দিতে লাগিলেন। ঠাকুরও বালকভাবে হাততালি দিয়া বলিতে লাগিলেন, "বোল্ হরিবোল্, বোল্ হরিবোল্।" এই হরি-ধ্বনির মধ্যে জনৈক ভক্ত লুচি-হালুয়া প্রভৃতি লইয়া আসিলেন। ঠাকুর বালকভাবে উহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সকলকে বণ্টন করিয়া দিয়া বলিলেন, "আমার মা আমায় বকছেন ; মা আমায় ঘুম পাড়াবেন, তোরা এখন বাড়ী যা।" আগামী কল্য পুনরায় দেখা হইবে জানিয়া ভক্তগণ বাড়ী ফিরিলেন।

পরদিন দেবেনবাবু ও ধর্ম্মদাসবাবু ষ্টীমার-ঘাটে স্নান করিতে গেলেন। সেখানে যাওয়ামাত্র ষ্টেশন-মাষ্টার কালীবাবু তাঁহাদিগকে বাসায় লইয়া গেলেন। অতঃপর ঠাকুরের সহিত কিরূপে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল, তাহা তিনি ব্যক্ত করেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহোৎসবের পূর্ব্বে যখন ঠাকুর নবদ্বীপ আগমন করেন, তখন আমেদপুরের জমিদার শ্রীপদ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার জন্য অনুরোধ-পত্র দিয়াছিলেন। সেই সূত্রেই ষ্টেশন-মাষ্টার কালীবাবুর সহিত ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ। কালীবাবু বলিতে লাগিলেন, "কখনও দেখি নাই, অথচ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় এরূপ আলাপ কর্‌লেন যেন কত পরিচিত! আমার ক'টী সন্তান, পত্নীর মূর্চ্ছারোগ প্রভৃতি যেন তিনি সমস্তই জানেন। সে রাত্রিতে ষ্টেশনেই ছিলেন ইত্যাদি।" ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় তাঁহাদিগকে আরও বলিলেন, "তৎপরে অনেক ভক্ত ক'লকাতা হ'তে এসেছিলেন, কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহোৎসবের পরেই অনেকে চ'লে গিয়েছিলেন। হরিহরানন্দজী মাত্র ছিলেন। ঠাকুরের আমার বাসাতে থাকাকালীন জনৈক বৈষ্ণব ভিক্ষা ক'র্‌তে এসে বাউলের সুরে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠগমন সম্বন্ধে গান করেন। উহা শুনে ঠাকুর এরূপ ভাবাবিষ্ট হ'য়েছিলেন যে, তাঁ'র চক্ষু দিয়ে শ্রাবণের ধারার ন্যায় বারি বইতে লাগ্‌ল। তা'তে তাঁ'র পরিহিত বস্ত্র সিক্ত হ'য়ে পদতলস্থ মৃত্তিকা পর্য্যন্ত কর্দ্দমাক্ত হ'য়ে গেল।" ইহা শুনিয়া ধর্ম্মদাসবাবু রোমাঞ্চিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভেতু

বাবুর মত চেহারা; পরিধেয় বস্ত্রও তদ্রূপ; অথচ প্রেমে গড়া ছবি! হরি বল্‌তেই দু'নয়নে গঙ্গাযমুনার ধারা ব'য়ে যায়! চৈতন্যভাগবতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর এইরূপ বর্ণনা আছে। এরূপ ভাবাবেশ ত আর কা'রও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। তবে ইনি কে?" এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অলৌকিক দর্শনের কথা এবং ঠাকুরের প্রত্যক্ষ দর্শনকালীন কথা—"ধামাই, আমি সেই, তুলসীপত্রটী কি পড়ে গিয়েছে?" ইত্যাদি —ব্যক্ত করিলেন। তৎশ্রবণে কালীবাবুও সজলনয়নে গদগদ ভাবে বলিলেন, "তাই ত, ভাই, ইনি কে?" তদনন্তর স্থির হইল যে কালীবাবু, ধর্ম্মদাসবাবু প্রভৃতি সকলেই বৈকালে ভক্তগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন, "ইনি কে?"

ক্রমে অপরাহ্ন হইল। ভক্তগণ রামচন্দ্র সাহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা ঠাকুরের সম্বন্ধে জানিবার জন্য যতই জিজ্ঞাসা করেন, ততই ভক্তগণ বলেন, "উনি একজন বাবু, আমাদিগকে ভালবাসেন, তাই আমরা আসি।" এইরূপ কথাবার্ত্তায় সন্ধ্যা হইলে, তাঁহারা জনৈক ভক্তের সঙ্গে ঠাকুরের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তিনি আসনে বসিয়া আছেন এবং মধ্যে মধ্যে কি যেন লিখিতেছেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে বাহিরে বসিতে বলিলেন এবং ভক্তগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা যে পরম সাধন তাহাও প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, "আপনারা যে আকাঙ্ক্ষায় এসেছেন, তা আমি জানি। মহামায়ার সম্বন্ধে যে কথা হচ্ছিল, তা'ও শুনেছি। আমি বাহিরে যাচ্ছি। বেশী বিলম্ব হ'বে না।" তাঁহারা প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, কালীবাবু আসিয়াছেন। অল্পকাল মধ্যে ঠাকুর বাহিরে আসিলেন। ভক্তগণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে, তাঁহারা প্রণাম করিলেন। ঠাকুর "নারায়ণ, নারায়ণ" উচ্চারণপূর্ব্বক বলিলেন, "আমি অতি অধম, অতি হীন, কীটাধম, এই রক্ত-মাংসের শরীর। আমার পা'র ধূল নিয়ে কি হ'বে?" এই কথা বলিতে বলিতে শেষে বেদান্তের কথা পর্য্যন্ত আসিয়া

উপস্থিত হইল। ঐ বেদান্ত প্রসঙ্গে পুরাণেও যে বেদান্ত আছে, তাহাও ঠাকুর প্রকাশ করিলেন। ঠাকুর লীলায় অবিশ্বাস হইবে বলিয়া আধ্যাত্মিক বিষয় বলিতে রূপকও প্রকাশ করিতেন না। এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "আজকাল যাহারা 'Philosophy, Philosophy (দর্শন, দর্শন)' করেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য আধ্যাত্মিক রূপকের প্রয়োজন। আর যাঁহারা প্রত্যক্ষ লীলা বুঝেন, তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক ভাবে বুঝাইতে হয় না। তাঁহাদের রূপকই সর্ব্বদাই তিনি।" এই কথা প্রসঙ্গে রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়া, বেলা আটটা বাজিয়া গেল। ঠাকুরের আহার হইবে না ভাবিয়া জনৈক ভক্ত দরজা বন্ধ করতঃ তাঁহার আহারের ব্যবস্থা করিলেন। অবশেষে ঠাকুরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। তিনি কিছুক্ষণ "হিং, রিং, রিং, রিং" ভাষায় কি যেন বলিলেন। শেষ শব্দটী শুনিয়া ভক্তগণ বুঝিলেন, "গোপাল খাবে, গোপাল খাবে। দে খাই, দে খাই।" ইহার পর জনৈক ভক্ত ঠাকুরকে খাওয়াইয়া সেই প্রসাদ সকলকে বণ্টন করিয়া দিলেন।

এদিকে নবদ্বীপ-নিবাসী সাধু-ভক্ত-বিদ্বেষী বহু ব্যক্তি ধর্ম্মদাসবাবুর পিতার নিকট ঠাকুরের বিরুদ্ধে অনেক পত্র লিখিলেন। তদনুসারে মতিবাবু বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ধর্ম্মদাসবাবুকে কহিলেন, "তুমি নাকি শূদ্রের নিকট মন্ত্র গ্রহণ ক'রেছ? শূদ্রকে প্রণাম কর? শূদ্রের প্রসাদ পাও? এ কি?" ধর্ম্মদাসবাবু পিতাকে অত্যন্ত ভয় করিতেন; কিন্তু উত্তর দিবার সময় তাঁহার ভয় কোথায় চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "আপনি একবার তাঁকে দেখ্‌বেন্ কি? যদি দেখে বলেন, ইহাঁর কাছে তুমি যেও না, আমি আর যাব না।" সে কথা শুনিয়া ধর্ম্মদাসবাবুর পিতা, মতি রায়মহাশয় সন্ধ্যার সময় তাঁহার সহিত রামচন্দ্র সাহার বাটীতে গমন করিয়া দেখিলেন যে, শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব বাহিরের ঘরে আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। মতি রায়মহাশয় সেই জ্যোতির্ম্ময়-মূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক আন-

আধ স্বরে ঠাকুর বলিলেন, "ভাল আছেন? এবার কি মহারাস শিখ্‌বেন্ না?" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি সমাধিস্থ হইলেন এবং ধর্ম্মদাসবাবুর পিতাও সমাধিস্থ হইলেন। এইভাবে চারি ঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। ভক্তগণ নীরবে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন। চারি ঘণ্টা পর উভয়েরই সমাধি ভঙ্গ হইল। তৎপর ঠাকুর "আচ্ছা, আচ্ছা" বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। তখন ধর্ম্মদাসবাবুর পিতা বলিলেন, "ধামাইকে ওপদে স্থান দিয়েছেন, ধামাইয়ের পিতা যেন বঞ্চিত না হয়।" তৎশ্রবণে ঠাকুর বলিলেন, "আপনি শ্রীভগবানের নিত্য-সিদ্ধ পারিষদ—আপনার উপর ত তাঁ'র কৃপা আছেই।" অতঃপর ধর্ম্ম-দাসবাবুরা তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। বাটী আসিয়া ধর্ম্মদাসবাবুর পিতা 'রামরাজার' ঘরে বসিলেন এবং ধর্ম্মদাসবাবুকে বলিতে লাগিলেন, "সংসারে পুত্র বন্ধনের কারণ; তুমি আমার মুক্তির কারণ। যদি সকলে একবাদী হইয়া ঠাকুরের কাছে তোমাকে যেতে নিষেধ করে, তুমি বজ্রপতন বাধাও মান্‌বে না।" ইহাতে ধর্ম্মদাসবাবুর আনন্দের আর সীমা রহিল না। আগুন চাপা থাকিবে কেন? আপনিই প্রচার হইল। ধর্ম্মদাসবাবুর পিতার মুখেই প্রচার হইল যে, শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালদেব সামান্য লোক নন্। কত লোক কত রূপে জিজ্ঞাসা করাতে এইরূপে কথাটী খুব প্রচার হইল যে, নবদ্বীপে এক নব-অবতার আসিয়া-ছেন। কত লোক কতরূপে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভক্তরাও প্রাণ খুলিয়া বলিতেন, "আবার শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু এসেছেন।" তাহা শুনিয়া নিন্দুকদিগের গাত্রদাহ হইতে লাগিল, আর ভক্তগণ আনন্দে আত্মহারা হইতে লাগিলেন।

নবদ্বীপের উচ্চ-বংশীয়, প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ-সন্তান ও গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্তরঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় দেবেন্দ্র-বাবুর শ্বশুর ছিলেন। জামাতা ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করায় সকলে তাঁহাকে (দেবেনবাবুকে) সমাজ-চ্যুত করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। ইহা

শুনিয়া রঘুনাথবাবু নবদ্বীপে আসিলেন এবং জামাতার অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই রামচন্দ্র সাহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিলেও কেহই তাহা শুনিতে পান নাই। এমন সময় ঠাকুর বলিলেন, "তোরা দোর খুলে দে, আমার বুড়ো এসেছে।" একজন ভক্ত দুয়ার খুলিয়া দিলেন। দুয়ার খুলিবামাত্র ভক্তগণ দেখিলেন যে, নবদ্বীপের মহামান্য 'বড বাঁড়ুয্যে মহাশয়' আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া কীর্ত্তনের রোল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও হাততালি দিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অতঃপর ঠাকুর অদ্ভুত নৃত্য করিতে করিতে বৃদ্ধ রঘুনাথবাবুকে কোলে টানিয়া লইলেন। তাঁহার কোল পাইয়া বুড়ো এমনভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন যে, তখন তাঁহাকে বালকের ন্যায় মনে হইল। ঠাকুরকে দেখাইয়া বুড়ো গানের ধুয়া ধরিলেন, "ঐ আমাদের গৌর-গোপাল, ঐ আমাদেব গৌর-গোপাল!" এইরূপ কীর্ত্তনানন্দের পর সকলেই প্রসাদ পাইলেন। তদ্দর্শনে দেবেন্দ্রবাবুর আনন্দের সীমা রহিল না। ইহার পর বাঁড়ুয্যেমহাশয় ঠাকুরকে বলিলেন, "কাল আমার আশ্রমে আপনার ভিক্ষা।" ঠাকুর বলিলেন, "অনেক দিন তোর বাড়ী যাই নাই। আমি একা যাব?" বাঁড়ুয্যেমহাশয় বলিলেন, "যাকে যাকে নিয়ে যেতে হয়, আপনার উপর ভার।" সেদিন রাত্রি আড়াইটার সময় সকলে শয়ন করিতে গেলেন।

এই ঘটনার পরদিন প্রভাতেই দেবেনবাবু ধর্ম্মদাসবাবুর নিকট গেলেন এবং প্রকাশ্যেই বলিতে লাগিলেন, "জাতির মুখে পেচ্ছাব্ ক'রে দিই। কেউ যদি কণ্ঠা কেটে দেয়, তখনও বল্‌ব, 'নিত্যগোপাল ভগবান্, নিত্যগোপাল ভগবান্! আমরা নিত্যগোপালের প্রসাদ খাই, নিত্য-গোপালের পায়ের ধুলো নেই'!" অতঃপর তাঁহারা রামচন্দ্রসাহার বাটীতে গেলেন। তথা হইতে ভক্তগণ ঠাকুরের সহিত ষ্টেশনের ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। ষ্টেশন-মাষ্টার কালীবাবু হাতে হাতে স্বর্গ পাইলেন।

কি যে বলিবেন, ভাষায় যোগাইল না। তাঁহার গৃহে পেঁপে, বাতাসা যাহা ছিল, তদ্দ্বারা ঠাকুরের সেবা করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে পুরী, মিঠাই আসিয়া পড়িল। ঠাকুর আহার করিতে করিতে বলিলেন, "তোমরা বামুনের ছেলে—গঙ্গাস্নান কর—আহ্নিক কর—আগেই খাবে? আমি দেব না, আমি খাব।" সে কথা শুনিয়া ধর্ম্মদাসবাবু বলিলেন, "বহু জন্ম আহ্নিক ক'রে আপনাকে পেয়েছি; আর আহ্নিক ক'র্ব্ব কেন?" যাহাহউক, ইহার পর ঠাকুর ভক্তগণের মধ্যে প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিলেন।

এইরূপে বেলা বারটা বাজিল দেখিয়া বাঁড়ুয্যেমহাশয় নিজপুত্র অনুকূলবাবুকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইলেন। ঠাকুর স্নান করিয়া গা মুছিলেন না এবং কাপড়ও ছাড়িলেন না—তাড়াতাড়ি অনুকূলবাবুকে বলিলেন, "চল, তোমাদের বাড়ী যাই।" তৎপরে ভক্তগণ পরামর্শ করিলেন যে, আহারান্তে সকলে বাঁড়ুয্যেমহাশয়ের বাড়ী যাইবেন। এদিকে ঠাকুরকে দেখিবার জন্য বাঁড়ুয্যে বাড়ীতে লোক সমাগম হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে কালী মুখোপাধ্যায়মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "রোঘো বুড়ো করলে কি? একে সাম্‌লাব কেমন ক'রে? নবদ্বীপে বাঁড়ুয্যে বাড়ীতেই যদি এই ঘটনা হোলো, ত কা'কে বারণ কর্ব্বো!" এই কথা শুনিতে শুনিতে ভক্তগণ বাঁড়ুয্যে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় রঘুবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র কালিদাসবাবু ঠাকুরের সেই ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। অতঃপর বেলা চারি ঘটিকার পর ঠাকুর বাহিরে আসিলেন। কিন্তু কালিদাসবাবু তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিবেন বলিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার হাত ধরিয়া ঠাকুর বলিলেন, "কি! এখানে ব'সে কেন?" কালিদাসবাবু বলিলেন, "আমাদের বাড়ীতে আপনাকে যেতে হ'বে।" এই সময় নবদ্বীপে কালিদাসবাবু সকল দলের পাণ্ডা ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে বাড়ীতে লইয়া গেলে, তথায় তুমুল কীর্ত্তন হইল। ইহার কিছুক্ষণ পরে লুচি, ক্ষীর, সন্দেশের মহোৎসব

হইল। ঠাকুর দুই হস্তে উহা বিলাইতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি প্রায় বারটা বাজিল। তখন কালিদাসবাবু বলিলেন, "চলুন্ আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।" আসিতে আসিতে কালিদাসবাবুর সহিত ঠাকুর নানারূপ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "রাত হ'য়েছে, এইবার বাড়ী গেলে হয় না?" তাহা শুনিয়া কালিদাসবাবু বলিলেন, "আমি একা যেতে পারব না।" পুনর্ব্বার ঠাকুর তাঁহাকে এগিয়ে দিলেন; কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া কালিদাসবাবু বাড়ী না যাইয়া, ঠাকুরের অনুসরণ করিলেন। এইরূপ আনাগোনা করিতে করিতে প্রভাত হইয়া গেল। সুতরাং কালিদাসবাবু আর বাড়ী গেলেন না। একেবারে ঠাকুরের সঙ্গে আশ্রমে আসিলেন। তথায় ভক্তগণ বলিতে লাগিলেন, "কাল দুপুর বেলা ভিক্ষা করতে গিয়ে আজ সকাল হ'য়ে গেল!" ইহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আমি এক বাড়ী ব'সে সকল বাড়ীর ভিক্ষা পেয়েছি।" কালিদাসবাবু তখন বলিলেন, "আমি যেন কাছ ছাড়া না হই, আমার এই ভিক্ষা।" এইরূপে ভক্তগণ ঠাকুরের সঙ্গে পরমানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে ১৩০১ সালের অন্নপূর্ণা-পূজার দিন ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইল। সেই উপলক্ষে বিদেশ হইতে বহু ভক্ত সমাগত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে তারাপদবাবু (শ্রীমৎস্বামী কৃষ্ণানন্দমহারাজ), হোগলকুঁড়ের বিপিনবাবু, গিরীশ ঘোষমহাশয়ের ভ্রাতা হাইকোর্টের উকিল অতুলবাবু, শরৎবাবু, মৃগেন্দ্রবাবু, হালতুর শশীবাবু, উপেনবাবু, স্বরূপনগর শশী সরকারমহাশয় প্রভৃতি পুরুষ-ভক্তগণ এবং 'লক্ষ্মী-পিসীমা, বড় পিসীমা, অন্নপূর্ণার মা' প্রভৃতি স্ত্রী-ভক্তগণ আসিয়াছিলেন। সেই উৎসবে বহু ভক্ত, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ আশ্রমে প্রসাদ পাইলেন। রাত্রে কীর্ত্তন হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইলেন। এমন সময় ধর্ম্মদাসবাবুর বাল্যবন্ধু শ্রীনাথ গোস্বামীমহাশয় (শ্রীমৎস্বামী কেশবানন্দ মহারাজ) সংকীর্ত্তনের রোল শুনিয়া তথায় গেলেন এবং ধর্ম্মদাসবাবুকে

ডাকিলেন। সেই শব্দ শুনিবামাত্র, "আরে চূড়ামণি, এসো ; চূড়ামণি, এসো" বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তৎশ্রবণে তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। সকলেই কীর্ত্তন করিতেছিলেন ; এমন সময় তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বীজ মন্ত্র কি 'হ্রীং' ?" ইহা শুনিয়া তিনি অবাক্ হইয়া রহিলেন এবং সেইদিন হইতেই ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন। অতঃপর ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "আজ অন্নপূর্ণা-পূজা ; গোস্বামীমহাশয আপনি প্রসাদ পা'বেন্ না ?" তদুত্তরে শ্রীনাথ গোস্বামীমহাশয় বলিলেন, "অন্নপূর্ণার প্রসাদে ত আপনাকে পেযেছি, এখন আপনি প্রসাদ দিন্।" এমন সময় কালিদাসবাবু আসিয়া কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে নৃত্য দেখিয়া সকলে নাচিয়া উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে ঠাকুরও অদ্ভুত নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শেষে তিনি শ্রীনাথ গোস্বামীমহাশযকে ছোট ছেলের মত হস্ত ধারণ করিয়া নাচাইলেন। এইরূপে সারারাত্রি কীর্ত্তন চলিল। পরদিন প্রত্যুষে ভক্তগণ প্রসাদ পাইযা বাড়ী গেলেন।

সেই অন্নপূর্ণা-পূজার পর অনেক ভক্ত চলিয়া গেলেন। বৈশাখ মাস কাটিয়া গেল। কত ভক্ত আসিলেন, কত ভক্ত গেলেন, তাহার নির্ণয় হইল না। এই সময় একদিন ঠাকুরের সমীপে ভক্তগণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এমন সময শ্রীমৎস্বামী কেশবানন্দমহারাজের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্তনৃত্যগোপাল গোস্বামীমহাশয় তথায় আসিলেন। ঠাকুর তখন সমাধিমগ্ন ছিলেন। জাত্যভিমানবশতঃ গোস্বামীমহাশয় শ্রীমৎস্বামী কেশবানন্দ মহারাজের ন্যায় ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম না করিয়া, হস্তোত্তলন পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। এমন সময় সেই উচ্চ কীর্ত্তনের মধ্যেও ভক্তগণ ভ্রমর-গুঞ্জনের ন্যায় এক অশ্রুতপূর্ব্ব ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তখন রাত্রি প্রায় একটা—নবদ্বীপ সহর নিস্তব্ধ—অতএব বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও ভক্তগণ বাহিরে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। 'আবার ঘরের ভিতরেও উহার উদ্ভব কোথায় হইতে পারে'—ইহা

ভাবিয়া ভক্তগণ বিস্ময়াভিভূত হইলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গ-ভক্ত, চিন্তাশীল ও শাস্ত্রজ্ঞ গোস্বামীমহাশয়ের হৃদয়ে নিত্য-কৃপা প্রভাবে এক অপূর্ব্ব অনুভূতির বিকাশ হইল। ইহা ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রান্তি দূর করিয়া উপলব্ধি করাইল, "ঠাকুরের ভ্রামরী কুম্ভক হইয়াছে।" তখন তিনি ভাবিলেন, "এইরূপ কুম্ভক যাঁর হয়, তিনি ত অসাধারণ! আহা! আমি এঁকে অসম্মান, অশ্রদ্ধা ক'রে কি অন্যায়—কি পাপ ক'রেছি।" একদিকে তিনি ইহা ভাবিয়া যেমন অনুতাপানলে জ্বলিতে লাগিলেন, অন্যদিকে তেমনই ঠাকুরের মাহাত্ম্য কথঞ্চিৎ অবগত হইয়া, সানন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'আজ আমি ভাই হ'তে ধন্য হ'লাম।" অতঃপর অপূর্ব্ব নিত্য-ভক্তি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল—তাঁহার জাত্যভিমান চিরতরে প্রশমিত হইল এবং তিনি পূর্ণপরব্রহ্ম শ্রীশ্রীনিত্যদেবের পদতলে পতিত হইলেন। অতঃপর সমাধি হইতে ব্যুত্থান লাভ করিয়া অন্তর্যামী ঠাকুর তাঁহাকে সস্নেহে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। অনন্তর ঠাকুরের অশেষ কৃপায় তিনি তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মে আশ্রয় লাভান্তর তন্মহিমা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

যাহাহউক, সন ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসের শেষে যে সকল ভক্ত ঠাকুরের দর্শন লাভার্থ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় এক সপ্তাহ আশ্রমে বাস করিয়া শ্রীশ্রীচরণে প্রণামান্তর স্ব স্ব দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কলিকাতায় যাত্রা ও মহানির্ব্বাণ মঠ স্থাপন

"ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুরবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ উতীঃ।
নামানিরূপানি মনোবচোভিঃ সন্তন্বতো নটচর্য্যামিবাজ্ঞঃ ॥" ৩৭ ॥

ভাঃ, ১ম স্কঃ, ৩য় অঃ।

[ভগবান্ নটের ন্যায়, ভক্তহৃদয়-বিনোদনকারী অনুপম রূপ পরিগ্রহ করিয়া, জগতে স্বীয় ঐশ্বর্য্যের বিস্তার করিতেছেন ; কিন্তু ভক্তিহীন কুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কেবল তর্কাদি কৌশলের দ্বারা বাঙ্মনোতীত সেই ভগবানের লীলা অনুভবে কখনই সমর্থ হয় না।]

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর ঠাকুর ষ্টীমারযোগে কলিকাতা রওনা হইলেন। ষ্টেশন-মাষ্টার কালীবাবু সারঙ্গকে বিশেষ-ভাবে বলিয়া দিলেন যে, সে যেন শ্রীশ্রীদেবের যথাসাধ্য যত্ন করে ; এবং মাষ্টারমহাশয় টিকিট দিয়া তাঁহাকে বসিবার আসন দিলেন। ষ্টীমার ছাড়িলে ঠাকুর সারঙ্গের সহিত ধর্ম্মালোচনা আরম্ভ করিলেন। তৎশ্রবণে সারঙ্গ মুসলমান্ হইলেও মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। ঐ সময়ে নবদ্বীপ-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্তকালীপদবাবুও পড়াশুনার জন্য সেই ষ্টীমারেই কলিকাতা যাইতেছিলেন। ইনি তখন ফিলজফির (দর্শনের) এম্-এ পড়েন। যাহাহউক, তিনি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ছিলেন। ঠাকুরও ঘটনাক্রমে সেই কক্ষেই উপবেশন করিলেন। শ্রীশ্রীদেবের সামান্য বেশ দেখিয়া কালীবাবু তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে করিলেন। তাই, তিনি বিশেষ বিরক্তির সহিত তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিলেন এবং একখানি দর্শন-গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু উহার কয়েক প্যারা (পরিচ্ছেদ) তাঁহার বুঝিতে বড়

কষ্ট হইতেছিল ; এমন সময় প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুর, উক্ত দর্শন-গ্রন্থের সেই কয়েক প্যারা ইংরাজীতে উল্লেখ করিয়া, বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেন। এইরূপে তিনি কালীপদবাবুর সন্দেহের বিষয়গুলি সারঙ্গকে অতি সুন্দর-ভাবে বুঝাইয়া বলিলেন। ইহা শুনিবামাত্র কালীপদবাবু পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু ঠাকুরের অপরূপ রূপ দেখিয়া তাঁহার নয়ন আর অন্যদিকে ফিরিল না। এই সময় কালীপদবাবুর হস্তে যে গ্রন্থখানি ছিল, ঠাকুর তাহার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, উহা হিন্দুশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। অতঃপর কাল্না-ষ্টেশনে ঠাকুর ডাবের জল পান করিবার নিমিত্ত তীরে অবতরণ করিয়া দেখিলেন যে, কালীবাবু পূর্ব্বেই তাঁহার জন্য ডাব লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তদ্দর্শনে তিনি বলিলেন, "এ কি! আপনি পয়সা খরচ করলেন কেন?" কালীপদবাবু যেন তাঁহাকে আপনার লোক মনে করিয়া সরলভাবে উত্তর দিলেন, "তোমাকে খাওয়াইতে ইচ্ছা করছে ; কি করবো? তুমি খাও।" ঠাকুর হাসিতে হাসিতে কালীপদবাবুর হস্ত হইতে ডাব লইয়া জলপান করিলেন। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় ডাবটীর জলপান করিবামাত্র কালীপদবাবু তাঁহার হস্ত হইতে উহা চাহিয়া লইলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'বে?" কালীপদ-বাবু বলিলেন, "প্রসাদ পাবো।" ঠাকুর বলিলেন, "ঠাকুরের ভোগ হ'লে প্রসাদ হয়। আমি নরাধম, আমাকে কি ওকথা বলতে আছে?" কালীপদবাবু যেন আব্দার করিয়া বলিলেন, "তা জানি না ; আমার খেতে ইচ্ছা ক'রছে ; আমি খাবো।" সেই সময় তাঁহার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া ঠাকুর সজলনয়নে বলিলেন, "ভগবানে মতি হউক।" অতঃপর তিনি সারঙ্গ ও কালীপদবাবুর সহিত ধর্ম্মালোচনায় সময় অতিবাহিত করিলেন।

কলিকাতায় আহিরীটোলার ষ্টীমার-ঘাটে অবতরণপূর্ব্বক কালীপদ-বাবু ঠাকুরের সঙ্গেই হোগলকুঁড়িয়ায় বিপিনবাবুর বাড়ীতে গেলেন। তিনি আর নিজের মেসে গেলেন না। এইরূপে ঠাকুর যেখানে ভ্রমণ করেন, কালীপদবাবুও সেখানে যান। বিপিনবাবুর বাড়ী হইতে ঠাকুর ও

কালীবাবু বাগবাজারে গিরীশ ঘোষমহাশয়ের বাড়ীতে 'ন'-দিদির নিকট গিয়া আহার করিলেন। বৈকালে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া তাঁহারা বেহালার নিকট স্বরশুনা গ্রামে শশী সরকারমহাশয়ের বাটীতে গমন করেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া শশীবাবু এবং তাঁহার মাসীমাতা 'যোগিনী-মা' অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই ঠাকুরের আশ্রিত। সুতরাং, সেখানে তাঁহার কোন অসুবিধাই রহিল না। এই গ্রামে যোগিনী-মা "রাজবালা" নাম দিয়া শ্রীশ্রীরাধাণীর একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অতি নির্জ্জন স্থান বলিয়া ঠাকুর সেই "রাজবালার" বাড়ীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় অবস্থান-কালে তিনি অধিকাংশ সময় গ্রন্থ-রচনায় অতিবাহিত করিতেন। দেখিতে দেখিতে ঐ গ্রামের বহু ভদ্র-সন্তান তাঁহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য, অলৌকিক ভাব-মহাভাবাদি দর্শন করতঃ তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে গুরুপদে পর্য্যন্ত বরণ করিলেন। তথাকার জনৈক ভক্ত কীর্ত্তন-মধ্যে ঠাকুরকে স্বীয় ইষ্টদেবী-রূপে দর্শনপূর্ব্বক ভাবোচ্ছ্বাসে তাঁহার ক্রোড়ে পর্য্যন্ত আরোহণ করিতেন। ভক্তবরের এইরূপ ভাবাবেশ দর্শনে গ্রামস্থ জনৈক ধনাঢ্য যুবক বিদ্রূপ করিতেন।

যাহাহউক, বিদ্রূপকারী ভদ্রলোকটি ঠাকুরের বাৎসল্য-পাশে এরূপ ভাবে বদ্ধ হইলেন যে, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার এই দীক্ষা-গ্রহণ স্বীয় ভার্য্যা ব্যতীত পরিবারস্থ অন্য সকলের অপ্রীতির কারণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা কোনওক্রমেই তাঁহাকে গুরু-দর্শন পর্য্যন্ত করিতে দিতেন না; কিন্তু গুরু-কৃপা থাকিলে শিষ্যের সমস্ত বাধাই দূর হইয়া যায়। তাই, তিনি নিশাযোগে স্ত্রীর সাহায্যে জানালা-সংলগ্ন বস্ত্র অবলম্বনে দ্বিতল প্রকোষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে মনোহরপুকুর আশ্রমে গমন করিতেন। তথায় ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনপূর্ব্বক নিশা অবসানের পূর্ব্বেই স্বীয় আলয়ে গমন করিতেন এবং নিজ কক্ষে শয়ন করিয়া থাকিতেন। এই সময় ভক্তগণ মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে

শ্রীশ্রীনিত্য-চরণ-দর্শন-লালসায় তথায় যাইয়া অনেক সময় কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে পর্ব্বাহ উপলক্ষে তাঁহারা তথায় আসিয়া উৎসবাদি পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন করিতেন।

শ্রীশ্রীদেব যে কখন কাহাকে কি ভাবে কৃপা করিতেন তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। স্বরশুনা-নিবাসী হরি ঘোষমহাশয়ের ভ্রাতৃবধূর অন্তিম-কাল উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে যাদবপুর-ঘাটস্থ শ্মশানে গঙ্গাযাত্রা করান হয়। সেই সময় অপার-করুণাময় ঠাকুর তদীয় ভক্ত-পত্নীর উপর কৃপাপরবশ হইয়া উক্ত শ্মশানে গমন করেন এবং একাগ্রচিত্তে সাধন-ভজন করিয়াও অনেকে যে ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন করিতে সমর্থ হন না, মৃত্যুর পূর্ব্বে ঠাকুর তাঁহাকে সেই ইষ্টরূপে দর্শন দান করতঃ তাঁহার ভব-বন্ধন মোচন করিয়া দেন।

এই সময় একদিন কার্য্যোপলক্ষে ঠাকুর কলিকাতায় গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে স্বরশুনা ফিরিবার পথে রাত্রি প্রায় দুইটা হইয়া গেল। তখন সাক্ষাৎ-ভূতনাথ-সদৃশ শ্রীশ্রীনিত্যদেবকে দর্শন করতঃ বহু-সংখ্যক ভূত নানাপ্রকারের বিকট শব্দ করিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। তিনি দত্তবাজারের সন্নিহিত হইলে তাহারা তত্রত্য একটী নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিল এবং তিনিও গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন। স্বরশুনা হইতে তিনি সময় সময় বালীগঞ্জ-ষ্টেশনের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত হালতু-গ্রামে শশীবাবুর গৃহে গমন করতঃ তাঁহাকে সঙ্গদানে ধন্য করিতেন। স্থানটী শ্রীশ্রীদেব পছন্দ করিতেন বলিয়া উহার পশ্চাদ্ভাগে তিনি মঠের জন্য জমি ক্রয়ের প্রস্তাব পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

স্বরশুনা থাকাকালীন ১৩০১ সাল ৫ই আষাঢ় ২৯ নং মনোহরপুকুর রোড্‌স্থ বাটী ও তৎসংলগ্ন জমি "মহানির্ব্বাণ মঠ" স্থাপনের জন্য নিলামে খরিদ করা হয়; ঠাকুর ঐ মঠ সম্বন্ধে উপস্থিত ভক্তগণকে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "তোমরা বাসন্তী-অষ্টমী-পূজার দিন আমার জন্ম-মহোৎসব গোপনভাবে করিবে; আর আষাঢ়ী-পূর্ণিমা বা গুরু-পূর্ণিমা-দিবসে গুরু-

পূজা-মহোৎসব প্রকাশ্যভাবে করিতে পার।" কিন্তু 'লীলা-সংবরণের পর ভক্তগণ ইচ্ছা করিলে, মহাসমারোহে তাঁহার জন্ম-মহোৎসব করিতে পারিবেন' এরূপ ইঙ্গিতও তিনি করিয়াছিলেন।

তিনি আরও জানান যে, অতি প্রাচীনকালে অবধূত-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কেবলানন্দ-শাখার "মহানির্ব্বাণ মঠ" প্রসিদ্ধ কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্রমে তাহা বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায় তিনি ঋষভ-বিধান বা পারম-হংস্য-ধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তনের সময় কলিকাতা মহানগরীর অধীনস্থ সুবিখ্যাত কালীঘাট-অঞ্চলে সর্ব্বধর্ম্মের মহামিলন-তীর্থ "মহানির্ব্বাণ মঠ" ১৩০১ সালে পুনঃ সংস্থাপিত করিয়া ঋষভপন্থী অবধূত-সম্প্রদায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ "মহানির্ব্বাণ মঠ" প্রসিদ্ধ কালীমাতার মন্দিরের প্রায় দেড় মাইল পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান রাসবিহারী এভিনিউয়ের উপর মনোহরপুরে প্রতিষ্ঠিত। যাহাহউক, স্বরগুনায় কিছুদিন বাস করিয়া ঠাকুর, কালীপদবাবু ও অন্যান্য ভক্তসমভিব্যাহারে নবদ্বীপ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু কালীপদবাবু আহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় ঠাকুরের নিকট থাকিতে লাগিলেন।

ইতঃপূর্ব্বেই কালীপদবাবুর পিতা আনন্দবাবু সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র মেসে না যাইয়া নবদ্বীপে যে নূতন সাধু আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গ লইয়াছেন। পিতা অনেক প্রকারে বুঝাইয়াও যখন পুত্রের মনের পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না, তখন নিরুপায় হইয়া এক রবিবারে বেলা একটার সময় আনন্দবাবু আশ্রমে আসিয়া ধীরে ধীরে দরজায় আঘাত করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের মধ্যে একজন কপাট খুলিয়া দিলেন। আনন্দবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বলিলেন এবং চুপিচুপি বলিলেন, "আমি নবদ্বীপ-মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্-চেয়ার্-ম্যান্; সুতরাং 'আমি যে এখানে এসেছি' এ কথাটী কা'রও নিকট প্রকাশ ক'র্বেন না।" অতঃপর তিনি বলিলেন, "এই সাধুর সঙ্গে মিশে কালীপদর পড়াশুনার ক্ষতি হ'চ্ছে। ইহাতে তার ভবিষ্যতের আশাভরসা নষ্ট হ'তে পারে। তাই ইঁহার নিকট আস্‌তে হ'লো।" আনন্দবাবুর

ইচ্ছানুসারে দেবেনবাবু আগন্তুকের পরিচয় ঠাকুরের নিকট প্রদান করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তৎশ্রবণে শ্রীশ্রীদেব বলিলেন, "আস্‌ছে রব্‌বার বেলা ৪ টার সময় তাঁকে আস্‌তে বলা হোক।" ইহাতে আনন্দবাবু দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক দুঃখিতান্তঃকরণে "তবে আসি" বলিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর আনন্দবাবু নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাসময় আশ্রমে উপস্থিত হইলে, তাঁহার আগমন-বার্ত্তা দেবেনবাবু শ্রীশ্রীদেবের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। ঠাকুর অল্পকাল মধ্যেই বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন এবং ঘরের শিকল টানিয়া দিয়া ভক্তগণকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইল; এমন সময় একদিকে যেমন একটী বিকট চীৎকার শ্রবণে ভক্তগণ চকিত হইলেন, অন্যদিকে তেমনই শ্রীশ্রীদেবের করতালি ও হাস্য-ধ্বনি শ্রবণে তাঁহারা কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। তাঁহারা এই ভাবে ঠাকুরকে বলিতে শুনিলেন, "ভাইস্‌-চেয়ারম্যানের এ কি হলো!" যাহাহউক, তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, আনন্দবাবু উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন ও বলিতেছেন, "মহাত্মা নারায়ণ! মহাত্মা নারায়ণ! এতদিন পরে আমি বুঝ্‌লাম যে, আমার 'মা' সাকারা—দক্ষিণা-কালী আমার ইষ্টদেবী; ব্রহ্মের সাকারত্বে আমার বিশ্বাস না থাকায়, আমি এতদিন সে মূর্ত্তি ধ্যানও করি নাই, সেমন্ত্র জপও করি নাই—প্রতিমা-পূজাকে পুতুল-পূজা ব'লেই জান্‌তাম; কিন্তু আজ আমি চিন্ময়ী 'মা' দেখ্‌লাম! কালীপদ হ'তে আমার জন্ম সার্থক হলো! আপনারা আজ হ'তে আমাকে ভাই ব'লে জান্‌বেন।" এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি শ্রীশ্রীদেবকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। তৎপর মঙ্গলবারেই তিনি প্রতিমা গড়াইয়া দক্ষিণা-কালী পূজা করিলেন এবং শ্রীশ্রীদেবকে সভক্ত নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তথায় শ্রীমৎ-স্বামী কৃষ্ণানন্দ "রাই রূপ কাঁচা সোনা" ইত্যাদি গান আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব ভাবাবেশে অদ্ভুত নৃত্য আরম্ভ করিলেন। আনন্দবাবু অনেক দূরে বসিয়াছিলেন। কিন্তু এক লম্ফে শ্রীশ্রীদেবকে

জড়াইয়া ধরিলেন। কালীপদবাবুও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সে এক অপরূপ দৃশ্য—আনন্দবাবুর ছেলেও নাচেন, আনন্দবাবুও নাচেন! শেষ রাত্রে নৃত্য বন্ধ হইলে, শ্রীশ্রীদেব প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই দিনই সপরিবারে কালীপদবাবু শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালদেবের নিকট দীক্ষিত হন।

সেইদিন হইতে আনন্দবাবু ভক্তগণের সঙ্গে অত্যন্ত সরল ভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কালীপদবাবু আশ্রমে আসিয়া সংকীর্ত্তন করেন, কখনও হাসেন, কখনও নাচেন, এবং কখনও কাঁদেন। মধ্যে মধ্যে দিব্য বানরের ন্যায় হুঙ্কারও করেন। একদিন ভাবাবেশে শ্রীশ্রীনিত্য-দেব তাঁহার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "ওরে আমার মুরারি রে!" যাহাহউক, ঠাকুরের নিকট সময় সময় কালীপদবাবু প্রার্থনা করিতেন যে, তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হউক। তিনি (শ্রীশ্রীদেব) তাহাতে অসন্তুষ্ট হইতেন। একদিন ঠাকুর ভাবাবেশে বিভোর ছিলেন, এমন সময় কালীপদবাবু তাঁহার শ্রীচরণ দুইখানি ধরিয়া প্রার্থনা করিলেন, "আমার পত্নীর মৃত্যু হোক্।" তৎশ্রবণে ঠাকুর বলিলেন, "হোক্, হোক্, হোক্"। ভক্তগণ এইরূপ প্রার্থনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কালীপদবাবু বলিলেন, "বড় পিছ্‌টান্! ঠাকুরের কাছে আস্‌বার বড় বাধা।" ইহার কয়েক দিন পরে কলেরা রোগে তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হয়। তৎপর কালীপদ-বাবুকে দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "বাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল ত?" কালীপদবাবু হাসিতে হাসিতে তদুত্তরে বলিলেন, "আর যেন আমার বিয়ে না হয়।" ইহাতে ঠাকুর বলিলেন, "তা'ত তুমি পূর্ব্বে জানাও নাই। আমি এই চক্ষেই দেখ্‌ছি, তোমার বিয়ে হ'বে, হ'বে, হ'বে; এ পত্নী হ'তে তোমার বাধা ঘটত না; কিন্তু সে পত্নী হ'তে তোমাকে মায়াজালে জড়িত হ'তে হ'বে।" ইহা শুনিয়া কালীপদবাবু পুনরায় বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর কালীপদবাবুকে ডাক্তার ডাকিতে যাইতে হইল। তাঁহার

বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলিয়া সেই ঘনঘটাচ্ছন্ন-রজনীযোগে ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই তিনি একাকী "জয় গুরু!" বলিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে কালীপদবাবু ঠাকুরকে সম্মুখে দেখিয়াই রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "এই যে গোপাল এসেছেন!" ঠাকুর বলিলেন, "চল, আমি তোমার সঙ্গে যাই; একাকী তুমি কেমন ক'রে যাবে?" কালীপদ-বাবু ডাক্তারের বাটীতে গেলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরও ছিলেন। ডাক্তার পাওয়া গেল না বলিয়া কালীবাবু বাড়ী ফিরিলেন; কিন্তু দেখিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে। এই ঘটনার পর আনন্দবাবু একদিন ঠাকুরের সম্মুখে প্রস্তাব করিলেন, "কালীপদর মাকে একবার সেই মৃত পুত্র দেখাতে হ'বে।" অনেক প্রকারে ঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনরূপেই তিনি প্রবোধ মানিলেন না। অবশেষে ঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হ'বে।" ইহার পর একদিন সন্ধ্যার পর আনন্দবাবু আহারান্তে বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন; এমন সময় তাঁহার সেই মৃত পুত্র আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাবা, পান খেয়েছেন?" তদুত্তরে আনন্দবাবু বলিলেন, না রে, না; তোর মার কাছ থেকে নিয়ে আয়।" ছেলে "মা, পান দাও, পান দাও" বলিয়া ভিতর হইতে পান লইয়া তাহার বাবাকে দিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, মা ও বাবা উভয়েরই স্মরণ হইল না যে, তাঁহাদের ছেলে মরিয়া গিয়াছে! আনন্দবাবু পান খাইয়া ছেলেকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে, নিজেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রা ভঙ্গের পর আনন্দবাবু ও তাঁহার স্ত্রী সেই পুত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আনন্দবাবুর মা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "তোরা কা'কে খুঁজ্‌ছিস্? তা'কে যে আমরা জন্মের মত হারিয়েছি!" তখন আনন্দবাবুর* চমক্ ভাঙ্গিল এবং সপরিবারে আশ্রমে আসিয়া এই অদ্ভুত ঘটনা ভক্তগণের নিকট ব্যক্ত করিলেন।

---

* এইস্থানে শ্রীশ্রীদেবের শিষ্য ও শ্রীযুক্তআনন্দবাবুর অন্যতম পুত্র (নবদ্বীপ-মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান্ ও বর্ত্তমানে স্থানীয়

এইরূপে যতদিন যাইতে লাগিল, ততই নবদ্বীপে ভক্ত-গোষ্ঠী বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা শ্রীশ্রীদেব বিদ্যানগরের প্রসঙ্গে গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌমমহাশয়ের কথা বর্ণনা করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন। তদ্দর্শনে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সেই সংকীর্ত্তন-স্থানে ভক্তগণের মধ্যে যিনি যে বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীদেব তাঁহাকে সেই বরই দিয়াছিলেন। সারারাত্রি সংকীর্ত্তন হইবার পর, শ্রীশ্রীদেব ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমরা বাড়ী

এড্ওয়ার্ড্-লাইব্রেরী ও বকুলতলা-হাইস্কুল, নবদ্বীপ-বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি স্কুলের সেক্রেটারী) শ্রীযুক্তজনরঞ্জন রায়মহাশয় শ্রীশ্রীদেবের মহিমা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল: "...ঠাকুরের দর্শনেই আমি বিভোর হ'য়ে যেতাম,—আনন্দ-স্পন্দনে প্রাণে যেন একটা তরঙ্গ বিক্ষোভিত হইয়া উঠিত!...কি একটা জিনিষ প্রাণের মাঝে যেন ধরা দিত,—যাহাতে নিমেষের জন্য বাহ্য জগৎটাকেই হারাইয়া ফেলিতাম!"...পিসিমা বল্লেন—"ওরে, আজ ঠাকুরের গোপালভাব হ'য়েছিল। এক ভক্ত কতকগুলি রসগোল্লা দিয়ে গিয়েছিলেন। ঠাকুর গোপালের মত ব'সে একটী একটী ক'রে রসগোল্লা চেয়ে নিয়ে খেয়েছেন। কিন্তু এখন আশ্চর্য্য দেখ্ছি, রসগোল্লার বাটী যেন ভরাই রয়েছে! তোরাও প্রসাদ পাবি।"... ঠাকুরকে এক একদিন গৌতম বুদ্ধের মত বলিয়া মনে হইত। উভয়েই সংসার-ত্যাগী, মহাশিক্ষক, জগদ্গুরু, শান্ত-কান্তিময় মূর্ত্তি!...আমার মাতার অষ্টম গর্ভের সন্তান মারা গিয়াছে। ঠাকুর আমার মা ও বাবাকে সান্ত্বনা দিতে আমাদের নবদ্বীপস্থ নিত্যানন্দ পাড়ার বাড়ীর বৈঠকখানায় আসেন। সঙ্গে তখনকার নিত্যপার্ষদগণ ছিলেন। ...তখন রাত্রি আন্দাজ ৮৷৷৹টা হইবে।...শিব-বিষয়ক গান হইতেছিল মনে হয়।...হঠাৎ মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—তোমরা দেখেছ...দেখেছ... ঠাকুরের গায়ের রং যে সাদা হয়ে গিয়াছে! সকলে দেখিলেন ঠাকুর সমাধিস্থ...চক্ষু মুদ্রিত...আর দেখিলেন এই রং পরিবর্ত্তন লীলা।...

থেকে বিশ্রাম ক'রে এস। আমি আজই বিদ্যানগর যা'ব।" ভক্তগণ সকলেই প্রস্তুত হইলেন এবং "জয় নিত্যগোপালের জয়!" বলিয়া ঠাকুরের সঙ্গে বিদ্যানগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নবদ্বীপের প্রান্তভাগেই শুঁড়ীর দোকান। ঠাকুর সেই দোকান দেখিয়াই শ্রীশ্রীবলদেবের ভাবে আবিষ্ট হইয়া, "দাও মদ, দাও মদ" বলিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অধর দিয়া অবিরল সুধা-ধারা ঝরিতে লাগিল। সেই সুধা যিনি স্পর্শ করিয়াছিলেন, তিনিও বিভোর হইয়াছিলেন। সেইসময় ভক্তগণ কহিতে লাগিলেন, "প্রেম-সুধা কে নিবি'রে আয়। ঐ ত্যাখ্ সুধার ধারা বয়ে যায়॥" তৎপর ভক্তগণ শ্রীরামপুর পশ্চাৎ করিয়া চাঁদপুর অতিক্রমপূর্ব্বক (যে স্থানে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বাটী ছিল সেই) বাসুদেবপুর উপস্থিত হইলেন। তথায়, "এই পথ কাটোয়ার" বলিয়াই ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। তদ্দর্শনে ভক্তগণ হরিনাম-সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইভাবে কতক্ষণ অতিবাহিত

ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম দেখার দিন পিতৃদেব বলিয়া আসেন —তিনি তাঁর পীরতলার বাগান-বাড়ীতে দক্ষিণা-কালিকা-পূজার সময় রাত্রে তাঁহাকে লইয়া যাইবেন। সেখানে ঠাকুর সদলবলে আসেন। ৺কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন। আমি ও আমার ছোট বোন্ শ্রীমতী প্রভাবতী ছিলাম, বেশ মনে আছে। কালী-বিষয়ক গান হইতেছিল। কালিদাসবাবু ঠাকুরকে কেবলই বলিতেছেন—কৈ কিছু তো দিলেন না· কিছুই তো পেলাম না। ঠাকুর হঠাৎ তাঁর একখানা হাত চাপিয়া ধরিলেন। তারপর কালিদাস দাদা একবার লাফাইয়া উঠেন—আবার পড়েন—আবার ওঠেন· আছার খান বিবস্ত্র হইয়া গিয়াছেন তিনি···মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছে। ভাবাবেশে ভক্তগণ উন্মত্তপ্রায়। ওদিকে ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ। দক্ষিণা-কালিকার মতো একটী পা আগাইয়া দিয়াছেন· দু'হাতে বরাভয়· জিব্ বাহির হইয়া পড়িয়াছে··· সর্ব্বাঙ্গ কালো।···অনেকক্ষণ পরে ঠাকুরের সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল।··· আবার গায়ের রং স্বাভাবিক হইল।

হইল। ঠাকুর সমাধি হইতে ব্যুত্থান লাভ করিয়া বিদ্যানিধি-স্থানে নিতাই-গৌর দর্শন করেন। অতঃপর তথাকার গোয়ালাপাড়ার ব্রজনাথ ঘোষের বাটীতে তিনি সভক্ত গমন করিয়া বৃদ্ধকে কৃপা করেন।

এই সময় ভক্তবর দেবেনবাবু ঠাকুরের সেবার জন্য একজোড়া সন্দেশ সঙ্গে লইয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু কুড়ি পঁচিশ জন ভক্তের মধ্যে উহা বাহির করিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। ইত্যবসরে ঠাকুর সেই সন্দেশ জোড়ার কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং ভক্তবর ধর্ম্মদাসবাবুকে বলিলেন, "ধামাই, তোমাদের জোড়া ঠাকুরকে এই জোড়া সন্দেশ ভোগ দিয়ে এস।" ধর্ম্মদাসবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ী যাইয়া উহা নিতাই-গৌরকে ভোগ দিয়া আনিলেন। দেবেনবাবুর ইচ্ছা যে, ধর্ম্মদাসবাবু ঠাকুরকে উহা নিজ হস্তে খাওয়াইয়া দেন। কিন্তু ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, "তা হ'বে না, তা হ'বে না—আমি সবাইকে প্রসাদ দেব।" এই বলিয়া তিনি উহা লইলেন। তখন কালিদাসবাবু বলিলেন, "আমি খণ্ড প্রসাদ চাই না; অখণ্ড প্রসাদ চাই।" ঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হ'বে—তোমরা হরিনাম কর।" তৎপর হরিনাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সকলেই মুখে নাম করিতেছেন। কেহ বা ঠাকুরকে ব্যজন করিতে লাগিলেন, কেহ বা পদসেবা করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে ঠাকুর "প্রসাদ নাও, প্রসাদ নাও" বলিয়া এক একজোড়া সন্দেশ সকলকে দিতে লাগিলেন। এইরূপে কেহ বা দশটা, কেহ বা বারটা, কালিদাসবাবু সতরটা সন্দেশ খাইয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া ভক্তগণের মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল। কালিদাসবাবু ঠাকুরের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "কই?—আছে? আরও দিন!" তখন ঠাকুর বালকভাবে হস্ত মুঠা করিয়া বলিলেন, "বল, দেখি, ভাই, টোক্কা না ফক্কা?" আবার নিজেই বলিলেন, "ফক্কা, আর নেই।"

বিদ্যানগর হইতে আহারান্তে রওনা হইয়া ভক্তসঙ্গে ঠাকুর ভাতশালার পথে চলিলেন। এই পথে গেলে নদীয়ামণ্ডল পরিভ্রমণ হইবে শুনিয়া তিনি অতীব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সেই সময় মাঘমাসের

শেষ বলিয়া ক্ষেত্রে নানারূপ ফসলাদি ছিল। তখন ঠাকুর বালকের ভাবে কখনও "আখ্ খাব," কখনও "কলাই-শুঁটী খাব" বলিতে বলিতে জমির মধ্যে দ্রুতবেগে চলিলেন এবং লাফাইয়া লাফাইয়া কাপড়ের মধ্যে অনেক কলাই-শুঁটী তুলিলেন। কিন্তু কৃষকদের যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, তজ্জন্য করুণাময় ঠাকুর শস্য-বৃদ্ধি-হেতু "নাগ, নাগ, সহস্রমুখে নাগ" মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সেই সময় ভক্তগণ বোধ করিলেন যে, ক্ষেত্রস্থ মটর-গাছগুলিও যেন আপন আপন অঙ্গ তুলিয়া দিয়া বলিতে লাগিল, "আমার ফল নাও, আমার ফল নাও।" এইরূপে প্রায় সন্ধ্যাকালে ভাতশালার পঞ্চানন-তলায় ভক্তসঙ্গে ঠাকুর উপস্থিত হইলেন। তথায় কলাই-শুঁটী আগুণে পোড়াইয়া পঞ্চাননকে ভোগ দেওয়া হইল এবং তাঁহার হস্ত হইতে ভক্তগণ প্রসাদ পাইলেন। সেইখানে এক কৃষক-বালক দণ্ডায়মান ছিল। সে বলিল, "আপনারা কলাই-শুঁটী খেয়ে জল খাবেন কি ক'রে?—গুড় এনে দেব?" তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "সবই গুরুর ইচ্ছে—গুড় আন্‌বে বই কি?" তখন সেই কৃষক-বালক নূতন আকের সারগুড় আনিয়া ঠাকুরকে অর্পণ করিল। তিনি তাহার মস্তকে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন, "দুধে ভাতে খেও, দুধে ভাতে খেও।" সেখান হইতে সভক্ত ঠাকুর গুড় ও কলাইপোড়া আহারপূর্ব্বক ধর্ম্মদাসবাবুর বাটীতে গেলেন। তাঁহার বাটীর নিকটে আর একটী বাটী ছিল। লোকে ইহাকে 'সান্যাল-বাড়ী' বলিত। তথায় 'মনমা' নামে এক ভক্তিমতী বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা ছিলেন। তিনি ধর্ম্মদাসবাবুর নিকট ঠাকুরের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ঠাকুর কি এই ভক্তিহীনার বাড়ী যা'বেন না?" এইকথা শুনিবামাত্র ঠাকুর বলিলেন, "যাবো, যাবো।" 'মনমা' তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিলেন, "কালীর কোলে উঠ।" 'মনমা'র আনন্দের সীমা রহিল না। সেই সন্ধ্যার সময় তিনি স্নান করিয়া ঠাকুরের ভোগ রাঁধিতে গেলেন এবং ভক্তগণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই

ভোগ রান্না হইল। 'মনমা' ঠাকুরের বসিবার জন্য আসন দিলেন। ঠাকুরকে আসনে বসাইয়া তিনি নিজেই পূজা করিতে লাগিলেন। এই পূজা শেষ হইতে রাত্রি প্রায় বারটা বাজিল। তারপর ভক্তগণ সকলেই পরমানন্দে প্রসাদ পাইলেন। তখন 'মনমা' বলিলেন, "ধ্যমাই, আমি প্রসাদ পাব?" ইহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণের বিধবা, রাত্রিতে প্রসাদ পা'বেন কি?" তদুত্তরে 'মনমা' বলিলেন,— "আর ত আমার রাত্রি নেই; আজ যে আমি দিন পেয়েছি!" এইরূপে সেই রাত্রি 'মনমা'র বাটীতেই অতিবাহিত হইল।

তৎপর দিবস আহারাদি করিয়া ভক্তগণসঙ্গে ঠাকুর নবদ্বীপাভিমুখে রওনা হইলেন। নবদ্বীপ প্রবেশ করিবার পথে মুচিপাড়া। ঠাকুর সেই পথে প্রবেশ করিয়া এক মুচির বাড়ীতে হরিনাম শুনিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে ঠাকুর সেই বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। বাড়ীর কর্ত্তার নাম ভুবন। তাহার ন্যায় ভক্ত বিরল—মৎস্য-মাংস-বর্জ্জনশীল—নবদ্বীপ পরিভ্রমণই তাহার কার্য্য—সন্ধ্যার সময় পত্নী, পুত্র, কন্যা ও জামাতাদিগকে লইয়া সে হরিনাম করিত। ঠাকুর সেই ভুবনকে গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন, "মুচি হ'য়ে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে।" সেইদিন হইতে ভুবন ভক্ত-গোষ্ঠীর মধ্যে পরিগণিত হইল। আশ্রম পর্য্যন্ত সে কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিয়াছিল। ইহার পর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ভক্তগণ বাড়ী ফিরিলেন।

অতঃপর একদিন কালিদাসবাবুর মধ্যম ভ্রাতা গণেশবাবু ঠাকুরকে বন-ভোজন করাইতে ইচ্ছা করিয়া প্রচুর আয়োজন করিলেন। ইনি ঠাকুরকে দর্শন করিতে ও আহার করাইতে বড় ভালবাসিতেন। এই উৎসবে ঠাকুর স্বয়ং তরকারী কুটিবার ভার লইলেন। পাকাটোলের দক্ষিণে ও ভুঁইচারার পশ্চিমে যেখানে বারুইদের বরজ আছে, সেই 'নিভৃত গহন বনে' বন-ভোজনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। গণেশবাবু ও হরেন্দ্রবাবু ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। দেবেনবাবু রন্ধনে নিযুক্ত হইলেন।

কালীপদবাবুর বন্ধু, ছাপ্‌রা স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার, গোপীবাবুও, ঐ বন-ভোজনে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রের বিচার করিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু কালিদাসবাবু তাঁহাকে শুষ্ক তর্ক করিবার বিশেষ অবসর দিলেন না এবং হাততালি দিয়া "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ" ইত্যাদি নাম আরম্ভ করিলেন। তখন কোথায় গেল ঠাকুরের তরকারী কোটা, আর কোথায় গেল গোপীবাবুর বিচার! ঠাকুর সংকীর্ত্তনে মহানৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং ভক্তগণের মধ্যেও অনেকে নৃত্য করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই বনভোজনে বনের শৃগালও আপন আপন স্বরে কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিল! ঠাকুর ভাবাবেশে হরিলুট দিবার ছলে উহাদিগকে সন্দেশ খাওয়াইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে দশ বার জন মাত্র ভক্তের প্রসাদ পাইবার আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই আয়োজনে প্রায় আড়াই-শত লোক পরম পরিতোষের সহিত ভোজন করিয়াছিলেন! সেই বন-ভোজনে হরেন্দ্রদত্ত, গোপীকুণ্ডু মহাশয়াদি কয়েক জন ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। বন-ভোজন শেষ করিয়া ঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে রামচন্দ্র সাহার বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই সময় ঠাকুরের নবদ্বীপ-মণ্ডল দর্শনের বড়ই ঔৎসুক্য হইল। কিন্তু নবদ্বীপের স্থান নির্দ্দেশ লইয়া তৎকালে বড়ই গোলমাল চলিতেছিল। কেহ কেহ মায়াপুরকে নবদ্বীপ বলিতেন। কিন্তু মায়াপুরকে সে দিকে 'মিঞাপুর' বলিয়া সাধারণে জানিতেন। যাহাহউক, এই সমস্ত বিষয় শুনিয়া ঠাকুর বলেন, "নবদ্বীপ এখন গঙ্গাগর্ভে, এপারেও নয়, ওপারেও নয়।" ইহার কিছুদিন পরেই, সেই বৎসর অনেকে দেখেন যে, নদীয়ার গঙ্গাবক্ষে (বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর দিকে) একটী মন্দিরের চূড়া জাগিয়া উঠিয়াছে। এই কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের মায়াপুর ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হয়; একদিন ফাল্গুনমাসের বৈকালে, ভক্তগণ সঙ্গে তিনি মায়াপুর দর্শনে গেলেন। উহা দর্শনপূর্ব্বক কিছু পথ গমন করিতে করিতে ভীষণ

গর্জ্জন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "ঐ খোল ভাঙ্গিল, ঐ খোল ভাঙ্গিল!" এই সময় ঠাকুরকে ধরিয়া রাখিতে পারে, কাহার সাধ্য? তিনি মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "কাজি মামা, তোকে মার্‌বো!" এই অবস্থাতেই ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে চাঁদ কাজির সমাধিস্থলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর চাঁদকাজির সমাধি পরিক্রমণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই সমাধিস্থলে একটী পত্রশূন্য কাঠমল্লিকা বৃক্ষ ছিল। শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব সেইখানে দণ্ডায়মান হইবামাত্র সমাধিস্থ হইলেন। অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রকটিত হইয়া অঙ্গজ্যোতিঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত—অশ্রুধারায় বক্ষঃপ্লাবিত—সর্ব্বশরীর হিমবৎ শীতল—নয়নের দৃষ্টি স্থির হইল—যেন মৃতদেহ। এমন সময় সেই কাঠমল্লিকা বৃক্ষ হইতে অজস্র পুষ্প পতিত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আবৃত করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে ভক্তগণ মনে করিলেন যে, ইহা চাঁদ কাজিরই পূজার পরিচয়। ইহার উপর দৈবযোগে তথায় একদল কীর্ত্তনীয়া আসিয়াও সেই সুমধুর কীর্ত্তনে যোগদান করিল। গ্রামের মুসলমান্-মহাত্মাগণ আসিয়া সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। তিনি সমাধি হইতে ব্যুত্থান লাভ করিয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন। চাঁদ-কাজির বংশধরগণ প্রার্থনা করিলেন, "এখানে কিছু জলযোগ কর্‌তে হ'বে। বৈষ্ণবকে দিয়ে এনে দেব?" তৎশ্রবণে ঠাকুর বলিলেন, "তুমি কি বৈষ্ণব নও? আমি কি মুসলমান্ নই?" এই বলিয়া তিনি ডাব ও বাতাসা লইয়া হরিলুট দিলেন। কি হিন্দু কি মুসলমান্ সকলেই পরমানন্দে প্রসাদ পাইলেন। অতঃপর তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে যেখানে খোল ভাঙ্গা হইয়াছিল সেই স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

অনন্তর ভক্তগণসঙ্গে ঠাকুর গোবিন্দ তুড়োর মাছধরা ডিঙ্গীতে গঙ্গাপার হইবার জন্য উঠিলেন। ঢেউ নাই, বাতাস নাই; অথচ জল উছলিয়া উছলিয়া তাঁহার পাদপদ্মে পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে

ডিঙ্গী জলে প্রায় পূর্ণ হইয়া গেল। গোবিন্দ মাঝি সকলকে সোজা হইয়া বসিতে বলিল। সকলে সাম্‌লাইয়া বসিলেন; তথাপি জল উঠা বন্ধ হয় না দেখিয়া, ভক্তগণ ঠাকুরের শ্রীচরণ দুইখানি গঙ্গার দিকে দিতে বলিলেন। "বাপ্‌রে! গঙ্গা ঠাকুর! ওদিকে কি পা দিতে আছে?" বলিতে বলিতে তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন ভক্তগণ তাঁহার শ্রীচরণ দুইখানি ধীরে ধীরে গঙ্গার দিকে দিবামাত্র জল উঠা বন্ধ হইল! ইহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। যাহাহউক, অল্পকাল মধ্যে নৌকা তীরে লাগিল; কিন্তু গোবিন্দ আর ঠাকুরকে ছাড়ে না—বলে, "আমার মাথায় পা দিতে হ'বে।" ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবানের কৃপা হউক, ভগবানের কৃপা হউক।" সেই অবধি গোবিন্দ নিত্যভক্তের মধ্যে পরিগণিত হইল।

দোল-পূর্ণিমা উপলক্ষে আশ্রমে একটী মহোৎসব হইবে বলিয়া নানাদেশ হইতে বহু ভক্ত সমাগত হইয়াছেন। প্রাতঃকাল হইতে হরিনাম-সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে সকলেই আবীর দিলেন। অতঃপর তাঁহাকে লইয়া ভক্তগণ ষ্টেশনের ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। তথায় ষ্টেশন-মাষ্টারের বাসায় গিয়া মহা হরিনাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভোগেরও ব্যবস্থা হইল। বেলা চারি ঘটিকার সময় এই কীর্ত্তন শেষ হইলে, ভক্তগণ পরমানন্দে প্রসাদ পাইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। ইতিমধ্যে ধর্ম্মদাস প্রভৃতি কতিপয় ভক্ত আশ্রমে প্রসাদ পাইবার কথা জানাইবার জন্য বাড়ীতে গেলেন। তথায় ধর্ম্মদাসবাবুর মাতুল দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্যমহাশয় বজরাপুর হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি মহানিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাই, ভাগিনেয় মহোৎসবে যোগদান করিবেন শুনিয়া, প্রথমতঃ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় নিত্যগতপ্রাণ ভক্তের সঙ্গ ও বাক্যের প্রভাবে মহাক্রোধী জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণেরও প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি যেন ঠাকুরের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াই ধর্ম্মদাসবাবুর সহিত মহোৎসবে যোগদান

করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভট্টাচার্য্যমহাশয় ঠাকুরের সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও এবং তাঁহার উৎসব-স্থলে গমনের কোনও নিশ্চয়তা না থাকিলেও, অন্তর্য্যামী ঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার প্রসাদ পাইবার স্থান প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। যাহাহউক, যে ঘরে সভক্ত ঠাকুর প্রসাদ পাইতেছিলেন, সেই ঘরের কুলুঙ্গীতে একটী সুন্দর মৃণ্ময়-গোপাল-মূর্ত্তি ছিলেন। ঠাকুর দেবেনবাবুকে বলিলেন, "ইহা তাঁহারই প্রসাদ।" কি আশ্চর্য্য! তদ্দর্শনে দেবেনবাবু বলিলেন, "উনি যে আমারই গোপাল!" এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরকে কহিলেন, "আমার গোপাল আমাকে দিন্।" তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "প্রসাদ পেয়ে আপনার গোপাল আপনি গ্রহণ ক'র্‌বেন।" তৎপরে সকলেই প্রসাদ পাইলেন। কেবল ত প্রসাদ পাওয়া নয়, সেই সঙ্গে ঠাকুর ভক্তগণের মনোবাসনা পর্য্যন্ত পূরণ করিলেন। তিনি বালকভাবে ভক্ত-গণকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে নিজহস্তে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। সেই সময় ঠাকুর গোপালের ন্যায় মাটীতে হাঁটু দিয়া বসিলেন এবং কখনও কখনও প্রসাদ মুখে দিতে লাগিলেন, কখনও কখনও মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে জনৈক ভক্ত ভয় দেখাইয়া বলিলেন, "উচ্ছিষ্ট ক'রোনা, মা মার্‌বে!" এই কথা শুনিয়া ঠাকুর আধ আধ ভাবে 'মা' 'মা' বলিয়া ঢুলিতে লাগিলেন, যেন মায়ের কোলে বসিয়া স্তন্যপান করিতেছেন। এই ভাবাবেশে রাত্রি বার ঘটিকা হইল। তখন ঠাকুর বলিলেন, "যে রাত্রিটুকু আছে, কীর্ত্তনে কাটান যাক্।" ভক্তগণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সেই কীর্ত্তনে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। এইভাবে দোল-পূর্ণিমার হরিবাসরে সভক্ত ঠাকুর জাগ্রত রহিলেন। প্রাতঃকালে বাড়ী যাইবার সময় দেবেনবাবু ঠাকুরের নিকট হইতে গোপাল-মূর্ত্তি চাহিয়া লইলেন এবং বলিলেন যে, এই মূর্ত্তি তিনি বজ্রাপুর লইয়া যাইবেন: তথায় স্বতন্ত্র বাটীতে তিনি এই মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাঁর নাম 'নিত্যগোপাল' রাখিবেন। তৎশ্রবণে বিস্ময়ে ও আনন্দে

ভক্তগণ সকলেই "জয় ! নিত্যগোপালের জয় !" বলিয়া উঠিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই দেবেনবাবু বজ্‌রাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক পৃথক্ বাটীতে 'নিত্যগোপাল'-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে অনেকেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইলেন। কিন্তু দেবেনবাবু সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তাঁহার 'নিত্যগোপালের' সেবা করিতে লাগিলেন। ঐ গ্রামেব মালোদের মধ্যে কেহ কেহ 'নিত্যগোপালের' নিকট প্রার্থনা করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, তাহারা 'নিত্যগোপালের' সেবা-পূজাদির যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিল। এই কথা লোকপরম্পরায় চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তৎশ্রবণে ঐ গ্রামের বেণীমাধব কর্ম্মকারমহাশয় একটী মোকদ্দমার জন্য দেবেনবাবুর প্রতিষ্ঠিত সেই 'নিত্যগোপালের' নিকট প্রার্থনা করিয়া ফললাভ করিলেন। সেইজন্য তিনি 'নিত্যগোপাল'কে সোনাব চূড়া, রূপার বাঁশী ও সোনার বালা দিয়া পূজা দিলেন! ঐ সঙ্গে মহোৎসবও হইয়াছিল। সেই সময় হইতে বেণীবাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গ প্রত্যহ 'নিত্যগোপালে'র নিকট কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই কীর্ত্তনে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের নাম বজ্‌রা-পুরে অনেকের নিকট ব্যক্ত হইল। উক্ত গ্রামের উপেন্দ্রনাথ গুপ্তমহাশয় স্বপ্নে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের কৃপা প্রাপ্ত হইলেন। বেণীবাবুর স্বভাবেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইল। এই সময় ধর্ম্মদাসবাবু একবার বজ্‌রাপুর গিয়াছিলেন। সেখানে ভক্তবৃন্দের মুখে তিনি দিবানিশি কেবল শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালদেবের নাম শুনিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে ধর্ম্মদাসবাবু প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া রহিলেন। তিনি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের আশ্রিত বলিয়া, বজ্‌রাপুরের ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মদাসবাবুও ঠাকুরের নাম করিতে করিতে ভক্তবৃন্দকে এরূপ আশ্বাস দিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা অচিরেই যেন শ্রীশ্রীদেবের কৃপা লাভ করিতে পারেন। এইরূপে কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল। তখন ভক্তবৃন্দ 'নিত্যগোপালে'র বাটীতে আসিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর সকলেই স্থির করিলেন যে, আগামী জন্মাষ্টমীতে তাঁহারা ঠাকুরের দর্শন করিতে নবদ্বীপ যাইবেন। কিন্তু উপেনবাবু অপেক্ষা না করিয়া ধর্ম্মদাসবাবুর সঙ্গেই শ্রীধামে গমন করিলেন। এইরূপে ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব বজ্‌বাপুরের ভক্তগণকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর ঠাকুর হাল্‌তুর চন্দ্রকান্ত ঘোষমহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাঁহার সঙ্গে ১৩০২ সালের ২৮শে পৌষ গঙ্গাসাগর-তীর্থে গমন করেন। তথা হইতে ৩রা মাঘ কলিকাতা-মনোহরপুর-আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। তথায় অনেক দিন অবস্থান করিয়া তিনি দোল উপলক্ষে বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে স্বরশুনায় (বেহালা) শশিভূষণ সরকারমহাশয়ের আলয়ে গমন করিলেন। ভক্তগণ দোলের দিন শ্রীশ্রীদেবের গলায় পুষ্প-মালা ও চরণে আবীর অর্পণ করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, শ্রীশ্রীদেবের অঙ্গে ফাগ্ দিতে লাগিলেন; এবং নাচিতে নাচিতে সকলে "আজি হোলি খেল্‌ব, শ্যাম, তোমারই সনে" এই গানটী গাহিতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবাবেশে কখনও চরণে চরণ দিয়া দাঁড়াইতেছেন, কখনও বা ভক্তগণের গায়ে পিচ্‌কারী দিতেছেন, কখনও বা নৃত্য করিতেছেন, কখনও বা অঙ্গুলি ঘুরাইয়া "বোল" "বোল" বলিয়া নাচিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ভক্তগণ শ্রীশ্রীনিত্যদেবের সঙ্গে ফাগ্-লীলা হইতে বিরত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তনাদি বন্ধ করিলেন। পরে সকলে স্নানান্তে ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করিয়া মহানন্দে শ্রীদোলমহোৎসবের প্রসাদ পাইলেন। সেই দোল-লীলার পরে শ্রীশ্রীদেবের শ্রীঅঙ্গ একমাসেরও অধিক দিন লাল ছিল। তাঁহার সেই দোল-লীলায় পরিহিত পবিত্র বস্ত্রখানি অদ্যাপি কলিকাতা-মহানির্ব্বাণমঠে অতি যত্নসহকারে রক্ষিত হইতেছে। যাহাহউক, ইহার কিছুদিন পরেই ঠাকুর নবদ্বীপ প্রত্যাগমন করিলেন।

অনেক দিন পর শ্রীশ্রীদেবের দর্শন লাভান্তর নবদ্বীপস্থ ভক্তবৃন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তাই, আবার তুমুল কীর্ত্তন আরম্ভ

হইল। ভক্তগণ একদিন কালীবিষয়ক কীর্ত্তন করিতে করিতে দেখিলেন যে, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন—তাঁহার জিহ্বা লম্বমান হইয়া অনেকটা বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার কনকোজ্জ্বল গৌরবর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে পরিণত হইয়াছে! ইহাতে ভক্তগণ বিস্ময় ও আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। এইভাবে অনেক সময় অতিবাহিত হইবার পর ঠাকুর স্বাভাবিক অবস্থায় আসিলেন।

এদিকে যতদিন যাইতে লাগিল, ততই ভক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রামচন্দ্র সাহার বাড়ীতে আর স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না। তখন আর একটী আশ্রম দেখিবার ব্যবস্থা হইল। অল্পকাল মধ্যেই বাগবাজার-নিবাসিনী ঠাকুরের জনৈকা দূরসম্পর্কীয়া ভগিনীর অর্থসাহায্যে আম্‌পুলিয়াপাড়ার আশ্রমটী খরিদ করা হইল। সেইবারই ঐ আশ্রমে 'লক্ষ্মী পিসিমা'র অন্নপূর্ণা-পূজা এবং ঠাকুরের শুভ জন্ম-তিথি-উৎসব সুসম্পন্ন হইবে বলিয়া ছাদ মেরামত করিবার জন্য দুইটি রাজ ও দুইটি যোগাড়ে কাজ করিতে লাগিল। যেদিন ছাদে খোয়া উঠিবে, সেইদিন মিস্ত্রি চারি জন ঠাকুরকে বলিল, "আজ আমরা ঠাকুরের প্রসাদ পাব। খোয়া তোলার দিন আমরা খেতে পাই।" তখন তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আজ তোমরা চার জন এখানে প্রসাদ পাবে।" সেই উপলক্ষে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের চিড়া ভোগ দেওয়া হয়। রাজমিস্ত্রিদের স্নান করিয়া আসিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। তাহাদের পরিবেশন করিবার জন্য ভক্তগণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে "জয় জ্ঞানানন্দ স্বামীজীকি জয়!" বলিয়া তিনশত বাউল করোয়া হাতে লইয়া মহোৎসবে উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, "মিস্ত্রিদের নিকট মহোৎসবের সংবাদ শুনে আমরা প্রসাদ পেতে এসেছি।" ঠাকুর ভক্তগণের মুখে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া একটু ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি স্বয়ং ভোগ উৎসর্গ করিয়া দিলেন এবং ভক্তগণকে পরিবেশন করিতে বলিলেন। ঠাকুর যে ভক্তকে যাহা পরিবেশন করিতে আদেশ দিলেন, তিনি তাহাই পরিবেশন করিতে

লাগিলেন। সকলে পরিতোষ সহকারে আহার করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিল; কিন্তু, চিড়া ও অন্যান্য সামগ্রী যে পরিমাণে ছিল, সেই পরিমাণেই রহিল। তদ্দর্শনে ঠাকুর বলিলেন, "ধামাই, তোমার পদ্মহস্ত; চার সের চিড়ায় চারশত লোক খাওয়ান হ'ল, আবার যেমন তেমনই রইল!" ক্রমে ক্রমে এই অলৌকিক ব্যাপারের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। তৎশ্রবণে ভক্তগণের আর আনন্দের ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

আম্‌পুলিয়াপাড়ার অবধূত-আশ্রমে সেইবার মহামহোৎসব। প্রতিমা গড়াইয়া অন্নপূর্ণা-পূজা অন্নদাকল্পের মতে হইবে এবং রাত্রিতে রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়ের জন্য মহা স্বস্ত্যয়ন হইবে। অন্নপূর্ণা-পূজার দিন প্রভাতে ঠাকুর দেবেনবাবুকে আদেশ করিলেন, "যাও, শ্মশানে যে চাঁড়ালের একটি আধ্‌খেকো মাথা প'ড়ে আছে, নূতন সরা ঢাকা দিয়ে সেইটি নিয়ে এস।" দেবেনবাবু তাহাই করিলেন। ঠাকুর ভক্তগণ লইয়া প্রতিমার নিকট বসিয়াছিলেন। তিনি ভাবাবেশে মত্ত। ভক্তগণ হরি-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। উহা শেষ হইতে রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল। সেইদিন নবদ্বীপ-নিবাসী গৌরাঙ্গ-সেবক বিনোদবিহারী গোস্বামী মহাশয় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার এ সব কর্ম্ম কেন?" তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "তোমার মা'র ছবি কি তুমি পূজা কর না? 'মা' যে আমার বিশ্বেশ্বরী, বিশ্বময়ী ছবি; ও ছবির পূজা কর্ব্বো না ত কোন্ ছবির পূজা কর্ব্বো? সেই খেতেও হ'বে, জলপান কর্‌তেও হ'বে; মা'র নামে উৎসর্গ ক'রে খেলে দোষ কি? আপনি যে কথা বল্‌ছেন— যতক্ষণ কথা বলা যায়, ততক্ষণ সে ভাবের কেউ অধিকারী হয় না। যিনি কথা ক'য়ে বলেন যে, আমার কর্ম্ম নাই—তিনি মিথ্যাবাদী। কথা কহাটাও যে কর্ম্ম। যখন জীব নির্ব্বিকল্প-সমাধিস্থ হয়, তখনই সে নিষ্কাম-অবস্থা-প্রাপ্ত হয়। "তুমি" "আমি" জ্ঞান থাক্‌তে হয় না। "তুমি" "আমি" জ্ঞান থাক্‌তে একজন কামনার ধন থাক্‌বেই। সেই কামনার ধনই 'কৃষ্ণ',

সেই কামনার ধনই 'কালী'। তাই, 'মা' আমার নিষ্কাম কামিনী, 'কৃষ্ণ' আমার নিষ্কাম কান্ত।" বিনোদবাবু বৈদান্তিক ছিলেন। কিন্তু, ঠাকুরের নিকট তর্কে পরাস্ত হইয়া গেলেন। অতঃপর বিশ্বেশ্বরবাবু (নবদ্বীপ-হিন্দু-স্কুলের হেড্‌মাষ্টার), বিনোদবাবু (অপর একজন শিক্ষক) এবং আনন্দবাবু প্রসাদ পাইয়া বাড়ী গেলেন। এমন সময় কীর্ত্তন করিতে করিতে দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি নবদ্বীপে "জয় নিতাই" বলিয়া পরিচিত। তিনি একজন নৈষ্ঠীক বৈষ্ণব হইলেও সেইদিন আম্‌পুলিয়াপাড়ার আশ্রমে প্রসাদ পাইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার দীনতার তুলনা নাই। বালক, বৃদ্ধ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গের নিকটেও তিনি অবনত থাকিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে বসিতে অনুবোধ করিলেন। দেবেনবাবু (জয় নিতাই) তাঁহার শ্রীপদে মস্তক রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "করেন কি? করেন কি? আমার মালা নাই, তিলক নাই, আমি অবৈষ্ণব।" তৎশ্রবণে দেবেনবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আপনার জন্যই লোকে মালা-তিলক নেয়। আপনার আবার মালা-তিলক কি হ'বে?" তৎপরে ঠাকুর বলিলেন, "মা'র প্রসাদ কিছু গ্রহণ ক'র্ব্বেন কি?" 'জয় নিতাই' বলিলেন, "আপনি যাহা দিবেন, তাহাই আমার মহাপ্রসাদ।" এই উত্তরে ঠাকুর সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি আবার বলিলেন, "না, মা'র প্রসাদই নেবেন কিনা বলুন।" তদুত্তরে দেবেনবাবু বলিলেন, "মা'র প্রসাদই নেব।" তখন ঠাকুর 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করিয়া বলিলেন, "মা'র কৃপা না হ'লে, এ হরিভক্তি মেলে না।" "জয় নিতাই" বলিয়া দেবেনবাবু প্রসাদ পাইয়া প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে ভক্তগণ প্রসাদ পাইয়া চলিয়া গেলে, ঠাকুর রঘুবাবুর স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন। বিশেষ কোন কারণ বশতঃ রঘুবাড়ুয্যে মহাশয়ের সর্ব্বস্ব নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। সেই সময় তিনি স্বস্ত্যয়ন করিবার জন্য ঠাকুরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। ভক্তের মনস্কামনা

পূরণের জন্য তিনিও তাহাতে স্বীকৃত হন। তাই, অন্নপূর্ণা-পূজার দিন সেই স্বস্ত্যয়নের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। রঘুবাবু সেখানে বসিলেন। প্রতিমার বামপার্শ্বে সেই দেবেনবাবুর আনীত মড়ার মাথা ঢাকা দেওয়া ছিল। ঠাকুর তাহার নিকট উপবেশন করিয়া উহা খুলিলেন এবং পূজার সামগ্রী ঐ মাথার মুখে দিতে লাগিলেন। সেই মড়ার মুণ্ডটি অট্ট হাস্য করিতে লাগিল। ভক্তগণ সকলেই স্তম্ভিত ও কম্পিত হইলেন! মড়ার মাথা যত হাসে, ঠাকুরও তত হাসেন। অবশেষে মড়ার মাথা চীৎকার করিয়া "বাঁড়ুয্যেমহাশয়, বাঁড়ুয্যেমহাশয়" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। বাঁড়ুয্যেমহাশয় কম্পিত কলেবরে ঠাকুরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন মড়ার মাথা বলিতে লাগিল, "বাঁড়ুয্যে মহাশয়, আপনার শত্রুকে মারব, না, রাখ্‌ব?" রঘুবাবু বলিলেন "তাকে আমার মারবার ইচ্ছা নাই; তবে আমার বিষয় ফিরে পেলেই হ'ল।" মড়ার মাথা বলিল, তা'ই হ'বে।" অতঃপর ঠাকুর বলিলেন "যাও, নিজস্থানে যাও।" এই সময় মড়ার মাথা চুপ করিল। তখন ঠাকুর বিশ্রাম করিতে গেলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

কলিকাতা যাত্রা ও নবদ্বীপে পুনরাগমন

"ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং—
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা—
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥"

গীতা, ১৮শ শ্লোঃ, ১১শ অঃ।

[তুমিই পরম অক্ষর স্বরূপ পরমব্রহ্ম, মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য; তুমিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, অতএব তুমিই অব্যয় (নিত্য); তুমিই শাশ্বত-ধর্ম্মের পালক; তুমিই সনাতন পুরুষ; ইহাই আমার অভিমত।]

অনন্তর শ্রীগুরুপূর্ণিমা-তিথি উপলক্ষে আম্‌পুলিয়াপাড়ার আশ্রমে কলিকাতা হইতে বহু ভক্ত সমাগত হইলেন। উৎসবান্তে ঠাকুর কলিকাতার ভক্তগণের সঙ্গে কলিকাতায় গেলেন। সেই সঙ্গে ভক্তপ্রবর ধর্ম্মদাসবাবুও কলিকাতায় যান। তথায় হোগলকুঁড়িয়া-নিবাসী বিপিনবাবুর বাটীতে ঠাকুর অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মদাসবাবু তাঁহাদের বাসাতে গেলেন। এই সময় বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া, ঠাকুর ধর্ম্মদাসপ্রমুখ ভক্তগণের সঙ্গে ষ্টার্-থিয়েটার্ দেখিতে যান। তথায় তাঁহাকে দেখিয়া কি মেয়ে, কি পুরুষ সকলেই আসিয়া প্রণাম করিলেন। অমৃত মিত্র, অমৃত বোস্, বেহারী, হ্যাপা প্রভৃতি থিয়েটারের অভিনেতৃগণ তাঁহাকে দেখিয়া যেন পাগলের ন্যায় হইয়া গেলেন; এমন কি, কিছুক্ষণের জন্য থিয়েটারের ঐক্যতান বাদন পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। যে ঐতিহাসিক

বই সেদিন অভিনয়ের জন্য স্থির ছিল, তাহারও পরিবর্ত্তন করা হইল এবং 'সীতার বনবাস' অভিনয় আরম্ভ হইল। থিয়েটার্ দেখিতে দেখিতে রাম-সীতার অভিনয় দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। তখন অমৃতবাবু নিজে আসিয়া স্বহস্তে ঠাকুরকে পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে থিয়েটার ভঙ্গ হইল। অমৃতবাবু ঠাকুরকে বলিলেন, "আজ রাত্রে এখানেই অবস্থান করুন।" ঠাকুর বলিলেন, "না, না, আমি নিমতলায় গিয়ে প'ড়ে থাক্‌ব।" অমৃতবাবু তাঁহাকে আট্‌কাইতে পারিলেন না,—বলিলেন, "আপনি যে মন্‌মুখী, পরমহংসদেব আপনাকে বাধ্য কর্‌তে পারেন নাই। তিনিই ত বলিতেন, 'নিত্য মন্‌মুখী, ইচ্ছা কর্‌লেই দেহত্যাগ কর্‌তে পারে'।" ঠাকুর "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া বহির্গত হইলেন। ভক্তগণও তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। তাঁহারা গাড়ী করিতে ইচ্ছা করায় ঠাকুর বলিলেন, "না, না, বেশ জ্যোৎস্না রাত্রি আছে। চল, চল, গল্প কর্‌তে কর্‌তে যাই।" তাহাই হইল। অতঃপর সেই গভীর রাত্রে ঠাকুর ধর্ম্মদাসবাবুর বাসাতে অবস্থান করিলেন। ধর্ম্মদাসবাবু একখানি কাচা কাপড় তক্তপোসের উপর পাতিয়া দিলেন। ঠাকুর তাহার উপরে শয়ন করিলেন। নিদ্রা কাহারও হইল না। নানা কথায় রাত্রি কাটিয়া গেল।

নবদ্বীপ-নিবাসী দীননাথ গোস্বামীমহাশয়ের পুত্র উপেন্দ্রনাথ গোস্বামীমহাশয় তৎকালে ধর্ম্মদাসবাবুর বাসাতে থাকিয়া ক্যাম্প্‌বেল্ হাসপাতালে চাকরী করিতেন। তৎপর দিবস তিনি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-দেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, ভোগ হ'বে কি?" তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "তাই ত, গোঁসাই, তুমি হ'লে গৌরাঙ্গ-সেবক, তোমাদের হাতেই আজ সব। প্রাতঃকালে বৃষ্টি হচ্ছে; ভাদ্র মাস; এ সময় খিচুড়ি ভাল লাগে।" তাহারই আয়োজন হইল। উপেন্দ্রনাথ শুনিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের পাতে যাহা দেওয়া যায়, তাহা সবই খান। তাই, ভোগ প্রস্তুত হইলে, দশ-বারখানি শালপাতা জোড়া দিয়া এক ডেক খিচুড়ির

অর্দ্ধেক তিনি ঠাকুরের পাতে দিলেন। তাহা দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গোঁসাই, তোমার আফিসে যাওয়া যেন বন্ধ না হয়। চাইলে আর পা'ব ত?" উপেনবাবুও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনি যত পারেন, ততই দেবো।" ঠাকুরও তাহা শুনিয়া "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া আহার করিতে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সব শেষ করিয়া বলিলেন, "গোঁসাই, খিচুড়ি দাও।" তখন ভক্তগণকে দিয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল, উপেনবাবু হাসিতে হাসিতে তাহাও দিলেন। ঠাকুর আবার বলিলেন, "দাও, আরও চাই।" তখন উপেনবাবু বলিলেন, "আপনি আস্তে আস্তে খান; আমি চড়িয়ে দিই।" ঠাকুর তাহা শুনিয়া বলিলেন, "তা'হ'লে ত তোমার আফিসে যাওয়া হয় না।" উপেনবাবু বলিলেন, "আজ না হয়, নাই গেলাম।" ঠাকুর বলিলেন, "তাও কি হয়? বাপ্‌রে! পরের চাকরী!"

ধর্ম্মদাসবাবুর বাসা হইতে ঠাকুর বাগবাজারে গিরীশচন্দ্র ঘোষ-মহাশয়ের বাটীতে যান। গিরীশবাবুর ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষমহাশয়, তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষমহাশয় এবং তাঁহার 'ন'দিদি' ঠাকুরকে ভগবান্‌রূপে দর্শন করেন। অতুলবাবু ঠাকুরকে কৃষ্ণ-কালীরূপে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। তথায় কয়েকদিন অবস্থানান্তর ঠাকুর কালীঘাট হইয়া স্বরগুনা যান। স্বরগুনা-নিবাসী শশী ঘোষমহাশয়ের বাটীতে একটী নির্জ্জন কক্ষে ঠাকুর থাকিতেন এবং সন্ধ্যার পর দোর খোলা হইত। এই সময় ধর্ম্মদাসবাবু ও কালীচরণ ভট্টাচার্য্যমহাশয় তথায় ঠাকুর দর্শন করিতে যান। ঠাকুর কালীবাবুকে একটী গান গাহিতে বলেন। কালীবাবু নীলকণ্ঠের পদাবলী হইতে একটী গান গাহিলেন। সেই গানেতেই রাত্রি শেষ। ঐ গানটী সতর বার গাওয়া হইয়াছিল। ঠাকুর সমাধিস্থ। এইরূপে স্বরগুনার ভক্তগণকে আনন্দ দান করিয়া ঠাকুর সশিষ্য নবদ্বীপে ফিরিলেন।

এই ঘটনার পর ধর্ম্মদাসবাবু "মারুতি-মিলন" পালা লিখিয়া একটী

সখের যাত্রার দল করেন। নদীয়া জেলার মুড়োগাছায় নন্দোৎসব উপলক্ষে তাঁহাদের সখের দলের যাত্রাভিনয় হয়। কিন্তু যাত্রা শেষ হইলে, অনেক রাত্রি থাকিল। নবদ্বীপ-বাসী ভদ্রসন্তানগণ তখনই বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। ধর্ম্মদাসবাবুর উপর যাত্রাদলের ভার ছিল। সুতরাং একজনের উপর জিনিষপত্রাদির ভার দিয়া তিনিও সেই সঙ্গে নবদ্বীপ-যাত্রা করিলেন। তখন ভাদ্র মাস; গঙ্গার বিস্তার প্রায় একক্রোশ। যে ঘাটে তাঁহারা পার হইবেন, সে ঘাটের পাটুনী যদু। রাত্রি থাকিতে থাকিতেই সেই ভদ্রসন্তানগণ পারঘাটে আসায় আনন্দে সমস্বরে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অপর পার হইতে মুদ্দফরাস্‌রা ভাবিল, বোধহয় কেহ মরা লইয়া আসিল। তাই তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "বেশী রাত্‌ নাই, অপেক্ষা করুন; যদু পাটুনী বাড়ী গিয়েছে; সকালে খেয়া পাবেন।" তাহা শুনিয়া সকলে বিমর্ষ হইলেন। সেই সময় ধর্ম্মদাসবাবু ঠাকুরকে স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন, "মাঝি, আমাকে যে পার ক'রে দিতে হ'বে।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসিল, "নৌকো তোমার সম্মুখে।" সকলেই দেখিলেন, তর্‌তর্‌ বেগে একখানি নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল। নৌকা তীরে লাগিলে একজন লোক নামিয়া গেলেন। সেদিকে কাহারও লক্ষ্য হইল না। সকলেই তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠিয়া বসিলেন। ভদ্রলোকদের মধ্যে কেহ হা'ল ধরিয়া, কেহ দাঁড় ধরিয়া নৌকা চালাইয়া দিলেন। ভাদ্র মাসের গঙ্গার স্রোতে নৌকা পড়িবামাত্রই যিনি হা'ল ধরিয়াছিলেন, তিনি বলিতে লাগিলেন, "মাঝি, হা'ল ধর।" কিন্তু মাঝিকে নৌকায় না দেখিয়া সকলেই ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! আমরা ভূতের নৌকোয় উঠেছি!" তখন ধর্ম্মদাসবাবুর মনে হইতে লাগিল যে, নৌকা তীরে লাগিলে ঠাকুরই যেন নৌকা হইতে নামিলেন। তাই তিনি দৃঢ়স্বরে সকলকে বলিলেন, "হা'ল, দাঁড় ছেড়ে দিয়ে সকলে 'হরি', 'হরি', বল, 'হরি', 'হরি' বল।" প্রাণের দায়ে সকলেই তখন প্রাণপণে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। এক মিনিটের মধ্যে নৌকা পারঘাটে আসিয়া লাগিল।

সকলেই অতি দ্রুত নামিয়া গেলেন। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, ত্রিশ-চল্লিশ জন লোকের পারের পয়সা ত্রিশ-চল্লিশ আনা কেহই লইতে আসিল না। নবদ্বীপ আসিতে রাত্রি ভোর হইয়া গেল। ধর্ম্মদাসবাবু ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যাইবেন ভাবিয়া আম্‌পুলিয়াপাড়ার আশ্রমে গেলেন। আশ্রমের দরজা বন্ধ। ঠিক এই সময় ঠাকুর একজন ভক্তকে বলিলেন, "ধামাই এসেছে, দোর খুলে দাও।" ধর্ম্মদাসবাবু আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্র ঠাকুর বলিলেন, "ধামাই, পারের পয়সা দাও।" এই কথা শুনিবামাত্র ধর্ম্মদাসবাবু উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর, আমি আপনার নিদ্রাভঙ্গ করেছি। রাত্রে ঘুমোতে দেই নি" ইত্যাদি। ইহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, "তুমি না ডাক্‌লেও তোমাকে পার কর্ব্বো বোলে আমি ব'সে ছিলাম। মনে ক'রে দেখ দেখি, তুমি ডাক্‌লে কি নৌকো ছাড়া হয়েছিল, না, তুমি না ডাক্‌তেই তোমার সম্মুখে নৌকো দেখেছিলে।" এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মদাসবাবু সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। তৎপরে ভক্তগণের চেষ্টায় তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া সেই দিনই সন্ধ্যায় 'পারের মহোৎসবে'র আয়োজন করেন।

অন্য একদিন প্রায় সন্ধ্যার সময় গঙ্গার পাউডির মাঝামাঝি একটী স্বভাবজাত গুহার মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ঠাকুর উপবেশন করিলেন এবং ধর্ম্মদাসবাবুকে তাঁহার সম্মুখে বসাইয়া বলিলেন, "ধামাই, গঙ্গা দেখেছ?" ধর্ম্মদাসবাবু তদুত্তরে বলিলেন, "এই ত গঙ্গা দেখ্‌ছি।" তাহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, "না, না, কারণবারি। গঙ্গার উপরে এই মায়াবারি, ভিতরে আছে কারণবারি। যখন মহাত্মাগণ স্নান করেন, তখন মায়াবারি সরে যায়, কারণবারি প্রকাশ পায়।" ঠাকুর এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে ধর্ম্মদাসবাবুকে বলিলেন, "ভাখ, ভাখ, গঙ্গা ভাখ।" তখন ধর্ম্মদাসবাবুর মনে হইল যেন ষ্টীমারের সার্চ্চ্‌ লাইট্‌ গঙ্গার উপরে পড়িয়াছে! দেখিতে দেখিতে রজত-ধবল-কিরণে গঙ্গা পরিপূর্ণ হ'য়ে গেলেন—ঠিক যেন রূপো গলান জল। সেই জল ধীরে ধীরে আসিয়া

ঠাকুরের পাদস্পর্শ করিলেন। অতঃপর ঠাকুর জলে হাত দিয়া "মা, যা; মা যা" বলিবামাত্র গঙ্গা পুনরায় সরিয়া শত হস্ত দূরে চলিয়া গেলেন। এই-রূপে ঠাকুরের কৃপায় ধর্ম্মদাসবাবুর গঙ্গাদর্শন হইল।

সন ১৩০১ সাল, ২৩শে পৌষ, ধর্ম্মদাসবাবু ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "অদ্য ··গঙ্গানিবাস নামক গ্রামে হরিহর দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। ··· গবাক্ষ সাহায্যে মন্দির মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া হরিহরের পরিবর্ত্তে হরিহরের স্থানে আপনাকে দেখিয়াছিলাম। পরে আপনার সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সময় শূন্যে আমার দিকে মুখ করিয়া হরিহর উপবিষ্ট রহিয়াছেন দেখিয়াছিলাম। এক পোয়া রাস্তা পর্য্যন্ত আমি এইভাবে হরিহরকে দর্শন করিয়াছিলাম।"

"ফাল্গুন, ১৩০৩। ···ঐ মাসে একদিন কীর্ত্তন সময়ে নিত্যকে ধর্ম্মদাস, গোবিন্দ প্রভৃতি কৃষ্ণ এবং পীতবর্ণ বিশিষ্ট দেখিয়াছিলেন।··· ঐ দিন নিত্যের কেবলমাত্র রক্তবর্ণ দেখিয়াছিলেন।"

অন্য একদিন ধর্ম্মদাস রায়মহাশয় ঠাকুরের নিকট বলিয়াছিলেন, "···এই পৌষমাসের কোন দিন অতি প্রত্যূষে শয়নাবস্থায় তাঁহার (ধর্ম্মদাসবাবুর তারিণী-কাকার) কতকগুলি প্রজার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবার জন্য যাইবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। সে সময় আপনার সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করিতেছিলেন না, সে সময় আপনাকে তাঁহার স্মরণ পর্য্যন্ত হইতেছিল না। হঠাৎ তাঁহার বোধ হইয়াছিল আপনি যেন তাঁহার সেই গৃহমধ্যে কথা কহিতেছিলেন। তৎশ্রবণে তিনি চমকিত হইয়া অতি আশ্চর্য্য বোধ করিয়া বিস্ময়ের সহিত বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক সেই কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে শুনিলেন আপনি তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছেন। অতি আগ্রহের সহিত তিনি শয্যোত্থিত হইয়া আপনাকে সেই গৃহমধ্যেই দর্শন করিলেন। তিনি ঐ প্রকার দর্শন করিয়া আপনাকে বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলেন আপনি সহাস্য বদনে সেই বারম্বার প্রণতিপরায়ণ তারিণীকে কহিলেন,

"তারিণি, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার আমার এই রূপে কি শ্রদ্ধা হয় না? তোমার আমার এই রূপে কি প্রীতি হয় না?" বলিয়া একপ্রকার নবমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তারিণী সেই নবমূর্ত্তির এই-প্রকার বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তির কটি হইতে পদ পর্য্যন্ত আপনার এই মূর্ত্তির কটি হইতে পদ পর্য্যন্ত যে প্রকার, আপনি যে প্রকার যোগাসনে অনেক সময়েই উপবিষ্ট রহেন, সেই অপূর্ব্ব নবমূর্ত্তি সেই প্রকার আসনেই উপবিষ্ট। সেই মূর্ত্তির কটি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত তারাব ন্যায়। সেই মূর্ত্তির কটি হইতে মুখ পর্য্যন্ত উজ্জ্বল নীলবর্ণ। সেই মূর্ত্তির চতুর্ভুজ। মস্তকে মনোহর জটাকলাপ। সেই মূর্ত্তির ত্রিনয়ন। তারার চতুর্ভুজে যে সমস্ত আয়ুধ বিন্যস্ত, সেই মূর্ত্তির চতুর্ভুজেও সেই সমস্ত আয়ুধই বিন্যস্ত। সেই মূর্ত্তির চতুর্ভুজ সর্ব্বপ্রকারে তারার চতুর্ভুজের ন্যায়ই বটে। সেই মূর্ত্তি হইতে বহু সূর্য্যের কিরণের ন্যায় রাশি রাশি কিরণোত্থিত হইতেছিল। সেই মূর্ত্তির ঔজ্জ্বল্য প্রতি নিয়ত দৃষ্টি সঞ্চার করা যায় না। সেই মূর্ত্তি মহাগাম্ভীর্য্য পরিপূর্ণ।" মেঘগম্ভীর স্বরে সেই মূর্ত্তি কহিলেন,—"তারিণি, আমার এই দিব্যমূর্ত্তিতে কি তোমার শ্রদ্ধা হয়? এই মূর্ত্তির উপাসক কি তুমি হইতে ইচ্ছা কর?" তারিণী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায়, জড়ের ন্যায় দণ্ডায়মান্ রহিলেন। তিনি কি উত্তর করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। অবাক্ হইয়া ভয় এবং ভক্তিবিমিশ্রিত ভাবে স্থির নয়নে সেই অদ্ভুত এবং অভূতপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ প্রকার দর্শন করিতে করিতে সেই অর্দ্ধতারা মূর্ত্তিকেই শ্রীকৃষ্ণরূপে পরিণত হইতে দেখিলেন। পুলকিত কলেবরে পরম আহ্লাদ সহকারে সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে কিয়ৎক্ষণ দর্শন করিয়া আর তাঁহাকে দর্শন করিলেন না। অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন।"

"ফাল্গুন, ১৩০৩। শ্রীনবদ্বীপ চাবুচারাপাড়ায় কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিত্যাকে ষড়্ভুজচৈতন্য হইতে দেখিয়াছিলেন।"

১৩০৩ ফাল্গুনী সংক্রান্তির দিন ধর্ম্মদাসবাবু ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "আপনাকে অদ্য মধ্যাহ্নকালে প্রায় দুই অঙ্গুলি পরিমাণ আকার বিশিষ্ট দেখিয়াছিলাম, সে সময় আপনি কৃষ্ণগোপালের মতন বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণগোপালের ভঙ্গিতে অবস্থান করিতেছেন দর্শন করিয়াছি। তখন আপনার অঙ্গ হইতে নীলজ্যোতিঃ উঠিতেছিল।..."

আবার, "১৩০৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের কোনদিন শ্রীধাম নবদ্বীপে ধর্ম্মাচার্য্য ধর্ম্মদাস রায়মহাশয় শেষরাত্রে অস্বপ্নযোগে জাগ্রতাবস্থায় শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে নিজ গৃহে দর্শন করিয়াছিলেন। তখন ঐ ঠাকুর শ্রীধাম নবদ্বীপেরই সাধুর আশ্রমে শায়িত এবং নিদ্রিত ছিলেন। ঐ রায়মহাশয় নিত্যগোপালকে দর্শন করিতে করিতে তাঁহাকে হটাৎ দশভুজা দুর্গা হইতে দর্শন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি নিজপার্শ্বে হটাৎ অনেক স্বর্ণালঙ্কার দেখিয়াছিলেন। তিনি আনন্দে সেই সকল সেই নিত্যগোপাল-দুর্গাকে পরাইয়াছিলেন।"

"১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬। কাশীর লক্ষ্মীমণি নবদ্বীপের দীনতারিণীর প্রতি—(নিত্যকে দেখাইয়া) দেখ ঠাকুরের পাদপদ্ম কেমন উজ্জ্বল পীতবর্ণ হইয়াছে। তারিণী—আমিও ঐ প্রকার দেখিতেছি। ঐ প্রকার বর্ণ প্রায় এক্ প্রহর দেখিয়া বলিল—এবার পাদপদ্মের কতক অংশ উজ্জ্বল পীতবর্ণ এবং কতকাংশ উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ দেখিতেছি। এক্ষণে পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে হীরকের ন্যায় অথবা উজ্জ্বল রজতের ন্যায় আংটী দেখিতেছি। এবার সমস্ত পদের ঐ বর্ণ দেখিতেছি।"

"১৩ই শ্রাবণ, সন ১৩০৬ সাল। অদ্য রাত্র ১২টা কিম্বা ১২-৩০টার সময় নবদ্বীপের নিমাই দত্তের দেহত্যাগ হইয়াছে। তিনি প্রায় পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত যক্ষ্মারোগ ভোগ করিয়াছিলেন। ঐ প্রকার উৎকট পীড়াকালেও সময়ে সময়ে তাঁহার দিব্যদর্শন হইত। তাঁহার এই শ্রীধাম নবদ্বীপ গমনের কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার হুগলীতে অবস্থানকালে একদিবস মধ্যাহ্নকালে নিজগৃহ মধ্যে আপনার বক্ষঃস্থলে তাঁহার গুরুদেবকে গোপালের ন্যায়

দিব্যকলেবরবিশিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে উপদেশ দিতে শ্রবণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার গুরুদেব তাঁহার মৃত্যু হইবার সংবাদও কহিয়াছিলেন। মৃত্যুর জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত হইতেও বলিয়াছিলেন। তাঁহার অগোচরে তাঁহাকে ছাগীমাংস খাইতে হইয়াছিল, সে বিবরণও বলিয়াছিলেন। পরে অনুসন্ধান দ্বারা তিনি জানিযাছিলেন যে, বাস্তবিক তাঁহার নিজের অগোচরে তাঁহাকে (বৃথা) ছাগীমাংস ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল। তিনি যে দিবস হুগলী সহরে তাঁহার বক্ষোপরি তাঁহার পরমপূজ্য গুরুদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন, সেই দিবস অমাবস্যা তিথিযুক্ত ছিল, সেইজন্য সেই দিবসের প্রাতঃকালে যাহাতে কালীঘাটের কালীমাকে পূজা দেওয়া হইতে পারে এরূপ সময়ে তথা পূজা পাঠান হইযাছিল। কিন্তু যাহা দ্বারা উক্ত পূজা পাঠান হইয়াছিল, তিনি সকালে মা কালীর পূজা না দিয়া মধ্যাহ্নকালে পূজা দিয়াছিলেন। নিমায়ের গুরুদেব তাঁহার বক্ষে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে সে সংবাদও কহিয়াছিলেন। তিনি নিমাইকে কহিয়াছিলেন,— "তোরা সকালে কালীমার পূজা দিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিস্। কিন্তু সে লোক সকালে কালীর পূজা দেয় নাই। এই মধ্যাহ্নকালে কালীর পূজা দিয়াছে। এখন সেই পূজা হইতেছে। তোদের ভক্তিভাবের পূজা মা গ্রহণ করিতেছেন।" পরে অনুসন্ধান দ্বারা জানা হইয়াছিল যে, বাস্তবিক প্রাতঃকালে মা কালীর পূজা প্রেরিত লোক না দিয়া সে অমাবস্যা তিথিতে মধ্যাহ্নকালেই দিয়াছিল।"

"২২শে শ্রাবণ, সন ১৩০৬ সাল। ধর্ম্মদাসবাবু (নিত্যের প্রতি)··· গোয়াড়ীর বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আশ্রয়ে যে কুমুদিনী বৈষ্ণবী বাস করেন, তিনি বিগত ভীম একাদশীর দিবস প্রায় বেলা ১০টার সময় তাঁহার ইষ্টদেবতার নাম-সমন্বিত মন্ত্র···জপ করিতে করিতে অত্যন্ত উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ দিব্যজ্যোতিতে, তিনি যে গৃহে জপ করিতেছিলেন, সেই গৃহ পরিপূর্ণ দর্শন করিয়াছিলেন। সেই জ্যোতি প্রকাশের কিঞ্চিৎ পরেই, সেই জ্যোতি মধ্যে আপনাকে দর্শন করিয়াছিলেন। আপনি সেই অদ্ভুত

জ্যোতি মধ্য হইতে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এই আমার স্বরূপ দর্শন কর্।" "এই কথা বলিয়াই আপনি শিব মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এই যে মূর্ত্তি দর্শন করিতেছিস্ এই মূর্ত্তিই আমার স্বরূপ। অন্ত এই আমার স্বরূপ দর্শন কর্।" ঐ বৈষ্ণবী সেই ভীম একাদশীর দিবস বেলা দশটা হইতে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভাবাবিষ্ট ছিলেন এবং দিব্যানন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলেন। অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায় বীরেশ্বর বাবু তাঁহার বাহ্যচৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।"

"১৩০৬ সালে দীর্ঘকাল জন্য গোয়াড়ীর মুন্‌সেফ্ বাবু শ্রীরজনীকান্ত মিত্র মহাশয় বিশেষ পীড়িত ছিলেন। তাঁহার সেই ভয়ঙ্করী পীড়াবস্থায় তাঁহার……শ্রীজ্ঞানানন্দকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত বাসনা হইয়াছিল। তাঁহার ঐ জ্ঞানানন্দকে দর্শন কবিবার ইচ্ছা নিয়ত বলবতী থাকায় তিনি শায়িতাবস্থায় হঠাৎ জ্ঞানানন্দকে দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহাব মস্তক যে স্থলে ছিল, সেই স্থানের পরবর্ত্তী স্থানে জ্ঞানানন্দ উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার মস্তকে হস্ত বুলাইতেছিলেন। তিনি পরে ঐ জ্ঞানানন্দকে তাঁহার বাটীর সর্ব্বস্থল দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কত কথা কহিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাব স্মরণ ছিল। যে সময়ে তাঁহাব জ্ঞানানন্দ দর্শন হইতেছিল, সে অবস্থায় জ্ঞানানন্দ শ্রীধাম নবদ্বীপে ছিলেন, তাহা শ্রীধামবাসী অনেকেই দর্শন করিয়াছিলেন। রজনী বাবুর ঐ প্রকার দর্শন স্বপ্নাবস্থায় হয় নাই। তিনি জাগ্রতাবস্থাতেই ঐ প্রকার দর্শন করিয়াছিলেন।"

"সতীশ। যে দিন রাত্রে খোকামালী আপনার (ঠাকুরের) মস্তকে মুকুট দিয়া কণ্ঠে পুষ্পমাল্য এবং মুণ্ডমালা প্রভৃতি দিয়া পুষ্পাভরণে সাজাইয়াছিল, সে দিবস রাত্রে আপনাকে প্রথমতঃ কালী হইতে দর্শন করিয়া তৎপরে দশভুজা দুর্গা হইতে দর্শন করিয়াছিলাম।……হটাৎ আপনার নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে আপনার সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ হইল, তৎপরে আপনার চতুর্ভুজ দর্শন করিলাম। সেই

চতুর্ভুজে অসিমুণ্ড বরাভয় দর্শন করিলাম। তৎপরে লোলজিহ্বা দর্শন করিলাম। লোলজিহ্বা দর্শনান্তে আলম্বিত মুক্ত কেশকলাপ দর্শন করিলাম। মস্তকে খোকামালী বা চন্দ্রহরি মালী প্রদত্ত মুকুটের পরিবর্ত্তে অপর দিব্যমুকুট দর্শন করিয়াছিলাম। ঐ প্রকার দর্শন করিতে করিতে আমার নিজ ইষ্টদেবতাকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল এবং সেই দর্শন জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম। ঐ প্রকারে দর্শন জন্য প্রার্থনা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সেই কালীমূর্ত্তীই দুর্গা হইয়াছিলেন। আমি একদৃষ্টিতে ঐ দুর্গারূপ দর্শন করিতেছিলাম।···কোন কোন ভক্ত আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াতে আমি দর্শন করিতে পারিতেছিলাম না।· ·তাঁহারা সরিবামাত্র আপনার ঐ রূপই দেখিতেছিলাম। কিছুক্ষণ ঐরূপ দর্শন করিতে করিতে আবার দুর্গা দেখিতেছিলাম। এই প্রকারে বারম্বার দর্শন এবং অদর্শন করিতেছিলাম।·· গৃহে সে সময় অত্যন্ত জনতা ছিল বলিয়া আমার কালী দর্শন সময়ে সময়ে ঐ দুর্গা দর্শনের মতন ব্যাঘাত হইতেছিল। ব্যাঘাত অপসারিত হইলে আপনার এই মূর্ত্তী কিছুক্ষণ দর্শন করিয়া তৎপরে কালী দর্শন করিতে- ঐ প্রকারে বারম্বার কালী দর্শন এবং প্রতিবন্ধক বশতঃ অদর্শন করিতেছিলাম।···সকলি আপনার কৃপা। আপনার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। আমি আপনাকে যখন কালী হইতে এবং দুর্গা হইতে দর্শন করিতেছিলাম, তখন আমার আপনার কৃপায় সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান ছিল।"*

এই সময় কৃষ্ণদাস বাবাজী নামে জনৈক বৃদ্ধ বাবাজী নবদ্বীপে বাস করিতেন। এই কৃষ্ণদাসকে কেহ চিনিতে পারিত না। ইনি ভগবানের সিদ্ধ পারিষদ ছিলেন। আহা! এই বৃদ্ধ বৈষ্ণব যখন ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন, তখন তাঁহার অঙ্গ প্রেমে পুলকিত হইত, নয়নধারায় বক্ষঃ

*যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব লিখিত "দিব্যদর্শন" নামক গ্রন্থ হইতে ১৮৮—১৯৩ পৃষ্ঠার " "—চিহ্নিত অংশগুলি উদ্ধৃত হইল।

ভাসিয়া যাইত। নিমেষমাত্র প্রণাম করিয়া বলিতেন, "কৃষ্ণ, চেনা দাও; ঢাকা দিয়ে থেকোনা।" আর কোন কথা নাই—জিজ্ঞাসা নাই—চলিয়া যাইতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে ফুলের মালা দিতে আসিতেন। তিনি একদিন তাঁহার শিষ্য নিতাইদাসকে দিয়া ঐ মালা পাঠাইয়া দেন। মালা দিয়া পরে তিনি প্রসাদ লইয়া প্রস্থান করিলেন। এই দিন আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল। ঠাকুর মালা পরিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন; এমন সময় উপর হইতে একটী টিক্‌টিকি তাঁহার পায়ে পড়িয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। সকলেই দেখিলেন, টিক্‌টিকিটী যেখানে পড়িয়াছিল, সেই স্থান ব্যাপিয়া ঠাকুরের পায়ে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে! ঠাকুর সমাধিস্থ ছিলেন। তিনি সমাধি হইতে ব্যুত্থান লাভ পূর্ব্বক বলিলেন, "তুলসীতলায় টিক্‌টিকিটীর সমাধি দাও।" তাহা দেওয়া হইলে, সেই রাত্রেই টিক্‌টিকির মহোৎসব হয়।

ঠাকুরের অবস্থানে শ্রীধাম নবদ্বীপে যেন এক নবযুগ আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি শ্রীধামে আসিয়া প্রথম প্রথম পরমানন্দে সর্ব্বত্র বেড়াইতেন। তখন ঠাকুরের বয়সও অধিক নয় —অনুমান চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসর—প্রফুল্ল বদন—তপ্তকাঞ্চননিভ বর্ণ—পাদযুগল অতিশয় রক্তিমাভা-বিশিষ্ট—গতি মন্থর—অথচ একএক সময়ে অত্যন্ত দ্রুত—নয়নযুগল প্রায়শঃ অরুণ বর্ণ, অথচ ছলছল—বাক্য অতিশয় মধুর—বিনয়ের খনি। যিনি একবার তাঁহার ঈষৎ-হাস্যযুক্ত প্রীতি-সম্ভাষণ ও সকরুণ বচনামৃত দ্বারা আপ্যায়িত হইতেন, তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিয়া চিরজীবনের জন্য তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইতেন। ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে—প্রত্যক্ষ দর্শন ও উপলব্ধির কথা। সেই সময়ে ঠাকুর যাহাদিগকে ধরা দিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনেই যেন এক অভিনব যুগ উপস্থিত হইয়াছে। ঠাকুরকে দেখিলেই সকলের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। তাঁহার সঙ্গে যতক্ষণ ভক্তগণ থাকিতেন, ততক্ষণ সকলেরই আত্ম-বিস্মৃতি হইত—দর্শনে, স্পর্শনে ও কথামৃত-পানে সকলেই যেন এক নূতন

প্রেমরাজ্যে মুহূর্ত্তের ন্যায় তিন চারি ঘণ্টা কাল কাটাইয়া দিতেন! অতি কষ্টেই তখন তাঁহারা ঠাকুরকে ছাড়িয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে গৃহকার্য্য করিতে নিজ নিজ বাটীতে বাধ্য হইয়া যাইতেন। এক একদিন সংকীর্ত্তনে ঠাকুরও এত বিহ্বল হইয়া কাঁদিতেন যে, সকলেই অস্থির হইয়া পড়িতেন। আবাব এক একদিন তিনি এত হাসির তুফান তুলিয়া দিতেন যে, সকলেই পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন।

এইভাবে ঠাকুর শ্রীধাম নবদ্বীপে পবমানন্দে আশ্রিত ভক্তবৃন্দেব উপর অহেতুকী করুণা বর্ষণ কবিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন; ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুব শুভ-জন্মদিন ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-তিথিতে গ্রহণযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। এতদুপলক্ষে নানা দেশ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া নবদ্বীপধামে সমবেত হইতে লাগিল। দিবারাত্রি শ্রীহরিসংকীর্ত্তনানন্দের বোল সর্ব্বসাধারণের প্রাণ-মন মাতাইয়া তুলিল। সেই শুভদিনে ঠাকুব গ্রহণ লাগিবার পূর্ব্বেই আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক পরমানন্দে উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় দেবেনবাবু প্রভৃতি কতিপয় ভক্ত আসিয়া ঠাকুরকে বাহিরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরও ভক্তের অভিলাষ পূরণে সম্মত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গেই বাহির হইলেন। চতুর্দ্দিকে মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনিতে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ এক একবার ভাবাবেশে ঢলঢল। ঠাকুর নিজভাব সংবরণ করিয়া মদমত্ত গজরাজের ন্যায় ধীরে ধীরে আসিয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। তখন গঙ্গাতীরে শত শত শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনের দল সমবেত হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর ধ্বনিতে মধুর হরিনাম-সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সেইসঙ্গে যাত্রিগণও প্রেমানন্দে, "নিতাই গৌর হরিবোল, নিতাই গৌর হরিবোল"-রবে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া জয়ধ্বনি করিতেছিলেন। পুণ্যার্থিনী অসংখ্য রমণী পরমানন্দে উলুধ্বনি দিয়া সেই স্থানটীকে সমধিক আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিলেন। ঠাকুর তখন এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। দুই চারি বার হরিনাম শুনিলেই যাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল আনন্দধারা প্রবাহিত হইত, অঙ্গ বিবশ

হইয়া মহাসমাধিতে বাহ্যচৈতন্য বিলুপ্ত হইত, সেই মহাভাবময় ঠাকুর অন্তর্নিহিত মহাভাব অতি সাবধানে সংবরণপূর্ব্বক গঙ্গার দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় "ভক্তগণের অনেকেরই পরিচিত" শ্রীমৎরাধারমণচরণদাস বাবাজীমহাশয়* সদলবলে "এই ন'দের মাঝে গৌর না হেবে প্রাণ তো বাঁচে না" রবে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুরের দিকে আসিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা ষ্টীমার-ঘাটের সন্নিকটে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কালিদাসবাবু সেই কীর্ত্তনদলের অধিনায়ক শ্রীমৎরাধারমণচরণদাস বাবাজীমহাশয়ের হাত ধরিয়া ঠাকুরের নিকট লইয়া গেলেন। ঠাকুরের অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় রূপলাবণ্য দর্শন করিয়াই তিনি সংকীর্ত্তন মধ্য হইতে তীরবেগে দৌড়াইয়া গিয়া "গৌর, গৌর" বলিতে বলিতে ঠাকুরের চরণতলে পতিত হইলেন এবং তাঁহার চরণযুগল বক্ষে ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে পশ্চাদ্বর্ত্তী সংকীর্ত্তনের দল সমধিক পরিমাণে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতে নাচিতে গাহিতে লাগিলেন। আর, ভাবাবিষ্ট ঠাকুর দুই অঙ্গুলি দ্বারা বাবাজীমহাশয়ের কর ধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া উভয়ে অপরূপ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সেই সময় অনেকেই ঠাকুরের হুঙ্কার ধ্বনিতে কম্পিত হইয়া তাঁহার স্পর্শমাত্র মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা ঠাকুরের স্পর্শমাত্র পুলকিত হইলেন এবং আত্মহারা

*এই বিষয়ে শ্রীশ্রীদেবের শিষ্য শ্রীমৎস্বামী কেশবানন্দ অবধূতমহারাজ "শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম" পত্রিকার (১ম বর্ষের) সন ১৩২১ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত ৮ম সংখ্যায় "জয়গুরু" নামক প্রবন্ধে ২১৫ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :— "...এমন সময় কালিদাসবাবু পূজ্যপাদ শ্রীমৎরাধারমণচরণদাস বাবাজীমহাশয়ের সহিত বহুলোক সমাবৃত হইয়া গঙ্গার তীরে তীরে কীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চরণদাস বাবাজীমহাশয় আসিয়াই ঠাকুরের চরণপ্রান্তে দীর্ঘদণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া রাঙ্গাচরণ দুইটী বক্ষে ধারণ করিলেন ;..."

হইয়া নাচিতে লাগিলেন, কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ গাহিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ কাটিয়া গেলে সকলেই কথঞ্চিৎ চৈতন্ত লাভ করিলেন। বাবাজীমহাশয় সগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুরের সঙ্গে অবধূতাশ্রম পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। সেখানেও সকলে শ্রীশ্রীদেবের সঙ্গে সমধিক মত্ত হইয়া বহুক্ষণ কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সহিত শ্রীমৎরাধারমণচরণদাস বাবাজীমহাশয়ের এই প্রথম মিলন। ইহার পরে প্রায়ই সভক্ত বাবাজীমহাশয় আশ্রমে আসিয়া সুললিত কণ্ঠে মধুর সংকীর্ত্তন করিতেন। ঠাকুরও মধ্যে মধ্যে সেই সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া সকলকে পুলকিত ও প্রফুল্লিত করতঃ অপরূপ নৃত্য করিতেন। আর, বাবাজীমহাশয়ও আবিষ্টচিত্তে ঠাকুরের ভাবসমাধিকালে তাঁহার বামে যাইয়া এরূপভাবে দাঁড়াইতেন যে, তাহা দর্শন করিয়া উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ-লহরী ক্রীড়া করিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীমৎরাধারমণচরণদাস বাবাজীমহাশয় সংকীর্ত্তন-লীলায় ঠাকুরের সহিত মধ্যে মধ্যে মিলিত হইতেন। ইনি* তাঁহাকে (ঠাকুরকে) "স্বামীজী" বলিতেন। একদিন এই মহাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর আশ্রমস্থ ভক্তগণকে বলিলেন, "ওরে, আজ আমার বাঁকা সিঁড়ি কেটে দে—আজ আমার বৌ আস্‌বে।" সেইদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভক্তগণ সম্মুখে বসিয়া শ্রীমুখের বচনামৃত পান করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে সুমধুর সঙ্গীত সুধা বর্ষণ করিয়া ভূলোকে গোলোকের আবির্ভাব করাইতেছেন; এমন সময় বাবাজীমহাশয় ভক্তবৃন্দসহ সুমধুর সংকীর্ত্তনে চারিদিক মাতাইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর সংকীর্ত্তনের

*এই ঘটনাটি নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের ভূতপূর্ব্ব (সুপরিচিত) শিক্ষক ও ঠাকুরের শিষ্য শ্রীযুক্তসন্তানাথ বিশ্বাসমহোদয়-লিখিত "শ্রীশ্রীনিত্যলীলা" নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিপিবদ্ধ হইল। ইহা "শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম" পত্রিকার (২য় বর্ষের) সন ১৩২২ সাল বৈশাখ মাসের (৪র্থ) সংখ্যায় ১২৬—২৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

শব্দ শুনিবামাত্র আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তদবস্থায় তিনি বাবাজী-মহাশয়ের সহিত সংকীর্ত্তনে মিলিত হইয়া উভয়েই অদ্ভুত নৃত্যানন্দ-লীলায় বিভোর হইয়া থাকিলেন। কিছুকাল পরে ঠাকুর চিত্রপটের শ্রীগোবিন্দজীর মত এক হস্ত উর্দ্ধে ও অপর হস্ত নিম্নে রাখিয়া নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। বাবাজীমহাশয়ও তৎক্ষণাৎ আবিষ্ট অবস্থায় হস্তদ্বয় সেই ভাবে রাখিয়া তাঁহার বামে গিয়া দাঁড়াইলেন। অনেক সময় (দুই ঘণ্টার কম নহে) এইভাবে অতিবাহিত হইল। উপস্থিত ভক্তগণ শ্রীবৃন্দাবন-লীলা স্মরণ করিয়া শুক-সারিকার ন্যায় দুই দলে বিভক্ত হইলেন এবং শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের মধুর ব্যাজস্তুতি-লীলার অভিনয় করিতে লাগিলেন। একদলের উক্তি,—"তোদের গয়লানী কিসে এত গরব্ করে ?" অপর দলের উক্তি,—"তোদের কালা হ'ল পাগল (এই) গয়লানীর তরে" ইত্যাদি প্রকার। এই সুমধুর রসলীলার অবসানকালে ঠাকুর আবিষ্ট-অবস্থায় বাবাজী-মহাশয়ের হস্ত ধারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বাবাজীমহাশয়ের বিশাল উন্নত দেহ বাতাহত কদলী-বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। মস্তকটী ইষ্টক-নির্ম্মিত সোপানের উপর এত বেগে পতিত হইল যে, ভক্তগণ ভাবিলেন, বাবাজীমহাশয় বোধহয় বিশেষ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন। পরে দেখা গেল, শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহার মস্তকের কোনওপ্রকার ক্ষতিই হয় নাই। বাবাজীমহাশয় পতিত হইবামাত্র শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব তাঁহার বক্ষদেশে পদার্পণ করিলেন। ইতিমধ্যে ভক্তগণ ঠাকুরের বসিবার জন্য একখানি চেয়ার আনিলেন। একটু পরে তিনি তাহাতে উপবেশন করিলেন। অতঃপর বাবাজীমহাশয়ের বাহ্যচৈতন্য হইলে, ঠাকুর তাঁহাকে কোলে বসাইয়া পৃষ্ঠদেশে হস্তমার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর উভয়ের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। অনেক কথার পর ঠাকুর বলিলেন, "কাজ কর ; আমার শরীর ভাল নহে।" বাবাজীমহাশয় বলিলেন, "মায়াপুর দেখে বড় ভয় হয় !" ঠাকুর বলিলেন, "কোনও ভয় নাই। আমি বল্‌ছি, 'কাজ কর'।" অনন্তর হরিলুট-প্রসাদ-বিতরণাদির পর বাবাজী-

মহাশয় সদলে কীর্ত্তন করিতে করিতে নিজ আবাসে গমন করিলেন। ঠাকুরও কিছুক্ষণ পর আশ্রম-বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বলা-বাহুল্য, পরবর্ত্তী কালে বাবাজীমহাশয় ঠাকুরের এই আদেশ অনুসারে কাজ করিয়াছিলেন।

একদিন (কোজাগরী পূর্ণিমা) আনন্দবাবুর বাগান-বাটী পীব-তলাতে মহোৎসব। পূজার ছুটীতে বহু ভক্ত আসিয়াছেন। আনন্দবাবুর উদ্দেশ্য, ভক্তগণ গান করিবেন, ভগবান্ নাচিবেন—তাঁহার বাগান-বাটীতে প্রেমের ফোয়ারা ছুটিবে। তাহাই হইল। বহু রাত্রি পর্য্যন্ত কীর্ত্তন ও নৃত্য হইল। কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর ধর্ম্মদাসবাবুকে বলিলেন, "ধামাই, আজ লক্ষ্মীপূজা; রাত্ জাগ্‌তে হয়। চল, আমরা গঙ্গার ধারে যাই।" ভক্তগণকে বলিলেন, "আপনারা সকলে আপন আপন আবাসে যান। রাত্রিও বেশী নাই। আমি ধামাইকে সঙ্গে ক'রে একেবারে গঙ্গাস্নানান্তে আশ্রমে যা'ব। ঠাকুরের আদেশ-লঙ্ঘন-ভয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভক্তগণের মধ্যে অনেকে আশ্রমে গেলেন; কেহ কেহ আবাসে গেলেন। ঠাকুর ও ধর্ম্মদাসবাবু তথা হইতে গঙ্গার ধার দিয়া পোড়াঘাটে আসিয়া গঙ্গার পাউড়ীতে বসিলেন। রাত্রি গভীর, স্থানটী জনপ্রাণীশূন্য। গঙ্গার জল, বাতাস আর চাঁদ এই তিনে মিলিয়া যেন খেলা করিতেছিল। ঠাকুর বলিলেন, "ধামাই, তুমি চাঁদ দেখ্‌বে?" এই বলিয়া ঠাকুর ধর্ম্মদাসবাবুর হাত ধরিবামাত্রই তিনি দেখিলেন যে, আকাশের চাঁদ সামান্য নয়। উহা চাঁদেগড়া একটী মহানগরী। ঠাকুর বলিলেন, "অনন্ত চক্ষু ভিন্ন অনন্ত জগৎ দর্শন হয় না। তোমার সান্ত চক্ষু, কিছু দর্শন কর। যেমন নবদ্বীপ একটী সহর, চন্দ্রলোকের মধ্যে এও একটী সহর। ঐখানেই চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিহার করেন।" দেখিতে দেখিতে ধর্ম্মদাসবাবু প্রত্যক্ষ করিলেন যে, 'ঐ চন্দ্রলোকের মধ্যে একটী সৌধ বিরাজিত। উহা মন্দিরের আকারে নির্ম্মিত। যাহাকিছু তথায় আছে, সবই যেন চাঁদ গলিয়ে তৈরী করা। স্ফটিক, রৌপ্য প্রভৃতির রং তা'র তুলনায় কিছুই নয়।'

অতঃপর ধর্ম্মদাসবাবুর হাত ছাড়িয়া দিয়া, ঠাকুর 'হো, হো' করিয়া হাসিতে হাসিতে গঙ্গায় অবতরণপূর্ব্বক অবগাহন করিতে লাগিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা কাল তিনি স্নান করিলেন। অতঃপর রৌদ্র উঠিয়াছে দেখিয়া ঠাকুর সেই পোড়াঘাট হইতেই আর্দ্রবস্ত্রে একেবারে আশ্রমে আসিলেন।

১৩০৩ সালের ৭ই ভাদ্র ধর্ম্মদাসবাবুর পিতামহীর দেহত্যাগকালে ঠাকুর তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সম্মুখেই গঙ্গাতীরে ধর্ম্মদাসবাবুর পিতামহী দেহত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মদাসবাবু স্বচক্ষে দেখিলেন, তাঁহার পিতামহী মহাজ্যোতিঃরূপে সূর্য্যলোকে উঠিয়া গেলেন। অতঃপর ধর্ম্মদাস-বাবু তাঁহার পিতামহীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ঠাকুরকে লইয়া নবদ্বীপ-সহর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে ভাতশালা-গ্রামস্থ তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া যান। তথায় সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীশ্রীনিত্যদেব উপস্থিত থাকায় সর্ব্বকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয় এবং বহু কাঙ্গালী তথায় প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হয়। এই সকল কাজ শেষ হইতে হইতে প্রভাত হইল দেখিয়া গোপীগোষ্ঠ কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সেই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর নির্ব্বিকল্প-সমাধি-মগ্ন হইলেন। তাই, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া নাড়ীর স্পন্দন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল। তাহা দেখিয়া নিমন্ত্রিত ভক্তগণের মধ্যে উপস্থিত প্রবীণ চিকিৎসকগণ "ইহাঁর নিশ্চয় মৃত্যু হইয়াছে" বলিতে বলিতে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের ভক্তগণ সকলকে আশ্বাস দিয়া নাম-সংকীর্ত্তন করিতে বলিলেন। অতঃপর সমবেত জনমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়া সমাধি হইতে ব্যুত্থান লাভান্তর ঠাকুর সেই সংকীর্ত্তনে অদ্ভুত নৃত্য করিতে করিতে সকলকে একে একে কোল দিলেন। অতঃপর ধর্ম্মদাসবাবুর পিতা মতিরায়মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অধমের কার্য্য কি সফল হ'ল?" ভাবাবেশে ঠাকুর উত্তর দিলেন, "হ'ল হ'ল।"

একদিন ঠাকুর বর্ণনাতীত দত্তাত্রেয়-ভাবে বিভোর হইয়া পরিধের

বস্ত্র মস্তকে বন্ধনপূর্ব্বক উলঙ্গ হইয়া নিজাসনে উন্মত্তবৎ উপবিষ্ট হইলেন। ‘তাঁহার দু’টি চক্ষু রক্তবর্ণ, দৃষ্টি উর্দ্ধে নিবদ্ধ।’ তদ্দর্শনে ভক্তগণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন ; এই ভাব সংবরণ করিবামাত্র ঠাকুর খল্‌খল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুর অতঃপর মৃদু হাস্যে ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন, “ইহাই আমার দত্তাত্রেয় ভাব।” এইরূপে রাত্রি অবসান প্রায় দেখিয়া ঠাকুর শান্তভাব অবলম্বনপূর্ব্বক উত্থান করিলেন ; ভক্তগণও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

সেই সময় নদীয়াতে যাঁহারা গৌরভক্ত বলিয়া বিশেষ পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে রাধেশ্যামবাবা বলিয়া বিখ্যাত শ্রীযুক্তরামলাল মিত্রমহাশয় একজন সাধক-প্রধান ছিলেন। শ্রীমৎরাধারমণচরণদাস বাবাজীমহাশয় তাঁহাকে “বাবা” বলিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। সেই মিত্রমহাশয় ঠাকুর দর্শন করিবার জন্য একদিন আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “সব ভাল ত ?” তদুত্তরে মিত্রমহাশয় জোড়করে বলিলেন, “আমার শ্রীনবদ্বীপধামে বাস উঠেছে। এক্ষণে অবশিষ্ট জীবন শ্রীবৃন্দাবনধামে কাটাবার ইচ্ছা ক’রেছি। তাই, আপনার অনুমতি প্রার্থনা ক’র্‌তে এসেছি।” তৎশ্রবণে ঠাকুরের চক্ষু ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল। আর ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন, “এও ত গুপ্তবৃন্দাবন, এখানে সুবিধা হ’ল না ? আচ্ছা, বৃন্দাবনে যা’বেন ? সেও উত্তম।” এই কথাগুলি বলিয়াই ঠাকুর আরও দুই চারি বার বিড়্ বিড়্ করিয়া অতিশয় ক্ষীণস্বরে “বৃন্দাবন, বৃন্দাবন” উচ্চারণ করিতে করিতে মহাভাব-সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বাঙ্গ এমন কাঁপিতে আরম্ভ করিল যে, হাড়গুলি পর্য্যন্ত খট্‌খট্ করিতে লাগিল। মুদিত চক্ষু দুইটী হইতে অবিরত অশ্রুধারা নির্গত হওয়ায় বক্ষঃস্থলের বস্ত্রখণ্ড পর্য্যন্ত সিক্ত হইতে লাগিল। পুলকাবলীতে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া গেল এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গ বিবর্ণতা-প্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে মিত্রমহাশয় কাঁপিতে কাঁপিতে ঠাকুরের পদপ্রান্তে লম্বা হইয়া পড়িয়া গেলেন। নিত্যভক্ত

দ্বারিকবাবু ত এইসব দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। প্রায় এক ঘণ্টাকাল পরে ঠাকুর ব্যুত্থান লাভ করিয়া বারবার "নারায়ণ, নারায়ণ, হরিবোল, হরিবোল" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মিত্রমহাশয় ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আর কি বল্‌ব! নিজ দয়াগুণে আমাকে ছেড়োনা।" তখন ঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা, তবে আসুন্; কিন্তু আপনাকে আবার এইখানেই এসে থাক্‌তে হ'বে; ভগবান্ মঙ্গল করুন্।" বলাবাহুল্য, ইহার কিছুদিন পরেই মিত্রমহাশয় বৃন্দাবনধাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া নবদ্বীপ-ধামেই বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীদেবের অহেতুকী কৃপা যে কেবলমাত্র মনুষ্য-দেহধারী জীবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেশো ও ভক্তা নামে দুইটী কুকুর। তাহারা পশুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছিল। তাহারা আশ্রমে পড়িয়া থাকিত এবং নিশাভাগে প্রহরীর কাজ করিত। তদ্দর্শনে ঠাকুর তাহাদের মস্তকে তাঁহার রাতুলচরণ স্থাপন-পূর্ব্বক পশুজন্ম হইতে তাহাদিগকে চিরতরে মুক্ত করিয়া দিলেন। কিছুদিন পর ভক্তা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল। ভক্তগণ তাহাকে গঙ্গাজলে নিমজ্জনপূর্ব্বক তাহার সৎকার করিলেন। দেশোর শরীর ক্রমে ক্রমে ব্যাঘ্রের ন্যায় হইল। চক্ষু দুইটী সর্ব্বদাই রক্তবর্ণ—দেখিলেই ভয় হয়। সে এরূপ ভীষণ চীৎকার করিত যে, তাহার নিকটে কোন কুক্কুরীও আসিতে পারিত না। ঠাকুরের কৃপায় পশু দেশোও নিষ্কাম ভাব লাভ করিয়া নদীয়ার রজে জীবন ত্যাগপূর্ব্বক দিব্যরূপে দেখা দিয়াছিল। ভক্তগণ তাহার দেহ গঙ্গাতীরে সমাধি দিয়া মহোৎসব করেন, এবং দেশোর উদ্দেশ্যে হরিনাম-সংকীর্ত্তন করেন।

ইহার পর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বহু ভক্ত আশ্রমে শুভাগমন করিলেন। তাহা দেখিয়া ঠাকুর নিজে যোগমায়ার পূজা আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ যোগমায়ার মূর্ত্তি গড়াইলেন। দিবাভাগে সমস্ত অনুষ্ঠান হইল। ঠাকুর সেই মূর্ত্তি কোলে করিয়া ভাবাবেশে অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন।

কখনও বা 'ছেলে ভুলে' আনন্দে মগ্ন হইয়া রহিলেন। ঠাকুরের ক্রোড়দেশে চৈতন্যরূপা প্রতিমা উপবিষ্টা থাকায় যোগমায়া ও যোগানন্দের একত্র মিলন হইয়াছিল। তদ্দর্শনে ভক্তগণ মাতোয়ারা হইয়া হরিনাম ও কালীনাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বোধ হইল, কত দেবদেবী ঠাকুরকে ঘিরিয়া দুন্দুভিবাদনপূর্ব্বক মহানৃত্য করিতেছেন, কত পুষ্পগন্ধ তথায় প্রবাহিত হইয়া সকলের প্রাণ মাতাইয়া দিতেছে। অতঃপর ঠাকুর ফল-মিষ্টান্নাদি নিবেদনপূর্ব্বক সকলকে প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিলেন।

এই সময় নবদ্বীপে "গলাভাঙ্গা সিদ্ধেশ্বর" নামে জনৈক সিদ্ধ বাবাজী বাস করিতেন। তিনি যেমন মহানিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন, তেমনই অন্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতকেও বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। কীর্ত্তনে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাই প্রভাতে শ্রীধাম-পরিক্রমের সময় সুললিত কীর্ত্তনে নদীয়াবাসীর হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করিতেন। তিনি নিজ ভক্তিভাবেই যেন ঠাকুরের অশেষ কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অনেক সময় ঠাকুর তাঁহার সুমধুর কীর্ত্তন শুনিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে পর্য্যন্ত যাইতেন। তিনিও ভাব-বিহ্বল-চিত্তে ঠাকুরকে সমাদরে একখানি চেয়ারে বসাইতেন এবং ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। যে দিন সন্ধ্যার সময় উক্ত সিদ্ধ বাবাজীর দেহত্যাগ হয়, সেইদিন শ্রীমৎকেশবানন্দমহারাজ তাঁহার দেহদাহের সময় শ্মশানঘাটে উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর সেই সময় ষ্টেশন-মাষ্টার কালীবাবুর বাসায় গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। তিনি আশ্রমে আসিবার পর শ্রীমৎকেশবানন্দ-মহারাজের নিকট সিদ্ধেশ্বর বাবাজীর দেহত্যাগাদির সংবাদ শুনিলেন। অতঃপর সেই গভীর রাত্রেই তিনি ভক্তবরকে সঙ্গে করিয়া শ্মশানঘাটে গেলেন। তথায় যেস্থানে বাবাজীর দেহদাহ করা হইয়াছিল, ঠাকুরের আদেশে ভক্তবর সেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তখন ঠাকুরের

ইঙ্গিতক্রমে শ্রীমৎকেশবানন্দমহারাজ এক অঞ্জলি গঙ্গাজল আনিয়া তাঁহাকে দিলেন। ঠাকুর উহা তিনবার নির্দ্দিষ্ট-চিতা-ভস্মের উপর প্রক্ষেপ করিলেন। ভক্তবর তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইলেন যে, উক্ত চিতার উপরে তাঁহার সুপরিচিত পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধেশ্বর বাবাজী দণ্ডায়মান হইলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত দেহ বস্ত্রদ্বারা আবৃত ছিল। যাহাহউক, শ্রীশ্রীদেব তাঁহাকে গোলকধামে যাইবার আদেশ করিলেন। আদেশ পাইবামাত্র বাবাজী শূন্যে উঠিতে লাগিলেন। এইভাবে পৃথিবী হইতে অনেক উর্দ্ধে উঠিবার পর তিনি অদৃশ্য হইলেন। অতঃপর ঠাকুর সভক্ত আশ্রমে ফিরিলেন।

ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যদেব নানাপ্রকারে অনেক সময় ভক্তগণের অতি সামান্য অভিলাষও পূর্ণ করিতেন। তাই শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়ের ইচ্ছা পূরণার্থ দয়াল ঠাকুর কাটোয়ায় তাঁহার শ্বশুর-বাটীতে একবার গমন করেন। কাটোয়াতে গৌরভক্ত 'মাধাইয়ের বাড়ী' নামে একটী দর্শনীয় স্থান আছে। ঠাকুরকে উহা দর্শন করাইবার জন্য ভক্তগণ বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বালকভাবে আবিষ্ট হইয়া "আমাকে মার্বে, আমি যাব না!" বলিতে বলিতে আড়ষ্ট হইয়া পড়িলেন। কানু ছাড়া যেমন কীর্ত্তন হয় না, তেমনই ঠাকুরকে না লইয়া কেহই তথায় যাইতে রাজী হইলেন না। অবশেষে তাঁহাকে জোর করিয়াই যেন ভক্তগণ তথায় লইয়া গেলেন। কিন্তু ঠাকুর ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক একেবারে নিজ বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যা অতীত হইল। অন্যান্য ভক্তগণ দর্শনাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া বাসস্থানে আসিলেন। তদনন্তর তুমুল কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ঠাকুর ভাবাবেশে অপরূপ নৃত্য করিতে লাগিলেন। 'পড়িয়া গেলে পাছে তাঁহার আঘাত লাগে' এই ভয়ে চারি পাঁচ জন ভক্ত তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কালীবাবু তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা কীর্ত্তন করুন, আমি ঠাকুরকে রক্ষা

কর্‌ছি।" বলাবাহুল্য, কালীবাবুর শরীর খুব বলিষ্ঠ ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি ঠাকুরকে স্পর্শ করিবামাত্র তড়িৎ স্পর্শ করিলে যেরূপ আঘাত লাগে, তদ্রূপ আঘাত পাইতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও যখন তিনি ঐরূপ আঘাতে একেবারে গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবর হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি ঠাকুরকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন, এবং বহির্ব্বাটীতে গিয়া উপবেশন করিলেন। এক ঘণ্টাকাল দুইজন চাকর তাঁহাকে বাতাস দিবার পরে তিনি সুস্থ বোধ করেন। এই ঘটনার পরে ঠাকুর নবদ্বীপ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একদিন কালীবাবু তেল মাখিয়া স্নান করিতে রওনা হন, কিন্তু গামছা কাঁধে একেবারে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা অনুমান নয় ঘটিকা হইবে। ঠাকুরের আহার হয় নাই। কালিদাসবাবু ঠাকুরকে বলিলেন, "আপনি বলুন যে, বিনা সাধন-ভজনে আমার ইষ্ট দর্শন হ'বে!" ঠাকুর তদুত্তরে হাত ঘুরাইয়া বলিলেন, "তাও কি হয় গো?" এইরূপ কথাবার্ত্তাতে বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়া গেল। উভয়েই 'নাছোড়্‌বান্দা'। এমন সময় ভক্তবৎসল পরম-করুণাময় ঠাকুর দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন, "হ'বে গো, হ'বে।" সেই কথা শুনিবামাত্র কালীবাবুর প্রাণে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, কারণ ছাড়া কার্য্য কখনই হইতে পারে না। তিনি ভুলিয়া গেলেন যে, শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালদেব অহেতুকী-কৃপাসিন্ধু। ঠিক তন্মুহূর্ত্তে কালীবাবু অলীক সন্দেহের উত্তর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিলেন যে, ঠাকুরের প্রকোষ্ঠের একটী কোণ কোটী কোটী সূর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে তাঁহার ইষ্ট-দুর্গা-দেবী বিরাজিতা। তদ্দর্শনে তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া স্নানান্তে নিজালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

যখন শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব নবদ্বীপ-আশ্রমে অবস্থিতি করিতেন, তখন প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর গীতা, চৈতন্যভাগবত, ভক্তমাল প্রভৃতি এবং কোন কোন দিন 'অভ্‌ দি ইমিটেশন্‌ অভ্‌ ক্রাইষ্ট্‌' পুস্তক পাঠ হইত। পাঠের শেষে কোন কোন দিন তিনি ধর্ম্মোপদেশ দিতেন,

কোন কোন দিন সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইত। অবশেষে তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে ভক্তগণ সমন্বয়-ভাবের দুই একটী গান গাহিয়া বিদায় লইতেন। এইভাবে ভক্তগণ শ্রীশ্রীদেবকে লইয়া নবদ্বীপধামে পরমানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীদেব কার্য্যোপলক্ষে পুনরায় কলিকাতা গমনান্তর স্বরগুনায় ভক্তগণকে সঙ্গ দানে কৃতার্থ করেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কলিকাতা গমন, নানাস্থান ভ্রমণ ও নবদ্বীপে প্রত্যাগমন

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততে সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

গীতা, ৩য় শ্লোঃ, ৭ম অঃ।

[সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কখনও কেহ সিদ্ধির অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করে; সেই প্রযত্নশীল সিদ্ধগণের মধ্যে আবার কখনও কেহ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে।]

১৩০৪ সাল, ফাল্গুন মাস; ঠাকুর তখন স্বরগুনায়। এই সময় বজ্রাপুরের মুকুন্দবাবু কার্য্যোপলক্ষে সপরিবার কলিকাতায় ৬নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে বাস করিতেছিলেন। একদিন ঠাকুর মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় ভক্তবর সহধর্ম্মিণীর দীক্ষার জন্য সস্ত্রীক

স্বরগুনায় উপস্থিত হইলেন। সেই দিনই দীক্ষা-কার্য্য-সমাধার পর তিনি কলিকাতার বাসায় ফিরিবার জন্য একখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন। গাড়ী আসিলে শ্রীশ্রীদেব সকলের অজ্ঞাতসারে একটী ছোট পুঁটুলি লইয়া তাহাতে উঠিলেন। ভক্তগণ তাঁহার স্বভাব জানিতেন। সুতরাং কেহ বিশেষ কিছু বলিলেন না। কোন কোন ভক্ত মুকুন্দবাবুকে বলিলেন, "আপনি কি অক্রুর হ'লেন?" উত্তরে মুকুন্দবাবু কহিলেন, "সে কি! আমি কি ক'র্‌লাম? ঠাকুর যে নিজে গিয়ে গাড়ীতে বসেছেন!" ভক্ত-গণের মধ্যে গিরীনবাবু, নফরবাবু প্রভৃতি ঠাকুরের সঙ্গ লইলেন।

অশ্বযান কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিল; তখনও খিদিরপুর বাজারের নিকট পৌছে নাই—মুকুন্দবাবু সহসা দেখিতে পাইলেন, শ্রীশ্রীদেবের নয়ন স্তিমিত—অশ্রুধারা উজ্জ্বল রক্তিমাভ গণ্ডদেশ বহিয়া প্রবাহিত—মহাভাবে শরীর দীর্ঘ হওয়ায় মস্তক প্রায় গাড়ীর ছাদে ঠেকিয়াছে—আবেশে কখনও হাসিতেছেন, কখনও অস্পষ্ট ভাষায় কি বলিতেছেন। আজ যে ঠাকুর এই ভাবে কেন কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তাহা ভক্তগণ পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সেদিন শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের শুভ জন্ম-তিথি। শ্রীশ্রীনিত্যদেবের সহিত শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের যে অনির্ব্বচনীয়, নিগূঢ় অথচ অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং এখনও রহিয়াছে, সেই সম্বন্ধের আকর্ষণেই সেদিন তিনি কলি-কাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ফুল ফুটিলেই ভ্রমর তাহার সন্ধান পাইয়া থাকে; তাই দেখিতে দেখিতে শ্রীমৎকেশবানন্দমহারাজ, কালী মাষ্টার, উপেন নাগ, ক্ষিতীশ পাইন, ত্রৈলোক্য পাইন এবং সতীশ ডাক্তারবাবু প্রভৃতি ভক্তগণ মুকুন্দবাবুর গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হইলেন। শ্রীমৎ-কেশবানন্দমহারাজ মুকুন্দবাবুকে বলিলেন, "আজ ঠাকুরকে প্রাণ ভ'রে সাজা'তে হ'বে।" মুকুন্দবাবু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "বেশ কথা! ফুলের মালা নিয়ে এস।" ভক্তগণ অবিলম্বে ফুলের গড়ে, ফুলের তোড়া ইত্যাদি আনিয়া শ্রীশ্রীনিত্যদেবকে মনের সাধে সাজাইয়ে

লাগিলেন এবং সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার রূপমাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন। সকলেই আনন্দে আত্মহারা; অথচ স্থির, ধীর ও শান্ত। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ভক্তবর গিরীন্দ্রবাবুকে ভগবদ্‌গুণ-কীর্তন করিতে অনুমতি করিলেন। গিরীন্দ্রবাবু গাহিলেন, "মন, আমি কা'র ভয় রেখেছি, যে দিন জ্ঞানানন্দের পদপ্রান্তে একান্ত শরণ ল'য়েছি" ইত্যাদি। সঙ্গীত শ্রবণমাত্র ঠাকুর আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রায় আট ঘটিকা। শ্রীশ্রীদেবের ভাবাবেশ লাগিয়াই আছে। ক্রমে ক্রমে তাহা গাঢ় হইয়া উঠিল। ঠাকুর প্রগাঢ় সমাধি-সিন্ধুনীরে নিমজ্জিত। সঙ্গীতের পর সঙ্গীত চলিতে লাগিল। ভক্তগণ আনন্দে অধীর হইয়া প্রাণের দেবতাকে প্রাণ ভরিয়া গান শুনাইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীদেবের সাড়া নাই, শব্দ নাই, নিমীলিত নয়নযুগল হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিনির্গত হইয়া গণ্ডস্থল ও বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল।

ঠাকুর রাত্রি আট ঘটিকা হইতে দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাধিস্থ ছিলেন। অতঃপর ধীরে ধীরে ব্যুত্থান লাভ করিলেন। আধ আধ ভাষায় ভক্তগণের প্রাণে অমিয় ধারা বর্ষণপূর্ব্বক বলিলেন, "এখন বিশ্রাম করা হউক।" ভক্তগণ ইঙ্গিত বুঝিয়া প্রণামান্তে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। পরে শ্রীশ্রীদেবের আহারান্তে ভক্তগণ মহানন্দে প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন।

অনন্তর অতি প্রত্যূষে সতীশবাবু আসিয়া মুকুন্দবাবুকে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীদেব তখনও শুইয়া আছেন। শ্রীমৎকেশবানন্দ মহারাজ দাঁতন করিতে করিতে বলিলেন, "জোরে চেঁচিও না—মুকুন্দ পায়খানায় গিয়েছে; কেন ডাকৃছ তা'কে?" এমন সময় মুকুন্দবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সতীশ ডাক্তারবাবু বলিলেন, "একটা কথা; দাদা* বল্লেন,

*সতীশ ডাক্তারবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ভক্ত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীমহাশয়। পরবর্ত্তী কালে ইনি বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট্ হইয়াছিলেন এবং শ্রীমৎস্বামী সারদানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

ঠাকুর নাকি কা'ল কাঁকুড়গাছীর যোগোদ্যানে গিয়েছিলেন' ?" শ্রীমৎ-কেশবানন্দমহারাজ ও মুকুন্দবাবু সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি! আমরা ত অবাক্ হ'য়ে যাচ্ছি!" সতীশ ডাক্তারবাবু বলিলেন, "শুধু যাওয়া নয়, সেখানে খাওয়া-দাওয়া, কীর্ত্তন-শোনা এবং নানা ভগবৎ-প্রসঙ্গও হ'য়েছিল। দাদা আরও বল্লেন যে, তাঁরা রাত্রে ঠাকুরকে সেখানে থাক্‌তে ব'লেছিলেন। ঠাকুর থাক্‌তে চাইলেন না—বল্লেন, 'আমি কল্‌কাতায় ৬নং রাধানাথ মল্লিকের লেনে যা'ব।' তখন তাঁরা ঠাকুরের সঙ্গে আস্‌তে চাইলেন। ঠাকুর তা'তেও রাজী হ'লেন না,—বল্লেন, 'আমি ধীরে ধীরে বেশ চলে যাব, তোমরা আমায় রেল্‌-লাইন্‌টা পার ক'রে দাও।' তাঁরা তখন ঠাকুরকে রেল্‌-লাইন্ পার ক'রে দিয়ে কাঁকুড়গাছি ফিরে গেলেন; আর ঠাকুর নাকি এদিকে চলে এলেন!" কথাগুলি সতীশ ডাক্তারবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন। শ্রীমৎ-কেশবানন্দমহারাজ ও মুকুন্দবাবু অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। ব্যাপারটা যেন ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না; কারণ "সমস্ত দিন মুকুন্দবাবু ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে; সন্ধ্যা হ'তেই ঠাকুর ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে বিভোর; তিনি গেলেন কি কোরে? গেলেনই বা কখন? আর সতীশবাবুর দাদাও ত মিথ্যা বল্‌বার লোক নন্—বল্‌বেনই বা কেন?" এইরূপে তাঁহারা নানাভাবে জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন। আর কথাটা স্বয়ং সতীশ ডাক্তারবাবুরও কেমন কেমন বোধ হইতেছিল—তাই তিনি রাত্রি দুই ঘটিকার সময় বাড়ী যাইয়া আবার প্রত্যূষেই হাজির হইলেন। যাহাহউক, কোন মীমাংসা হইল না। শ্রীমৎস্বামীকেশবানন্দ মহারাজের প্রাণটা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল—'কখন কথাটা ঠাকুরের কাছে বলিবেন'! এমন সময় শ্রীশ্রীদেবের শয্যার দিক্ হইতে "নারায়ণ, নারায়ণ" শব্দ উত্থিত হইল। তৎশ্রবণে তিনি দৌড়াইয়া গিয়া এক নিঃশ্বাসে ঠাকুরকে বলিলেন, "বাবা, একটা কথা, আপনি নাকি কা'ল কাঁকুড়গাছি গিয়েছিলেন?" চতুর-চূড়ামণি ঠাকুর কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং

বলিলেন, "সে কি গো ? সে কি ? আমি ত কাল মাথা খারাপ হ'য়ে তোমাদের সঙ্গে এখানেই ব'সেছিলুম্—কাঁকুড়গাছি গেলুম্ কি ক'রে ?" শ্রীমৎকেশবানন্দমহারাজ বলিলেন, "তা'নয়—তা'নয় : আপনাকে বল্‌তেই হ'বে ; সতীশের দাদা ত আর মিথ্যা বল্‌বার লোক নন্ ।" যখন তিনি বুঝিলেন, চূড়ামণি (শ্রীমৎকেশবানন্দমহারাজ) ছাড়িবার পাত্র নহেন, তখন অগত্যা শ্রীশ্রীদেবকে বলিতে হইল, "তা' আমি কি জানি ? ভগবানের ইচ্ছায় সব সম্ভব।" শ্রীমৎকেশবানন্দমহারাজ হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ভক্তগণ সকলে শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। এ লীলা শ্রীভগবানের পক্ষে নূতন নহে—চিরপুরাতন—আবার চিরনূতনও বটে। তাই তৎসম্বন্ধীয় কিছুই পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার রূপ—তাঁহার লীলা—তাঁহার ক্রীড়া পুরাতন হইলেও ভক্তের নিকট নিত্যনূতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শ্রীনিত্যলীলা নিত্যই সুন্দর। জন্ম ভরিয়া দেখিলেও নয়নের তৃষ্ণা মিটে না—লক্ষ শ্রবণে অনন্তকাল শুনিলেও কৌতূহল নিবৃত্তি হয় না। যাহাহউক, এইপ্রকারে ভক্তগণকে সঙ্গদানে কৃতার্থ করিয়া কিয়দ্দিবস পর শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বলাবাহুল্য, শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের শুভ জন্মদিনে শ্রীশ্রীনিত্যদেবকে কাঁকুড়গাছি-যোগোদ্যানের ভক্তগণ বিশেষভাবে তথায় যাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। তাই, তিনি দেহান্তর ধারণপূর্ব্বক যোগোদ্যানের উৎসবে যোগদান করিয়া ভক্তগণকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

যাহাহউক, শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব নবদ্বীপধামে আগমন করিলে নদেবাসী ভক্তগণ যেন আনন্দে আত্মহারা হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার শ্রীচরণ-প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন। তৃষিত চকোরের ন্যায় ভক্তগণ তাঁহার পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ, প্রেমে-ঢলঢল-বদন-সুধা পান করিয়া দীর্ঘকালের বিরহ-সন্তাপ দূর করিলেন। ভক্তগণের এই প্রকারের অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর ও প্রেমাবেশে আপ্লুত হইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে ভক্তগণ এরূপ তুমুল কীর্ত্তন

আরম্ভ করিলেন যে, সকলেই মাতোয়ারা হইয়া গেলেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর ঠাকুর "নারায়ণ, নারায়ণ" উচ্চারণপূর্ব্বক বাহ্যদশাপ্রাপ্ত হইয়া ভক্তগণকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন।

তদনন্তর ১৩০৭ সালের শ্রীশ্রীগুরু-পূর্ণিমা-তিথি উপলক্ষে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দদেবের শ্রীশ্রীচরণকমলে শ্রদ্ধাঞ্জলি-প্রদানের নিমিত্ত সমাগত ভাবোন্মত্ত নিত্য-ভক্তগণ মহাসমারোহে চৌদ্দমাদল-কীর্ত্তনানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ নদেবাসী কীর্ত্তনানুরাগী অসংখ্য লোক এই দলে যোগদান করতঃ ইহার পুষ্টিসাধন করিলেন। প্রেমিক কীর্ত্তনীয়াগণ নগরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গগনভেদী খোল-করতালের শব্দ ও কীর্ত্তনের ঝঙ্কার এবং "গুরু জ্ঞানানন্দ কি জয়!" ধ্বনিতে তাঁহারা সমস্ত নবদ্বীপ আলোড়িত করিয়া তুলিলেন। তখন দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের মনে এই ভাব উদ্দীপিত হইল যে, নদীয়া-নাগর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর পুনরাবির্ভূত হইয়া নদীয়াবাসীকে কীর্ত্তনানন্দে ভাসাইতেছেন। অনন্তর কীর্ত্তনীয়াগণ আম্‌পুলিয়াপাড়ার আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীদেবের শ্রীচরণ-দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলে, ভক্তপ্রাণ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব বহিরাগমন করিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারে প্রেমবারি বহিতে লাগিল। অতঃপর তিনি সমাধিমগ্ন হইলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কেহবা তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। সমাধি হইতে ব্যুত্থান লাভ করিয়া ভক্তবৎসল ঠাকুর সুমধুর বচনে ভক্তগণকে বিশ্রামান্তে প্রসাদ পাইতে বলিলেন। এই ভাবে শ্রীগুরু-পূর্ণিমা-তিথির পূর্ব্বদিন অতিবাহিত হইল।

পরদিন পাপক্ষয়কারিণী মোক্ষদা তিথি শ্রীশ্রীগুরু-পূর্ণিমা। উক্ত দিবস ভক্তগণ দলে দলে গঙ্গাস্নান করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে শ্রীশ্রীদেবের শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান কারতে করিতে অঞ্জলি দিবার উদ্যোগ করিলেন। এদিকে ঠাকুর লোক-শিক্ষার্থ ঐ তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সমাপনান্তে স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ভক্তগণ নানাবর্ণের মনোহর সুগন্ধি-

পুষ্পরাশির দ্বারা কেহ বা মালা, কেহ বা নূপুর, কেহ বা কিরীট, কেহ বা কেয়ূর, কেহ বা বলয় রচিত করিয়া সেই তপ্তকাঞ্চন-বিনিন্দিত-গৌরাঙ্গ মূরতি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে সুসজ্জিত করিয়া দিলেন। কোন কোন ভক্ত· চন্দন দ্বারা মুখপদ্ম অলকাবলিত করিয়া দিয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আবার কেহ কেহ বা তাঁহার রক্তোৎপল-বিনিন্দিত চরণ যুগল অলক্ত রঞ্জিত করিয়া দিলেন। মোহন সাজে বিভূষিত শ্রীশ্রীনিত্যদেব মহাভাবে আবিষ্ট; ভক্তগণ সচন্দন পুষ্প-তুলসী-ও-বিল্বপত্র দ্বারা ঐ রাতুল চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীদেব ভাববিহ্বল-চিত্তে "নারায়ণ, মঙ্গল করুন" এই বাক্যে প্রত্যেককে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। আবার কীর্ত্তন-বাটীতে মহাকীর্ত্তনের ধূম পড়িয়া গেল। "গুরু জ্ঞানানন্দ কি জয়!" ধ্বনিতে গৃহটী প্রকম্পিত হইতে লাগিল। এতদুপলক্ষে ভক্তগণ খিচুড়ী, বহু প্রকারের শাক্-সব্জী, তরকারি, প্রচুর পরিমাণে ঘি, ক্ষীর, দধি, মিষ্টান্নাদির দ্বারা মহামহোৎসবের আয়োজন করিলেন। শ্রীশ্রীদেব দৃষ্টিভোগ করিয়া দিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধমাত্র পান করিলেন। অতঃপর আসন গ্রহণান্তর ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ পাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহারাও তদনুসারে আকণ্ঠ প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। আশ্রমে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। প্রাসাদ প্রাপ্তির পর শ্রীশ্রীদেবকে ঘিরিয়া পুনরায় কীর্ত্তন চলিল। এই ভাবে নিশি প্রভাত হইলে, পরদিন ঠাকুর নদেবাসীদিগকে ভোজন করাইবার উদ্দেশ্যে আর একটী মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন। তিনি স্বয়ং তরকারি কুটিতে বসিলেন। যথাসময়ে ভোগরাগাদি সুসম্পন্ন হইল। দ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য বশতঃ অসংখ্য লোক প্রসাদ লাভে পরমা তৃপ্তি লাভ করিলেন। আবার কীর্ত্তনের রোল পড়িয়া গেল। যাঁহার হরিনামে নয়নযুগল হইতে প্রেমবারির স্রোত বহিত, সেই ঠাকুর যখন ভক্ত-তারকা-মণ্ডলীর মধ্যস্থলে চন্দ্রবৎ উপবিষ্ট হইয়া সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন, তখন ভাবাবেশে তাঁহার যে কিরূপ মত্ততা হইত, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঠাকুরের নবদ্বীপে অবস্থানকালে ভক্তগণ অনেক সময় কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন। একদা প্রথমে হরিসংকীর্ত্তন হইল, পরে ঠাকুরের আজ্ঞায় কালীনাম হইতে লাগিল। সেদিন ঐ সময়ে "সুরাপান করি নে আমি, সুধা খাই 'জয়কালী' ব'লে; মন-মাতালে মেতেছে আজ, মদ্-মাতালে মাতাল বলে" এই গানটী গাওয়া হইতে-ছিল। গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের শিব-সমাধি হইল। তৎপরে তাঁহার অধরের দুই পাশ দিয়া লালা ক্ষরিত হইতে লাগিল। ঘরে মদিরার গন্ধ ছুটিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন ঘরের মধ্যে দুইচারিটী ব্র্যাণ্ডির বোতল ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে! ভক্তপ্রবর শ্রীমৎকেশবানন্দমহারাজ অঞ্জলি পাতিয়া সেই লালা ধারণ করিলেন। অনেক ভক্তই সেই লালা-প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। গ্রহণমাত্রেই তাঁহাদের মনে অপূর্ব্ব আনন্দের স্ফূর্ত্তি দেখা গেল এবং তাঁহারা সমস্ত রাত্রি, এমন কি, পরদিন পর্য্যন্তও সামান্য সামান্য নেশা বোধ করিয়াছিলেন। আহা! সে নেশা কি সামান্য নেশা, সে নেশা যে দিব্য নেশা! সে নেশা যে ভগবন্নেশা! হে নিত্যভক্তবৃন্দ, তোমরাই ধন্য! তোমরাই নিত্য-নেশায় নিত্যে বিভোর!

এক সময় নলিন নামক জনৈক ভক্ত জেলের মধ্যে আমাশয় রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হন এবং জীবন-নাশের আশঙ্কায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তাই, তিনি ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকেন। এমন সময়ে শ্রীশ্রীনিত্যদেব জেলের ভিতরে হঠাৎ তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলেন, "তুই ভাল হ'বি; তোর কোন ভয় নাই।" আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছুদিন পরে তিনি ঐ কষ্টদায়ক পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করেন ও জেল হইতে মুক্ত হন! প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারিলে ভগবান্ এইরূপে দয়া করেন। পরে শ্রীশ্রীদেব বলিয়াছিলেন, "নলিন যতই দুষ্ট ও বদ্‌মায়েস্ হোক্, যে হরিনাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে কাঁদে, তা'র কোন ভয় নাই। অতি পাতকীও বিপদের সময় অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে কাঁদ্‌লে, শ্রীভগবান্ তাঁহার অহেতুকী কৃপায় এইরূপে তা'কে বিপদ্ হ'তে উদ্ধার ক'রে আপনার শ্রীচরণে

স্থান দেন।"

এই ঘটনার কিছুদিন পর একদিন ভক্তগণ ঠাকুরকে ফুলের মালা দিয়া সাজাইয়াছেন। ভক্তগণের সহিত কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীদেব কহিলেন, "আমি আজকাল বড় সুলভ হ'য়েছি—আমাকে এখন কেহ চিন্‌তে পারছে না। যদি বহুদিন পথ হেঁটে, অনেক পর্ব্বত অতিক্রম ক'রে, অতি দীর্ঘ শিকল্ ধ'রে উঠে বহু ক্লেশের পর আমাকে দর্শন করতে হ'ত, তা'হ'লে লোকে আমাকে কিছু বুঝ্‌তে পারত। আমাকে এখন কেউ বুঝ্‌তে পারছে না—যখন আমি দেহ রাখ্‌ব, তখন অনেকে আমাকে বুঝ্‌তে পারবে।" উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে তখন সতীশবাবু বলিলেন, "ঠাকুর ঐ নিদারুণ কথা আর বল্‌বেন না—আমরা যেন আপনার সঙ্গে সঙ্গেই খেলা সাঙ্গ ক'রে যেতে পারি। আপনার অভাবে আমরা কি নিয়ে সংসারে থাকব ?" এই বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তখন হাসিতে হাসিতে সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন যে, তাঁহার দেহ রক্ষা করিবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

যাহাহউক, পূর্ব্বোক্ত গুরুপূর্ণিমা-তিথি উপলক্ষে সমাগত ভক্তবৃন্দ পাঁচ সাতদিন শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের সঙ্গে পরমানন্দে অবস্থান করতঃ তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পরমারাধ্য দেবতার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় এরূপ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, তদ্দর্শনে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। যাঁহার মুখপদ্ম একটীবার দর্শনমাত্র তাঁহারা সংসারের ত্রিতাপ-জ্বালা মুহূর্ত্তমধ্যে বিস্মৃত হইতেন, তাঁহার নিকট হইতে ক্ষণেকের বিচ্ছেদ যে কত হৃদয়-বিদারক তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহই অনুভব করিতে পারে না। সামান্য সংসারের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণাই লোকের অসহ্য হইয়া উঠে ; কিন্তু যিনি সর্ব্বগুণের আধার, যিনি "রসো বৈ সঃ," তাঁহার সহিত বিচ্ছেদের কথা ভাবিতেও প্রাণ আকুল হইয়া উঠে ; তাই ভক্তগণ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের নিকট হইতে বিদায়-কালে এরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তদ্দর্শনে পরমকারুণিক শ্রীশ্রীনিত্যদেবের কোমল হৃদয় এরূপ

বিচলিত হইয়াছিল যে, তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সুমধুর বচনে তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হয়ো না, আমি শীঘ্রই কল্‌কাতা যাচ্ছি; সুতরাং মনোহরপুর-আশ্রমটী যেন পরিষ্কার কর্‌বার ব্যবস্থা করা হয়।"

ইহার কিছুদিন পরেই কয়েক জন ভক্ত সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীদেব মনোহরপুর-আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শুভাগমন-বার্ত্তা ভক্তগণের মুখে মুখে চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হওয়ায়, নূতন ও পুরাতন অনেক ভক্তের সমাগম হইতে লাগিল। এইবার শ্রীশ্রীদেব দীর্ঘকাল উক্ত আশ্রমে বাস করেন; কদাচিৎ আশ্রমের বাহিরে যাইতেন। সেই সময় তিনি অনেকদিন কীর্ত্তনানন্দে এরূপভাবে নিমগ্ন থাকিতেন যে, বহুক্ষণ বাহ্য-জগতের সহিত একেবারে নিঃসম্বন্ধ হইয়া পড়িতেন—আবার অনেকদিন গ্রন্থ-রচনায় এরূপ ব্যাপৃত থাকিতেন যে, তাঁহার আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ হইয়া যাইত।

এই প্রকারে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর বাসন্তী-অষ্টমী আসিয়া পড়িল। উক্ত দিবস শ্রীশ্রীদেবের শুভ জন্ম-তিথি। এতদুপলক্ষে সমাগত ভক্তমণ্ডলী একটী মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। উষা-সমাগমে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসি-মৃদঙ্গ-করতালের ধ্বনিকে ভেদ করিয়া সময় সময় "জয় গুরু জ্ঞানানন্দ!" "জয় নিত্যগোপাল!" ইত্যাদি ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইতে লাগিল। এই সময় ভক্তগণ শ্রীশ্রীদেবের মঙ্গল-আরত্রিক সমাপন করিলেন। অতঃপর ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে তৈলাদি মর্দ্দন করিয়া তাঁহারা কলসী কলসী দুগ্ধ ও গঙ্গোদক ঢালিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বিশেষভাবে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। অনন্তর তাঁহারা শ্রীশ্রীদেবকে নানাবিধ পুষ্প-মাল্যাদিতে ও মনোহর বেশে সুসজ্জিত এবং তাঁহার সুঠাম বরবপু চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া দিলেন। এই রূপ-সুধা ভক্ত-চকোরমাত্রেই প্রাণ ভরিয়া পান করিতে লাগিলেন। ঐ শুভদিনে কীর্ত্তনানন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। ঠাকুর ভাবাবেশে

আজ কল্পতরু সাজিলেন—শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক যে ভক্ত যাহা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, শ্রীশ্রীদেব তাঁহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। অনেক ভক্তই স্ব স্ব ইষ্টরূপে শ্রীশ্রীনিত্যদেবকে দর্শন করিয়া বিস্ময় ও অপূর্ব্ব আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এদিকে নানাবিধ দ্রব্যাদির দ্বারা ভোগের ব্যবস্থা করা হইল। শ্রীশ্রীদেব উহা প্রসাদিত করিয়া দিলে, ভক্তগণ পরম তৃপ্তির সহিত সাক্ষাৎ ভগবানের প্রসাদ পাইয়া মানব জন্ম সার্থক করিলেন।

শ্রীশ্রীদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য। সংকীর্ত্তন ধর্ম্মাচরণের একটী প্রধান অঙ্গ। তাই, তিনি বলিয়াছেন, উচ্চৈঃস্বরে হরি-সংকীর্ত্তনে যত শীঘ্র মনঃস্থির হয়, এত আর অন্য কিছুতে হয় না। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবও সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। এই সংকীর্ত্তনে বাধা দান করিবার অপরাধে তিনি নৃসিংহ-রূপ ধারণপূর্ব্বক চাঁদকাজীর ভীষণ আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঠাকুরও সংকীর্ত্তনে বাধাদানকারী কালীঘাট-নিবাসী জনৈক ভদ্রলোককে ভীষণ হুঙ্কারে ভয়াভিভূত করিয়াছিলেন। এই ভদ্রলোক ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বরডাক্তারবাবুর ডাক্তারখানার পার্শ্ববর্ত্তী একটী বাটীতে বাস করিতেন। নিত্যভক্তগণ এই ডাক্তারখানায় সমবেত হইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। দুই একদিন কীর্ত্তন হইবার পর উক্ত ভদ্রলোক আসিয়া ভক্তগণকে কর্কশবাক্যে ভর্ৎসনা করেন এবং তাঁহাদিগকে এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে বলেন। 'অন্যথা করিলে তিনি যথোচিত শাস্তি বিধান করিবেন' এই ভাবে তর্জ্জন-গর্জ্জন পর্য্যন্ত করেন। ভক্তগণ এই কথা শ্রীশ্রীদেবকে জানাইলেন। ইহা শুনিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার জন্য তিনি যেন ভদ্রলোকটীর উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আজ সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন হ'বে!" ভক্তগণ তাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন। কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই কীর্ত্তনে ঠাকুরও যোগদান করিলেন। তিনি ঊর্দ্ধবাহু

হইয়া কীর্ত্তনে বারম্বার হুঙ্কার করিতে লাগিলেন এবং ভক্তগণকে "মাভৈঃ! মাভৈঃ!" বলিয়া অভয়বাণী দিতে লাগিলেন। ঠাকুরের সেই হুঙ্কারে সেই ভদ্রলোকের হৃদয় যেন বিদীর্ণ করিতে লাগিল; কেননা তাঁহার মনে হইল যে, কোটি কোটি সিংহ একত্রে গর্জ্জন করিতেছে। সেই নাদে তাঁহাকে ভয়ার্ত্ত এবং প্রায় সংজ্ঞাহীন করিয়া তুলিল। এই বিষয় তিনি ভক্তগণের নিকট পরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহাহউক, সেইদিন অবধি তিনি আর তাঁহাদের কীর্ত্তনে বাধাদান করিতে সাহসী হন নাই।

সন ১৩০৭ সালে ঠাকুর যখন মনোহরপুর-আশ্রমে, সেই সময় জন্মাষ্টমী-তিথিতে কাঁকুড়গাছি-যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের একটি বিশেষ উৎসব হয়। ঐ উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব্বে কালীবাবু (বেঁটে কালী) প্রভৃতি পরমহংসদেবের কয়েকজন ভক্ত তাম্বুল-উপহার-সহকারে মনোহরপুর আশ্রমে আসিয়া প্রণামান্তর, ঠাকুরকে যোগোদ্যানে উক্ত উৎসবে যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া প্রার্থনা করিয়া যান। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ভক্তগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া, রামবাবু (শ্রীমৎস্বামী প্রণবানন্দমহারাজ) চিন্তাহরণ কবিরাজমহাশয়, প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়, সতীশ সেনমহাশয়, বিপিনবাবু প্রভৃতি ভক্তগণ সহ আহারাদির পর বেলা প্রায় একটার সময় ঠাকুর একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে তথায় যাত্রা করিলেন। পরিধেয় গৈরিক বসনের উপর একটি সাদা বিছানার বোম্বাই চাদর দ্বারা শ্রীঅঙ্গ আবৃত করতঃ চটিজুতা পায়ে দিয়া, ঠাকুর ঢুলুঢুলু নেত্রে "নারায়ণ, নারায়ণ" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে গাড়ীতে উঠিলেন। ঠাকুর গাড়ীতে কখনও বা ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, কখনও বা ভক্তসঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন, কখনও বা প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন।

বেলা প্রায় তিন ঘটিকার সময় কাঁকুড়গাছিতে গাড়ী পৌছিল। ঠাকুর সভক্ত গাড়ী হইতে নামিলেন। ঠাকুরের চটিজুতা দৈববাবু লইলেন।

কর্দ্দমযুক্ত জলমগ্ন রাস্তা দিয়া ঠাকুর যোগোদ্যানের দিকে চলিলেন। যোগোদ্যানে পৌঁছিবামাত্র বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি সকলেই ঠাকুরকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের চরণযুগল কর্দ্দমাক্ত দেখিয়া তথাকার ভক্তবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ সিক্ত উড়ুনী দ্বারা তাহা ভক্তিপূর্ব্বক মুছাইয়া চটিজুতা পরাইয়া দিলেন। যোগোদ্যানের যে গৃহে মহাত্মা রামচন্দ্র দত্তমহাশয় থাকিতেন, সেই গৃহের দ্বারে ঠাকুর গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় নাট্যাচার্য্য গিরীশবাবু, সিষ্টার নিবেদিতা ও তাঁহার দুইজন পরিচারিকা, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। 'তিনি পড়িয়া যাইবেন' এই আশঙ্কায় রামবাবু (শ্রীমৎস্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ) প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। তদবস্থায় ঠাকুর বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতঃপর কিঞ্চিৎ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে তিনি বসিয়া পড়িলেন এবং বসিয়াই আবার সমাধিস্থ হইলেন। গিরীশবাবু, সিষ্টার নিবেদিতাকে ঠাকুরের সেই অবস্থা দেখাইয়া বলিলেন যে, ইহার নাম সমাধি। তিনি আরও বলিলেন, "ইনি ও পরমহংসদেব পাশাপাশি সমাধিস্থ অবস্থায় বোস্‌তেন এবং সংস্কৃতের ন্যায় (Allied to Sanskrit) একপ্রকার ভাষায় দু'জনে কথা কইতেন। তা' আমরা কেউই বুঝ্‌তে পার্‌তাম না।" সিষ্টার নিবেদিতা ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। পরে ঠাকুরের সমাধি ভাঙ্গিলে গিরীশবাবু সিষ্টার নিবেদিতার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইনি বিবেকানন্দের কন্যা। আপনি এঁকে আশীর্ব্বাদ করুন।" ঠাকুর দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, "এঁর আধার খুব ভাল।" সিষ্টার নিবেদিতা ভক্তিভাবে হাত জোড় করিলেন।

ঠাকুর উঠিলেন। ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। ঠাকুর রাম দত্তমহাশয়ের সমাজ হইতে পরমহংসদেবের সমাজের সম্মুখে নাটমন্দিরে

দাঁড়াইয়া একেবারে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। দলে দলে কীর্ত্তনীয়ারা আসিতে লাগিল, আর ভাবও গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। আহা! তাঁহাতে যে কত ভাবের উদয় হইতে লাগিল তাহা আর কি বলিব! কখনও চক্ষু একেবারে স্থির হইয়া রহিল, কখনও বা চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল, কখনও বা ভাবাবেশে উত্তোলিত বাহুযুগল স্থির হইয়া রহিল, কখনও বা আবার উহা অবশ হইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। এইপ্রকারে ঠাকুর আবিষ্ট হইয়া রহিলেন। উপস্থিত ভক্তমাত্রই তাঁহার ভাব দর্শনে মোহিত হইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ঠাকুর এই অবস্থায় থাকিবার পর কিঞ্চিৎ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে বেলা অবসান প্রায় দেখিয়া ভক্তগণ প্রত্যাগমনের জন্য ঠাকুরকে লইয়া ধীরে ধীরে গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী সন্ধ্যার পর মনোহরপুর-আশ্রমে পৌঁছিল।

অতঃপর ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্তসতীশচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্তসতীশচন্দ্র সেন মহাশয়দ্বয়ের আকুল প্রার্থনা পূরণের জন্য ঠাকুর মেদিনীপুর-জেলার অন্তর্গত আম্‌লাগুঁড়া এবং বাঁকুড়া-জেলার অন্তঃপাতি ময়নাপুর গ্রামে গিয়াছিলেন। উভয় স্থানেই ভক্তবৃন্দের বিশেষ সেবা ও যত্নে তিনি কিয়ৎকাল কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আম্‌লাগুঁড়ায় সতীশ ঘোষমহাশয়ের বাটীতে অবস্থানকালে তিনি ঠাকুরকে নারায়ণের ন্যায় অতিশয় শুদ্ধাচারে রাখিয়াছিলেন; এমন কি, তাঁহাকে অপর কাহারও বাড়ী যাইতে ও অপর কাহারও হাতে পর্য্যন্ত খাইতে দিতেন না। এমন সময় ঐ গ্রামের জনৈকা বৃদ্ধার হৃদয়ে শ্রীশ্রীদেবের প্রতি বিশেষ অনুরাগের উদয় হয়—ঠাকুরকে কিছু খাওয়াইবার তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল। কিন্তু সতীশবাবুর নিকট তাঁহার মনোগত ভাব তিনি প্রকাশ করিতে সাহস করিতেছিলেন না—মনের দুঃখ মনেই রহিল। এদিকে অন্তর্য্যামী পতিতপাবন, দীনদয়াল ঠাকুরের প্রাণ পতিতের আর্ত্তি দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাই তিনি বৃদ্ধার মনের বাসনা পূরণের নিমিত্ত এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন—তিনি শৌচে যাইবার ছল করিয়া বৃদ্ধার

বাটীতে গেলেন। বামন চাঁদ ধরিতে পারিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হইতে পারে, আজ বৃন্ধারও সেইরূপ হইল। তিনি যাহা কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই, আজ তাঁহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা এবং তাঁহাকে জলযোগ করাইবার নিমিত্ত বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যাহাহউক, মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহপূর্ব্বক প্রাণ ভরিয়া ঠাকুরের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। ভাবগ্রাহী ঠাকুরও ভক্তিভাবে প্রদত্ত উক্ত সামগ্রী সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন।

আহা! শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইলে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের প্রাণে সাড়া পড়িয়া যায়। তাই, তাঁহার শুভাগমন-বার্ত্তা-শ্রবণেই তদ্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের প্রাণ আকুল করিয়া দেয়। এই আকুলতা জাগিয়া উঠিল গড়বেতা-নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্তহরগোবিন্দ শুকুলমহাশয়ের শুদ্ধহৃদয়ে; শ্রীযুক্তশুকুলমহাশয় লোক-চক্ষে গৃহস্থাশ্রমী হইলেও তাঁহার অন্তর ছিল শুদ্ধসাত্ত্বিকভাবময়। তিনি পরাভক্তিভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যে সমস্ত ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহাই জানাইয়া দিয়াছিল তিনি কোন্ রাজ্যে বাস করিতেন। এই নিষ্ঠাবান্ ভক্তের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল এই শুভ সংবাদ যে, আম্‌লাগুঁড়ায় এক অদ্ভুত মহামানব আসিয়াছেন। তাঁহার যেমন অপরূপ রূপ, তেমনই মনোহর গুণ—তিনি ভাবনিধি-মহাপ্রভু-শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের ন্যায় সংকীর্ত্তন-শ্রবণে কখনও মহাভাব-সমাধি-সমুদ্রে নিমজ্জিত হন, কখনও বা মহা-ভাবাবেশে সুমধুর নৃত্য করেন। ইহা শ্রবণে তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুই আবার আসিয়াছেন। তাই তিনি প্রাণের আবেগে পূর্ব্বোক্ত নিত্য-ভক্ত শ্রীযুক্তসতীশ ঘোষমহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। আহা! তথায় তিনি ঠাকুরকে প্রাণের দেবতা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে দর্শন করতঃ পূর্ণমনস্কাম ও কৃতকৃতার্থ হইলেন। ঠাকুরের সহিত তাঁহার মিলন-দর্শনে গড়বেতা-নিবাসী নিত্য-ভক্ত শ্রীযুক্তরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী-

মহাশয়ের স্বতঃই মনে হইল, মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত যেন গৌরগতপ্রাণ রায়রামানন্দের মিলন হইল। আজ শ্রীযুক্তশুকুলমহোদয় আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভাববিগলিত-চিত্তে স্বরচিত মধুর সঙ্গীতাবলী শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবকে শুনাইতে লাগিলেন। যে সঙ্গীতের মূলে পরাভক্তিভাব তাহা আবার ভাবের আবেগে ভক্তকর্ত্তৃক মধুর কণ্ঠে গীত হইলে আর কি ভাবনিধি স্থির থাকিতে পারেন! তাঁহার ভাব-সমুদ্রে উদ্বেলের সৃষ্টি করিল; তিনি সমাধিমগ্ন হইলেন। অনন্তর শ্রীশ্রীদেব প্রকৃতিস্থ হইলে ভক্তবর নিভৃতে মনের অনেক কথা তাঁহাকে জানাইয়া কৃতকৃত্য হইলেন, এবং তাঁহার অপূর্ব্ব-দর্শন-বার্ত্তা ভক্তসমাজে ঘোষণা করিলেন। আজ ভক্ত কেবল নিজেই যে নিত্য-কৃপা-লাভে ধন্য হইলেন তাহা নহে; তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সকলেই ধন্য হইলেন। তাই, তাঁহার স্বজন শ্রীযুক্তপাঁচুগোপাল শুকুল, শ্রীযুক্তহীরেন্দ্রনাথ শুকুল প্রভৃতি সপরিবারে নিত্যসর্ব্বস্ব মদীয় পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীমৎস্বামীনিত্যপদানন্দ অবধূত-মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এইজন্যই শ্রীশ্রীনিত্যদেব বলিতেন, "যাকে কৃপা করা হয় তার বাড়ীর বিড়াল-কুকুরটাকে পর্য্যন্ত কৃপা করা হয়।"

উক্ত আম্‌লাগুঁড়া-গ্রামে প্রকাণ্ড শালবন আছে। শ্রীশ্রীদেব একদিন ঐ বনের ভিতর ভ্রমণ করিতেছিলেন; এমন সময় তথায় কতকগুলি দোনাবৃক্ষ* তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন—শ্রীবৃন্দাবনের কথা স্মরণ হওয়ায় বোধ হয় তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই সময় কতকগুলি সাঁওতালি স্ত্রীলোক দুগ্ধের ভাণ্ড লইয়া ঐ পথে যাইতেছিল। ঠাকুরের দিব্যকান্তি-দর্শনে তাহারা ভক্তিরসে আপ্লুতা হইল এবং তাঁহার সেবা করিবার জন্য তাহাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু তাহাদের নিকট এমন কোন

*শ্রীবৃন্দাবনেও ঐরূপ বৃক্ষ আছে—তাহাদের পাতা দেখিতে বাটির মত—সেইজন্য উহাদিগকে দোনাবৃক্ষ বলে।

পাত্র ছিল না, যাহাতে একটু দুগ্ধ পান করাইয়াও তাঁহার সেবা করিতে পারে। তাই, অগত্যা দোনাপত্রেই তাঁহাকে উহা অর্পণ করিয়া তাহারা তাহাদের বাসনা কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিল। শ্রীশ্রীদেব সেই সরল-ভাবাপন্না সাঁওতালি-রমণীদের দান সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া তাহাদের মানব-জন্ম সার্থক করিয়া দিলেন। যাহাহউক, আম্‌লাগুঁড়ার ও ময়নাপুরের বহু ভক্তকে কৃপা করিয়া কিছুদিনের মধ্যেই ঠাকুর কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

অতঃপর মনোহরপুর-আশ্রমে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর* যশোহর-জেলার অন্তর্গত বজ্‌রাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং

*অন্যান্য-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় উপদেশের ন্যায় 'সদ্‌গুরু-তত্ত্ব'-বিষয়েও শ্রীশ্রীদেবের অপূর্ব্ব উপদেশাবলী আছে। তাহার স্বল্পাংশমাত্র এইস্থানে উদ্ধৃত হইল: "···আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে হইলে কেবলমাত্র নিজ গুরুদেবের সংসর্গ হইলেই ভাল হয়। তাহা হইলেই প্রকৃত উন্নতি হইয়া থাকে। তাহা হইলেই নিজের স্বভাব বিকৃত হয় না। তাহা হইলেই নিজের স্বভাবকে প্রবঞ্চনা প্রভৃতি কালিমা দ্বারা রঞ্জিত করিতে হয় না। ···গুরুকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। সেইজন্য তাঁহার স্বভাব-চরিত্রও সর্ব্বোত্তম বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। ···আপনার গুরুর প্রত্যেক বাক্যকে সিদ্ধান্ত বাক্য বলিয়া গণ্য করিতে হয়। আপনার গুরুবাক্য অপেক্ষা অন্য কোন বাক্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতে নাই। গুরুবাক্যের সহিত শাস্ত্রীয় কোন বাক্যেরও যদ্যপি অনৈক্য হয়, তথাপি আপনার গুরুবাক্যকে গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হয়, যেহেতু শাস্ত্রানুসারে 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ; গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।' ···শ্রীগুরু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসনাতন, চিন্ময় চৈতন্যদেব হরিনারায়ণ। ··· শ্রীগুরুদেব অনন্ত, তিনি পরেশ প্রশান্ত, দিব্য সদাকার তিনি নিত্যনিরঞ্জন। মুক্তিতে কি প্রয়োজন, প্রয়োজন তাঁরে, নেহারে নয়ন তাঁরে নিয়ত অন্তরে; তাঁহার শ্রীপদে মুক্তি, অহেতুকী পরাভক্তি, কত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য

অনতিকাল মধ্যে শিবনিবাস-ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। নিত্য-ভক্ত বেণীবাবু ও উপেনবাবু ঠাকুরকে লইবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সভক্ত ঠাকুরের যে গাড়ীতে আসিবার কথা ছিল, তাহার পূর্ব্ব গাড়ীতেই তাঁহারা আসিয়াছিলেন বলিয়া, উপেনবাবুরা ঠাকুরকে খুঁজিতে লাগিলেন; এমন সময় রক্ত-কোকনদ-সদৃশ চরণযুগল তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তদ্দর্শনে তাঁহাদের মনে হইল যে, ঐ রাতুল চরণ শ্রীশ্রীদেবের ব্যতীত অন্য কাহারও হইতে পারে না। যাহাহউক, সেই রক্তোৎপলাভ-চরণ বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখের দিকে যেমন তাঁহারা চাহিলেন, অমনই ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "কিগো, উপেন, চল, চল, যাই।" শ্রীশ্রীনিত্যদেবের অপরূপ রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া ষ্টেশনে সমাগত ব্যক্তিমাত্রই তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চতুর-চূড়ামণি ঠাকুর তাহা বুঝিতে পারিয়াই তাড়াতাড়ি ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলেন। ঠাকুরের গায়ে পা লাগিবে বলিয়া উপেন বাবুরা কোচ-বাক্সে বসিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, "দেখ, উপেন, তোমরা আমার সন্তান। পিতামাতা যখন সন্তানকে লালন-পালন করেন, তখন তাদের পা তাঁদের বুকেও লাগে—কখনও পিতামাতা তাহাদিগকে মাথাতেও রাখেন। তোমরা আমার যে শিশু, সেই শিশুই আছ।" দেখিতে দেখিতে গাড়ী বেণীবাবুর দরজার সম্মুখে আসিয়াই থামিল। দলে দলে ভক্তগণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বেণীবাবুর ঘরে বিশ্রামের পর ঠাকুর গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন। তিনি প্রতি বাটীতে গমনপূর্ব্বক যাহাদিগকে কখনও দেখেন নাই, তাহাদেরও নাম ধরিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ধন্য যশোহর জেলার বজ্রাপুর গ্রাম! আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই রূপলাবণ্যে ও অমিয় বচনে আকর্ষণ করিতে

তাঁতে বর্ত্তমান! অনন্ত বিভূতি তাঁতে বিভূতি-ভূষণ, বাঞ্ছাকল্পতরু তিনি পুরুষ প্রধান। হও তাঁহার আশ্রিত, একান্ত শরণাগত, হইবে বিঘ্নবারণ বিপদ-ভঞ্জন।..."

করিতে ঠাকুর দেলঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতঃপর দেলঘাটে স্নান সমাপন করিয়া বেণীবাবুর বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং তিনি ভক্তগণের স্বহস্তে প্রস্তুত ও ভক্তিসহকারে নিবেদিত মধুর সামগ্রী দ্বারা ভোজন সমাপন করিলেন। তদনন্তর ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তথায় অবস্থানকালে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব কোনদিন ভগবৎ প্রসঙ্গে এবং কোনদিন কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। সেই সকল মধুর ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক চিরকালের জন্য পরমাশান্তি লাভ করিলেন। এই সময় ভক্তগণ প্রত্যহই শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবকে সুগন্ধিপুষ্প, মাল্য ও চন্দনাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সাজাইতেন এবং ধূপ-দীপাদি দ্বারা তাঁহার আরত্রিক করিতেন। একদিন তাঁহারা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে ফুলের মালা, বলয়, নূপুর প্রভৃতি দ্বারা সাজাইয়া বসনাদি পরাইয়া দিলেন। তৎপরে তাঁহার শিরোদেশে মুকুট ও শ্রীমুখমণ্ডলে অলকা-তিলকা অঙ্কিত করিবার কালে ঠাকুর এরূপ সমাধিস্থ হইলেন যে, বহুক্ষণ পলক-বিহীন নেত্রে ভক্তগণ তাঁহার সেই অপরূপ কান্তি নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, এই সময় ঠাকুর পেঁপের ডাল দিয়া বাঁশী বাজাইয়া ভক্তমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। অতঃপর বজ্রাপুরের ভক্তগণ চৌদ্দমাদল-কীর্ত্তন বাহির করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ঠাকুর খুবই আনন্দিত হইলেন। চৌদ্দমাদলের দিন সকাল বেলা হইতে মহোৎসবের সমস্ত যোগাড় হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ঠাকুর বলিলেন যে, কীর্ত্তনীয়াগণ যেন মোহনভোগাদি প্রসাদ পাইয়া কীর্ত্তন করে। অনন্তর কীর্ত্তন বাহির হইবার সময় ভক্তগণ ঠাকুরের অনুমতি প্রার্থনা করিলে, ভাবাবেশে ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ"। তখন তাঁহারা কেহ খোল, কেহ করতাল লইয়া এরূপ মাতিয়া উঠিলেন যে, সকলেই পানোন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় বিভোর হইয়া

কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং গ্রাম প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ঠাকুরের চরণতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধীরে ধীরে সকল সম্প্রদায়ই তথায় আসিলে, একসঙ্গে তুমুল কীর্ত্তন হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ঠাকুর ভাবাবেশে সেই কীর্ত্তনের মধ্যে লম্ফ দিয়া পড়িলেন এবং উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পর ঠাকুর দুলিয়া দুলিয়া কীর্ত্তনের মধ্যে কাহারও হাত, কাহারও গলা ধরিযা নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন বন্ধ হইলেও ঠাকুর আবিষ্ট অবস্থায় বহুক্ষণ দাঁড়াইযাছিলেন। তদনন্তর অল্প বেলা থাকিতে ঠাকুর আহার সমাপনপূর্ব্বক ভক্তগণকে প্রসাদ দিলেন। অতঃপর ভক্তগণকে লইয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব স্থানে স্থানে কীর্ত্তন ও মহোৎসব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে 'জয়দিয়ার' বিপিন দেমহাশয় ঠাকুরকে তাঁহার বাটীতে লইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করায় ঠাকুর বলিলেন, "দু'চার দিন পরে যাওয়া হ'বে।"

বজ্‌রাপুর থাকাকালীন তথাকার জমিদার বিশ্বম্ভরবাবু শ্রীশ্রীদেবের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তাঁহাকে একদিন তাঁহার (বিশ্বম্ভরবাবুর) বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। যেমন প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন, তেমনই শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে তিনি ভোগের সামগ্রীসকল স্বর্ণ-পাত্রে রক্ষিত করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীদেবও ঐ সমস্ত সামগ্রী সাদরে গ্রহণ করায় তাঁহার মনস্কাম-সিদ্ধি হইয়াছিল।

এই বজ্‌রাপুর গ্রামে বাঁওর নামে প্রকাণ্ড একটী জলাশয় আছে। সেই বাঁওরের ওপারে দ্বিতীয় বটগাছ তলায় ভক্তগণ মহোৎসবের আয়োজন করিয়া ঠাকুরকে তথায় লইয়া গেলেন এবং একদিকে রন্ধন আরম্ভ হইল, আর অন্যদিকে তুমুল কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কীর্ত্তনান্তে বহু-লোক-সমাগম দেখিয়া ভক্তগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "একশ লোকের আয়োজনে এত লোকের কি কোরে হ'বে!" তাহা শুনিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ওগো, আগে আমায় দাও, আমি আগে খাই।" আহারান্তে তিনি হাতমুখ না ধুইয়াই, "সব

লোক খেতে বসাও" বলিতে বলিতেই আবিষ্ট হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত লোক তৃপ্তিপূর্ব্বক প্রসাদ পাইলেও, কিছু কিছু জিনিষ উদ্বৃত্ত হইয়া গেল! যাহাহউক, তথা হইতে বজ্রাপুর আসিয়া দুই চারি দিন অবস্থানপূর্ব্বক ঠাকুর 'জয়দিয়া' গ্রামে বিপিন দেমহাশয়ের বাটীতে গমন করেন। সেখানেও খুব মহোৎসব এবং কীর্ত্তনানন্দ হইয়াছিল। সেই সময় শীতকাল এবং যশোহর জেলার খেজুর-রসও অতীব সুস্বাদু। সেইজন্য ভক্তদের ইচ্ছা হইল যে, তাঁহারা 'জিরান-কাটার' খেজুর-রস সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরকে খাওয়াইবেন। তদনুসারে একটী হাঁড়ীতে সেই রস সংগ্রহ করিয়া রাখা হইল। সন্ধ্যাবেলা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব যখন শৌচান্তে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন নিত্য-ভক্ত শ্রীহরিবাবুর ইচ্ছা হইল যে, তিনি সর্ব্বাগ্রে ঠাকুরকে খেজুর-রস খাওয়াইবেন। সেইজন্য তিনি বিহ্বল অবস্থায় দ্রুতপদে উহা আনিতে গেলেন। কিন্তু খেজুর-রসের হাঁড়ীর নিকটে যে মাছের আঁইস্-ধোয়া জলের হাঁড়ী ছিল, প্রাণের আবেগে তাহা তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। সুতরাং ভুলক্রমে খেজুর-রস মনে করিয়া আঁইস্-ধোয়া জলই এক গ্লাস্ লইয়া ঠাকুরকে দিলেন। ভক্তবৎসল নির্ব্বিকার ঠাকুরও অম্লান-বদনে তাহা পান করিলেন। অনন্তর প্রসাদ পাই-বার সময় ভক্তগণ "হায়! হায়!" করিয় উঠিলেন এবং 'ভক্তবর শ্রীহরিবাবু খেজুর-রসের পরিবর্ত্তে ঠাকুরকে আঁইস্-ধোয়া জল দিয়াছেন' জানিয়া সকলেই তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে ঠাকুর সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তিনি ত খুব ভালই খাইয়াছেন। সুতরাং শ্রীহরির কোনই দোষ নাই। ভগবান্ ভক্তের ভাবটুকুই গ্রহণ করেন। তিনি বস্তু বিচার করেন না। তাই ভক্তিমতী শবরীর উচ্ছিষ্টও ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র অম্লান-বদনে খাইয়াছিলেন। ভক্তের মহিমা ভগবান্ এইরূপেই বাড়াইয়া থাকেন। যাহাহউক, ভক্তগণের অনুরোধে ঠাকুর পুনরায় সেই খেজুর-রস পান করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। এইরূপে তথায় আট দশদিন থাকিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব পুনরায় বজ্রাপুর আসিলেন।

বজ্‌রাপুরে যে মাঠে শ্রীশ্রীচণ্ডীদেবীর পূজা হয়, সেই মাঠে একটী প্রকাণ্ড গাবগাছ আছে। তাহা দেখাইয়া ঠাকুর বলিলেন, "এখানেই মহোৎসব হ'বে।" সেই মহোৎসবেও খুব কীর্ত্তন ও প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল। ইহার পরে জগন্নাথপুর-গ্রামের ভক্তগণের অনুরোধে ঠাকুর তথায় গমন করিলেন এবং প্রত্যেক ভক্তের বাটীতে দুই একদিন থাকিয়া পুনরায় বজ্‌রাপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

অতঃপর পাঁচুসেখ নামে জনৈক ধার্ম্মিক মুসল্‌মানের গাড়ীতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব সাধুহাটী (মাগুড়া) রওনা হইলেন। সেই সঙ্গে আরও তিন চারিখানা গাড়ীতে অনেক ভক্ত ছিলেন। যাহাহউক, ঠাকুর যে গাড়ীতে ছিলেন, সেই গাড়ীটী হঠাৎ থামিয়া গেল; কেননা গরু দুইটী যেন ভীত ও চমকিত হইয়া কোনওক্রমেই আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য ভক্তগণ শশব্যস্তে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। অতঃপর তাঁহারা দেখিলেন যে, উক্ত গাড়ীর সম্মুখস্থ একটী বৃক্ষ যেন উত্তেজিত হইয়া একবার তাহার শির নত, আবার উন্নত করিতেছে। তাঁহারা ইহার অদ্ভুত আচরণ বুঝিতে পারিলেন না। তখন ভক্তগণ ঠাকুরকে বলিলেন, "ঝড় নাই, বাতাসের পর্য্যন্ত বেগ নাই; অথচ গাছটী অমন ক'র্‌ছে কেন?" তদুত্তরে ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "কোনও মহাপুরুষ এই গাছে বাস ক'র্‌ছেন। তিনি আমার নিকট ঐ প্রকারে মুক্তি প্রার্থনা ক'র্‌ছেন।" ভক্তগণ তখন তাঁহাকে মুক্তিদান করিবার জন্য ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি স্বস্থানে গমন করুন।" ঠাকুর ঐ কথা বলিবার পরেই বৃক্ষটীর আর কোনও চাঞ্চল্য দেখা গেল না। উহা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। কিন্তু একটা 'সোঁ' 'সোঁ' শব্দ হইতে লাগিল। ভক্তগণ বেশ উপলব্ধি করিলেন যে, এক অশরীরী আত্মা উক্ত বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া কোন্ অজানা দেশে যেন চলিয়া গেলেন।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচু অত্যন্ত বিনয়ী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। তাই, প্রভাত

হইবার সময়ম কালে গাড়ী সাধুহাটীর সমীপবর্ত্তী একটী মাঠের মাঝখানে যখন আসিয়া পড়িল, তখন সে ভক্তিভরে "আল্লা, খোদাতালার" নাম লইতে লাগিল। তৎশ্রবণমাত্রেই ঠাকুর ভাবাবেশে মগ্ন হইয়া পড়িলেন; তাঁহার অঙ্গজ্যোঃতিতে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে পাঁচু পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল। নিত্যরূপের অপূর্ব্ব ছটা এবং ঠাকুরের নয়নযুগল হইতে তীব্রবেগে উচ্ছলিত অশ্রুধারা সন্দর্শনে পাঁচু অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। সে তখন আর গাড়ী চালাইতে পারিল না। কেবল তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে ঠাকুর গাড়ী হইতে নামিয়া মাঠের মাঝে একটী অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে গিয়া একটী বল্মীক-স্তূপের অন্তরালে উপবেশন করিলেন। পাঁচু পুনরায় সেই জগদ্গুরুর* চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন দয়াল ঠাকুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে শ্রীচরণে আশ্রয় দানপূর্ব্বক কৃতার্থ করিলেন।

তৎপর যথাসময় সাধুহাটীতে পৌঁছিয়া ঠাকুর অনেক ভাগ্যবান্কে কৃপা করিলেন এবং তথা হইতে সভক্ত নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আম্পুলিয়াপাড়ার আশ্রমে অতি প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে লাগিলেন।

———

*শ্রীশ্রীগুরুমাহাত্ম্য-বিষয়ে দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন,"...ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ন গু.রারধিকং ন গুরোরধিকং। মম শাসনতো মম শাসনতো মম শাসনতো মম শাসনতঃ॥...গুরুর্দেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরোর্নিষ্ঠা পরং তপঃ। গুরোঃ পরতরং নাস্তি নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরং॥...গুরুসেবা পরং তীর্থমন্যত্তীর্থ-মনর্থকং। সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ং দেবি সদ্গুরোশ্চরণাম্বুজং॥.. শ্রীমৎপরংব্রহ্ম গুরুং বদামি শ্রীমৎপরংব্রহ্ম গুরুং ভজামি। শ্রীমৎপরংব্রহ্ম গুরুং স্মরামি। শ্রীমৎপরব্রহ্ম গুরুং নমামি॥...মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ। মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥...ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ। তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরংনাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ..."

অন্ত্য লীলা

ষোড়শ অধ্যায়

নবদ্বীপে অবস্থিতি

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥"

গীতা, ৮ম শ্লোঃ, ১০ম অঃ।

[আমি নিখিল জগতের উৎপত্তির হেতু। আমা হইতে সমস্তই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহা জানিয়া পরমার্থতত্ত্ব-পরায়ণ বিবেকীগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন।]

এই সময় একদিন ভক্তবর অশ্বিনীকুমার বসুমহাশয় অবধূত-আশ্রমে গমন করেন। তথায় তিনি দেখিলেন যে, ভক্তগণ গৃহমধ্যে একখানি তক্তপোসের উপর বসিয়া আছেন ; আর একখানি চেয়ারে একজন সাধু বসিয়া আছেন। তাঁহার দেহের গঠন, তাঁহার রূপের লাবণ্য, তাঁহার কারুণ্যপূর্ণ সস্মিত-দৃষ্টি, তাঁহার মধুমাখা কথা প্রভৃতি সমস্তই অশ্বিনীবাবুর নিকট অপার্থিব বলিয়া মনে হইল। তিনি দূর হইতে প্রণাম করিয়া তক্তপোসে বসিলেন। সেই ভালবাসামাখা, সেই পরকে-আপন-করা, সেই ভয়ার্ত্তকে-নিভয়-করা দৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত হইল। সেই পলক-বিহীন, সস্নেহ দৃষ্টি যেন তাঁহার হৃদয়ের অন্তর্দ্দেশে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। দুই একটী কথার পর শ্রীশ্রীদেব

তাঁহাকে গান শুনাইতে আদেশ করিলেন। এইটাই ঠাকুরের কৃপার নিদর্শন বুঝিয়া ডাক্তার দেবেনবাবু তাঁহাকে গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার সাধ্যমত আত্ম-নিবেদন-পূর্ণ দুই একটী গান হইতে না হইতেই ঠাকুর আবিষ্ট হইলেন। এরূপ আবেশ অশ্বিনীবাবু পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই--যেন এক দিব্যজ্যোতিঃ ঠাকুরের দেহ হইতে চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি স্থির ও নিস্পন্দ হইয়া বসিয়াছিলেন এবং মাঝে মাঝে হস্তে বরাভয়-মুদ্রা আপনা হইতেই প্রকটিত হইতেছিল। এই ভাব দর্শনে অশ্বিনীবাবু অতীব বিস্মিত হইয়া সঙ্গীত বন্ধ করিলেন। 'পাছে ঠাকুরের আনন্দ ভঙ্গ হয়'—এই ভয়ে, দেবেনবাবু তাঁহাকে আরও গান গাহিতে বলিলেন। সঙ্গীত চলিতে লাগিল। ঠাকুরের ভাবাবেশ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উঠিল; কিন্তু রাত্রি অধিক হওয়ায় গান বন্ধ হইল। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ অনিমেষ-লোচনে ঠাকুরের রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীবাবুও ঠাকুরের সেই অপরূপ রূপ দর্শনে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। যতই দেখিতেছেন, ততই ভাবিতেছেন, "এ বস্তুটী কি? এমন মধুর কমনীয় ভাব ত মানুষে কখনও দেখি নাই!" যিনি সৌভাগ্যবশে সে রূপ দেখিয়াছেন, তিনিই তাহা অনুভব করিয়াছেন! ঠাকুর যখন নয়ন উন্মীলিত করিলেন, তখন অশ্বিনীবাবুর মনে হইল, নয়নপদ্ম যেন তখনই ভাব-সরোবর হইতে ফুটিয়া উঠিল। ঠাকুর এইবার কথা কহিলেন। অশ্বিনীবাবুকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর দেবেনবাবুকে বলিলেন, "বেশ গান! হৃদয়ে ভক্তি আছে। একটু মার্জ্জনা ক'রে দিলেই উত্তম হ'বে।" দেবেনবাবু ঠাকুরকে বলিলেন, "সে ভার আপনার; আপনি দয়া ক'রে ভক্তি দান করুন।" ঠাকুর হাসিলেন। হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে কৃপা-দৃষ্টিপাত করিলেন। অশ্বিনীবাবু বুঝিলেন, তাঁহার কৃপাডোরে তিনি বাঁধা পড়িলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "তুমি কে, এই ভবকূপ হ'তে আমাকে কেশে ধ'রে উঠা'লে? তুমি কে, আমার হৃদয়টী এমন ক'রে সবলে অধিকার ক'র্‌লে? তবে, তুমি কি আমার নিজ-জন?"

যাহাহউক, ইহার পরেই অশ্বিনীবাবু শ্রীশ্রীদেবের আশ্রিত হইলেন।

অতঃপর ঠাকুর ডাক্তার দেবেনবাবু, ধর্ম্মদাসবাবু, কালীবাবু, হরেন-বাবু, সতীশ সেনমহাশয়, সতীশ ঘোষমহাশয়, যজ্ঞেশ্বরবাবু, ও কেশবানন্দ মহারাজ প্রভৃতি ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া একদিন বিকালে ষ্টীমার-আফিসে কালী মাষ্টারমহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে বিধু মুখার্জ্জি ও মাষ্টারমহাশয় ছিলেন। ঠাকুরকে দেখিবামাত্র তাঁহারা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে বসিতে চেয়ার দিলেন। ঠাকুর চেয়ারে বসিলে, ভক্তগণ একখানি বেঞ্চের উপর বসিলেন। মাষ্টারমহাশয় বলিলেন, "অদ্য রাত্রে আমার বাসায় সভক্ত ঘি-খিচুড়ি ভোগ লাগুক্।" ঠাকুর বলিলেন, "বড় আনন্দ! বড় আনন্দ!" অমনই সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোগ হইতে লাগিল। দুই তিনজন ভক্ত ঐসব যোগাড় করিতে লাগিলেন। এদিকে আফিস্ ঘরে ঠাকুর সতীশ ঘোষমহাশয়কে বলিলেন, "একটী গান কর ত, সতীশ।" সতীশবাবু গান ধরিলেন,—"জয় জয় গুরু কল্পতরু, ত্বং হি শিব শঙ্কর" ইত্যাদি। ঐ গানটীর মধ্যে "ভক্তগণ মাঝে হেলিয়া দুলিয়া, ভাবাবেশে ভোলা নাচে বিনোদিয়া, তা তা থৈ থৈ তাথিয়া তাথিয়া প্রেমে তনু গর গর।" এই অংশটী যেই সতীশবাবু গাহিতে লাগিলেন, অমনই ঠাকুরও প্রেমে গর-গর হইয়া উঠিলেন। আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—সমস্ত শরীর জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল—বর্ণও বিবর্ণ হইয়া গেল—দুই চক্ষু দিয়া অবিরল প্রেমধারা বহিয়া ক্রমে গণ্ডস্থল ও বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। সেই ধারা মৃত্তিকাতে পতিত হইয়া সেই স্থান সিক্ত করিতে করিতে অন্য এক ধারার সৃষ্টি করিল। মানুষের চক্ষু হইতে যে এত জল পড়ে তাহা ভক্তগণের জীবনে এই প্রথম দর্শন! কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের সমাধি প্রায় ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, অর্দ্ধ বাহ্যদশা উপস্থিত হইয়াছে; সেই অবস্থায় আবেশের মুখে ঠাকুর বরদমুখী হইয়াছেন। উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে কালীবাবু বলিলেন, "ঠাকুর আমাদের গতি কি হ'বে? আমরা ভজন জানি না, সাধন জানি না, আমাদের উপায় কি হ'বে? আমাদের উদ্ধার করুন।"

এই বলিয়া তিনি ঠাকুরের চরণ জড়াইয়া ধরিলেন। তখন ঠাকুর সস্মিত বদনে বলিলেন, "ওগো, তোমাদের ভয় নেই। এবার যে আমায় দেখ্‌বে, সেই উদ্ধার হ'য়ে যা'বে।" এই কথা বলিয়া ঠাকুর পুনশ্চ সমাধিস্থ হইলেন। বহুক্ষণ পরে বাহ্যভাব উপস্থিত হইলে, তিনি ভক্তগণকে লইয়া গঙ্গার ধারে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে বসিয়া গঙ্গার শোভা দর্শন করিতে করিতে ভক্ত সঙ্গে কত গল্প ও কত আনন্দ করিতে লাগিলেন। তারপরে কালীবাবুর বাসায় ঠাকুরকে ঘি-খিচুড়ি ভোগ দেওয়া হইল। তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ বসিয়া পরমানন্দে প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। আহারান্তে ঠাকুর সভক্ত আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একদিন তুমুল কীর্ত্তন চলিতেছিল। নানা ভক্ত ঠাকুরকে নানা রূপে দর্শন করিতেছিলেন; এমন সময় শ্রীমৎকেশবানন্দ মহারাজ দেখিলেন, ঠাকুরের জ্যোতির্ম্ময় দেহ একবার উর্দ্ধে উঠিতেছে, আবার নামিতেছে—সেই দিব্যদেহে একটী গোপাল-মূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তাঁহার দিব্যজ্যোতিঃ সমস্ত ঘরটীকে উদ্ভাসিত করিল। শ্রীশ্রীদেবের এই অনুপম বিভূতি দর্শনে শ্রীমৎকেশবানন্দ মহারাজ ভক্তিভাবে দ্রবীভূত হইয়া গেলেন। তিনি ভাবের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উন্মত্তবৎ ঠাকুরের চরণে পতিত হইলেন। ঐ অমল-কমল পদে মস্তক রাখিয়া উহা নয়ন-জলে বিধৌত করিতে লাগিলেন। এদিকে কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া গেল। অন্যান্য ভক্ত স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু শ্রীমৎ-কেশবানন্দ মহারাজ তখনও শ্রীশ্রীচরণে ভাব-বিহ্বল অবস্থায় পতিত রহিলেন। সেদিন ঠাকুর ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "ভগবান্‌কে পেতে হ'লে চুড়োর (শ্রীমৎকেশবানন্দ মহারাজের) মত কাঁদ্‌তে হয়!"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "মহাপ্রভুর জন্মস্থান এখন গঙ্গাগর্ভে—এপারেও নয়, ওপারেও নয়।" কিন্তু কালক্রমে নির্দ্দিষ্ট গঙ্গাগর্ভ শুষ্ক হইতে লাগিল এবং চড়া পর্য্যন্ত পড়িয়া গেল। তাই, যেস্থানে এক সময় গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত হইত, সেই স্থানে বাব্‌লাবৃক্ষ বিরাজ

করিতে লাগিল। ইহার নাম হইল রামচন্দ্রপুরের চড়া। যাহাহউক, শ্রীশ্রীদেবের হুগলী যাত্রার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে শ্রীমৎস্বামীকেশবানন্দমহারাজ প্রমুখ ভক্তবৃন্দের বিশেষ ইচ্ছা হইল যে, তাঁহারা ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীশ্রীমন্মহা-প্রভু গৌরাঙ্গদেবের পরমপবিত্র জন্মস্থান 'মায়াপুর' দর্শন করিতে যান। বাঞ্ছাকল্পতরু ঠাকুর তৎপূরণার্থ তাঁহাদের সহিত উক্ত স্থানাভিমুখে গমন করিলেন। গমন করিতে করিতে বাব্‌লাবৃক্ষ-সুশোভিত একটী ভূমিখণ্ডে উপনীত হইবামাত্র তিনি সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তগণ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর সমাধি হইতে ব্যুত্থান লাভ করিলে ভক্তগণ বলিলেন, "চলুন, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে—গঙ্গার ওপারে তো মায়াপুর —সেখানেই তো মহাপ্রভুর জন্মস্থান।" শ্রীশ্রীদেব যেস্থানে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, সেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "না, এইখানেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান।" ভক্তগণ বিস্ময়াভিভূত হইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন; কেননা তাঁহারা উক্ত চডা পড়িবার বিষয় অবগত ছিলেন না। এইরূপে ঠাকুর মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্দ্ধারণ করেন। তদবধি নিত্য-ভক্তবৃন্দ অদ্যাপি তৎস্থান ভক্তিভাবে দর্শন করিয়া আসিতেছেন।

এই সময় শ্রীশ্রীদেবের অযাচিত-কৃপা-লাভ করিয়াছিলেন নবদ্বীপ-বাসী আর একজন ব্রাহ্মণকুমার। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত রাঘবেশ্বর ভট্টাচার্য্য। একদিন নিত্য-ভক্ত দৈবীবাবুর দ্বারা আহূত হইয়া তিনি শ্রীশ্রীদেবের আদেশে গঙ্গাস্নান সমাপনপূর্ব্বক আমপুলিয়াপাড়া-আশ্রমস্থ নিত্য-কক্ষে প্রবেশান্তর দর্শন করিলেন সেই ভুবনমোহন নিত্য-রূপ ও তৎসম্মুখে সুরক্ষিত একটী আসন। ঠাকুরের ইঙ্গিতক্রমে তিনি তদাসনে উপবেশন করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে তাঁহার অভীষ্ট দেবতার মন্ত্র দান করিলেন। ভক্তবর চমৎকৃত হইলেন। অতঃপর তাঁহার এই ভাব-বিহ্বলতা প্রবলতর হইল; কেননা তিনি যাহা কখনও জীবনে দর্শন করিতে পারিবেন বলিয়া কল্পনা পর্য্যন্ত করেন নাই সেই অপূর্ব্ব ইষ্টমূর্ত্তি শ্রীঅঙ্গে প্রকাশিত হইলেন। আহা! তদবধি ভক্তবর জীবনে কত স্থানে যে কতভাবে প্রত্যক্ষতঃ নিত্য-

মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আসিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এমন কি, নবদ্বীপ-মহানির্ব্বাণমঠে একদিন তিনি যখন আমাদের পরমার্থ-ভ্রাতা ডাক্তার শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, এম্, বি, মহোদয়কৃত সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছিলেন, তখন তিনি শ্রীশ্রীদেবের প্রত্যক্ষ-দর্শন-লাভপূর্ব্বক চমৎকৃত হইয়াছিলেন। যাহাহউক, দীক্ষার সময় শ্রীশ্রীদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাকে কার্য্যব্যপদেশে অন্যত্র থাক্‌তে হ'বে। তাই, প্রয়োজন অনুসারে আমার নিকটে এসে উপদেশ গ্রহণ করবার সুবিধা পাবে না। এইজন্য তোমার কোনও বিষয়ে জান্‌তে হ'লে নিজের মনকে প্রশ্ন কর্‌লেই তাহা জান্‌তে পার্ব্বে।" নিত্য বাক্যে আস্থাবান্ ভক্তবর এইভাবেই জীবনের অনেক বিষয় অবগত হইয়া কৃতার্থ হইয়া আসিতেছেন। বাস্তবিকই, গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হিসাবে তাঁহাকে কার্য্যব্যপদেশে সুদূর পাঞ্জাবে সুদীর্ঘকাল থাকিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত আম্‌পুলিয়াপাড়া-আশ্রমের নিকটবর্ত্তী তাঁহার বাটীতে বাস করিতেছেন। এখন তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর। তিনি নির্জ্জন গৃহে নিত্য-চিন্তায় কালাতিপাত করিতেছেন।

কায়মনোবাক্যে যে ভক্ত ঠাকুরের নিকট যে প্রার্থনা করিতেন বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যদেব তাহাই পূর্ণ করিতেন (এবং করিয়া থাকেন)! জনৈক ভক্ত কামের উৎপীড়নে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া কাম নিবারণের জন্য কাতরভাবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। করুণাময় ঠাকুর তাহাতে একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা কি ভক্ত-বংশ লোপ্ ক'র্‌তে চাও?" ভক্তটী নিরুত্তর রহিলেন। কালক্রমে তাঁহার একটী কঠিন ব্যাধি হইল। তাহাতে স্ত্রী-সহবাস শরীরের পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। ভক্তবর আবার ঠাকুরের নিকট সেই পূর্ব্ব প্রার্থনা লইয়া উপস্থিত হইলেন। এবার ঠাকুর তাঁহাকে মুখে বিশেষ কিছু বলিলেন না। রাত্রিযোগে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, ঠাকুর স্বহস্তে তাঁহার লিঙ্গচ্ছেদ করিয়া দিলেন। তার পরদিন হইতে

ভক্তটীর স্ত্রী-সহবাসের প্রবৃত্তি চিরতরে প্রশমিত হইল—তিনি বিবাহিতা ধর্ম্ম-পত্নীর সহিত একত্রে ভ্রাতা-ভগ্নীর ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন! ধন্য! ধন্য! ধন্য মদনমোহন শ্রীনিত্যগোপাল! ধন্য তোমার শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণ!

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥" অর্থাৎ—"হে পার্থ! যাহারা নিকৃষ্ট কুলজাত বা নিতান্ত পাপাত্মা; যাহারা কৃষ্যাদিনিরত বৈশ্য ও যাহারা অধ্যয়ন-বিরহিত শূদ্র এবং স্ত্রীলোক—ইহারাও আমাকে আশ্রয় করিলে অত্যুৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে।" ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন 'সর্ব্বধর্ম্ম-সংস্থাপনের' নিমিত্ত। তাই, তাঁহার আচরণে এবং উপদেশে একদিকে যেমন বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, পুরাণ, উপপুরাণ (শ্রুতি-স্মৃতি) প্রভৃতির চরম তত্ত্ব প্রতিভাত হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনই 'সর্ব্বোপ-নিষদের সার' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পরম তথ্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল। একদিকে যেমন উচ্চতম শ্রেণীর ও পণ্ডিত-চূড়ামণি ব্রাহ্মণ-সন্তান তাঁহার রাতুল চরণে আশ্রয় লাভ করিয়া মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনই অতি নিকৃষ্টকুলজাত, পাপাচারী, নিরক্ষর লোকও তাঁহার কৃপালাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার সুমধুর লীলা-কাহিনী পাঠে আমরা বিশেষভাবে অবগত হই। ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ স্বরূপ আরও দুইটী ঘটনা এই স্থানে লিপিবদ্ধ হইল:—একদিন ঠাকুর ভক্ত-পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় মথুর বাগ্ নামে জনৈক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন। ইনি নীচ-কুলজাত হইলেও শ্রীশ্রীদেবের কৃপালাভ করিয়া-ছিলেন। ভক্তবরের কি সরল ভাব! যিনি সর্ব্বজন-নমস্কৃত ছিলেন ও নবদ্বীপের বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলী যাঁহার সহিত কত সমীহ করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেন, আজ বাগ্ মহাশয় শিষ্টাচারের অতি সাধারণ নিয়ম পর্য্যন্ত অমান্য করতঃ সেই পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন শ্রীশ্রীনিত্যদেবকে বলিলেন, "আর

তোমাকে দেখ্‌তে পাই না কেন? আর যাও না কেন?" অন্তর্য্যামী, ভাবগ্রাহী ঠাকুর সরল-চিত্ত ভক্তবরের সরলতাময় প্রশ্নের উত্তরে হাসিমুখে বলিলেন, "কোথায় যাই না, গো?" তদুত্তরে বাগ্‌মহাশয় বলিলেন, "বেশ! তুমি আমাকে তুলসীতলায় জপ ক'র্‌তে ব'লেছিলে। আমি তাই কর্‌তাম—আর আমার সাম্‌নে তোমাকে দেখ্‌তে পেতাম্—আর দেখি না কেন, বল দেখি?" উপবিষ্ট ভক্তগণ এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। যাহাহউক, শ্রীশ্রীদেব বাগ্‌মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এখনও তোমার বউএর সঙ্গে ঝগড়া কর?" ভক্তবর তখন অকপট-চিত্তে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন, "এইজন্যই বুঝি তোমাকে আর দেখ্‌তে পাই না? আচ্ছা, আমি বল্‌ছি, আর তার সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌ব না। এখন থেকে দেখা পা'ব ত?" ঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হঁা"। অতঃপর বাগ্‌মহাশয় চলিয়া গেলেন। ঠাকুর ভাবাবেশে বলিলেন, "আহা! ঠিক যেন গুহক চণ্ডাল!"

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থানকালে বিশেষ-নিত্য-ভক্তি-সম্পন্ন আর একজন নিম্ন-শ্রেণীর লোক ছিলেন খোকামালী। তাঁহার একমাত্র সাধন-ভজন ছিল যেন ঠাকুরকে নানাবেশে ও নানাভাবে সজ্জিত করা। সমস্ত পর্ব্বাহেই তদুপযুক্ত সাজে ঠাকুরকে তিনি এমনভাবে শোলার ফুল, মালা ও গহনা দ্বারা সাজাইতেন যে, দর্শকমাত্রই চমৎকৃত হইতেন! বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও আভরণেও বোধহয় শ্রীঅঙ্গ অমন মনোহর সাজে কেহই সাজাইতে পারিত না। এই নিরক্ষর মালী যখন কীর্ত্তনে আবিষ্ট হইতেন, তখন তাঁহার নয়ন-ধারার বিরাম থাকিত না। তদবস্থ তাঁহাকে ঠাকুর ভাবোচ্ছ্বাসে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সমাধি-মগ্ন হইতেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! ভক্ত ও ভগবানের অশ্রুধারা মিলিত হইয়া যেন ধরিত্রী দেবীকে স্নান করাইত।

এক রাস-পূর্ণিমার শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীতে ভক্তবর ঠাকুরকে 'মোহন-মুরলী-ধরের মোহন-সাজে সাজাইয়া দিলেন; কিন্তু

অভাব ছিল একটী—তাহা হইতেছে মোহন-বাঁশরী। খোকামালী ভুলক্রমে বাঁশীটী আনিয়াছিলেন না। এদিকে ঠাকুর বংশীধরের-ভাবে 'ত্রিভঙ্গিম-ঠামে' দাঁড়াইলেন। এই সময় মুরলীর অভাব খোকা মালীর চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তাই, ভক্তবর একটী পেঁপের ডাল কাটিয়া ঠাকুরের হাতে দিলেন। ঠাকুর ইহাই বাজাইতে লাগিলেন। এক অশ্রুতপূর্ব্ব, শত-বাঁশরীর-মধুতান-মাখা ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মাতাইয়া তুলিল। ভক্তগণও ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গেলেন। এই সময় আম্‌পুলিয়াপাড়ার অবধূত-আশ্রম হইতে অনেক দূরে পোড়ামাতলা দিয়া ভক্তবর কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় কোথায় যেন যাইতেছিলেন। সেই প্রাণ-মাতান বাঁশী-রব তাঁহার কর্ণে প্রবেশমাত্র তিনি পুলকিত হইয়া উঠিলেন—আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন, ইহা তাঁহার জীবন-সুহৃৎ 'নিত্য'-মুরলীধরের মুরলী-রব। সুতরাং মোহন-বাঁশীর শব্দে আকৃষ্ট হইয়া কালীবাবু আশ্রমে আসিলেন। তথায় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনপূর্ব্বক তিনি চমৎকৃত হইলেন। তিনি দেখিলেন, ঠাকুর মুরলীধর-রূপে দণ্ডায়মান; আর তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ ব্রজগোপিনী-রূপে ভাবাবেশে আত্মহারা! কালিদাসবাবু ঠাকুরের অশেষ কৃপালাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এরূপ দর্শন বিশেষ আশ্চর্য্যজনক নয়। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত (স্বরগুনায় কৃত) দোল-লীলার দিন উক্ত গ্রামবাসীরা যাহা দর্শন করিয়াছিলেন তাহাই বিস্ময়জনক! "রাস্তা হইতে গ্রাম-বাসীরা দেখিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীদেবকে বেড়িয়া যত মেয়েরা কীর্ত্তন করিতেছে। তাঁহারা (গ্রামবাসীরা) ভক্তগণকে স্ত্রীলোকের মত নৃত্য করিতে দেখিয়া পুরুষ বলিয়া কেহ বোধ করিতে পারেন নাই।

আহা! নিত্য-কৃপা-বারি যে কত ভক্তের উপর কতভাবে বর্ষিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। ইহা বিশেষভাবে বর্ষিত হইয়াছিল এক সময়ে যেমন শ্রীযুক্তসত্যনাথ বিশ্বাসমহাশয়ের উপর, তেমনই ইহা দ্বারা সিঞ্চিত হইয়াছিলেন তাঁহার স্নেহাস্পদ নবদ্বীপ-বাসী শ্রীযুক্তরামদাস

মোদকমহাশয়। ঠাকুরের অদ্ভুত-রূপ-দর্শনে ও অদ্ভুত-বাণী-শ্রবণে মুগ্ধ এই যুবকের শ্রীশ্রীদেবের শ্রীচরণে আশ্রয়-লাভের পর অপূর্ব্ব অবস্থা লাভ হইল। কোনও প্রকার সাধন-ভজন করেন না, অথচ তিনি পরমানন্দে ভরপূর হইয়া থাকিতে লাগিলেন; আর তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত, একদিন রাত্রে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, প্রথমতঃ মুক্তদ্বার তৎপর রুদ্ধদ্বার কক্ষে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীদেবের দিব্যদেহ হইতে অপূর্ব্ব শ্বেতজ্যোতিরাশি প্রকাশিত হইতেছে। কোটি কোটি চন্দ্র কোটি কোটি সূর্য্যের কিরণ হইতেও তাহা উজ্জ্বল। তাহা অনুপম। ইহা একবার শ্রীঅঙ্গ হইতে বহির্গত হইতেছিল, আবার তথায় প্রবেশ করিতেছিল। আবার, তথায় সমস্ত দেবদেবী একবার ভক্তবরের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিলেন, আবার দৃষ্টির বহির্ভূত হইতেছিলেন। ইহাতে মোদকমহাশয় এত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, সে রাত্রে তাঁহার আহার পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিল। ভক্তগণ তাঁহাকে বহির্ব্বাটীতে লইয়া গেলেন এবং প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য মাথায় প্রচুর পরিমাণে জল দিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তিনি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন না। সমস্ত রাত্রি সেই জ্যোতিরাশি তাঁহার নয়নকে মুগ্ধ করিয়া রাখিল। প্রত্যুষে ভক্তগণ তাঁহাকে স্নানার্থ গঙ্গার তীরে লইয়া গেলেন। তথায় তিনি গঙ্গাজলের স্থানে গলিত-শ্বেতজ্যোতিরাশি দর্শন করিতে লাগিলেন। তাই, তিনি গঙ্গায় আর অবতরণ করিতে পারিলেন না; পবিত্র গঙ্গাজল তিনি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এক সময় পূর্ব্বোক্ত সত্যবাবু প্রচুর পরিমাণে মৎস্য-মাংস ভোজন ও অনেক অন্যায় কার্য্যও করিতেন; কিন্তু পরে তাঁহার জীবনে পরিবর্ত্তনের সাড়া আসিল। তাঁহার কীর্ত্তনে বিশেষ অনুরাগ জন্মিল। এই কার্য্যে রাম-দাসবাবুও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারেই মোদকমহাশয় আম্‌পুলিয়াপাড়ার অবধূত-আশ্রমে আসিতে পারিয়াছিলেন। আবার, বিশ্বাসমহাশয় তৎপূর্বে শ্রীযুক্তকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সহায়তায়

উক্ত আশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তথায় নিত্যরূপ-পাশে যেমন তাঁহার নয়ন-মৃগী বদ্ধ হইয়াছিল, তেমনই নিত্য-বাক্য তাঁহার কর্ণে সুধাবর্ষণ করিয়াছিল। তাই, তিনি ঠাকুরের শ্রীচরণে চিরতরে শরণ লইলেন। তিনি শ্রীশ্রীদেবের মহিমা যেমন অনুভব করিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহার লেখনী তাহা নানাভাবে "শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় পত্রিকায়" লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে। তল্লিখিত প্রবন্ধগুলির ভাব যেমন গভীর, ভাষাও তেমনই প্রাঞ্জল, সরস ও হৃদয়স্পর্শী।

বিভিন্ন ধর্ম্ম একই ভগবান্‌কে লাভ করিবার বিভিন্ন পন্থা মাত্র। শাস্ত্র-বিধান অনুসারে যিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত যে পন্থা অবলম্বন করিবেন, তাহা দ্বারাই তিনি পরমার্থ লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিক স্বধর্ম্মাচরণে একনিষ্ঠ-চিত্ত হইলেও অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিন্দু-মাত্রও বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করেন না। বরঞ্চ উহা যে তাঁহার ধর্ম্মেরই রূপান্তর মাত্র ইহা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া তিনি তৎপ্রতিও শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হন। 'সর্ব্বধর্ম্মই যে এক ঈশ্বরোদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে' ইহাই ছিল ঠাকুরের প্রদত্ত ধর্ম্মোপদেশের প্রাণ-স্বরূপ। তাই, তিনি সর্ব্বধর্ম্মাচরণের প্রতিই সমান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। তাই, অবধূত-আশ্রমে সর্ব্ব-দেবদেবীর নামেই তুমুল কীর্ত্তন হইত। তাই, তিনি সর্ব্বদেবদেবীর নাম-শ্রবণেই সমাধিস্থ হইতেন। তাই, তিনি উক্ত আশ্রমে তুলসী-বৃক্ষের পাশে মনসা-বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। তাই, তিনি তুলসীতলায় হরিরলুটের এবং মনসাতলায় বলির ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। ইহাতে কয়েক-জন বৈষ্ণব পণ্ডিত আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, "এ আপনার কিরূপ বিধান? আপনি, দেখি, কীর্ত্তনও করেন, হরিরলুটও দেন, আবার বলি দিবারও ব্যবস্থা ক'রেছেন!" তদুত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "আমি জীবের অশেষ-কল্যাণ-কামনায় এইরূপ ব্যবস্থা ক'রেছি। আমি এবার খোলে-ঢোলে ভেদ রাখি নাই। তুলসীতলায় হরিরলুট দেওয়াও যেরূপ সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান, মনসাতলায় বলি দেওয়াও তদ্রূপ সাত্ত্বিক কর্ম্ম—উভয়

বিধানই শাস্ত্রীয়—আমি এবার উভয়েরই সমন্বয় দেখাচ্ছি।" বাস্তবিকই, "কর্ম্ম-বিকর্ম্মের বিচার করিতে গিয়া অনেক বুদ্ধিমান্ই ভ্রম-চক্রে বিঘূর্ণিত হয়েন। (মনে কর) পশু হিংসা করা নিতান্ত অন্যায় বা 'বিকর্ম্ম'; কিন্তু উহাই আবার 'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে 'কর্ম্ম' বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ভোজন করিবার জন্য হিংসা-বৃত্তির বশীভূত হইয়া পশু-বধ করিলে উহা 'বিকর্ম্ম' হইত; কিন্তু যজ্ঞ-সঙ্কল্পে পশু-বধ করিলে উহাকে আর 'বিকর্ম্ম' বলা যায় না।" বেদ ও তন্ত্রের বিধান অনুসারে পশু-বলি প্রত্যবায়ের কারণ হয় না। ইহাও নিবৃত্তিমার্গের অন্তর্গত।

শ্রীধাম-নবদ্বীপে বাসকালে অনেক সময় ঠাকুরের আচরণে বালক-ভাবের প্রকাশ পাইত। সমাধি-ভঙ্গের পর তাঁহার অর্দ্ধ-বাহ্যদশায় তাঁহাকে গরম দুগ্ধ পান করান হইত। প্রায়ই "আমি দুধ খাব না, আমি দুধ খাব না" বলিয়া তিনি বালকের ন্যায় বায়না ধরিতেন। আবার কখনও "ও মা, তুই খা, আর আমি খাই" বলিয়া দুগ্ধ পান করিতেন। এইরূপে তিনি প্রায়ই দিব্য-বালক-ভাবে বিভোর হইতেন। একদিন রাত্রিতে আহারকালে ঠাকুর—"কাঁচা-কলাসিদ্ধ ভাত দে" বলিয়া—কান্না জুড়িয়া দিলেন। কিছুতেই কান্না আর থামে না—আহারও করেন না—কেবলই সেই এক কথা—"আমাকে কাঁচা-কলাসিদ্ধ ভাত দে"। জনৈক ভক্ত ঠাকুরের এই বালক-ভাবাবেশ বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাত্ দুপুরে দুষ্ট ছেলের কি আব্দার, দ্যাখ ত—শীগ্গীর ভাত খাও।" এইকথা শুনিবামাত্র বালক-ভাবাপন্ন ঠাকুর ভাত খাইতে আরম্ভ করিলেন—কতই না যেন তাঁর ভয়! ঠাকুরের এই সব বালক-ভাবের দৃশ্য ভক্তগণের বড়ই মনোমুগ্ধকর হইত।

এই সময় প্রিয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক ভদ্রলোক কৃষ্ণনগরের জজ্কোর্টের কেরাণী ছিলেন। তিনি একদিন ছুটিতে কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপে আসিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই বোতল মদ ছিল;

নেশায় টলিতে টলিতে তিনি নবদ্বীপের ষ্টীমার-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তখন ষ্টীমারের ষ্টেশন-মাষ্টার ভক্ত কালীবাবুর বাসার বাহিরে চেয়ারে বসিয়াছিলেন; সঙ্গে অনাদিবাবু প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তও ছিলেন। প্রিয়বাবু উন্মত্ত অবস্থায় তথায় আসিয়া বলিলেন, "নবদ্বীপে কি একটু মদ খাবার স্থান নাই?" ঠাকুর তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া যাইবার জন্য ভক্ত অনাদিবাবুকে ইঙ্গিত করিলেন এবং অন্য একজন ভক্তকে আদেশ করিলেন, "তুমি ওঁকে গঙ্গাস্নান করিয়ে আম্‌পুলিয়া-পাড়ার আশ্রমে নিয়ে যাও।" অতঃপর ঠাকুর সদয় হইয়া তথায় তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন।

একদিন প্রিয়বাবু মদ খাইয়া নেশায় বিভোর হইয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেই তিনি মদের বোতল হাতে করিয়াই ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বাবা! আমাকে ত জানেন?" ঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "হাঁ, জানি।" তিনি জনৈকা বারবনিতার নাম করিয়া বলিলেন যে, তিনি তাহার বাড়ী যাইতেছেন। ঠাকুর আবার হাসিয়া বলিলেন, "তা' বেশ।" ঠাকুরের হাসিও ছিল জগদ্বিমোহন হাসি। উহা ছিল যেমন উচ্চ, তেমনই মধুর; যাঁহারা উহা ক্ষণেকের তরেও দেখিয়াছেন, তাঁহারাই চিরতরে মুগ্ধ হইয়াছেন। সে হাসিমুখ এখনও তাঁহাদের চোখের সাম্‌নে ভাসিতেছে। ঠাকুরের হাসিবারও এক অভিনব ধরণ ছিল। তিনি যখনই হাসিতেন, তখনই প্রায়শঃ হাতটী মুঠা করিয়া মুখের নিকট ধরিতেন। তাঁহার চম্পক-বিনিন্দিত অঙ্গুলিগুলি তাঁহার বিম্ব-বিনিন্দিত অধরোষ্ঠের শোভা বর্দ্ধন করিত। এই হাসির বর্ণনা করিবার সময় শ্রীমৎস্বামীহরিপদানন্দ অবধূতমহারাজ ভাবাবেশে লিখিয়াছেন,—

"ভালবাসা মাখাইয়ে, অমৃতের সার দিয়ে, সে রাঙ্গা অধরে দিল হাসি।
যখনি হেরি লো সই, আমি না আমাতে রই, সুখের সাগরে সদা ভাসি॥"

যাহাহউক, অতঃপর প্রিয়বাবু তাঁহার ঈপ্সিত স্থানে গমন করিলেন। এদিকে কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীদেব অনাদিবাবু ও অন্য একজন ভক্তকে আদেশ

করিলেন, "দেখ ত, প্রিয়বাবু বোধহয় রাস্তা দিয়ে কাঁদ্তে কাঁদ্তে আস্ছেন; তোমরা দু'জন শীগ্গীর গিয়ে তাঁকে সাবধানে ধ'রে নিয়ে এস। দে'খ, যা'তে নেশায় রাস্তায় প'ড়ে আঘাত না পান।" অনাদি-বাবু ও সেই ভক্ত শ্রীশ্রীদেবের আদেশে প্রিয়বাবুকে আনিতে গেলেন। ওদিকে প্রিয়বাবু নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়া এক পা ঘরের ভিতরে, আর এক পা বাহিরে দিয়া দেখেন যে, অবিকল তাঁহার গর্ভ-ধারিণী জননীর সদৃশ এক নারীমূর্ত্তি তথায় বিরাজ করিতেছেন। দেখিবামাত্র তিনি "এঁ্যা!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরের নিকট উন্মত্ত অবস্থাতেই আসিতে লাগিলেন। অনাদিবাবুরা সেই কান্নার স্বর লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁহারা প্রিয়বাবুকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে সাবধানে ঠাকুরের নিকট আনিলেন। ঠাকুরকে দর্শন করিয়া প্রিয়বাবুর কান্নার বেগ আরও বাড়িয়া গেল। শ্রীশ্রীদেব প্রিয়বাবুকে বলিলেন, "দেখা শোনা হ'য়েছে ত'?" কান্নার বেগ কমিলে প্রিয়বাবু তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা! আমাকে সেই সময় নিষেধ কর্লেন না কেন?" তদুত্তরে ঠাকুর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি যদি পূর্ব্বে নিষেধ কর্তাম, তা'হ'লে তুমি কি মান্তে চাইতে?" সেইদিন হইতে শ্রীশ্রীদেবের কৃপায় প্রিয়বাবুর সুরাপান-ও-অগম্যাগমন-প্রবৃত্তি চিরতরে বিদূরিত হইল।

প্রসাদের মাহাত্ম্য-প্রকাশ শ্রীশ্রীদেবের শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। তৎপ্রতি কিঞ্চিৎ-অবজ্ঞা-প্রদর্শনও যেন তাঁহার বিশেষ অপ্রীতির কারণ হইত। ইহা আমরা আম্পুলিয়াপাড়ার আশ্রমে অনুষ্ঠিত একটী উৎসবের বিবরণ হইতে অবগত হই। ঠাকুর ইচ্ছাপূর্ব্বকই সেই উৎসব করেন। তিনি বলিলেন, "নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের মহোৎসব সবাই করেন; কিন্তু পোড়ামা'র মহোৎসব ত হয় না! আজ আমি পোড়ামা'র মহোৎসব কর্ব।" খিচুড়ি রান্না করিয়া পোড়ামা'র ভোগ হইল। তদনন্তর ভক্তগণ প্রসাদ পাইতে বসিলেন। এমন সময় গোয়াড়ি হইতে বীরেশ্বর মোক্তার,

ব্রজমাষ্টার, মোক্তার অনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাক্তার দেবেনবাবুর বড় সম্বন্ধী) প্রভৃতি আসিলেন। দেবেনবাবু বড় সম্বন্ধীকে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। তিনি আর প্রসাদ পাইলেন না। এরূপ ভাব দেখাইলেন যেন তিনি খাইতে বসেন নাই ; সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাঁহারা আসায় তিনি উঠিয়া পড়িলেন। তৎশ্রবণে ঠাকুর জনৈক ভক্তকে বলিলেন, "আমার ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দাও এবং সকলকে বল, আজ আর আমার সঙ্গে কা'রও দেখা হ'বে না।" এই সময় হইতেই ঠাকুর দরজা বন্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ভক্তগণকে পুনঃ পুনঃ বলিতেন, "ভিড় ক'রোনা, জাহির ক'রোনা, তোমরাই ঠক্‌বে।" শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের নবদ্বীপ থাকাকালীন ভক্তগণ এমন কথা কোন দিনই শুনেন নাই যে, আজ তাঁহার সহিত দেখা হইবে না। তাই তাঁহারা সেই নিদারুণ কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। ধর্ম্মদাসবাবু শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের দর্শন না পাইয়া অস্থিরভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন ; এমন সময় তিনি সংবাদ পাইলেন যে, শ্রীশ্রীদেব তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। তৎশ্রবণে তিনি অবিলম্বে ঠাকুরের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সকলের উপরই কি এক বিধি ? তোমার যখনই ইচ্ছা হ'বে, তখনই দেখ্‌তে আস্‌বে। কিন্তু, ধামাই, তুমি ডাক্তারকে ব'লে দিও যে, সে যেন আমার কথা না কয়, আমার দুয়ারে না আসে, এবং আমার প্রসাদ না চায়।" তদুত্তরে ধর্ম্মদাসবাবু বলিলেন, "তা'হ'লে কি সে প্রাণে বাঁচ্‌বে ?" তাহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, "বাঁচা মরার কথা পরে হ'বে, এখন তুমি ত বল।" দেবেনবাবুকে ঠাকুরের আদেশ জানাইয়া দেওয়া হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ঠাকুর ডেকে প্রসাদ না দিলে আমি আর খাব না।" এইরূপভাবে সপ্তাহকাল অতীত হইল। বার দিনের দিন দেবেনবাবুর কণ্ঠাগত প্রাণ, গাত্রজ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন ; এমন সময় জনৈক ভক্ত বুদ্ধিপূর্ব্বক কৌশল অবলম্বন করিয়া ডাক্তারবাবুকে ঠাকুরের নিকট লইয়া গেলেন। সেই সময় অভয়-

মুদ্রায় অন্ন তুলিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ ছিলেন। তদ্দর্শনে সেই ভক্ত দেবেন-বাবুকে ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিতে বলিলেন। তিনিও প্রসাদ পাইবার নিমিত্ত ঠাকুরের নিকট বদ্ধাঞ্জলি হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের হস্তস্থিত অন্নগুলি ধীরে ধীরে দেবেনবাবুর হস্তে পতিত হইল। ইহাতে দেবেন-বাবুর আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আমার উপর এত পরীক্ষা কেন?" তৎশ্রবণে ঠাকুর বলিলেন, "যে সহ্য করে, ভগবান্ তা'কেই সহ্য করান।" অতঃপর দেবেনবাবুর আগ্রহাতিশয্যে ঠাকুর তাঁহাকে পাঁচ দিব্যরূপে দর্শন দিলেন; কিন্তু চূড়াবাঁধা গৌরগোপাল রূপটী ডাক্তারবাবুর পছন্দ হইল। সেই সময় দেবেনবাবু একটী গান রচনা করিয়া গাহিলেন, "হ'লেন গৌর গুরু কল্পতরু নদীয়া মণ্ডলে" ইত্যাদি। শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব গানটী শুনিয়া ভাবাবেশে বলিলেন, "তোমার নাম রইল সদানন্দ পরিব্রাজক। তুমি সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী।"

বাস্তবিক, অহেতুকী দয়াই ছিল শ্রীশ্রীদেবের লীলার বৈশিষ্ট্য। শরণাগত আর্ত্ত ভক্তের আর্ত্তি দূর করিবার নিমিত্ত অভাবনীয় কষ্ট ও যন্ত্রণা স্বেচ্ছায় বরণ করিতে পর্য্যন্ত ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিয়াছেন। ভক্ত নবীনবাবুর দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। নবীনচন্দ্র সেনগুপ্তমহাশয় গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরে সরকারি চাকরি করিতেন। তিনি পেন্‌শন্ লইবার পর বহুমূত্র-রোগে আক্রান্ত হইয়া অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট হন। বহুবিধ চিকিৎসা দ্বারাও তাঁহার কোন উপকার হইল না দেখিয়া চিকিৎসকগণ তাঁহার জীবনের আশা পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন। এই অন্তিম-কালে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি ও তাঁহার পত্নী গুরু-গঙ্গা-দর্শনের জন্য নিত্য-ভক্ত প্রিয়বাবুর সহিত নবদ্বীপে গমন করেন। তথায় ঠাকুরের আদেশে ডাক্তার দেবেনবাবু তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং শ্রীশ্রীদেবকে বলিলেন, "চিকিৎসার আর সময় নাই—এখন আপনার চিকিৎসা।" ভক্তের আর্ত্তি দেখিয়া দয়াল

ঠাকুরের প্রাণ কাঁদিল। তিনি নবীনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি খেতে ইচ্ছা হয়?" ভক্তবর অতি কষ্টে ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আপনার প্রসাদ।" তখন ঠাকুরের ইঙ্গিতক্রমে খিচুড়ি রান্না হইল। জনৈক ভক্ত উহা শ্রীশ্রীদেবকে নিবেদন করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি (উক্ত ভক্ত) ঐ প্রসাদ ধীরে ধীরে রোগীকে দিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কণ্ঠনালী ক্ষতযুক্ত হওয়ায় যে রোগী কিছুক্ষণ পূর্ব্বে জল পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করিতে পারিতেছিলেন না, তিনি ক্রমে ক্রমে প্রায় আধসের খিচুড়ি প্রসাদ খাইয়া ফেলিলেন। প্রসাদ পাইতে পাইতে তিনি বেশ অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার কণ্ঠনালী ক্ষতশূন্য হইতেছে। যাহাহউক ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া নবীনবাবু বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর, আমি ভাল হ'য়েছি।" বাস্তবিকই, তিনি একেবারে সুস্থ হইলেন; এমন কি, তিনি উঠিয়া আসিয়া ঠাকুরের পাদস্পর্শ করতঃ হাততালি দিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং ভক্তগণও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। কীর্ত্তন সমাধা হইলে, ঠাকুর নবীনবাবু ও তাঁহার পত্নীকে সেই দিনই গোয়াড়ি অভিমুখে যাত্রা করিতে বলিলেন। তাঁহারা রওনা হইয়া গেলে, শ্রীশ্রীদেবের ভয়ানক কম্প ও প্রস্রাব হইতে লাগিল। তিনি এক ঘণ্টা মধ্যে একশত বার প্রস্রাব করিয়াছিলেন। প্রস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রবল বেগে জ্বর আসিয়াছিল। সেই সময় ঠাকুর হাততালি দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ্ হ'য়েছে! বেশ্ হ'য়েছে! নবীন আমার ভাল হ'য়েছে, আমার সেই রোগ ধ'রেছে!" ভক্তগণ কাঁদিয়া আকুল হইলেন। এই সময় যজ্ঞেশ্বরবাবু* চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করেন। এইরূপে

---

*শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দত্তচৌধুরী মহাশয়ের শ্রীশ্রীদেবে বিশেষ নিষ্ঠা-ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল এবং সাধন-ভজনেও অত্যধিক রতি ছিল। নিত্য-প্রসঙ্গ লইয়াই তাঁহাকে অনেক সময় ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যাইত। তাঁহার কীর্ত্তনেও অসাধারণ অনুরাগ প্রকাশ পাইত। কীর্ত্তন-শ্রবণে তিনি আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন এবং ভাবের আবেশে 'উদ্দাম নৃত্য' করিতেন।

ঠাকুর ভক্তের রোগ গ্রহণ করিয়া অনেক সময় আপন দেহে স্থান দিতেন। এমন দয়াল ঠাকুর জগতে আর কোথায় কে দেখেছে?

আহা! শ্রীশ্রীদেবের মহিমা কতভাবে যে কতজন অনুভব করিয়াছেন তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? এই মহিমা একভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল সন ১৩০৪ সালের শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর দিন নবদ্বীপ-বাসী শ্রীযুক্ত বিহারী কুম্ভকারের নিকট। তিনি স্বরশুনায় "শ্রীমতী দয়াময়ী যোগিনী ঠাকুরাণীর জ্ঞানাশ্রমে, শ্রীনিত্যগোপালকে রাধামূর্ত্তিতে ভোজন করিতে দেখিয়াছিলেন। ঐ বিষয়ে বিহারী কহিয়াছিলেন, "...আমি এবং অন্যান্য সকলে সতত ঠাকুরের যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকি, সেই সময় তাঁহার সেইরূপের পরিবর্ত্তে তাঁহার

শ্রীশ্রীদেবের নিকট হইতে দীক্ষিত হইবার প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কুমিল্লার 'শ্রীশ্রীকরুণাময়ী মা'র বাটীর একটী কক্ষে (অন্যত্রপ্রাপ্ত) 'নাম' জপ করিতে করিতে একদিন রাত্রে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শন করিলেন। তাহা কক্ষটীকে উদ্ভাসিত করিল এবং তন্মধ্যে দৃষ্ট হইলেন এক অপূর্ব্ব, মোহন মূর্ত্তি। তাঁহার গৈরিক-বসন-ভূষিত শ্রীঅঙ্গে দিব্য সৌন্দর্য্য ও দিব্যকান্তি বিরাজ করিতেছিল। এতদ্দর্শনে যজ্ঞেশ্বরবাবু ভক্তিভাবে আপ্লুত হইয়া গেলেন। এই ঘটনার অনেক দিন পর তিনি যখন কলিকাতায় ২৪ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্স্থ ভবনে চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন তিনি ঘটনাক্রমে নিত্য-ভক্ত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য পাইন প্রভৃতির নিকট শ্রীশ্রীদেবের বিষয় শ্রবণ করেন। কিন্তু প্রথমতঃ তদ্বিষয়-শ্রবণাদিতে তিনি তৎপ্রতি অবজ্ঞাই প্রকাশ করেন। যাহাহউক, একদিন হঠাৎ তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন হওয়ায় তিনি মনোহরপুর-আশ্রমে শ্রীশ্রীদেবকে দর্শন করেন। তদ্দর্শনান্তর তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট জ্যোতিতে বিরাজমান মহামানবের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল বটে; কিন্তু উক্ত আশ্রমে ঠাকুর সেই সময় শ্বেত-বস্ত্র-পরিধান করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞেশ্বরবাবু যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না যে, 'ইনিই তিনি'। তৎপর শ্রীশ্রীদেব গৈরিক-বসনাচ্ছাদিত দেহে যখন একদিন

রাধারূপ দর্শন করিয়াছিলাম। আমি তখন তাঁহার পুরুষাকার দর্শন করি নাই। তখন আমি তাঁহাকে রাধা দর্শনই করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে তাঁহার মস্তকে যে গাত্রমার্জ্জনী (বাঁধা ছিল) বেষ্টিত ছিল তখন আমি তাহার পরিবর্ত্তে অতি মনোহর দিব্য স্বর্ণ কিরীট দর্শন করিয়াছিলাম। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গেই দিব্য স্বর্ণালঙ্কার সকল দর্শন করিয়াছিলাম। তাঁহার বক্ষ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গই স্ত্রীলোকের অঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিল। (তদ্দর্শনে আমার তাঁহার প্রতি মাতৃভাব হইয়াছিল।)" (দিব্যদর্শন, ৮১ পৃঃ)

যেমন উক্ত কুম্ভকার মহাশয় নিত্য-মহিমা একদিন একভাবে দর্শন

পূর্ব্বোক্ত বাসায় গমন করিলেন, তখন ডাক্তারবাবু সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলেন যে, সেই দিব্যজ্যোতির মধ্যে দৃষ্ট মহাপুরুষ সশরীরে তাঁহাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিলেন। তখন তিনি শ্রীশ্রীদেবের শ্রীপাদপদ্মে আবেগ-ভরে পতিত হইলেন। সেদিন তুমুল কীর্ত্তন হইল। শ্রীশ্রীদেব সুমধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তদবস্থায় ডাক্তারবাবুর যে ঘরে ঔষধ তৈয়ারী হইত সেই ঘরে তিনি উপস্থিত হইলেন: তৎপর শ্রীশ্রীদেব প্রকৃতিস্থ হইলে তাঁহাকে ডাক্তারবাবু ভক্তিভরে একটী চেয়ারে উপবেশন করাইলেন এবং তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। তিনি যেন ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাই, হস্তদ্বারা চরণ-যুগল বেষ্টনপূর্ব্বক তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আহা! যিনি তাঁহার ঔষধালয়ে শ্রীশ্রীদেবের আনয়নের প্রস্তাব-শ্রবণে একদিন অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত ভক্তগণের সহিত তদ্দর্শনার্থ মনোহরপুর-আশ্রমে গমন করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন তিনি আজ নিত্য-ভক্তিতে দ্রবীভূত হইয়া গেলেন; এবং তদনন্তর শ্রীশ্রীনিত্য-চরণে আশ্রয় পর্য্যন্ত লইলেন। উক্ত ডাক্তারবাবুর পিত্রালয় ছিল ত্রিপুরা জেলার অন্তঃপাতি শ্রীপুর গ্রামে ও মাতুলালয় ছিল চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত কয়েরহাট গ্রামে। তবে তিনি মাতুলালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানেই বসবাস করিতেন। ইঁহার নাম এই গ্রন্থের একাধিক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

করিয়াছিলেন, তেমনই উহা অন্যভাবে আর এক সময়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন নবদ্বীপের কবিরাজ শ্রীযুক্তদীননাথ সরকারমহোদয়। তিনি "একদিন···অবধূত আশ্রমে আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,—"কোন সময় আমার মরণাপন্ন পীড়া হইয়াছিল। সেসময়ে আমি জীবনের আশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আমার ঐপ্রকার সাংঘাতিক পীড়িতাবস্থায় এক্ সময়ে বোধ হইয়াছিল 'যমদূতেরা আমাকে লইতে আসিয়াছে। তাহারা আমাকে লইয়া যাইবার জন্য যে পরামর্শ করিতেছিল তাহাও আমি শ্রবণ করিয়াছিলাম। তাহারা আমার গৃহবহির্ভাগে ঐপ্রকার পরামর্শ করিতেছিল। তাহাদের পরামর্শ সমাপ্ত হইলে, আমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। কিন্তু গুরুদেব জ্ঞানানন্দ মহাপ্রভু তাহাদিগকে গৃহপ্রবেশ করিতে দেন নাই। আমি দেখিয়াছিলাম গুরুদেব জ্ঞানানন্দ নিজ অভয় হস্তদ্বারা তাহাদিগকে তাড়াইতেছেন, তিনি হস্ত দ্বারা তাহাদিগকে আমার গৃহপ্রবেশদ্বার হইতে বহিষ্কৃত করিতেছেন।' তদ্দ্বারা সে যাত্রা আমার মৃত্যু হইবে না বুঝিয়াছিলাম।" (দিব্যদর্শন, ৬৫ পৃঃ)

পরম-কারুণিক শ্রীশ্রীনিত্যদেব ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য সদাসর্ব্বদা অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতেন। সেইজন্য নবদ্বীপ-বাসকালে যে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহার সূচনা দেখিয়াই হঠাৎ তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ব্যস্ততা সহকারে জনৈক ভক্তের নিকট তাঁহার পাদুকা চাহিলেন। সত্বর তাহা পরিধানপূর্ব্বক ঠাকুর বারান্দাতে এক পা আগে ও এক পা পিছনে রাখিয়া মহাবিক্রমে, গুরু-গম্ভীরভাবে, রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে দণ্ডায়মান হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ধরিত্রীদেবী শান্তভাব ধারণ করিলেন! অতঃপর ঠাকুর, "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। জনৈক ভক্ত "এই নৈসর্গিক প্রলয়কালে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত শিষ্যবৃন্দের কি ঘটিল?"—জিজ্ঞাসা করায়, তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কাহারও কোন অনিষ্ট ঘটে নাই।" সত্যই পরে জানা গেল, কাহারও কোন

অনিষ্ট হয় নাই।

দয়ার সাগর ঠাকুর ভক্তের জন্য কত দুঃখ, কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা যে স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে ও সানন্দে বরণ ও ভোগ করিয়া তাঁহাদের শান্তিবিধান করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। নবদ্বীপে অবস্থিতিকালে ঠাকুর এক সময় নিত্য-ভক্ত রঘুনাথ বাঁড়ুয্যেমহাশয়ের পুত্র অনুকূলবাবুর সর্প-দষ্ট-দেহ হইতে বিষের অসহ্য জ্বালা আকর্ষণ করতঃ নিজ অঙ্গে আশ্রয়-দান পূর্ব্বক স্বভক্ত-সন্তানকে তন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল একদিন রাত্রে। ঠাকুর তখন তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছিলেন; এমন সময় সর্পদংশনের ফলে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অনুকূলবাবু তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য শ্রীশ্রীদেবের কৃপাপ্রার্থী হইলেন। তখন ঠাকুর শ্রীমুখ হইতে কিঞ্চিৎ তাম্বূলাংশ তাঁহাকে দিলেন। বাঁড়ুয্যে-মহাশয় তদাদেশক্রমে তাহা চর্ব্বণ করিতে করিতে শরীরের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে চর্ব্বিত-তাম্বূলাংশ দিবার পরই ঠাকুর আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; বিষের দারুণ জ্বালায় নিজে অস্থির হইয়া পড়িলেন। তন্নিকটে দণ্ডায়মান দুইজন ভক্ত ব্যথিত-হৃদয়ে তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর শ্রীশ্রীদেব পুনরায় সুস্থ হইলেন। তাই, বলি, 'এত দয়া আর কে করিবে?'

আহা! অতি দূর দেশে থাকিলেও ভক্তগণের জন্য শ্রীশ্রীদেবের কত চিন্তা থাকিত! তাঁহাদের দৈন্যে তাঁহার প্রাণ কত কাঁদিত! দূর-দেশস্থ ভক্তও যেন তাঁহার শ্রীচরণ-সেবায়-রত ভক্তের ন্যায় তৎসন্নিধানেই থাকিতেন! ইহা নবদ্বীপস্থ কতিপয় সেবক বিশেষভাবে অবগত হইয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। কোনও সময় রাত্রিকালে দুর্গা-বিষয়ক কীর্ত্তন হইতেছিল। তৎশ্রবণে ঠাকুর ভাবাবেশে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি স্থির হইয়া শয়ন করিলেন। দৈবীবাবু পদসেবা করিতে লাগিলেন; এমন সময় ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই

কাঁদ্‌ছিস্‌ কেন ?" দৈবীবাবু উত্তর করিলেন, "না, আমি ত কাঁদ্‌ছি না !" কিন্তু ঠাকুর সহসা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "তবে আমার ডান পার আঙ্গুলে (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীতে) চোখের জল পড়্‌ল কেন ?" পরে সতীশ সেনমহাশয় প্রমুখ ভক্তগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ঠাকুর বলিলেন, "কল্‌কাতার কোনও ভক্ত বিপদে প'ড়ে আমাকে ডাক্‌ছে।" সতীশ সেনমহাশয় বলিলেন, "বিপন্ন ভক্ত বিপদ হ'তে উদ্ধার পেয়েছেন ত ?" ঠাকুর উত্তর করিলেন,"হাঁ"। যাহাহউক, ঐ সময় তাঁহার পদাঙ্গুলিদ্বয় অত্যন্ত শীতল হইয়াছিল।

এই সময় কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলেন, "সম্প্রদায় গঠন আমার উদ্দেশ্য নয়। তাহা হইলে আমি বিস্তর শিষ্য করিতে পারিতাম। যেখানে যত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে—অর্থাৎ যাঁহারা যে যে ভাবে ভগবানের ভজনা করিতেছেন, তাঁহারা সাধনার চরম অবস্থায় সেই সেই ভাবেই এক ঈশ্বরকেই লাভ করিবেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সহানুভূতি আছে। 'জগতের লোক ভগবানের যে কোন মূর্ত্তিকে বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্মকার্য্য করিবে'—ইহা দেখিতেই আমি আসিয়াছি ; নতুবা আমি ইচ্ছা করিলে, বহু শিষ্য করিতে পারিতাম। যাহারা আমাকে চায়, আমি গুহার মধ্যে থাকিলেও তাহারা আমার নিকট আসিবে। আমি দল গড়িতে আসি নাই। সাম্প্রদায়িক ভাব খুবই খারাপ—ইহাতে কোন না কোন ধর্ম্মমতের বা সম্প্রদায়ের বা মহাপুরুষের নিন্দা করিতেই হয়।" অতঃপর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে"র উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "মহেন্দ্র-বাবু তাঁ'র গুরুদেব রামকৃষ্ণপরমহংসমহাশয়কে বাড়া'বার জন্য সত্যের অপলাপ ক'র্‌তেও কুণ্ঠিত হন নাই। সেইজন্য সাম্প্রদায়িক ভাবের বশীভূত হ'য়ে আমার বিরুদ্ধে অনেক কথাই উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন। ঘটনা-ক্রমে আমি ইহা দেখেছি।" ইহার পর তিনি নিত্য-ভক্ত শ্রীযুক্তকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়কে বলেন, "মহেন্দ্রবাবুকে আমার সম্বন্ধে কিছু লিখ্‌তে বিশেষভাবে নিষেধ ক'রে দাও।" তাহা সত্ত্বেও যখন ঠাকুর দেখিলেন যে,

মহেন্দ্রবাবু তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কিছু কল্পনা করিয়া লিখিতেছেন, তখন বোধহয় বাধ্য হইয়া সংক্ষেপে উহার সমালোচনা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা ভক্তগণের মধ্যে কেহই জানিতেন না। অতঃপর "শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম" পত্রিকা ছাপাইবার সময় নিত্য-ভক্তগণ উক্ত পত্রিকায় শ্রীশ্রীদেবের লিখিত উপদেশাবলী প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন—এবং করিতে থাকেন। সেই সময় পাণ্ডুলিপির মধ্যে ভক্তগণ নিম্নলিখিত সমালোচনাটী পাইয়া উহা উক্ত পত্রিকার সন ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়-সংখ্যার ২০—২২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন। ইহা দ্বারা শ্রীশ্রীদেবের একটী সংক্ষিপ্ত আত্ম-কাহিনীও অবগত হওয়া যায়। সেইজন্যও উক্ত সমালোচনা যথা-যথ এই গ্রন্থে সংযোজিত হইল:—"রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় হইতে পরমহংসাচার্য্য* নিত্যগোপাল স্বামীর কোন কালে উপদেশ গ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই। সেইজন্য রামকৃষ্ণপরমহংস মহাশয় কর্ত্তৃক পরম-হংসাচার্য্য নিত্যগোপাল স্বামী কোন কালে উপদিষ্ট হন নাই, বলিতে হয়।

রামকৃষ্ণপরমহংসমহাশয় পরমহংসাচার্য্য নিত্যগোপাল স্বামীকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিতেন। রামকৃষ্ণপরমহংস মহাশয়ের মতে পরম-হংসাচার্য্য নিত্যগোপাল স্বামীর কোন প্রকার সাধনা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। রামকৃষ্ণপরমহংসমহাশয় পরমহংসাচার্য্য নিত্যগোপাল স্বামীকে হংস বলিতেন, রামকৃষ্ণপরমহংসমহাশয় পরমহংসাচার্য্য নিত্যগোপাল স্বামীকে পরমহংস বলিতেন, রামকৃষ্ণপরমহংসমহাশয় পরমহংসাচার্য্য নিত্য-গোপাল স্বামীকে অবধূত বলিতেন। কলিকাতার অন্তর্গত শ্যামপুকুরের শিব চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের আলয়ে রামকৃষ্ণপরমহংসমহাশয় পরমহংসাচার্য্য নিত্যগোপাল স্বামীকে নিত্যানন্দ বলিয়াছিলেন। কোন সময়ে পরমহংসাচার্য্য নিত্য-গোপাল স্বামী শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিলে বাগ্‌বাজারের বসু-

*উক্ত উপাধিটী শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব তাঁহার শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করি।

কুলোদ্ভব বলরাম বাবু প্রভৃতি তাঁহাকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের নিকট গমন করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণপরমহংস মহাশয় অনেক নরনারীর সমক্ষে ঐ পরমহংসাচার্য্য নিত্যগোপাল স্বামীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছিলেন। সেইজন্য বলি ঐ পরমহংসাচার্য্য নিত্যগোপাল স্বামীর প্রতি রামকৃষ্ণপরমহংসমহাশয় কোন কালে কোন প্রকার শাসনবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ইহা কথনই সম্ভব হইতে পারে না। পরমহংসাচার্য্য নিত্যগোপাল স্বামী কখন কোন ব্যক্তির নিকট উপদেশ গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেন না। সেইজন্য তিনি রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃকও উপদিষ্ট হন্ নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। স্বয়ং রামকৃষ্ণই অনেকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় রামকৃষ্ণ বিষয়ক অনেক গ্রন্থেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেইজন্য আমাদের এই স্থলে তদ্বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত করিবার প্রয়োজন নাই।

কোন সময়ে বাগ্‌বাজারের বলরাম বসু মহাশয়ের আলয়ে নিত্যগোপাল স্বামীকে রামকৃষ্ণপরমহংস চৈতন্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। সেকথা কি মহেন্দ্রবাবু বিস্মৃত হইয়াছেন! নিজমুখে রামকৃষ্ণ যে নিত্যগোপাল স্বামীকে চৈতন্য প্রভৃতি অদ্ভুত আখ্যা-সকলে আখ্যাত করিয়াছিলেন, তাঁহার কখনই সেই নিত্যগোপাল স্বামীকে "ওরে সাধু সাবধান। এক আধ্‌বার যাবি, বেশী যাস্ নে—প'ড়ে যাবি। কামিনী-কাঞ্চনই মায়া, সাধুর মেয়েমানুষ থেকে অনেক দূরে থাকৃতে হয়। ওখানে সকলে ডুবে যায়।" বলিবার সম্ভাবনাই ছিল না। যেহেতু রামকৃষ্ণ কোন একজন নির্ব্বোধ পুরুষ ছিলেন না। মহেন্দ্রবাবুর গুরু রামকৃষ্ণ যাঁহাকে চৈতন্য শব্দে অভিহিত করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত মহেন্দ্রবাবুর স্বগতপ্রসঙ্গে ছোট হরিদাসের তুলনা করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করা হয় নাই। তদ্দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি-বিকৃতিরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে! তদ্দ্বারা তাঁহার বালকত্বেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে! তদ্দ্বারা তাঁহার বাতুলতারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে! মস্তিষ্কের বিকৃতি বশতঃ মহেন্দ্রবাবু অনেক

প্রকার খোস্-গল্পই লিখিয়া থাকেন! তাঁহার কল্পনা-প্রসূত গল্পগুলিতে আমাদের তিলার্দ্ধ শ্রদ্ধা নাই। ঐ প্রকার গল্প জগতে অনেক বিদ্যমান্ রহিয়াছে। "ম"—ই না কোন সময়ে রামকৃষ্ণকে কমাইয়া নরেন্দ্রকে বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন? সে বিষয়ে বঙ্গবাসী অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। সেইজন্য, এ প্রসঙ্গে, সে সম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আবশ্যক মতে আমাদের রামকৃষ্ণ বিষয়ে অনেক কথাই বলিবার ইচ্ছা রহিল। আবশ্যক মতে আমাদের রামকৃষ্ণ কথামৃতের ভাল করিয়া সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।"

প্রকৃতপক্ষে, শ্রীশ্রীনিত্যদেব তাঁহার উপদেশাবলীতে তাঁহার সমসাময়িক (ও পূর্ব্ববর্ত্তী) সাধু-মহাপুরুষদিগকে যথোপযুক্ত স্থান দিয়াছেন; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও মাহাত্ম্যের বিশেষভাবে সম্মান করিয়াছেন। তাহা এই গ্রন্থের ৬৮—৬৯ ও ৭৭ পৃষ্ঠা পাঠেই অবগত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং সে সম্বন্ধে এখানে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের সংবাদে অশ্রুবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিয়া তাঁহার মহত্ত্বের যথোচিত মূল্যদান করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীনিত্যদেব সত্যের অপলাপ আদৌ পছন্দ করিতেন না বা সহ্য করিতে পারিতেন না। বাস্তবিকই, তিনি সত্যের মর্য্যাদা-হানিকর কিছু দেখিলে তাহার বিশেষ প্রতিবাদ করিতেন। ইহা কেবলমাত্র তাঁহার উপদেশাবলী পাঠেই যে অবগত হওয়া যায় তাহা নহে; ইহার প্রমাণ আমরা তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনাবলী হইতেও বিশেষভাবে প্রাপ্ত হই। তাই, যখন ৺কাশীর বিশেষ-সাধুতা-সম্পন্ন ও বিদ্যালঙ্কার-বিভূষিত শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে কালিমাময় করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ভীষণ ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা মামলার কবলে নিপতিত করা হইয়াছিল, তখন তিনি (শ্রীশ্রীনিত্যদেব) ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন; তাই, তিনি অত্যন্ত শিষ্টাচারী হইয়াও সভা-মণ্ডপে দণ্ডায়মান, বক্তৃতাকারী (৺কাশীর) শ্রীমৎ সত্যানন্দ স্বামীর সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর

সমক্ষে অতি-কর্কশ ভাবে-ও-ভাষায় উদ্‌ঘাটিত করিতে পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন না। তাই, তিনি তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে (ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে বঙ্গবাসীতে) প্রকাশিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর অপমানজনক উক্তির ভিত্তিহীনতা ও মিথ্যাত্ব পূর্ব্বোল্লিখিত সমালোচনায় প্রদর্শন ও প্রমাণ করিয়াছেন। বাস্তবিকই, অবতার-মহাপুরুষগণ অনেকসময় প্রয়োজনবোধে দুর্ব্বাক্য (বা শ্লেষ-বাক্য বা কটূক্তি) প্রয়োগ ও নানাভাবে ক্রোধপ্রকাশের (বা কর্কশ ব্যবহারের) অভিনয় করিয়া থাকেন। এইভাবে তাঁহারা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা ও মিথ্যা ও অন্যায়ের অপকারিতা ও দোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক জগৎকে নীতি-শিক্ষাদান ও জীবের মঙ্গলসাধনও করিয়া থাকেন।* তবে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তাঁহাদের আচরণ গভীর-রহস্যময় বলিয়া জীব-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর।

*ইহার জলন্ত প্রমাণ ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য-(গৌরাঙ্গ) দেব প্রভৃতি অবতারগণের লীলা-কাহিনী-পাঠেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, প্রভুপাদ মহাত্মা শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও লর্ড্ যীশু খৃষ্টের জীবনীতেও এরূপ অনেক ঘটনা দৃষ্ট হইয়া থাকে: "...শ্রীরামকৃষ্ণ...।...একদিন বরাহনগরের ঘাটে দেখ্‌লাম জয় মুখুজ্যে, জপ কর্‌ছে, কিন্তু অন্যমনস্ক! তখন কাছে গিয়ে দুই চাপড় দিলাম! একদিন রাসমণি ঠাকুর বাড়ীতে এসেছে। কালীঘরে এলো। পূজার সময় আস্‌তো আর দুই একটা গান গাইতে ব'ল্‌তো। গান গাচ্ছি, দেখি যে, অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে। অমনি দুই চাপড়! তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাতজোড় ক'রে রইলো।..."(পৃঃ ৩—৪, ২য় ভাগ, ৭ম সংস্করণ) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-শ্রীমকথিত।

স্বসম্প্রদায়ে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন ও শিক্ষিত জনৈক বাউল কর্ত্তৃক প্রেরিত তদীয় এক শিষ্য নিজ গুরুদেবের আদেশক্রমে প্রভুপাদ মহাত্মা শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মাহাত্ম্য-ও-সম্মান-হানিকর বাক্য তাঁহার উপর প্রয়োগ করিলে মহাত্মা গোস্বামীজী "তাহাকে বলিলেন, আমি কে,

যাহাহউক, পূর্ব্বোক্ত সমালোচনা প্রকাশিত হইবার পর বঙ্গবাসী আফিসের পুরাতন কর্ম্মচারী ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীযুক্ত-হরেন্দ্রনাথ দত্তমহাশয় উহার প্রতি মহেন্দ্রবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তাহা তুমি জানিবে কিরূপে? এইকথা বলিতে বলিতে তাঁহার মধ্যে শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল। তাঁহার দুই চক্ষু যেন জ্বলিতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত তেজের সহিত বলিতে লাগিলেন, তুই আমাকে চিনিবি, সে ক্ষমতা তোর কোথায়? ক্ষুদ্র চটকপক্ষী হইয়া অনন্ত অসীম আকাশের সীমা নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াসী হইয়াছিস্। এক আমিই আছি। আমি ভিন্ন জগতে দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। আমিই এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকি। আমার গলায় উপবীত নাই? তোর যদি চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে তুই আমার গলায় সুবর্ণের উপবীত দেখিতে পাইতিস্। তুই মূঢ়, তুই আমার তত্ত্ব কি বুঝিবি?…" (শ্রীজগবন্ধু মৈত্র প্রণীত ও ১৩১৮ সাল আশ্বিন মাসে প্রকাশিত "প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী"; পৃঃ ৬৪১।)

"…লর্ড যীশুখৃষ্ট স্ক্রাইব্ (ইহুদীদিগের শাস্ত্রীয় বিধানদাতা) ও ফ্যারিসি (ইহুদীদিগের বিখ্যাত ধর্ম্মসম্প্রদায় বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ীদিগের কপটতা, মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি সন্দর্শনে এইভাবে বলিয়াছিলেন, "হা ধিক্! স্ক্রাইব্ ও ফ্যারিসীগণ! তোমরা কি কপটাচারী! তোমরা বিধবার গৃহ (সর্ব্বস্ব) গ্রাস কর; আর ভণ্ডামি কোরে দীর্ঘকাল উপাসনা কর্‌বার্ ভাণ কর; এইজন্য তোমাদের কঠোরতর শাস্তি বা ভীষণতর নরকবাস হ'বেই!…তোমরা বাহিরে সাধুতার ভাব দেখাও; কিন্তু তোমাদের ভিতর কপটতা ও পাপে ভরা!…" ইত্যাদি।

[বাইবেলের 'সেইন্ট্ ম্যাথ্, ২৩' ('St. Mathew, 23') হইতে উদ্ধৃত কতিপয় বাক্যের মৎকৃত বঙ্গানুবাদ]

(স্ক্রাইব্, ফ্যারিসী প্রভৃতি দুর্জ্জনগণকে তাঁহাকে অভিযোগ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে দেখিয়া) "…যখন

তদনন্তর মাষ্টারমহাশয় নিজের অন্যায় ও ত্রুটী বিশেষভাবে বুঝিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলেন, "তাই ত, শেষকালে কথামৃতের সমালোচনাও

তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার দৃষ্টির দ্বারা তাহাদের প্রত্যেকের নির্দ্দয়, সমুন্নত মুখমণ্ডলকে যেন আঘাত করিতেছিলেন, তখন একটী পবিত্র অথচ অবজ্ঞা-মিশ্রিত ক্রোধ তাঁহার অন্তরে জ্বলিতেছিল; ইহার উত্তেজনায় তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়াছিল; ইহার প্রভাবে তাঁহার অঙ্গভঙ্গী উত্তেজিত হইয়াছিল; ইহা তাঁহার কণ্ঠে বাজিতেছিল। এই দৃষ্টির দ্বারা তিনি তাহাদের বিদ্বেষভাব, নীচতা, অজ্ঞানতা ও অহঙ্কারের জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেছিলেন।···(১৫৫ পৃঃ)···মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি প্রধানতঃ স্বীয় শিষ্যবৃন্দকে ···সম্বোধন পূর্ব্বক হঠাৎ গুরু-গম্ভীর সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিলেন,"ফ্যারিসীদের স্বরূপ কপটতা বা ভণ্ডামি; এ হ'তে তোমরা সাবধান হও।"···(পৃঃ ১৬৪) · সময় সময় তিনি জ্বলন্ত, (চিত্তকে ক্ষত-বিক্ষত করে এরূপ) অনিষ্টকারী ক্রোধের উক্তি প্রয়োগ করিতেন··· সময় সময় তিনি কঠোর শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিতেন··কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাকে কেবলমাত্র ঘৃণাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকেন।··· পৃঃ ২০০।"

[ডি, ফ্যার্‌রার্‌-লিখিত যীশুখৃষ্টের ইংরাজী জীবনী (The Life of Christ By D. Farrar) হইতে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তির সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ]

বাস্তবিকই, অবতার-মহাপুরুষগণ বিধি নিষেধের অতীত ও স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ। তাঁহারা সর্ব্বাবস্থায়ই সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহারা 'শূন্যের মত; শূন্যে ধূলি উড়ে; কিন্তু শূন্যে লেগে থাকে না। সেইরূপ পাপরূপ ধূলি, কোনপ্রকার মালিন্যরূপ ধূলি তাঁহাদের লেগে থাকতে পারে না।' সত্যই 'সূর্য্য বা অগ্নির ন্যায় সামর্থ্যযুক্ত যাঁহারা, তাঁহাদিগকে কোনও দোষই স্পর্শ করিতে পারে না, যথা—"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্‌ তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥" অর্থাৎ "যেমন

আরম্ভ হ'ল !—যাহাহউক, পরের সংস্করণে নিতাবাবুর সম্বন্ধে যা যা লিখেছি সে সব বাদ দিয়ে দিব। কি ক'র্‌ব ? সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই আমাকে ঐরূপ লিখ্‌তে হ'য়েছে। (নিতা) 'তুই এসেছিস্ ? আমিও এসেছি—এ কথা কে বুঝ্‌বে ?' ইহা লেখাতেই অনেকে আপত্তি ক'রেছেন। আচ্ছা, ইহা (উক্ত সমালোচনা) কি তিনিই অর্থাৎ (শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবই) লিখেছেন ?" তাহাতে হরেনবাবু বলেন, "বিশ্বাস না হয়, কালীঘাট মহানির্ব্বাণ মঠে পাণ্ডুলিপি দেখে আস্‌বেন।" তদুত্তরে মহেন্দ্রবাবু বলেন, "হাঁ, একদিন যা'ব।" কিন্তু যতদূর জানি, তিনি আর উক্ত মঠে যান নাই।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব সাম্প্রদায়িক-ভাবের কথা শুনিলেই মর্ম্মাহত হইতেন। তাই, তাঁহার রচিত শ্রীগ্রন্থাবলীতে লিখিয়াছেন, "আমি অগ্নি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সকল দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়াও "পাবকই" থাকেন, অপবিত্র হয়েন না, তদ্রূপ ঈশ্বরভাবাপন্ন পুরুষে ধর্ম্মবিরুদ্ধ (বা রীতি-বিরুদ্ধ বা নীতি-বিরুদ্ধ) দোষ দৃষ্ট হয় বটে ; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের তেজঃপ্রভাববশতঃ তাঁহাদিগকে দূষিত করিতে পারে না।" তাঁহারা কর্ম্ম করিলেও কর্ম্ম যে তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না সেই বিষয়ে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ন মাং কর্ম্মানি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা" (গীতা, ৪র্থ অঃ, ১৪শ শ্লোকাংশ) অর্থাৎ "কর্ম্মরাশি আমাকে স্পর্শ করে না, কর্ম্মফলের বাসনাও আমার নাই।" অবতার-মহাপুরুষ "নিরহঙ্কার —কর্ত্তৃত্বাভিমান-রহিত, সুতরাং কার্য্য করিয়াও তিনি অকর্ত্তা। "আমি করিতেছি" এরূপ বুদ্ধির উদয় না হইলে কাহাকেও "কর্ত্তা" বলা যায় না। ব্যবহার দৃষ্টিতে" তাঁহাকে অনেক (এমন কি, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, ন্যায়-বিরুদ্ধ এবং রীতি-বিরুদ্ধ পর্য্যন্ত) কার্য্য করিতে দেখা যায় ; "কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা" (শ্রুতিঃ) ; সর্ব্বাত্ম-দৃষ্টিতে সমস্তই যাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই আপ্তকাম পুরুষের আবার কোন্ বস্তুর কামনা হইবে ? কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি" কোনও কর্ম্মই করেন না। "এতাবৎ তাঁহার প্রকৃতি-সুলভ জল-তরঙ্গ লীলা মাত্র।"

বৈষ্ণব নহি, কারণ তাহাতে তিলক কেটে ভেক্ নিতে হয়; আমি বৈষ্ণবের দলের বলিলে তাঁহারা আমাকে নিবেন না। দাড়ি আছে বটে; কিন্তু কাজী মৌলবীর নিকট কল্‌মা পড়ে মুসল্‌মান্ হই নাই। মুসলমানের দলের মুসলমান্ কেবল মুখে বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। ব্যাপ্‌টাইজ্ না হইলে খৃষ্টান খৃষ্টানের দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। বাহ্যিক জপ, তপ, পূজা, অর্চ্চনাও নাই; কুলগুরুর কাছে কাণে ফোঁকা মন্ত্রও লইতেও চাহি না; ইহাতে সাধারণ হিন্দুরা আমাকে নাস্তিক বলিবেন। বাহ্যিক পূজা, অর্চ্চনা, জপই আস্তিকের কার্য্য, তাঁহারা বলেন। এখন কোন দলে ত আমাকে লইবে না, আমিও দল চাই না; দল গেড়ে ডোবাতেই পঙ্কিল পঙ্কপরিপূর্ণ পূতিগন্ধযুক্ত পল্ললেই হইয়া থাকে, স্বচ্ছ সরোবরে, প্রবাহিনী, স্রোতস্বিনী নদীতে হয় না। তবে, আমি কি? আমি সকল দলে ভিখারী। ভিখারীর জন্য সকল দ্বারই উন্মুখ। আমাকে প্রেমভক্তি ভিক্ষা সকল দলের সাধুরাই দিয়া থাকেন। আমি সকল দলেই ভিক্ষা পাই। সেইজন্য আমার এক সকল দল লয়ে অখণ্ড দল। শাক্ত, শৈব, গাণপত, বৈষ্ণব, খৃষ্টান, মুসল্‌মান্ সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়ই আমাকে ভিক্ষা দিয়া থাকেন···আমি কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত নহি, আমার ইষ্ট যেমন বহুরূপী, আমিও সেইরূপ বহু সম্প্রদায়ী। আমার ইষ্ট যখন শিব হন, আমি তখন শৈব; তিনি যখন বিষ্ণু হন, আমি তখন বৈষ্ণব; তিনি যখন অন্য কোন সাম্প্রদায়িক হন, আমিও তখন সেই সাম্প্রদায়িক হই। আমি হিন্দু, মুসলমান্, খৃষ্টান।···I am a cosmopolitan.···প্রকৃত জ্ঞানীর কোন সম্প্রদায় নাই; অথচ তাঁহার সকল সম্প্রদায়।" ঠাকুরের রচিত অমূল্য গ্রন্থাবলী পাঠ করিলেই, এ সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া যায়। যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া নয়ন-যুগল সার্থক করিয়াছেন, তাঁহারাই সাম্প্রদায়িক ভাবের অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন!

ঠাকুরের সর্ব্বধর্ম্মে সমান আস্থা ছিল। তিনি বলিতেন যে, দেশ-

কাল-পাত্র-ভেদে মহম্মদ জগতের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। যীশুখৃষ্ট এবং বাইবেলকে তিনি খুব সম্মান করিতেন। যীশুর মৃত্যুদিনে বাইবেলের কথা—তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুরতার কথা—ক্রুশে আবদ্ধ-করণের কথা আলোচনা করিতে করিতে তিনি একদিন ভাবাবেশে বড়ই শোকার্ত্ত হইয়া পড়েন। শেষে উন্মাদের ন্যায় নিজের মাথার চুল দুই হাতে ছিঁড়িতে আরম্ভ করিলে, সকলে অনেক প্রকার চেষ্টার পর তাঁহাকে শান্ত করেন।

অন্য একদিন সন্ধ্যার পর ডাক্তার দেবেনবাবু কীর্ত্তন-ঘরের বারান্দায় বসিয়া, ধর্ম্মদাস রায়, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের সহিত কীর্ত্তন করিতেছেন; এমন সময় হঠাৎ ঠাকুর ভাবাবেশে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া সকলে প্রাণের আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবাবেশে সেই সংকীর্ত্তন স্থানে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 'ঐ উন্মত্ত অবস্থায় ঠাকুর পড়িয়া যাইতে পারেন' এই আশঙ্কায়, দেবেনবাবু, ধর্ম্মদাসবাবু প্রভৃতি কয়েকজন হাত ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইল। ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া আছেন; কখনও অল্প অল্প সমাধি ভাঙ্গিতেছে; আবার পরক্ষণে ঘোর তন্ময়তা আসিতেছে। যখন অল্প অল্প সমাধি ভাঙ্গিতে থাকে, তখন আধ আধ জড়তাময় কথায় কি বলেন বুঝা যায় না। জনে জনে গান করিতেছেন—যাঁহার যেমন প্রাণে আসিতেছে, তিনি সেইভাবেই—অর্থাৎ কেহ কালী, কেহ দুর্গা, কেহ শিব, কেহ রাম, কেহ কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা বিষয়ক—সঙ্গীত করিতেছেন। ঠাকুর হঠাৎ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বামহস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন ও বামদিকের ঊর্দ্ধ-ভাগে দৃষ্টি স্থির করতঃ চীৎকার করিয়া কি বলিলেন। ভক্তগণ অবাক্ হইয়া একে অন্যের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর যেন অত্যন্ত নেশার ভাষায় বলিলেন, "মদ দাও"। এই কথা উচ্চারণ করিবামাত্র তাঁহার মুখের দুই পার্শ্ব দিয়া অবিরল ফেন নির্গত হইতে লাগিল। সঙ্গে

সঙ্গে সমস্ত ঘর মদের গন্ধে ভরিয়া গেল। কেহ কেহ সেই ফেন আস্বাদন করিয়া দেখিয়াছিলেন, উহার স্বাদ ঠিক মদের অনুরূপ। কেহ একটু বেশী অর্থাৎ অঞ্জলি পাতিয়া লইয়া আস্বাদন করিয়া নেশায় বিভোর হইয়াছিলেন।* এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার জীবনে আর কেহ কখনও দেখেন নাই। রাত্রি প্রায় চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত সেদিন সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তনান্তে অনেকেই আশাতিরিক্ত ফললাভ করিয়াছিলেন। সেদিনের কৃপা প্রকাশ দেখিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের রাত্রির কথা ভক্তগণের স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল।

অপর একদিন ঠাকুর আশ্রমে ভক্তপরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট আছেন; এমন সময় নবদ্বীপ-স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষকমহাশয় যদুবাবু ঠাকুরের নিকট একখানি বাইবেল হাতে করিয়া আসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টারমশায়ের হাতে ওখানা কি?" তিনি উত্তর করিলেন, "বাইবেল"। "দাও, দেখি" বলিয়া ঠাকুর দুই হস্ত প্রসারণ করিলেন; অমনি ঠাকুরের দুই চক্ষু স্থির হইয়া গেল—চোখের প্রান্ত দিয়া যেন গঙ্গা-যমুনার প্রবাহ বহিতে লাগিল। সর্ব্বশরীর রক্তবর্ণ ধারণ করিল—দেখিতে দেখিতে মনে হইল যেন চক্ষুর উপর জাল পড়িয়া আসিতেছে—যেন মৃতদেহ! গুরু-জ্ঞানানন্দরূপী-ভগবান্-শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব আজ যীশুখৃষ্ট-ভাবে সমাধিস্থ। শ্রীভগবানের সর্ব্বভাবে, সর্ব্বনামে ও সর্ব্বরূপে সমভাব জগতে এই নূতন। তাঁহার নিকট সকল সম্প্রদায়ের ভক্ত আসিয়াই পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন। সর্ব্বধর্ম্মের ধর্ম্মী শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল, তোমার জয় হউক!

বৈবর্ণ্যও যে শ্রীশ্রীদেবের ভাবাবেশের একটী বিশেষ লক্ষণ ছিল,

---

*বলাবাহুল্য, ঠাকুর অনেক সময় ভাবাবেশে "মদ দাও, মদ দাও" বলিতেন। কিন্তু তাঁহার পার্থিব-লীলা-কালে তিনি কখনও উহা পান করেন নাই। তবে কি উহা সহস্রার-চ্যুত কারণামৃত—যাহার বিন্দুমাত্র পান করিয়া ভক্তগণ মাতোয়ারা হইয়া যাইতেন?

তাহা তদীয় নবদ্বীপ-লীলা-কালীন এক রামনবমী তিথির ঘটনা হইতেও আমরা সম্যক্‌রূপে অবগত হই। ঠাকুর যখন নবদ্বীপে আম্‌পুলিয়াপাড়ার আশ্রমে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় উক্ত তিথি উপলক্ষে ভক্তগণ ঠাকুরকে লইয়া কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হইলেন। কীর্ত্তন-শ্রবণে ঠাকুরের কত রকমের ভাবাবেশ ও সমাধি হইতে লাগিল। ঠাকুরের সমাধি-ভঙ্গের পর তিনি বলিলেন, "আজ রামনবমী, শ্রীরাম-সম্বন্ধে কীর্ত্তন হউক।" ভক্তগণ রাম-নামে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের শরীরে স্বভাব-সিদ্ধ সাত্বিক-ভাবের উদয় হইল। ঠাকুর মুহুর্মুহুঃ আবিষ্ট হইতে লাগিলেন—কখনও হাস্য—কখনও ক্রন্দন—কখনও উদ্দণ্ড নৃত্য—অশ্রু-কম্প-পুলকে সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। সে শোভা যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই ভাগ্যবান্। কিয়ৎক্ষণ পর দেখা গেল, ঠাকুরের হেমকান্তি নবদূর্ব্বাদল-শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ধর্ম্মদাসবাবু প্রদীপ লইয়া দেখিতে লাগিলেন; অন্যান্য ভক্তগণও দেখিবার জন্য হুড়াহুড়ি করিতে লাগিলেন। কি অদ্ভুত ব্যাপার! কি অমানুষিক শক্তি! "যে হেরে এই লীলা সেই ভাগ্যবান্"। যাহা কখনও কেহ দেখে নাই, ভক্তগণ সেইদিন তাহা দেখিয়া নয়ন সার্থক করিলেন।

অন্য একদিন রাত্রিতে তুমুল কীর্ত্তনের মধ্যে ঠাকুর ধর্ম্মদাসবাবুকে কোলে বসাইয়া সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। এই সমাধি-মগ্ন অবস্থায় ধর্ম্মদাস-বাবু বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ঠাকুর স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীশ্রীদেব কীর্ত্তন বড় ভালবাসিতেন। সেইজন্য আম্‌পুলিয়াপাড়ার আশ্রমে ভক্তগণ সমবেত হইবামাত্রই কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেন এবং তাহা বহুক্ষণ চলিত—এমন কি, কোন কোন দিন রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত হইয়া যাইত। এক সময়ে ঐরূপ তুমুল কীর্ত্তনের মধ্যে ঠাকুর এমন করুণার্দ্র-নেত্রে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন যে, ঠাকুর যে দিকে তাকাইলেন, সেইদিকে সকলেই "হা গৌরাঙ্গ হরি!" বলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। সকল ভক্তের চক্ষে অশ্রু, সকলের দেহে পুলক; তাঁহাদের আনন্দের আর

সীমা ছিল না। কিছুক্ষণ পরে 'মা'র নাম কীর্ত্তনও হইল। তৎপরে মোক্তার বীরেশ্বরবাবু (ঠাকুরের জনৈক ভক্ত) আব্দার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর, আমরা কলির জীব, সাধন-ভজন-বিহীন, কিছুই কর্‌বার ক্ষমতা নাই।" এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। মোক্তার-বাবুর ক্রন্দন শুনিয়াই ঠাকুর মাতৃভাবে বীরেশ্বরবাবুর দুইখানি হাত ধরিয়া "আমি যে তোদের মা" এই বলিয়া আবিষ্ট হইলেন: আর কিছু বলিতে পারিলেন না। সকল ভক্ত সেই সময়ে তাঁহাকে স্ত্রী-মূর্ত্তিতে দর্শন করিলেন—অঙ্গের লক্ষণ সকল স্ত্রীলোকের মত হইয়া গেল এবং মাতৃহারা সন্তান বহুক্ষণ পরে মা'র দেখা পাইয়া যেমন ক্রন্দন করে, ভক্তগণও সেইরূপ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,— "তোদের কিছুই ক'র্‌তে হ'বে না; আমার উপর তোদের "বকল্‌মা" রইল।" এই সুমধুর অভয়-বাণী ঠাকুর আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে, হাসিমাখা মুখে, করুণামাখা স্বরে এমনভাবে বলিয়াছিলেন যে, উহা শ্রবণমাত্রই ভক্তগণের প্রাণ আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইল।

কোনও এক সময়ে জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, আপনাকে কি ক'র্‌লে সন্তুষ্ট ক'র্‌তে পারা যায়?" শ্রীশ্রীদেব বলিলেন, "তোমাদের এমন কিছুই নাই, যদ্দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট ক'র্‌তে পার; তবে আমি এমনই তোমাদের উপর সন্তুষ্ট আছি।"

একদিন ভক্তগণ ঠাকুরকে লইয়া মৃদঙ্গ-করতালের সহিত সুমধুর সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীদেব আপনার গুণগাথা শ্রবণ করিয়া ঘনঘন হরিধ্বনি পূর্ব্বক প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হুঙ্কার দিতে লাগিলেন ও আনন্দে "বোল্‌, বোল্‌" শব্দে ভাবেতে বিভোর হইয়া ব্রজভাবে কত নৃত্য করিতে লাগিলেন। কখনও দক্ষিণে, কখনও বামে হেলিয়া দুলিয়া কত রঙ্গে ভঙ্গে নাচিতে লাগিলেন। নাচিতে নাচিতে কখন কোন ভক্তের বক্ষে পদ ধারণ করিতেছেন, কখনও বা কাহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, কখনও বা কাহাকে কোলে করিতেছেন, কখনও বা কাহাকে বামে লইয়া

'ত্রিভঙ্গঠামে' দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি অধরে ধরিয়া বাঁশরী বাজাইবার ভঙ্গী করিয়া মধুর স্বরে "জয় রাধে!" "জয় রাধে!" বলিতেছেন। শ্রীশ্রীদেবের গলিত-সুবর্ণের-ন্যায় দেহখানি ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল এবং তাহা হইতে স্বেদ বহিতে লাগিল। নয়নযুগল হইতে গঙ্গা-যমুনার ন্যায় প্রবল ধারা পতিত হইয়া কীর্ত্তন-ভূমি সিক্ত করিতে লাগিল। কষিত-কাঞ্চন বর্ণ ক্ষণে ক্ষণে বিবর্ণ হইতে আরম্ভ করিল—কখন কৃষ্ণ, কখন শ্বেত, কখন বা লোহিত প্রভৃতি নানাবর্ণে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীদেব যেন কোন প্রিয় বস্তুর অন্বেষণে "ইতিউতি" চাহিতেছেন—কখনও বা একদিকে ধাইয়া যাইতেছেন—কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। কখনও হ্রস্ব, কখনও দীর্ঘ. কখনও হস্তপদ অঙ্গের ভিতর প্রবিষ্ট হইতেছে, কখনও মুখাকৃতি নানারূপ ধারণ করিতেছে। মাঝে মাঝে লোমকূপ হইতে রক্ত স্বেদ ঝরিতেছে। কখনও মুখে বাক্য সরিতেছে না, কখনও কত দুঃখে কাঁদিতেছেন, কখনও অট্টহাস্যে কীর্ত্তন-ভূমি মুখরিত করিতেছেন। কখনও বা শ্বাসরুদ্ধ—যেন মৃতপ্রায়। কখনও মৃদু ভাষে কত কি সুধাইতেছেন। কখনও বা 'রাধা' বলিতে গিয়া 'রা' 'রা' 'রা' বলিয়া 'ধা' আর বলিতে পারিতেছেন না; কখনও ভূমিতে পড়িয়া অচৈতন্য হইতেছেন, কখনও বা চৈতন্য পাইয়া শ্রীমুখ ভূমিতে ঘর্ষণ করিতেছেন, কখনও বুক চিরিতে—কখনও বা চুল ছিঁড়িতে চাহিতেছেন—আবার কিছুক্ষণ পরে ভক্তগণের হাতে ধরিয়া কত ছাঁদে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছেন। কখনও বা প্রেমময়রূপে আপনা পাসরিয়া অঞ্জলি পাতিয়া রাধাপ্রেম ভিক্ষা করিতেছেন, আবার কখনও জ্ঞানানন্দে মত্ত হইয়া নিজতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন; কখনও বা বরাভয় করে ভক্তগণকে আপন আপন অভিলষিত বরদান করিতে লাগিলেন; কখনও নিজ অঙ্গে মনোহর দিব্যরূপসমূহ প্রকটিত করিতেছেন। চারিদিকে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া 'ঐ মোর গোরা', 'ঐ মোর শ্যামা', 'ঐ মোর শ্যামসুন্দর' ইত্যাদি বলিয়া সেই 'নিত্য'-পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন; কেহ বা 'নিত্য'-পানে ধাইয়া

আলিঙ্গন করিতেছেন, কেহ বা শ্রীপদযুগলের উপর পড়িয়া রহিয়াছেন। কেহ বা কীর্ত্তন-প্রাঙ্গণের রজে লুটাইতেছেন, কেহ বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। এইরূপে শ্রীশ্রীনিত্যদেব চারিদিকে ভক্তগণের সহিত সংকীর্ত্তনে নানাভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিত্যপ্রেমে বহির্জগত মাতিল! ভাসিল!! আনন্দে উথলিয়া উঠিল!!!

এইরূপে কলিকাতা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে ঠাকুর সংকীর্ত্তনে অপরূপ নৃত্য করিতেন। এই সকল স্থানের ভক্তগণ তদ্দর্শনে কৃতার্থ ও মহানন্দে মগ্ন হইতেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা, কালী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে যখন যে বিষয়ের গান হইত, সেই সময় ঠাকুরের ভাব-সমাধি-অবস্থায় তাঁহার অঙ্গ-ভঙ্গীতে তত্তদ্‌ভাবের লক্ষণ দৃষ্ট হইত। তিনি ভক্তগণের সঙ্গে কখনও কখনও গান গাহিতে আরম্ভ করিতেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবাবিষ্ট হইতেন। কখনও চক্ষু মুদিয়া, কখনও বা চাহিয়া বিগ্রহবৎ নীরব, নিস্পন্দ হইতেন; কিন্তু নয়নধারার বিরাম হইত না। এ অপরূপ দৃশ্য যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই নয়নযুগল সার্থক হইয়াছে—তাঁহাদেরই মনুষ্যজন্ম সফল হইয়াছে! তাঁহাদের ভাগ্যের কথা আর কি বলিব!

বহু স্থলে বহু সময়ে বহুবার ভক্তগণ দেখিয়াছেন যে, ঠাকুর আহার করিতে করিতে, লিখিতে লিখিতে, উপদেশ দান করিতে করিতে হঠাৎ সমাধিস্থ হইতেন। যোগ-প্রক্রিয়া, আসন, প্রাণায়াম ও ধ্যানাদি করিতে ভক্তগণ তাঁহাকে কখনও দেখেন নাই। তিনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভাবে যে কোন অঙ্গ-ভঙ্গীতে সমাধি-মগ্ন হইতেন; কারণ ভাব-সমাধি ছিল তাঁহার ইচ্ছাধীন; তিনি ঐ সকলের অধীন ছিলেন না। তিনি নিত্য, স্বয়ম্ভু ও স্বপ্রকাশ; সুতরাং তাঁহাকে জানিবার জন্য তাঁহার কোনরূপ সাধন-ভজনের আবশ্যক হয় নাই। লীলাময় প্রভু বর্ত্তমান লীলায় যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র জীবের শিক্ষার জন্য।

সমাধি-ভঙ্গের পর তিনি অর্দ্ধ-বাহ্যদশায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন, যেন কোন প্রিয়বস্তু হারাইয়া একাগ্রচিত্তে তাহার সন্ধান করিতেছেন। ক্ষণেক পরে "নারায়ণ" "নারায়ণ", কখনও বা অর্দ্ধস্ফুটস্বরে "হই" (হরি), "কায়ী" (কালী), "দুগ্‌গা" (দুর্গা), "গগ্‌গা (গঙ্গা) ইত্যাদি নানা দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করিতেন এবং বালকের ন্যায় নিকটস্থ ভক্তগণের সহিত "মা যাবো, তুই যাবি" ইত্যাদি নানা কথা কহিতেন। সংকীর্ত্তনে অপরূপ নৃত্য করিতেন—বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইতেন—অশ্রু-কম্প-বৈবর্ণ্য প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক-ভাবের উদয় হইত। সিন্দুরবর্ণ আম্রের ন্যায় রক্তাভ-চক্রসমূহ হস্তে, বক্ষে ও পৃষ্ঠে দৃষ্ট হইত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের যে কোন মূর্ত্তি-বিষয়ক গান বা গ্রন্থ পাঠ হইত, তাঁহাতে তত্তদ্ভাবের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইত। রাধাভাবে বিভোর হইয়া বিরহে কখনও তিনি চুল ছিঁড়িতেন, কখনও বা অধৈর্য্যভাবে বুক চিঁড়িবার চেষ্টা করিতেন। বাহ্যজ্ঞান-প্রাপ্তির সময় "আমি সেই, আমি সেই"—আবার কখনও কখনও 'কালী', 'দুর্গা মা' বলিতেন—কখনও বা বিড়্ বিড়্ করিয়া নানা কথা কহিতেন।

আশ্রমে সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে রাত্রি শেষ হইয়া যাইত। কীর্ত্তনের শেষে যখন ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুনঃ "হরিবোল্", "হরিবোল্" ধ্বনি করিতেন, তখন ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁহাদের সহিত নাচিতে নাচিতে সমস্বরে "হরিবোল্" "হরিবোল্" বলিতে বলিতে অবশেষে বারম্বার "বোল্" "বোল্" শব্দ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইতেন। ভক্তগণকে মৃদঙ্গ-করতালের সহিত উচ্চৈঃস্বরে "হরিবোল্" ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত যাহাতে পূর্ণ করেন তজ্জন্য তিনি তাঁহার উত্তোলিত সুচারু বাহু ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া অবিশ্রান্ত মস্তকোপরি অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেন। ঐ সময়ে হরিনাম-উচ্চারণের বিরাম তাঁহার সহ্য হইত না। তৎকালীন তাঁহার আনন্দ ও হাস্য অতিশয় মনোমুগ্ধকর হইত। কীর্ত্তনের সময় প্রায়ই তিনি ভাবাবেশে নাচিতেন—সে নৃত্য অপরূপ, নয়ন-তৃপ্তিকর ও মনোমোহন; 'পাছে পড়িয়া যাইয়া তিনি

আঘাতপ্রাপ্ত হন' এই ভয়ে, সেই সময় কোন কোন ভক্ত তাঁহাকে ধরিয়া থাকিতেন। তাঁহার ঐ অবস্থায় উপবেশন কালে বিশেষ সাবধান হইতে হইত। ভাবাবেশের সময় উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম শুনাইলে কিছুক্ষণ পরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইত। সে সময় অবিরল ধারায় তাঁহার অশ্রুপতন হইত।

কীর্ত্তনান্তে কোন কোন দিন অন্তর্বাহ্যদশার মধ্যে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন,—"এখন দিন, না রাত ?" এইভাবে যতদিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, ততই শ্রীশ্রীদেবের মহিমা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হওয়ায় দলে দলে ভক্ত সমাগম হইতে লাগিল। তাঁহারাও শ্রীশ্রীদেবের সঙ্গসুখে পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

হুগলী 'নিত্যমঠ' স্থাপন ও তথায় অবস্থান

"সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥"

গীতা, ১৪শ শ্লোঃ, ৯ম অঃ।

[কেহ বা সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া, কেহ বা দৃঢ়ব্রত হইয়া ঐশ্বর্য্য জ্ঞানাদিতে প্রযত্ন করিয়া, কেহ বা ভক্তিসহকারে নমস্কার করিয়া, আবার অপরে অনবরতই অবহিতচিত্ত হইয়া আমার উপাসনা করে।]

তদানীন্তন কালে নবদ্বীপ-ধামে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা না থাকায়, ভক্তগণকে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবকে দর্শন

করিতে আসিতে হইত। এই অসুবিধা নিবারণের জন্য এবং নবদ্বীপ-আশ্রমে স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে, ঠাকুর ভক্তগণকে কলিকাতা ও নবদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী স্থলে মঠোপযোগী একটী নির্জ্জন স্থান অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। তদনুসারে ভক্তগণ হৃষ্টান্তঃকরণে এই কার্য্যে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলেন। ইত্যবসরে সংবাদ পাওয়া গেল যে, হুগলী সহরে চক্‌বাজার নামক স্থানে পুরাতন হাঁসপাতালটী বিক্রয়ার্থ আছে। উহা 'ভূতের বাড়ী' বলিয়া কেহই খরিদ করিতে রাজী ছিলেন না। সেইজন্য শ্রীশ্রীদেব খুব অল্প মূল্যে সে বাড়ীটী খরিদ করিয়া জঙ্গলাদি পরিষ্কার করাইতে লাগিলেন। ভক্তগণও প্রাণপণ চেষ্টায় এই কার্য্য সম্পাদন করিতে ব্রতী হইলেন। এই সময় তাঁহাদের আহার-নিদ্রার পর্য্যন্ত কোন সময়ের ঠিক ছিল না। কি করিয়া শ্রীশ্রীদেবের আদেশ পালন করিতে পারিবেন, তাহাতেই তাঁহারা ব্যস্ত। ঠাকুর হুগলীতে গমন না করিলেও, নবদ্বীপ হইতেই কোথায় কি করিতে হইবে এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রাঙ্কন করিয়া দিলেন যে, তদ্দর্শনে ভক্তগণ বিস্ময়াভিভূত হইলেন। তবে ইহা সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার পক্ষে যে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, তাহা তাঁহারা বিশেষভাবে অবগত ছিলেন।

এইরূপে হাঁসপাতাল-বাটীটী বাসোপযোগী হইবার সংবাদ পাইবা-মাত্র সন ১৩১৩ সালের ১লা বৈশাখ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব হুগলী যাত্রা করিলেন। তথায় রাত্রি আট ঘটিকায় পৌঁছিবার পর তিনি অশ্বযান হইতে অবতরণ করিয়া আশ্রম-বাটীতে প্রবেশ করিতেছেন ; এমন সময় হুঁচট্ খাইয়া পড়িয়া যান। তদ্দর্শনে ভক্তগণ "হায়! হায়!" করিয়া তাঁহাকে উত্তোলন পূর্ব্বক সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনা দর্শনে ভক্তগণ ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের বিষয় ভাবিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। অতঃপর তাঁহারা ঠাকুরকে লইয়া আশ্রমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীশ্রীদেবের বিশ্রামান্তে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করাইয়া, তাঁহারা তাঁহার সেবার নিমিত্ত ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিলেন।

এই সময় ভক্তপ্রবর হরি ঘোষমহাশয় একটী আম আনিয়া শ্রীশ্রীদেবের সম্মুখে ধরিলেন। শ্রীশ্রীদেবের আগমনের পূর্ব্বে তিনি ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ইহার কিয়দংশ কর্ত্তন করিয়া আস্বাদন করিবামাত্র দেখিলেন, উহা অতি মধুর। তখন শ্রীশ্রীদেবের সেবার জন্য নিত্য-গত-প্রাণ হরিবাবু উহা অতি যত্নে উঠাইয়া রাখিলেন। অন্তর্য্যামী ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীদেব উহা দৃষ্টিমাত্র ভক্ষণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু 'উচ্ছিষ্টফ কি করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিবেন' ভাবিয়া হরিবাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে ভাবগ্রাহী শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব হরিবাবুর অনুরাগের দ্রব্য উচ্ছিষ্ট হইলেও ফলরূপে তাঁহার প্রেমটুকু সাদরে গ্রহণ করিলেন। শ্রীভগবান্ এইরূপেই প্রেমিকের প্রেম গ্রহণ করিয়া থাকেন; তাহাতে আর বিধির বাঁধন থাকে না।

আশ্রমটী হুগলী সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইলেও অতি নির্জ্জন ও শান্তিপূর্ণ ছিল। সহরের কোলাহল সেখানে পৌঁছিত না। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাইত সেই দিকেই মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিরাজ করিত—মনে হইত যেন প্রাচীন ভারতের তপোবন। ইহা সপার্ষদ তপঃফল-বিধাতার আগমনের জন্য যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল। স্থানটী ক্রয় করা অবধি ভক্তপ্রবর হরিবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে উহা নানা-প্রকার ফল-পুষ্প-বৃক্ষ-শোভিত হইয়া অতি মনোহর হইয়া উঠিল। ত্রিতাপদগ্ধ ব্যক্তিমাত্রই এখানে আসিয়াই মুহূর্ত্তমধ্যে সংসারের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া অপূর্ব্ব শান্তিরস আস্বাদন করিত। স্বতঃই তাহার মনে হইত যেন সে শোকদুঃখময় পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র কোনও এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি-ধামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত অনুমান চারি বিঘা জমির উপর আশ্রম-বাটী নির্ম্মিত হইলেও, ভক্তগণের মনে হইত যেন ইহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় একটী বিশাল রাজ্য। তন্মধ্যে একটী পুষ্করিণী এবং বাসোপযোগী কয়েকটী প্রকোষ্ঠযুক্ত পুরাতন অট্টালিকা। কিন্তু ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের আগমনে উহা যেন

নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল ও নূতন শোভা ধারণ করিল। বাহিরের প্রকোষ্ঠটী একটী সুদীর্ঘ ঘর ছিল বলিয়া তাহার নাম হইল "হল্ ঘর"। ইহাই ছিল তত্রত্য ও নানাদেশ হইতে সমাগত ভক্তমণ্ডলীর আশ্রয়স্থল। এই ঘরই সদাসর্ব্বদা কীর্ত্তন, পাঠ ও নিত্য-লীলা-আলোচনায় মুখরিত হইতে লাগিল। কিন্তু নির্জ্জনতা-প্রিয় শ্রীশ্রীনিত্যদেব তদ্ব্যবহারার্থ একটী ক্ষুদ্র আলো-বাতাস-বিহীন, অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ মনোনীত করিলেন। ইহা ছিল "হল ঘরের" দক্ষিণে ও পুষ্করিণীর পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার দেয়ালের গা শিব-দুর্গা-কালী, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবী, এমন কি, সগণ ঈশাজীর আলেখ্যদ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। এই নির্জ্জন প্রকোষ্ঠেই তিনি স্থান দিলেন তাঁহার প্রাণাধিক গ্রন্থরাজির। এইগুলি তাঁহার স্বরচিত অপূর্ব্ব মীমাংসা-গ্রন্থ এবং সমন্বয়বাদের ভিত্তিস্বরূপ দিব্যজ্ঞান-প্রসূত অক্ষয় ভাণ্ডার।

সর্ব্বত্রসমদর্শী ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যদেব জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলকেই সমাদর করিতেন। তাই, তিনি ভদ্র-মহিলাগণের জন্যও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সমাগত ভক্তমণ্ডলী স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া দীর্ঘকাল বাস করিলেও যাহাতে তাঁহাদের কোনও অসুবিধাই না হয়, সেদিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। তাই, তাঁহারা গৃহসুখ বিস্মৃত হইয়া শ্রীমুখ-নিঃসৃত-বাণী-সম্ভোগে পরমানন্দে কালযাপন করিতেন। তাঁহাদের নিত্য-নিষ্ঠা ছিল অপূর্ব্ব। তাই, যখন শ্রীশ্রীদেবের সুশীতল চরণছায়া পরিত্যাগ করিয়া নিজগৃহে ফিরিবার সময় আসিত, তখন তাঁহারা কাঁদিয়া আকুল হইতেন। তাহা দেখিয়া মনে হইত, তাঁহারা যেন আপন জন ছাড়িয়া কোন্ অজানা দেশে যাইতেছেন।

আশ্রমের ফল-পুষ্পের বৃক্ষগুলি যেন কল্পবৃক্ষের ন্যায় ছিল। উহারা নিত্যই ফলসম্ভার ও পুষ্পসম্ভার দ্বারা নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীদেবের সেবা করিতে লাগিল। তিনি তাহাদের সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আদর করিয়া আশ্রমটীর নাম দিলেন "নিত্যমঠ"। মঠটী ঠাকুরের সংস্পর্শে এক অপূর্ব্ব স্থান হইয়া উঠিল। যাহা প্রতিবেশীর নিকট এক সময়ে ভূতের

বাটী বলিয়া অতীব ভয়োদ্দীপক ছিল, তাহা এখন সুমধুর নাম-কীর্ত্তনে মুখরিত এবং আমোদিত হওয়ায় প্রেমোদ্দীপক হইয়া উঠিল। নামের প্রভাবে ভূতপ্রেতগণের দৌরাত্ম্য যেন চিরতরে প্রশমিত হইল। একদিন কীর্ত্তনের পর দেখা গেল, একটী পেয়ারা বৃক্ষের একটী বৃহৎ শাখা মড়্‌মড়্ শব্দে ভগ্ন হইয়া ভূপতিত হইল। ইহাতে শ্রীশ্রীদেব বলিলেন, "একটী ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধার হইল।" প্রথম প্রথম তিনি তাঁহার শয়ন-কক্ষে ভুতাদির পদচারণ শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতেন ; কিন্তু ভূতনাথের আগমনের পর তাহারা শান্তভাব ধারণ করিল ! যাহাহউক, শ্রীশ্রীদেব নিত্যমঠে ভক্তবৃন্দ লইয়া কখনও কীর্ত্তনানন্দে, কখনও ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠ-শ্রবণে, কখনও বা গ্রন্থ-প্রণয়নে, কখনও বা রুদ্ধকক্ষ-বাসে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই শ্রীগুরুপূর্ণিমা-তিথি উপলক্ষে বহু ভক্তের সমাগম হইল। কেহ কেহ কীর্ত্তন করিতেছেন, কেহ নৃত্য করিতেছেন, কেহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন, কেহ বা সুমধুর নিত্য-লীলা-কাহিনী-শ্রবণে মগ্ন, কেহ ঠাকুরকে সাজাইবার জন্য মালা গাঁথিতেছেন, কেহ বা সাজাইতে ব্যস্ত। আবার কেহ বা শ্রীচরণ-পূজা, কেহ বা স্তবপাঠ, কেহ বা প্রাণমন ভরিয়া মনোহর নিত্যরূপ দর্শন করিবার জন্য লালায়িত। দয়াল ঠাকুর সকলকে ডাকিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, "ঠাকুর, সংসারে কাল-কুটিল মায়া যে ঘিরে মার্‌ছে ; কি উপায় হ'বে ?" দয়াল ঠাকুর প্রত্যেকের কথার উত্তর দিতেছেন, আর মুখে "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিতেছেন। তিনি আবার বলিতেছেন, "হাঁ, সংসার বড় কুটিল ; এখানে অনেক রকম 'সং' আছে। তবে যত পার, হুঁসিয়ার থাক্‌বার চেষ্টা ক'রো। ভগবান্ তোমাদের উপায় ক'রে দেবেন। তাঁর নাম কর। সমস্ত বাধাবিঘ্ন হ'তে উদ্ধার কর্‌বার তিনিই মালিক। তাঁর কাছে সদাসর্ব্বদা প্রার্থনা কর।" এইরূপে তিনি স্থির প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় বসিয়া ভক্তগণকে কত প্রকারে প্রকৃত ধর্ম্মপথে চলিবার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভক্তগণ নানাবিধ

সামগ্রীর দ্বারা শ্রীশ্রীদেবের ভোগের আয়োজন করিলেন। ভক্তবৎসল ঠাকুরও ভক্তিভাবে নিবেদিত সেই উপাদেয় বস্তুসকল সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। অনন্তর শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি সহ শ্রীশ্রীদেবের আরত্রিক আরম্ভ হইল। আরত্রিক আরম্ভ হইবামাত্রই তিনি সমাধি-মগ্ন হইলেন। ক্রমে আরত্রিক-কার্য্য সমাপ্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পর শ্রীশ্রীদেবও সমাধি হইতে বুত্থান লাভ করিয়া ভক্তগণকে প্রসাদ পাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহারাও পরমানন্দে প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন।

বিশ্রামান্তে সন্ধ্যার পর ভক্তগণ তুমুল কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তৎশ্রবণে ঠাকুর গভীর ভাবে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। শিব, কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ ইত্যাদি দেবদেবী-বিষয়ক কীর্ত্তনে তাঁহার ভাবের, এমন কি, রূপেরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তাই, আজ ভক্তগণ যাঁর যেই ইষ্ট তাঁহাকে সেই রূপেই দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন! এই সময় পণ্ডিত-শিরোমণি শম্ভুনাথ বেদান্ত-সিদ্ধান্ত মহাশয়* তাঁহাকে যেরূপভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে সেইরূপভাবেই তাঁহার স্তব-স্তুতি লিপিবদ্ধ করিয়া পাণ্ডিত্য সার্থক করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুপুষ্পাঞ্জলি নামক গ্রন্থে প্রকাশিত তদ্রচিত

*ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শিয়ারশোলের রাজার দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভোলানাথবাবু ও জ্যেষ্ঠপুত্র রাধানাথবাবুও শ্রীনিত্য-চরণাশ্রিত হইয়াছিলেন। রাধানাথবাবু সন্ন্যাস পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর ভাগিনেয় বক্তারপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধারমণ মণ্ডলমহাশয় শ্রীশ্রীদেবের কৃপালাভান্তর শিবপুর-ইন্‌জিনিয়ারিং-কলেজে ওভার্সিয়ারি পড়িতেছিলেন। এই সময় তাঁহার নিত্য-সেবার একান্ত আকাঙ্ক্ষা জন্মে। তাই, তিনি সুদীর্ঘকাল বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন পূর্ব্বক পরম-ভক্তি-সহকারে কলিকাতা-মহানির্ব্বাণমঠে তৎকার্য্যে রত ছিলেন। সেই সময় মনোহরপুকুর রোডের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ অনেক পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত ছিল। তন্মধ্যে একটী উদ্যানে ভক্তবর প্রত্যূষে স্নান সমাপন পূর্ব্বক পুষ্প-

স্তোত্রাবলী অদ্যাপি ভক্তগণের চিত্ত-বিনোদন করিয়া থাকে। সেই সকল স্তব-স্তুতি তিনি পরবর্ত্তীকালে শ্রীশ্রীদেবের সম্মুখে পাঠ করিতে করিতে ভাব-বিহ্বল হইয়া পড়িতেন ; ভাবাবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিত ; নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারে অশ্রুপাত হইত ; ভাবাধিক্য বশতঃ পাঠ স্বভাবতঃই বন্ধ হইয়া আসিত। যাঁহারা এইরূপ ভক্ত-ভগবানের মধুর মিলন দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য ! তাঁহাদের চরণে আমার কোটী

চয়ন করিতেন। একদিন উক্ত-কার্য্যে-রত তাঁহাকে উক্ত উদ্যানের মালী তস্কর-ভ্রমে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে। ইহাতে ভক্তবরের নাসিকা-দেশ ভীষণভাবে আহত হওয়ায় তন্নাসারন্ধ্র হইতে প্রভূত রক্তপাত হয়। মালী প্রহার-কার্য্য অবাধে সমাপন করিলে রক্তাক্তবস্ত্র, দীনভাবাপন্ন মণ্ডলমহোদয় তাহাকে মিনতি করিয়া বলিল, "বাপু! আমাকে মারা তো হ'ল। এখন আমাকে ঠাকুর-পূজোর ফুল দাও।" আহা! কি অপূর্ব্ব ঠাকুর-সেবা-নিষ্ঠা! কি তিতিক্ষা! কি বিনয়! কি দীনতা! এই আদর্শ প্রত্যেক ভক্তেরই অনুসরণীয়। ইহাতে মালীর নিষ্ঠুর হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। সে তখন ভক্তবরকে পুষ্প-চয়ন করিতে দিল। তৎপর মণ্ডলমহাশয়ের মনে হইল, "আমার এই রক্তমাখান কাপড় দেখ্‌লে মঠের ভক্তবৃন্দ মর্ম্মাহত হ'বেন ; এবং কোন সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থভক্ত মালীকে তৎকার্য্যের জন্য বিশেষভাবে শাস্তিও দিতে পারেন।" এই সমস্ত বিষয় ভাবিয়া তিনি তাঁহার রক্তাক্ত বস্ত্রখণ্ড লুকাইয়া রাখিলেন এবং ওবিষয়ও কাহাকেও জানিতে দিলেন না। কিন্তু দৈবযোগে একদিন তাহা মঠের অপর একজন ভক্তের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় তিনি রাধারমণবাবুকে ইহার কারণ বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সত্যনিষ্ঠ মণ্ডলমহোদয় আর সত্য গোপন করিতে পারিলেন না। ইহা শ্রবণে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। বর্ত্তমানে ইনি স্বগৃহে বাস করিতেছেন। বলাবাহুল্য, ইহাঁর ভাবটী সুন্দর! ইনি ইহাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা হরিদাসী দেবীকে মদীয় গুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রিতা করিয়া দিয়াছেন।

কোটী প্রণাম।

ভক্তপ্রবর শম্ভুনাথ পণ্ডিতমহাশয়ের অনুভূতি-প্রসূত স্তোত্রগুলি যেমন শ্রুতি-মধুর, তেমনই মনোহর, তেমনই ভাবপূর্ণ। উহা পাঠ করিলে মনে হয়, ঠাকুর যেন প্রত্যক্ষ হইয়া উহা শুনিতেছেন। সেইজন্য শম্ভুবাবুর বিরচিত "শ্রীশ্রীগুরুপুষ্পাঞ্জলি" হইতে উদ্ধৃত একটি স্তোত্র ভক্তগণের পাঠের সুবিধার জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীগুরুজ্ঞানানন্দস্তোত্রম্।

নিত্যানন্দং পরমসুখদং সর্ব্বলোকৈকনাথং
সর্ব্বানন্দং নিয়তসুখদং পূর্ণমানন্দরূপম্।
দিব্যানন্দং জনহিতরতং জ্ঞানদাতারমীশং
জ্ঞানানন্দং পরমরতিদং শ্রীগুরুং নৌমি নিত্যম্ ॥১॥

নিত্যং শুদ্ধং বিমলমমলং জ্যোতিষাং জ্যোতিরূপং
সত্যং শান্তং পরমমৃতদং বিশ্বরূপং পরেশম্।
মায়াধীশং ভুবনবিদিতং সর্ব্বতত্ত্বৈকসারং
জ্ঞানানন্দং পরমরতিদং শ্রীগুরুং নৌমি নিত্যম্ ॥২॥

স্বাত্মারামং পরমপুরুষং যোগিভির্ধ্যানগম্যং
বিশ্বাধারং ত্রিগুণনিলয়ং সর্ব্বদাসাক্ষিরূপম্।
সর্ব্বাত্মানং প্রকৃতিনিলয়ং সর্ব্বধর্ম্মৈকসারং
জ্ঞানানন্দং পরমরতিদং শ্রীগুরুং নৌমি নিত্যম্ ॥৩॥

পূর্ণানন্দং পরমগতিদং সর্ব্বদেবৈঃ সুপূজ্যং
সর্ব্বারাধ্যং সকলফলদং সর্ব্বদৌর্ভাগ্যনাশম্।
নিত্যোপাস্যং প্রণবমনবং নির্ব্বিকারং নিরীহং
জ্ঞানানন্দং পরমরতিদং শ্রীগুরুং নৌমি নিত্যম্ ॥৪॥

সর্ব্বব্যক্তং ত্রিগুণরহিতং ভক্তিকান্তং সুরেশং
জ্ঞানাত্মানং কমলনয়নং চন্দ্রকোটিপ্রকাশম্।

পদ্মাসীনং বিষদবসনং শ্বেতগন্ধানুলেপং
জ্ঞানানন্দং পরমরতিদং শ্রীগুরুং নৌমি নিত্যম্ ॥৫॥
জ্ঞেয়াজ্ঞেয়ং বিমলহৃদয়ং জ্ঞানবিজ্ঞানরত্নং
শুদ্ধিষ্টাদ্যং পরমমতিদং দীননাথং ভবেশম্ ।
ভক্তাভীষ্টং বিষমমসমং শাস্তদৃষ্টং প্রসন্নং
জ্ঞানানন্দং পরমরতিদং শ্রীগুরুং নৌমি নিত্যম্ ॥৬॥
প্রেমাধারং পরমসুহৃদং সর্ব্বদুঃখাপহারং
দুর্গত্রাণং কলুষহরণং ব্রহ্মদেহাদধানম্ ।
ভাবাভাবং পরমবিভবং সর্ব্বভাবপ্রভাবং
জ্ঞানানন্দং পরমরতিদং শ্রীগুরুং নৌমি নিত্যম্ ॥৭॥
শাস্ত্র্যাগারং শিবদশিবদং সর্ব্বশাস্ত্রৈকমার্গং
ভক্ত্যাধারং তরণচতুরং সর্ব্বধর্ম্মপ্রকাশম্ ।
ভক্তপ্রাণং পরমজনকং গুহ্যগুহ্যং বরেণ্যং
জ্ঞানানন্দং পরমরতিদং শ্রীগুরুং নৌমি নিত্যম্ ॥৮॥
বিশ্বব্যাপ্তং পতিতগতিদং পাবনেশপ্রদীপ্তং
দিব্যাচারং ভুবনবিচরং নিত্যরূপাবতারম্ ।
ভক্তত্রাণং তরণিচরণং মোহপাশপ্রণাশং
জ্ঞানানন্দং পরমরতিদং শ্রীগুরুং নৌমি নিত্যম্ ॥৯॥
শুদ্ধানন্দং পরমধনদং বিশ্বনাথং নিদানং
পূর্ণং জ্ঞানং প্রকৃতিবিলয়ং ভক্তপালং মহেশম্ ।
নিত্যধ্যেয়ং নিয়তসদয়ং গুপ্তধর্ম্মপ্রমেয়ং
জ্ঞানানন্দং পরমরতিদং শ্রীগুরুং নৌমি নিত্যম্ ॥১০॥
অস্তোতব্যং স্তবনবিষয়ং নির্ব্বিশেষং নিরীশং
ভাবাভাবং বিষয়রহিতং সর্ব্বতত্ত্বং ত্রিমূর্ত্তম্ ।
দৃশ্যাদৃশ্যং নয়নসুখদং সর্ব্বরূপং স্বরূপং
জ্ঞানানন্দং পরমরতিদং শ্রীগুরুং নৌমি নিত্যম্ ॥১১॥

ভক্ত্যা নিত্যং পরমমমৃতং স্তোত্রমেতৎ পঠেৎ যঃ
সর্ব্বাভীষ্টং পরমকৃপয়া শ্রীগুরোঃ প্রাপ্নুয়াৎ সঃ।
মোহং তীর্ত্বা গুরুপদযুগং তৎপ্রসাদাল্লভেদ্বৈ
গচ্ছেন্নিত্যং বিষমনরকং চাস্য পাঠাদভক্ত্যা॥
ওঁ তৎসৎ ওঁ! ওঁ তৎসৎ ওঁ!! ওঁ তৎসৎ ওঁ!!!
ইতি শ্রীগুরুজ্ঞানানন্দস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

এই সময় শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব তাঁহার আপন গণকে ক্রমশঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপরূপ রূপ-লাবণ্য এবং অলৌকিক প্রভাবের কথা চতুর্দ্দিকে যতই বিস্তার লাভ করিতে লাগিল, ততই দেশ-দেশান্তর হইতে ভক্তগণ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মিলিত হইতে লাগিলেন।* ঠাকুর বলিতেন, "আমি যা'কে নেব সে সুদূর পর্ব্বত-গুহার মধ্যে থাকলেও আমার নিকটে আসবে।" যাহাহউক, কেহ কেহ চিরতরে তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করতঃ আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। এই সকল নিত্য-ভক্তের তুলনা জগতে নাই। শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালদেবের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহাদের এরূপ নিষ্ঠা যে, তাঁহারা শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না। তাই, স্বগৃহের এবং স্বজনের মমতা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া তাঁহারা শ্রীশ্রীনিত্যদেবকেই জীবন-সর্ব্বস্ব-রূপে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

একদিন ঠাকুর জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি

*স্থানাভাব বশতঃ সেই সমস্ত ভক্তের ও তাঁহাদের জন্মভূমির নাম উল্লেখ করা অসম্ভব। তবে, যে যে স্থান হইতে অধিক-সংখ্যক ভক্ত আগমন করিয়া নিত্য-লীলার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, সেই কয়েকটী স্থানের নাম এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল: পাবনা, তারেজা (পাবনা), রংপুর, হুগলী, জীরাট ও বারহাটা (হুগলী), সন্নিবা ও বরগুনা (চব্বিশ পরগণা), রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান), বরিশাল, টাঙ্গাইল (মৈমনসিংহ), গরবেতা (মেদিনীপুর), নদীয়া, কলিকাতা ইত্যাদি।

হিন্দুর কোন্ শাস্ত্রে কোন্ বর্ণ সম্বন্ধে কি কি দোষগুণ বর্ণিত আছে, তৎ-সম্বন্ধীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অনর্গল বলিতে লাগিলেন। মনে হইল, যেন সমস্ত শাস্ত্র-ভাণ্ডার তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে! তিনি আবশ্যক অনুযায়ী এক একখানি গ্রন্থ হইতে শ্লোকগুলি বলিয়া যাইতেছেন। এক একটী শ্লোক—সঙ্গে সঙ্গে শ্লোকের নাম, অধ্যায়টী পর্য্যন্ত বাদ পড়িতেছে না। ভক্তগণ এই অদ্ভুত শাস্ত্রজ্ঞান, অভাবনীয় স্মৃতিশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্যের একত্রে বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল। ঠাকুর ভক্তগণের বিশ্রামের সময় অবগত হইয়া বলিলেন, "এখন বিশ্রাম করা ভাল।" ভক্তগণ একে একে প্রণামান্তর বিশ্রামার্থ গমন করিলেন।

মাধুর্য্যভাবের মধ্যে ঐশ্বর্য্যভাবের বিকাশ যেন নিত্য-লীলার অঙ্গ-বিশেষ ছিল। ইহা অনুভব করিয়াছিলেন অনেক ভাগ্যবান্। তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কালীঘাট-নিবাসী কবিরাজ চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতা সত্যরঞ্জনবাবু। নিত্য-কৃপায় তিনি একদা প্রেমের আকর্ষণে ঠাকুর-দর্শন-মানসে নিত্যমঠে উপনীত হইলেন। সে সময় শ্রীশ্রীদেব ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া কথামৃত বিতরণ করিতেছিলেন। তিনি নিঃশব্দে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া নিশ্চল স্থিরনেত্রে দেখিতে লাগিলেন যে, পালঙ্কোপরি বাল-গোপাল-মূর্ত্তি বালক স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া মুখে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক পদপঙ্কজ দোলাইতেছেন। দেখিবামাত্র তিনি বিস্মিত ও বিমূঢ় হইয়া গেলেন—প্রণাম করিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। পর মুহূর্ত্তেই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! তিনি বিস্মিত-নেত্রে দেখিলেন, আর বাল-গোপাল-মূর্ত্তি নাই। তৎস্থলে লাবণ্য-ঢলঢল সুন্দর মূরতি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল পালঙ্কোপরি পদ্মাসনে সমাসীন। সত্যরঞ্জনবাবু অন্তরে অন্তরে বেশ বুঝিলেন যে, সেই যশোদানন্দন ব্রজগোপাল এবারে শ্রীনিত্য-গোপালরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীদেব নিত্যমঠে অনেক সময় গম্ভীরা লীলার ন্যায় ঘরের দোয়ার

জানালা রুদ্ধ করিয়া সর্ব্বদাই মহাভাবে মগ্ন থাকিতেন।* কোনদিন দিনান্তে একবার, কোনদিন বা তুইবার দর্শন লাভ হইত। কখনও কখনও তিন চারিদিন পর্য্যন্ত ঘরের দরজাই খোলা হইত না! কখন কখন তাঁহার

*শ্রীনিত্যমঠে অবস্থান-কালে ঠাকুর মাত্র তিন দিন সহরের মধ্যে বাহির হইয়াছিলেন: একদিন মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ার্ম্যান্ নির্ব্বাচনের সময়, অন্যদিন জনৈক ভক্তের বাটীতে শুভান্নপ্রাশন উপলক্ষে, আর এক-দিন মাস্তুতো ভাই খগেনবাবুর সহিত সাক্ষাৎকার উদ্দেশ্যে। বাস্তবিকই, কলিকাতা-নবদ্বীপ-লীলা-কালে যিনি অত সুলভ ছিলেন, তিনি তখন প্রায় তুর্ল্লভ হইয়া উঠিলেন; যিনি এক সময়ে ভক্তগণের সহিত অবাধে মেলা-মেশা, আহার-বিহার এবং সখ্যভাবে ব্যবহার করিতেন, তাঁহার শ্রীচরণ-স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম পর্য্যন্ত করা এখন সমস্যার ব্যাপার হইয়া উঠিল; কেন না, বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহ ব্যতিরেকে তক্তাপোসের সম্মুখে ভূমিতে প্রণাম করিতে হইত। অবশ্য পর্ব্বাহোপলক্ষে ভক্তগণ শ্রীশ্রীচরণকমলে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান ও তাহা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে পারিতেন।

যাহাহউক, উক্ত নির্ব্বাচন-ব্যাপারে ঠাকুরের বিশেষ-পরিচিত হুগলীর জমিদার ও হুগলী-বারের প্রসিদ্ধ উকিল, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্রমহাশয় অত্যন্ত বিব্রত হইলেন; কেননা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত অনেক তান্ত্রিকের শরণাপন্ন হইয়া ক্রিয়া আরম্ভ করাইলেন। বিপিনবাবু ইহাতে অতীব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী নিত্যগোপালের কৃপাপ্রার্থী হইলেন। বন্ধুর উদ্বেগ দেখিয়া শ্রীশ্রীদেবের হৃদয় টলিল। তিনি পরিধেয় গৈরিক বসন শুভ্রবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া তুইজন ভক্ত সমভিব্যাহারে ছদ্মবেশে নির্ব্বাচন-স্থলে গমন করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তদীয় তেজঃপুঞ্জ শুদ্ধসত্ত্বময়, দিব্যকান্তিপূর্ণ রূপ দর্শনে সমাগত ভদ্রমণ্ডলী স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাঁহার গমনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। তিনি তৎকৃপাপ্রার্থী বিপিন-বাবুকে ভোট দিয়াই তৎস্থান ত্যাগ করিলেন। ভগবৎকৃপায়

আদেশক্রমে কীর্ত্তন আরম্ভ হইত। সেই কীর্ত্তনের রোল সমস্ত রাত্রি চলিত। ভক্তগণেরও বিরাম থাকিত না। তাঁহারা নিত্য-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া একটুমাত্র ক্লান্তি বোধ না করিয়া গানের পর গান করিতেন। এদিকে শ্রীশ্রীদেবের ভাব-সমুদ্রে কত তরঙ্গ খেলিত। পুলকে সমস্ত অঙ্গ কণ্টকিত, নয়নযুগল হইতে অবিরত অশ্রুপাত, দেহ কম্পিত হইত এবং সে কম্পনে যে তক্তপোসে তিনি উপবিষ্ট থাকিতেন, তাহা পর্য্যন্ত "মড়্, মড়্" করিয়া উঠিত। ভাব-মহাভাবের অদ্ভুত বিকাশে দেহ অপূর্ব্ব শোভা ও পীত, নীল, শ্বেত প্রভৃতি নানা বর্ণ ধারণ করিত। আহা! যখন গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে সঙ্গীত হইত, তখন শ্রীঅঙ্গের আভা কষিত-কাঞ্চনবৎ হইত। অনন্তর শ্রীরাম-বিষয়ক কীর্ত্তন শ্রবণের পরই সেই কনককান্তি নবদূর্ব্বাদল-শ্যামাভা ধারণ করিত—যেন সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র ভক্তগণের কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া নিত্যদেহে আবির্ভূত হইতেন। আবার শিব-বিষয়ক কীর্ত্তন শ্রীশ্রীনিত্যদেবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র আর্য্যশাস্ত্রে শ্রীশিবের অঙ্গের যেরূপ বর্ণ ও জ্যোতিঃর বিষয় বর্ণিত আছে ঠিক সেইরূপ বর্ণ ও জ্যোতিঃ নিত্যদেহে প্রকাশ পাইত। বলাবাহুল্য, ভক্তগণ সমন্বয়াবতার ঠাকুরের সম্মুখে সর্ব্ব দেবদেবীর সম্বন্ধেই কীর্ত্তন করিতেন। তাই, যখন তাঁহারা কালী-বা-কৃষ্ণ-বিষয়ক কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হইতেন, তখন কনককান্তি নিত্যগোপালের দেহও নবনীরদ-নিন্দিত কান্তি ধারণ করিত।

অসম্ভব সম্ভব হইল। বিপিনবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয় হইল এবং তিনি নিত্য-কৃপায় অনায়াসে চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচিত হইলেন। শ্রীশ্রীদেবের ও তদাশ্রিতের প্রতি ব্যবহারে বিপিনবাবুর ঠাকুরের প্রতি অকপট প্রেমের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি নিজ প্রিয় পুষ্পোদ্যান উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন নিত্য-ভক্তের অবাধ পুষ্পচয়নের নিমিত্ত। যখন যেখান হইতে অতি উত্তম সামগ্রী আসিত, তখন তিনি তাহা শ্রীশ্রীদেবকে উপহার দিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন।

কীর্ত্তন-লাম্পট্যই* যে ঠাকুরের এই গুরু-গম্ভীর-লীলার পুষ্টি সাধন করিত তাহা নহে, স্বাধ্যায়ও তাহার অঙ্গীভূত ছিল। কখনও গীতা, কখনও চণ্ডী, কখনও ভাগবত, কখনও মহাভাগবত, কখনও পুরাণ, কখনও তন্ত্র, কখনও চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি এবং কখনও বাইবেল, অভ্ দি ইমিটেশন্ অভ্ ক্রাইষ্ট্ ও কোরাণ পাঠ হইত। পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে কখন যে রাত্রি প্রভাত হইত তাহা অনেক দিন ঠিক থাকিত না।

এই স্থানে ভক্তগণের আর একটী অনুভূতির বিষয় বিবৃত হইতেছে ; অনেক ভক্ত অনেক সময় মনে করিতেন যে, শ্রীশ্রীদেবের দর্শন লাভের পর

*শ্রীশ্রীদেবের কীর্ত্তন-লাম্পট্যের একাঙ্গের একটী সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শ্রীমৎ হরিপদানন্দমহারাজের লিপি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

"খট্টার উপরে শ্রীনিত্যগোপাল আসীন। চারিদিকে ভক্তগণ কীর্ত্তনানন্দ করিতেছেন, কভু বা ভক্তসঙ্গে নৃত্যরঙ্গে মাতিতেছেন। দুনয়নে ধারা বহিতেছে, অঙ্গে পুলক-কদম্বরাজি। দিব্য-গৌরাঙ্গসুন্দর অঙ্গে লাবণ্যের জ্যোতি; কখন বা খট্টার উপরে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সঙ্গীত শুনিতেছেন; ভাবে ঢলঢল—সমাধিস্থ হইতেছেন, দুনয়নে অবিরল ধারায় গঙ্গাযমুনার ধারা প্রবাহিত। শ্রীমূর্ত্তিতে কৃষ্ণপ্রেমের জোয়ার বহিয়া যাইতেছে। গান হইতে হইতে নিশি প্রভাত হইল। শ্রীশ্রীনিত্যদেব সমাধিস্থ। আবার বাহ্যদশা হইতেছে। আবার সঙ্গীত। শেষ কুঞ্জভঙ্গ-গান গীত হইল। তৎপর 'সোঙর নব গৌরচন্দ্র' ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। এইরূপ এক রাত্রি নয়। রাত্রির পর রাত্রি চলিয়া যাইতেছে। আবার সকাল বেলা নয়টা দশটার সময় ঠাকুর-ঘর খোলা হইল। আবার গীত আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীদেব সমাধিস্থ হইলেন। সেই মহাভাব, সেই অপূর্ব্ব প্রেমানন্দ মেলা। হায়! সেই সব দিনের ছবিখানি মনে হইলে সেই রাধাভিমানিনী-শ্রীনিত্যগোপালের মুখখানি মনে পড়িলে, সত্য সত্যই মনে হয় স্বীয় কান্তার কান্তি অঙ্গীকার করিয়া আবার এক অজান মানুষ নরচক্ষের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন।"

তাঁহার দ্বারা অনেক প্রশ্নের সমীমাংসা করাইয়া লইবেন। এতদুদ্দেশ্যে কেহ কেহ অনেক প্রশ্ন লিখিয়া পর্য্যন্ত আনিতেন ; কিন্তু নিত্য-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র এক অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তাঁহাদের চিরপুষ্ট সঙ্কল্প বিস্মৃতির কবলে নিপতিত হইত। আবার, ঠাকুর একজন ভক্তের সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে অন্য ভক্তের অন্তরের প্রশ্নের উত্তর অতি মধুর-ভাবে প্রদান করিতেন। অন্তর্য্যামী, সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুরের এরূপ আচরণেও অনেকে বিস্ময়ান্বিত হইতেন।

তদীয় প্রকোষ্ঠে ছিল দুইখানি তক্তাপোস। তাহার একখানিতে একটী সামান্য মাদুর বিছান থাকিত আর একটী কদাকার বালিস। ইহারা ছিল ছারপোকার দুর্গস্থানীয় ; কেননা তাহারা তথায় অকুতোভয়ে বসবাস করিত। কেবল তথায় কেন শ্রীশ্রীদেবের কর্ণ, শ্মশ্রু ও উরু-দেশও ছিল তাহাদের বাসভূমি। এই সমস্ত স্থানে যথেচ্ছা আহার-বিহার করিয়া তাহারা হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়াছিল। শ্রীঅঙ্গ যে তাহাদেরই মাত্র আহারের সামগ্রী সরবরাহ করিত তাহা নহে ; মশক পর্য্যন্ত অনায়াসে তথায় রক্তপানপূর্ব্বক পুষ্টি লাভ করিত। এই সমস্ত হইতে মনে হয় যে, দেহ থেকে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতেন। বাস্তবিকই, যেমন ছিল তাঁহার বিছানা, তেমনই ছিল তাঁহার পরিধেয় বসন। অতি সাধারণ বস্ত্রের একাংশ তিনি পরিধান করিতেন এবং অপর অংশের দ্বারা বক্ষঃস্থল আবৃত করিযা গলদেশে বন্ধন করিয়া রাখিতেন। এই অবস্থায় অপর তক্তাপোসে উপবেশনপূর্ব্বক কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিতেন ও ভক্তবৃন্দকে উপদেশামৃতদানে তৃপ্ত করিতেন। দারুণ শীতেও অনেক সময় (বিশেষ করিয়া যখন কীর্ত্তনাদি শ্রবণে সমাধিমগ্ন থাকিতেন) তিনি ঘর্ম্মাক্ত (ও প্রায় অনাবৃত) কলেবরে উপবিষ্ট থাকিতেন। শ্রীঅঙ্গের গলিত ঘর্ম্ম বিশেষ ব্যজনেও নিবারিত হইত না। আহা! তপঃফল-বিধাতা ও সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও কি তপশ্চরণই তিনি করিতেন! আহারেও তাঁহার অত্যদ্ভুত সংযম দৃষ্ট হইত। প্রকৃতপক্ষে,

কঠোর বৈরাগ্যের উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপনের জন্যই যেন ঠাকুর আহার-বিহারে অকৃত্রিম কৃচ্ছ্র অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভক্তদের মধ্যে বিশেষ বৈরাগ্যভাব দেখিলে তিনি যে কত আনন্দ লাভ করিতেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অনেক সময় তিনি উচ্ছ্বাসের সহিত বলিতেন, "জগৎশুদ্ধ লোক যদি বৈরাগী হয়, তাহা হইলে আমার পরম আনন্দ—আমার পরম আনন্দ!" আবার জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেন, "তা'ও কি হয় গো?" এক সময়ে জনৈক ত্যাগী ভক্ত তাঁহার একজন পরমার্থ ভ্রাতার নিকট হইতে একখানি মূল্যবান্ পট্টু (পশমের গরম) বস্ত্র উপহারস্বরূপ পাইলেন—তাহা গায়ে দিয়া তিনি যেমন ঠাকুরের সম্মুখে গিয়াছেন, অমনই ঠাকুর তাঁহার প্রতি ঘনঘন কটাক্ষ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান্ ভক্ত বুঝিলেন, ঠাকুর তাঁহার ঐ বেশ পছন্দ করিতেছেন না। তাই, ভক্তবর পর দিবস উহা অপরকে প্রদান করিলেন এবং একখানি ছিন্ন কন্থা দ্বারা নিজ দেহ আবৃত করিয়া ঠাকুরঘরে গেলেন। অমনই ঠাকুর সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "বা! বেশ্ হ'য়েছে—আজ তোমাকে বেশ্ মানিয়েছে!"

প্রয়োজনবোধে এই স্থানে জনৈক নিত্য-ভক্তের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। ইনি আমাদের নিকট 'শ্রীমৎ প্রণবানন্দমহারাজ' নামে সুপরিচিত ছিলেন। ইঁহার নাম পূর্ব্বেও দৃষ্ট হইয়াছে। ইনি শ্রীশ্রীদেবের নবদ্বীপ-লীলা-কালে তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছিলেন। বৈরাগ্য-পথের পথিক হইবার পূর্ব্বে ইঁহার নাম ছিল শ্রীযুক্তরামলাল চৌধুরী। ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কলসা-গ্রামে ইঁহার বসবাস ছিল। ইনিও চির-কুমার ও সরলহৃদয়ের লোক ছিলেন। ঠাকুরের শ্রীচরণ-দর্শন-লাভের পূর্ব্বেই ইঁহার উপর নিত্য-কৃপা-বারি একদিন বর্ষিত হইয়াছিল যখন ইনি একটী মাঠের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন। সেই সময় একটী মনোহর 'দিব্যগন্ধ' তাঁহার নাসা-রন্ধ্রে হঠাৎ প্রবেশ করিয়াছিল। শ্রীশ্রীদেবের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবার পর তিনি শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন যে,

উহা তাঁহার প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীনিত্যদেবের নিত্যদেহের দিব্য সৌরভ। ইঁহার যেমন ছিল স্বাস্থ্য, তেমনই ছিল ব্রহ্মচর্য্য, তেমনই ছিল নিত্য-সেবা-নিষ্ঠা ও নিত্য-সঙ্গ-সুখ-লালসা। নিত্য-প্রেমের আকর্ষণে তিনি প্রায়শঃ নিত্য-সন্নিধানে বাস করিতেন, এবং হুগলী-মঠে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, ইঁহার এই আশ্রমের নাম ছিল শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ অবধূত। ইনিও নিত্য-লীলা ও নিত্য-মহিমা বিশেষভাবে দর্শন ও অনুভব করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার দেহ-ত্যাগ হইলে সেই পবিত্র-দেহ হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ায় সমাহিত হইয়াছিলেন। উক্ত সমাধি-স্থল এখন শ্রীনিত্য-প্রণবানন্দ-মঠ-নামে পরিচিত।

ঠাকুর সরল ভাব খুব পছন্দ করিতেন। যাঁহার চিত্তে কপটতার লেশমাত্র দেখেন নাই, তাঁহার নিকট আত্মগোপন পর্য্যন্ত করেন নাই। তাই, রাণীগঞ্জ-নিবাসী শ্রীযুক্ত গৌর নন্দী ঠাকুরের কৃপালাভ করিবার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমি কেমন ক'রে ভগবানের ধ্যান ক'র্‌ব ?" তদুত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "এই ত আমি ব'সে আছি— এইরূপেই ধ্যান ক'র্‌বে।" বলাবাহুল্য, ভক্তবর খুব সরল স্বভাবের লোক ছিলেন। আবার, শ্রীমৎ স্বামী কেশবানন্দমহারাজ যখন যাহা করিতেন, তখনই তাহা ঠাকুরের নিকট সরলভাবে প্রকাশ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। এইজন্য ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "চূড়ো কেবল সরলতার জন্য বেঁচে গেল।" বাস্তবিকই, ঠাকুর ছিলেন দয়ার মূর্ত্তি, স্নেহের খনি। ভক্তগণ বলিতেন, শত-সহস্র অন্যায়, শত-সহস্র অপরাধ করিলেও তাঁহার নিকট অবশ্য ক্ষমা পাইবেনই। তথাপি কোনও ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কি আমাদের অপরাধ নেন্ ?" অমনই উত্তর হইল, "হাঁ, নেই। তবে স্নেহের বন্যায় সব ভেসে যায়।" আহা! ইহা হইতে আর মধুর অভয়বাণী কি হইতে পারে ?

একবার বড়দিনের সময় ভক্ত সমাগম হইল। শ্রীশ্রীদেব হঠাৎ

খৃষ্টান্‌দের ধর্ম্মগ্রন্থ (Bible) বাইবেলের মত তাঁহাদের সমক্ষে প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "Confession is the best atonement of sins (অর্থাৎ অপরাধ স্বীকার সমস্ত পাপের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত)।" ঠাকুর যেন যীশুর ভাবে সকলকে নিজ নিজ পাপ confess (স্বীকার) করিতে বলিলেন। অনেকেই স্বকৃত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ও রীতি-বিরুদ্ধ কার্য্যের কথা অকপট-চিত্তে ঠাকুরের নিকট প্রকাশ করিলেন। কিন্তু জনৈক ভক্ত নিজ দৈন্য জানাইয়া বলিলেন, "বাবা, আমি জীবনে মহা-পাপ ক'রেছি—ইহাঁরা আপনার জন হ'লেও, সে কথা সকলের সমক্ষে আমার বল্‌বার সাহস নাই—শুধু আপনার কাছে গোপনে বল্‌তে পারি—আমাকে ক্ষমা করুন।" এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। ভক্তের আর্ত্তি—ভক্তের দৈন্য দেখিয়া দয়াময় কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তাঁহার কোমল-প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি গুরুগম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "তুমি দুঃখ কোরো না—চিন্তা কোরো না। তুমি যত মহাপাপই ক'রে থাক, সমস্তই আমি নিলাম—তোমাতে আর পাপের লেশ রইল না। কিন্তু, ভবিষ্যতে যেন আর পাপ না করা হয়।" তাই, তিনি স্বরচিত 'সর্ব্বধর্ম্ম নির্ণয়সারে' লিখিয়াছেন, "অনেক পাপ করিয়াছ। আর কেন পাপে লিপ্ত হও? এখন কেবল আর না পাপ করিতে হয়, এখন কেবল আর না কুসঙ্গ করিতে হয় এরূপ প্রার্থনা ভগবানের কাছে নিয়ত কর। দয়াময় ভগবান্ তোমায় সুবুদ্ধি দিবেন, দয়াময় ভগবান্ তোমায় নিষ্পাপ করিবেন।"

এই সময় রংপুর সহরের খ্যাতনামা এলোপ্যাথিক্ চিকিৎসক, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিশ্ববন্ধু মজুমদার, এল্-এম্-এস্, নিত্য-ভক্ত শ্রীযুক্ত নৃত্য-গোপাল গোস্বামীমহাশয়ের নিকট হইতে শ্রীশ্রীদেবের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তদ্বিষয় শুনা অবধি তাঁহার শ্রীনিত্য-মঠে যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ জন্মে। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি হুগলীতে গমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীদেবের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেন। যশ, মান, অর্থ ইত্যাদি সংসারে নানা আকর্ষণের বস্তু থাকা সত্ত্বেও, তিনি ঠাকুরের কৃপায়

অতি শীঘ্রই বৈরাগ্য-পথের পথিক হন। তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম হইল শ্রীমৎ স্বামী হরিপদানন্দ অবধূত। এই আশ্রম অবলম্বনের পর একদিন তিনি ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরকে বলিলেন, "আমার ত এখনও ভগবান্ লাভ হ'ল না!" তখনই দয়াল ঠাকুর তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "বাবা বিশ্ববন্ধু! এখনও কি তোমার ভগবান্ লাভ হ'ল না?" এই বলিয়াই তিনি সমাধিস্থ হইলেন। বলাবাহুল্য, শ্রীমৎ হরিপদানন্দ মহারাজ তখন ঠাকুরকে নিজ ইষ্টরূপে দর্শন করিয়া পরমা শান্তিলাভ করিলেন। কথিত আছে যে, তিনি শ্রীশ্রীদেবকে 'মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণরূপে, শ্রীগৌরাঙ্গরূপে, শ্রীরাধারূপে ও শ্রীগোপালরূপে' দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি পরিব্রাজকতার সময় ও শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীদেবের মাহাত্ম্য আরও নানাপ্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন ও অপূর্ব্ব অনুভূতি লাভান্তর চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন সমবেত ভক্তবৃন্দের মধ্যে জনৈক ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, শিবের শক্তি দুর্গা, বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী, কৃষ্ণের শক্তি রাধা; অন্যান্য দেবতার অন্যান্য শক্তি আছেন। আপনার শক্তি কে?" ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন, "আমারও শক্তি আছেন—তিনি আমাকে এত ভালবাসেন যে, তিনি আমাকে ছেড়ে পৃথক্ মূর্ত্তিতে থাক্‌তেই পারেন না—তিনি আমাতে একেবারে মাখামাখি হ'য়ে আছেন।" পরাশক্তি-সম্পন্ন ঠাকুরের ঐ সুমধুর বাণী শুনিয়া ভক্তগণের হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল।

অদ্ভুত-কর্ম্মা নিত্যগোপালের আচরণ লোক-বুদ্ধির অগোচর। তাঁহার স্নান-লীলাও ভক্তগণের মনে পরমানন্দের সঞ্চার করিত। যখন তিনি নিত্য-কুণ্ডে অবগাহনের নিমিত্ত অবতরণ করিতেন, তখন তাঁহারা কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া নিত্য-স্নান-লীলা দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেন। ঠাকুর কখনও বালকের ন্যায় জল ক্ষেপণ করিতেন। কখনও বা অন্তর্ভাবে মত্ত হইয়া এরূপভাবে জল ফেলিতে প্রবৃত্ত হইতেন যে, তাঁহার

বাহ্য-খেয়াল থাকিত না। অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল এই ভাবে কাটিয়া যাইত। ইহা দর্শন করিয়া ভক্তগণ পরস্পর আলোচনা করিতেন যে, শ্রীশ্রীদেবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলা স্মরণ হওয়াতেই তিনি ঐরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বাস্তবিকই, যিনি যোগীর যোগ, সাধকের সাধন এবং ধ্যানীর ধ্যান ফলের বিধাতা এবং ভাব, মহাভাব ও সমাধি যাঁহার ক্রীতদাসের ন্যায়, তিনি যে কেন এরূপ কৃচ্ছ্র সাধন করিতেন, কীর্ত্তন ও পাঠে এত রাত্রি অতিবাহিত করিতেন, তাহা বিচার দ্বারা কে নিরূপণ করিতে পারে? মুক্তিকামী সাধকের পরমার্থ লাভের জন্য যে কিরূপে সাধন-ভজন ও স্বাধ্যায়-কীর্ত্তনাদিতে সদাসর্ব্বদা রত থাকা উচিত এবং কত তিতিক্ষাশীল হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা তিনি নিজে ভক্তবেশ ধারণ করিয়া প্রত্যেক আচরণে প্রকাশ করিতেন।

অহেতুকী-কৃপাসিন্ধু নিত্যগোপালের ভক্ত-বাৎসল্যের প্রকাশ অনেক প্রকারে পাইত। ভক্তের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তিনি একদা যাহা করিয়াছিলেন তাহা কোন যুগে অন্য কোন অবতার করেন নাই। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন রায়মহাশয়ের (শ্রীমৎ স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজের) পিতৃ-বিয়োগ হইবার এক বৎসর পর সপিণ্ড-করণের সময় উপস্থিত হইল। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা তাঁহাকে ঐ উপলক্ষে বাড়ী যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত দক্ষিণাবাবু সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করায় কোনও মতেই বাড়ী যাইতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা পত্র দ্বারা ঠাকুরের নিকট সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলেন। তাই ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "দক্ষিণারঞ্জন, কুমুদ-বাবু তোমাকে তোমার বাবার সপিণ্ডকরণ উপলক্ষে না কি বারে বারে বাড়ী যেতে লিখ্ছেন। কাল ত সপিণ্ডকরণ—বাড়ী ত গেলে না—এখন কি ক'রবে?" অতি দীনভাবে ভক্তবর বলিলেন, "আমি ঐ পাদপদ্মেই পিণ্ডার্পণ কর্‌বার সঙ্কল্প ক'রেছি—তাই, বাড়ী যাই নাই।"

ঠাকুর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সে কি ! তা'ও কি হয়, গো ? গয়াধামে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম পিণ্ডদানের অত্যুত্তম স্থান—অথবা গঙ্গাতীরে উক্ত কার্য্য সমাপন ক'র্‌তে পার।" কিন্তু ভক্তবর ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে জীবন-সর্ব্বস্ব করিয়াছেন—তিনি নিত্যগতপ্রাণ—তিনি ঠাকুরকে সর্ব্ব-দেবদেবীময় এবং ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম সর্ব্বতীর্থময় বলিয়া জানিয়াছেন। তিনি কি আর তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র পিণ্ডদান করিতে পারেন ? তাই, শ্রীযুক্ত দক্ষিণাবাবু ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে বলিলেন, "আমি মাত্র ঐ পাদপদ্ম জানি—আমি শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মও জানি না, গঙ্গাতীরও জানি না। ঐ পাদপদ্মে পিণ্ডদান ক'র্‌লেই আমার পিতৃ-পুরুষ উদ্ধার হ'য়ে যা'বেন। আমি আর কোথায়ও যা'ব না !" তথাপি ঠাকুর নানা কথায় নিজেকে সামান্য মানুষ বলিয়া প্রতিপন্ন এবং ভক্তবরকে উক্ত সঙ্কল্প হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিলেন। ইহাতেও শ্রীযুক্ত দক্ষিণাবাবু অবিচলিত রহিলেন এবং কাতরভাবে বলিলেন, "আমার একান্ত ইচ্ছা, ঐ পাদপদ্মে পিণ্ড-দান ক'রব। যদি অনুমতি না দেন ত আর পিণ্ড দেওয়া হ'বে না।" অতঃপর ঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি আমার এই ঘরে ব'সে শ্রাদ্ধ কর—আমি দেখ্‌ব।" কিন্তু ভক্তবরের সঙ্কল্প টলিল না। আবার ঠাকুর বলিলেন, "দেখ, দক্ষিণা, পিণ্ড আমার পায়ে না দিয়ে আমার সাম্‌নে একটী থালা রেখে তা'তেই দিও।" তথাপি শ্রীযুক্ত দক্ষিণাবাবু অচল-অটল রহিলেন। ইহা দেখিয়া পরম কারুণিক ঠাকুর যেরূপ ইঙ্গিত করিলেন তাহাতে ভক্তবর বুঝিলেন, অহেতুকী-কৃপা-সিন্ধু ঠাকুর তাঁহার প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত দক্ষিণাবাবু ঠাকুরের আদেশ অনুসারে সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া শ্রীশ্রীদেবের শয়ন-খট্টার উত্তর দিকে স্থাপন করিলেন। ঠাকুর অন্যান্য ভক্তগণকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। অতঃপর তিনি উত্তর দিকে ঘুরিয়া উপবেশন করিলেন—তৎসম্মুখে স্থাপিত একখানি বৃহৎ পিত্তলের থালায় সর্ব্বতীর্থাশ্রয় চরণযুগল বিরাজ করিতে লাগিল। ঠাকুর বামপদের

উপর দক্ষিণপদ বিন্যস্ত করিলেন। তখন তাঁহার দিব্য-জ্যোতির্ম্ময় রূপের ছটায় ঘরটী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! দক্ষিণাবাবু তাঁহাকে সাক্ষাৎ গদাধরের ন্যায় দর্শন করিতে করিতে যথাবিধি সেই যোগীন্দ্র-বন্দ্য পাদদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশ-মধ্যবর্ত্তী-স্থানে ভক্তি-বিগলিত-চিত্তে পিণ্ডার্পণ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের এই অভূতপূর্ব্ব ও কল্পনাতীত আচরণে ভক্তবর আনন্দে ও বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া গেলেন। অনন্তর তিনি ঐ মুনিজন-মনোহর চরণযুগল গঙ্গাবারি দ্বারা ধৌত করিয়া দিলেন। ঠাকুর পুনরায় তদীয় শয়ন-খট্টার যথাস্থানে উপবেশন করিলেন।

ঐ উপলক্ষে স্বল্প ব্যয়ে একটী মহামহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। আশাতীত-ভাবে সম্মিলিত ভক্তবৃন্দ প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

ঠাকুরের অসীম ভক্ত-বাৎসল্যের ঐ অপূর্ব্ব নিদর্শনের বিষয় যিনিই শ্রবণ করিলেন, তিনিই বিস্ময়াভিভূত হইলেন। যাহাহউক, একদিন শ্রীযুক্ত দক্ষিণাবাবু* স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, তাঁহার পিতা নিত্য-মঠে শ্রীশ্রীদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন—তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত এবং পরিধানে গৈরিক বসন। অন্য একদিন ভক্তবর দেখিতে পাইলেন যে, সেই গৈরিক-বসনধারী সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীদেবের স্বারূপ্য পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন!

শ্রীশ্রীদেবের প্রকট অবস্থায় মেদিনীপুর-জেলা-নিবাসী ভক্ত মৃগেন্দ্র-বাবুও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ড প্রদান করেন। অদ্যাপি কলিকাতা-মহা-নির্ব্বাণ-মঠে তাঁহার পবিত্র সমাধি-স্থল শ্রীশ্রীগুরুপীঠে নিত্য-ভক্তগণ পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশ্যে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়া আসিতেছেন।

সর্ব্বব্যাপী পরমব্রহ্ম শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব সদাসর্ব্বদা সর্ব্বত্র ভক্ত-

---

*শ্রীশ্রীদেবের কৃপায় ইনি সন্ন্যাসাশ্রমী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে নদীয়া-জেলার সিমুরালি পোষ্ট-আফিসের অধীনে কালীগঞ্জ-শ্মশানের সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত নিত্যানন্দ-মঠে ইঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত আছেন।

গণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং এখনও রাখিয়া থাকেন। ইহা অনেক ভক্তই সম্যক্‌রূপে অনুভব করিয়াছেন এবং এখনও করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হন। ভক্তের ক্লেশ, তাপ ও ব্যাধি দয়াল ঠাকুর স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া নিজে অশেষ দুঃখ ও পীড়া ভোগ করিয়াছিলেন—নিজের দেহকে কতপ্রকারে কতদিন জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন! সে সম্বন্ধে অনেকেই অবগত আছেন। একদিন ঠাকুর শয়নখট্টায় উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময় তিনি হঠাৎ যেন ভীষণ জ্বালায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। নিকটস্থ জনৈক ভক্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন—দেখিলেন যে, নিমেষের মধ্যে তাঁহার সেই কণকোজ্জ্বল গৌরবর্ণ কালিমাময় হইয়া গিয়াছে! ঠাকুর মুখে বলিতেছেন, "উঃ! কি বিষের জ্বালা! যাক্, চূড়ো আমার ত বেঁচে গেল!" যাহাহউক, অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রীঅঙ্গ পুনরায় স্বাভাবিক উজ্জ্বল-কান্তি ধারণ করিল। ভক্ত অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন—কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এদিকে শ্রীমৎ কেশবানন্দমহারাজ শরডাঙ্গার মেলায় যাইবার পথে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িলেন। সম্মুখে দেখিলেন, একটী সুপক্ক ফুটী পড়িয়া আছে—তবে তাহার এক স্থান ক্ষত। তিনি ভাবিলেন, ক্ষত বা ভুক্ত অংশটুকু বাদ দিয়া উহার অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিবেন। তাই, উহা ভাঙ্গিয়া কিয়দংশ মুখে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বিষের অসহ্য জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং অচেতন অবস্থায় রহিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কিছুক্ষণ পরেই সংজ্ঞালাভ করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। তখন তাঁহার হুগলীতে যাইয়া শ্রীশ্রীদেবকে দর্শন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল—আর মেলায় যাওয়া হইল না। নিত্য-মঠে পৌছিবামাত্র বালকভাবাপন্ন ভক্ত ভগবদ্দর্শনের নিমিত্ত আকুল হইয়া পড়িলেন। মঠে আসিয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। আর তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না—ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যাহাহউক, শ্রীশ্রীদেব তাঁহাকে আশ্বাস দানে শান্ত করিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, নিত্য-কৃপা অনুপম। মাদৃশ অভাজন ইহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেও সম্পূর্ণ অসমর্থ। এই কৃপা-প্রভাবেই অপূর্ব্ব নিত্য-সেবা-রতি লাভ করিয়াছিলেন কাশীর (পূর্ব্বোক্তা লক্ষ্মীপিসিমা) শ্রীযুক্তা লক্ষ্মী-মণি*, কলিকাতার শ্রীযুক্তা বিন্দুবাসিনী প্রভৃতি বিশেষ-কুল-মর্য্যাদা-সম্পন্না কতিপয় সাধ্বী-রমণী। শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীমণি স্বামীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বহুমূল্য অলঙ্কারাদি, অতুল ঐশ্বর্য্য ও কাশীধামে নির্ম্মিত একটী বাটী। অতএব বৈষয়িক-সুখ-ভোগের সর্ব্বপ্রকার সুবিধাই ইনি বিশেষ-ভাবেই লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীশ্রীদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিবার পর তাঁহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা জন্মিল, তাঁহার দেহ-মন-প্রাণ ও ঐশ্বর্য্যাদি যেন শ্রীশ্রীদেবের সেবাতেই উৎসর্গীকৃত হয়। এই ইচ্ছা পূরণার্থ তিনি সন্ন্যাসীর আশ্রম-জীবনের কঠোরতা সাগ্রহে বরণপূর্ব্বক অনেক সময় নবদ্বীপধামে শ্রীশ্রীনিত্য-চরণ-সমীপে বাস ও নবদ্বীপ-আশ্রম-পরিচালনার্থ প্রভূত অর্থ পরমভক্তিসহকারে ব্যয় করিতেন। এতদ্ব্যতীত, তৎপ্রদত্ত অর্থ দ্বারাই কলিকাতা-মহানির্ব্বাণমঠের জমি প্রায়শঃ ক্রীত হইয়াছিল। বাস্তবিকই নিত্য-মহিমা তিনি বিশেষভাবেই দর্শন ও অনুভব করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

নিত্য-নিষ্ঠা যেমন শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীমণিকে ভোগ-বিলাস-বিমুখী করিয়াছিল, তেমনই ইহা পরম-প্রেম-সূত্রে শ্রীনিত্য-চরণে সম্বদ্ধ করিয়াছিল আর একজন বিশেষ-সঙ্গতি-সম্পন্না ভদ্রমহিলাকে। ইঁহার বাসস্থান ছিল কলিকাতার অন্তঃপাতি বাগবাজারে। ইনি নিত্য-ভক্তগণের নিকট 'বড় পিসিমা' বলিয়া সুপরিচিতা ছিলেন; কেননা (দেহসম্পর্কে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী হওয়ায়) শ্রীশ্রীদেব ইঁহাকে 'বড় দিদি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইঁহার নাম ছিল শ্রীযুক্তা বিন্দুবাসিনী। ইনি সভক্ত ঠাকুরের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তদর্থে ইঁহার প্রচুর অর্থও অকাতরে প্রতি মাসেই ব্যয়িত হইত। শ্রীশ্রীদেব সমাধি হইতে ব্যুত্থান লাভ করিলে

*ইঁহার নাম এই গ্রন্থের ১৫৭ ও ১৯০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে।

'যেদিন যেরূপ আহার্য্য তাঁহার শরীরোপযোগী হইবে' নিত্য-ধ্যান-যুক্তা এই রমণী সেদিন ঠিক সেইরূপ আহার্য্যই তাঁহার জন্ম প্রস্তুত রাখিয়া তাঁহাকে প্রদান করিতেন। এই সমস্ত কারণেই ঠাকুর তাঁহার এই শিষ্যার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "বড় দিদি আমার যেমন সেবা করিয়াছেন এমনটী আর কেহই করে নাই।" শ্রীশ্রীদেবের কৃপায় ইনি সন্ন্যাসাশ্রম পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ইহাঁর দেহত্যাগের পর ঠাকুর হুগলী-নিত্যমঠে একটী উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন।

যাহাহউক, যে সময় শ্রীযুক্তা গোলাপ ঠাকুরাণী নাম্নী জনৈকা নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ-কন্যা শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সেবায় রত হইয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার ভক্তিমতী কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করতঃ চিরতরে তাঁহার শরণাপন্না হইয়াছিলেন। ইহাঁর নাম ছিল 'নিত্যকালী'; কিন্তু ইনি বয়োজ্যেষ্ঠা ব্রাহ্মণ-কন্যা ছিলেন জন্ম ভক্তগণ ইহাঁকে 'মা-ঠাকরুণ' বলিয়া চিরদিনই সম্বোধন করিতেন। ইনিও সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিত্য-সেবার্থ বিশেষ কষ্ট বরণ এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। শ্রীশ্রীদেবে ছিল ইহাঁর অচলা ভক্তি ও অটল বিশ্বাস। তাই, অতীব দুঃখজনক অবস্থায় পতিত হইলেও তিনি আজীবন নানাস্থানে (এবং অবশেষে কলিকাতা-মহানির্ব্বাণমঠেও) শ্রীশ্রীদেবের সেবা পরম-ভক্তিসহকারে করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নবদ্বীপে অবস্থান-কালে একদিন তিনি ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "আমি এই ছোট ঘরের এক পার্শ্বে পীত জ্যোতিঃ দেখিতেছি। এবার আপনার বাম অঙ্গ পীতবর্ণ দেখিতেছি। ঐ অঙ্গ পীতবর্ণ, অথচ অতি উজ্জ্বল।" (দিব্যদর্শন, ৫৭ পৃঃ)। অন্য একদিন তিনি শ্রীশ্রীনিত্যচরণে নিবেদন করিয়াছিলেন, "...কেবল আপনার মুখখানি ঔজ্জ্বল্য সমন্বিত নীলবর্ণ দেখিলাম।" (দিব্যদর্শন, ৯৪ পৃঃ)। বলাবাহুল্য, সুদীর্ঘকাল শ্রীশ্রীনিত্য-চরণ-সেবায় রত থাকায় ঠাকুরের অনেক অপূর্ব্ব-লীলা ইনি প্রত্যক্ষতঃ দর্শন করতঃ চমৎকৃতা হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীদেবের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন আর একজন বিশিষ্ট

ভদ্র-মহিলা। ইনি ছিলেন খরশুনা-নিবাসী নিত্য-ভক্ত (পূর্ব্বোক্ত) শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী, শ্রীযুক্তা গোলাপসুন্দরী ঘোষ। ইঁহার যেমন ছিল সেবানুরাগ, তেমনই ছিল তিতিক্ষা, তেমনই ছিল সহৃদয়তা ও তেমনই ছিল স্বার্থ-ত্যাগ। নিত্য-ভজন-শীলা এই রমণী ছিলেন ঠাকুরের শিষ্যবৃন্দের স্নেহময়ী-ভগ্নী-ও-প্রশিষ্যাদির-স্নেহময়ী-জননী-রূপা। শরীরে ব্যাধি থাকিলেও সেবা-কার্য্যে ইঁহার ক্লান্তি-বোধ ছিল না। প্রত্যুষ হইতে রজনীর অনেকাংশপর্য্যন্ত তিনি নানাকর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিতেন। তিনি হুগলী-ও-কলিকাতা-মঠে ঠাকুর-ভোগের যাবতীয় সামগ্রী প্রায় প্রত্যহ তো রন্ধন করিতেনই; এতদ্ব্যতীত নানা উৎসব ও মহোৎসবের সময় তিনি কি বিরাট ভোগের যে আয়োজন করিতেন তাহা প্রত্যক্ষ-দর্শী ব্যতীত অন্য কেহ ধারণা পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন না। নিত্য-সেবা-নিরতা এই ভক্ত-রমণী শ্রীশ্রীদেবকে 'হরিহর ও অন্য রূপে'ও দর্শনপূর্ব্বক চমৎকৃতা হইয়াছিলেন। তল্লিখিত দর্শন-কাহিনীর কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল:

(১)

"১৩০৭ সালে মনোহরপুর আশ্রমে, ফাল্গুন মাসে, দোলের সময় ঘরের ভিতর চেয়ারের উপর শ্রীশ্রীদেব ঠাকুর বসিলেন। ভক্তগণ ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে এত আবির দিলেন যে স্বর্ণবর্ণ লাল হইয়া গেল; ঠাকুরের গলে ফুলের মালা। আবির খেলা সাজ হইলে ভক্তগণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ভক্তপ্রবর ৺বিপিন চৌধুরী ভাবে বিভোর হইয়া নাচিতে নাচিতে শ্রীশ্রীদেবের গলা হইতে ফুলের মালা ছিঁড়িয়া লইয়া আপনার গলায় পরিলেন; ঠাকুর সমাধিমগ্ন। পরে কীর্ত্তন সাজ হইলে ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইল। ঠাকুর যে ঘরে থাকিতেন আমরা সেই ঘরে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন দেখিতেছিলাম। ভক্তেরা বাহিরের ঘরে চলিয়া যাইলে শ্রীশ্রীদেব ঠাকুর আসিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধি-মগ্ন হইলেন। বড় পিসীমা, ছোট পিসীমা, কালোর মা, আমি, আর কে

কে ছিল মনে নাই, আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ঠাকুরের বুক হইতে শ্রীমুখমণ্ডল নবনীরদাকার শ্যামবর্ণ, তাহাতে আবির লাগিয়া কতই সুন্দর শোভা পাইতেছে। আমি দেখিয়া বড় পিসীমাকে বলিলাম, —'বড় পিসীমা, দেখ, ঠাকুরের বুক থেকে মুখ অবধি নবনীরদবরণের ন্যায় হইয়াছে।' তখন সকলেই বলিল, 'হ্যাঁ, তাইতো; কিন্তু পদ দুটী স্বর্ণ-বর্ণ, নিজ বর্ণের ন্যায়!' আমরা সকলেই দেখিয়া হাঁ করিয়া ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি—ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুর বলিলেন, 'তোরা কি বল্‌ছিস্?' আমি বলিলাম যে, আপনার বুক থেকে মুখ সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখের ন্যায়। ঠাকুর বলিলেন, 'তোরা কি ভুল দেখিতেছিস্।' আমরা—'এতগুলি লোক, সকলেরই কি ভুল হইল?' বড় পিসীমা বলিলেন, 'না—সত্যই, মিথ্যা তো নয়।' আমি বলিলাম, 'কেন পায়ের রং ত নয়।' ঠাকুর বলিলেন, 'তোরা কারো কাছে বলিস্ নি। লোকে শুনিলে হাসিবে।' শ্রীশ্রীদেব ঠাকুরের নিষেধ বলিয়া এ পর্য্যন্ত কারু কাছে বলা হয় নাই। কিন্তু সেই মোহনীয়া মূরত্তি অদ্যাপি হৃদয়ে জাগিছে। যাহা দেখা হইয়াছিল, তাহার কিছুই বলা হইল না—বলিতে জানিও না।"

(২)

"১৩০৮ সালে, শ্রাবণ মাসে, ঝুলনের সময়ে, বেলা ৮টা কি ৯টা। শ্রীশ্রীদেব ঠাকুর শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। বড় পিসীমাতা সুকোমল রাতুল চরণ দুটীতে আলতা পরাইতেছেন। সেই ঘরেই বড় পিসীমার শুইবার জন্য একখানি ছোট তক্তপোষ ছিল। কালোর মা, আমি সেই তক্তপোষে বসিয়া আল্‌তা পরান দেখিতেছিলাম। বড় পিসীমার হাতে স্বর্ণ বর্ণের জ্যোতি পড়িয়াছে। আমি বলিলাম, 'বড় পিসীমা, আপনার হাতে কি স্বর্ণ বর্ণের জ্যোতি পড়িয়াছে?'—বলিতে বলিতে সমস্ত বিছানাটী সেই জ্যোতিতে ভরিয়া গেল। বড় পিসীমা বলিলেন, 'কই, আমি ত দেখিতে পাইতেছি না?' কালোর মা বলিল, 'হাঁ মাসীমা,

তোমার গা শুদ্ধ ভরিয়া গিয়াছে।' সেই জ্যোতিটী শ্রীশ্রীদেবের গাত্র হইতে বাহির হইয়া সূর্য্যগ্রহণের ন্যায় হল্‌দে জ্যোতি পড়িয়া গ্রহণের জ্যোতির চেয়ে আরো বেশী উজ্জ্বল দেখাইতেছে। ঠাকুর বলিলেন, 'তোরা কি পাগলের মত বকিতেছিস্?' আমি বলিলাম, 'কেন, কালোর মাও ত দেখিতেছে।' ঠাকুর বলিলেন, 'ওসব কারু কাছে বলিস্ নি।' সেই জ্যোতি প্রায় এক ঘণ্টা হবে ছিল।"

(৩)

"১৩০৮ সালে, মাস মনে নাই। বিকাল ৬টা কি ৬৷টা হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুমাইতেছেন। আমি একটী মোড়াতে বসিয়া বাতাস করিতেছি, খুব আস্তে আস্তে; পাছে ঠাকুরের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। বাতাস করিতে করিতে শ্রীশ্রীদেব ঠাকুরের দিকে চাহিয়া দেখি, ঠাকুর সোজা চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন, অর্দ্ধেক নীরদাকার শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, অর্দ্ধেক শ্বেতবর্ণ শিবের ন্যায়। আমি দেখিয়া মেজ পিসীমাকে ডাকিলাম—বড় পিসীমা এখানে ছিলেন না। কালোর দিদিমা দেখিয়া বাহির হইতে দ্বারিককে ডাকিয়া আনিল। দ্বারিক আসিয়া বলিল, 'পিসীমা, শীঘ্র দীপ জ্বাল।' তখন একটু ঘোর হইয়াছে। এই সমস্ত কথা খুব আস্তে আস্তে হইতেছে, পাছে ঠাকুর জাগিয়া উঠেন। আলো লইয়া শ্রীমুখের নিকট দেখিল—ঠিক্ হরিহর মূর্ত্তি! আলো লইয়া দেখিতে ঠাকুর জাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, 'তোরা কি কর্‌ছিস্?' মেজ পিসীমা, আমি বলিলাম, 'আপনার ঠিক্ হরিহর মূর্ত্তি দেখিতেছিলাম।' ঠাকুর বলিলেন, 'তোরা কি দেখে কি গণ্ডগোল করিস্? ওসব বলিস্ নি—বলিতে নাই।' আমরা চুপ করিয়া যাইলাম।"

শ্রীযুক্তা গোলাপসুন্দরী কতিপয় গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'নিত্যগোপাল গীতাভিনয় ১ম খণ্ড, শ্রীশ্রীনিত্য-গীতা, অবলাজীবন ও ব্রজবালার প্রশ্নোত্তর' নামক গ্রন্থ-চতুষ্টয় প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার ন্যায় গ্রন্থ-রচনায় নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন ইঁহার গুরু-ভগ্নী শ্রীযুক্তা নির্ম্মলাবালা

রায়। ইনি হইতেছেন বরিশালের খ্যাতনামা অশ্বিনীকুমার দত্ত মহোদয়ের সহধর্ম্মিণীর কনিষ্ঠা ভগ্নী। শ্রীশ্রীদেবের নবদ্বীপে অবস্থান-কালে ইনি শ্রীশ্রীনিত্য-চরণে আশ্রয় লাভ করতঃ তাঁহার মহিমা-দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীদেবের সম্বন্ধে ইনি যাহা যাহা অবগত হইয়াছেন তাহা স্বরচিত 'শ্রীশ্রীনিত্যচন্দ্রোদয়' ও 'শ্রীনিত্যলীলাসম্পুট' নামক গ্রন্থদ্বয়ে পদ্যাকারে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। বাস্তবিকই, নানা ভক্তের মধ্য দিয়া নিত্য-ভক্তির বিকাশ নানা ভাবে হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা আর একজন ভক্ত-রমণীর নিত্য-সেবা-নিষ্ঠা-দর্শনে আমরা চমৎকৃত হইতেছি। ইনি হইতেছেন (অতঃপর উল্লিখিত) সরিষা-নিবাসী নিত্য-ভক্ত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দে মহোদয়ের বাল-বিধবা ভগ্নী। ইনি নামেও 'সুশীলা' কাজেও সুশীলা। ইনি অতি অল্প বয়সেই হুগলী-নিত্য-মঠে শ্রীশ্রীদেবের নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, তদবধি ঠাকুরই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়া আছেন। তাই, তিনি তন্মহিমা-প্রচারার্থ জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত সুকচরে 'গৌরী-মঠ' নামে একটী ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান স্থাপনপূর্ব্বক তথায় এবং কলিকাতা-মহানির্ব্বাণমঠে নানাভাবে বিশেষ নিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীদেবের সেবা করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে ভক্তবর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনগুপ্ত মহোদয়ের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। যশোহর জেলার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে ছিল ইঁহার বসবাস। ইনি যখন খলিসপুর পোষ্ট-আফিসে চাকরি করিতেন, তখন বজরাপুরের ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে ঠাকুরের মাহাত্ম্য শ্রবণান্তর নবদ্বীপ আম্‌পুলিয়াপাড়ার অবধূত-আশ্রমে গমন করেন এবং তথায় শ্রীশ্রীনিত্য-চরণে আশ্রয় লাভ করেন। অতঃপর কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করতঃ তিনি কলিকাতা-মঠে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। তাঁহার এই আশ্রমের নাম ছিল শ্রীমৎ স্বামী প্রবোধানন্দ অবধূত। বৃদ্ধ বয়সেও যতদিন সক্ষম ছিলেন ততদিন তিনি নানাভাবে ঠাকুরের সেবা করিতেন এবং অত্যন্ত স্বাবলম্বী ছিলেন। তিনি চিরখঞ্জ হইলেও তাঁহার কর্ম্মপটুতা খুবই ছিল।

অবশেষে তিনি বাত-ব্যাধির কবলে পতিত হইলেন। ইহাতে তাঁহার অবাধ-অঙ্গ-চালনা-ক্ষমতার বিশেষ হানি হইল। তাই, নানা বিষয়ে তাঁহাকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইল; কিন্তু তথাপি তিনি গুরুস্থান ত্যাগ করেন নাই এবং পরমমুক্তিক্ষেত্র মহানির্ব্বাণমঠেই তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। দীক্ষাদানের সময় শ্রীশ্রীদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "গোস্পদকেই তুমি তোমার গঙ্গা বলিয়া জানিও।" অবশ্য তখন তিনি বেশ স্বাস্থ্যবান্ বা হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ছিলেন; কিন্তু যখন তিনি পঙ্গুপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন, তখনই তিনি শ্রীশ্রীদেবের উক্ত বাক্যের মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে অবধারণক রিতে পারিয়াছিলেন।

উক্ত যশোহর জেলায় জগন্নাথপুর নামে একটী গ্রাম আছে। তথায় শ্রীযুক্ত কুমারীশচন্দ্র নন্দী নামে জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি বাস করিতেন। শ্রীশ্রীদেবের মহিমা শ্রবণান্তর তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ইনি একদা কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন। ঠাকুর তখন মনোহরপুর-আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। কলিকাতা গমনের পর ভক্তবর এই আশ্রম অনুসন্ধান-কার্য্যে রত হইলেন। কিন্তু তাহার সন্ধান না পাইয়া পথ-শ্রান্তি উপশমের জন্যতিনিকালীঘাটস্থ একটী দোকানে আশ্রয়লইলেন। ঠিক সেইসময়জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি-মনোহরপুকুর আশ্রমে যাবেন কি?" এতৎ শ্রবণান্তর কুমারীশ-বাবু তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে লোকটী তাঁহাকে তৎস্থানে লইয়া গেলেন; কিন্তু তদনন্তর তাঁহার সহিত ভক্তবরের* আর কখনও দেখা হয়

*এই নিত্য-গত-প্রাণ ভক্ত ঠাকুরের অপ্রকটের পর বিরহ-জ্বালা সহ্য করিতে না-পারায় স্বল্প কালের মধ্যে ব্যাধির কবলে পতিত হইয়া ওঁ নিত্য-ধামে গমন করেন। আহা! মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে তাঁহার অপূর্ব্ব নিত্য-দর্শন লাভ হইয়াছিল! এতৎ সম্বন্ধে শ্রীমৎ হরিপদানন্দ মহারাজ যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল: "...দাদা শৌরীশ-চন্দ্র...চিকিৎসার ত্রুটী করিলেন না, ...শৌরীশচন্দ্র সহোদরও বটেন,

নাই! যাহাহউক, ঈপ্সিত স্থান প্রাপ্তির পর তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। এখন হইতে তিনি নানাস্থানে নিত্য-সঙ্গ-সুখ-সম্ভোগে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার যেমন ছিল নিত্য-নিষ্ঠা তেমনই ছিল অন্তর সরল। আবার শ্রীশ্রীদেবের প্রতি তাঁহার অভিমানও হইত অত্যধিক।

আবার পরমার্থ-ভ্রাতাও বটেন। …কুমারীশ অতি মৃদুভাবে কহিলেন, '…দাদা, আমার ঘরের মেজের উপর বিছানা করিয়া দাও, কাপড় বদ্‌লাইয়া দাও।' শৌরীশ…তাহাই করিলেন। তখন কুমারীশকে সেই শয্যায় অবতরণ করান হইল। কুমারীশ কহিল, 'দাদা, এই ঘরে গঙ্গাজল ছিটাইয়া দাও, ধূনা দাও, আসন করিয়া দাও, ঠাকুর এসেছেন। …আধ ঘণ্টা এই ঘর হইতে বাহিরে যাইয়া অপেক্ষা কর, …আমাকে বসাইয়া দাও। পিছনে বালিশ দাও।' শৌরীশ তাহাই করিলেন। কুমারীশের কথা মত সম্মুখের চৌকিতে ঠাকুরেব আসন করিয়া রাখা হইল।… এদিকে গ্রামস্থ জনৈক প্রতিবেশী শৌরীশচন্দ্রের আলয়ে আসিয়া… কহিলেন, '…ঠাকুর যে এইমাত্র তোমাদের বাড়ী আসিলেন।…দেখিলাম তিনি ধুতি পরিয়া এক জোড়া চটি পায় দিয়া যাইতেছেন। আমি অতি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি কোথায় যাইতেছেন?' তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন, 'কুমারীশের বাড়ীতে।' তাহা শুনিয়া তাড়াতাড়ি আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলাম।'·· শৌরীশচন্দ্র কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া গেলেন। কুমারীশ গৃহদ্বার অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বন্ধ করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু শৌরীশ এত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, তিনি গৃহের দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন উর্দ্ধনেত্রে কুমারীশ স্থিরভাবে উপবিষ্ট—দুনয়নে ধারা বহিয়া অশ্রু পড়িতেছে, অঙ্গ পুলকিত। ক্ষণপরে কুমারীশ একটু বিরক্তির স্বরে কহিলেন, 'আর একটু সহ্য হ'ল না? যাক্, যা করেছ করেছ।' শৌরীশ তখন ভ্রাতার নিকট গিয়া বসিলেন। …আসনোপবিষ্ট অবস্থাতেই কুমারীশ নিত্যধামে প্রস্থান করিলেন।"

হুগলী-মঠে অবস্থান-কালে শ্রীশ্রীদেব বহু দূরদেশ হইতে ভক্তগণকে অলৌকিক-শক্তি-প্রভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাই, ডায়মণ্ড্-হারবার্ মহকুমার অন্তর্গত সরিষা-গ্রাম-নিবাসী অনেক ভদ্র-সন্তান শ্রীনিত্য-চরণে আশ্রয় লাভ করিয়া দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিতে পারিয়াছিলেন। একদা নগেনবাবু* নামে জনৈক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত স্নেহময়ী মাতৃদেবীর সহিত অশ্বযানে রওনা হইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ও অল্প-বয়স্কা বিধবা ভগিনীকে গৃহে রাখিয়া তিনি গমনোদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বপ্নযোগে শ্রীশ্রীদেব তাঁহার স্ত্রীকে দর্শন দিয়া জানাইয়াছিলেন যে, গর্ভাবস্থায় মুক্তি-পথের পথিক হইতে কোনও দোষ নাই। এইরূপ ভগবদাদেশ অমান্য ও ভগিনীর নিত্য-চরণ-দর্শনে আগ্রহাতিশয্য অগ্রাহ্য করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে না লইয়াই অশ্বযানে আরোহণ করিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অশ্বটী ধরাশায়ী হইল ও গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া গেল, আর অন্য কোন যান পাওয়া গেল না! এইরূপ দৈব-দুর্বিপাকে পতিত হইলে, নগেনবাবুর পূর্ব্বোক্ত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত মনে পড়িল। তিনি পূর্ব্ব সংকল্প ত্যাগ করিলেন। ইতিমধ্যে গাড়ীর চাকাও ভাল করা হইল এবং ঘোড়াটীও সুস্থ হইয়া গেল। তাই, তিনি স্ত্রী ও ভগিনীকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন এবং হুগলীতে শ্রীশ্রীদেবের চরণ সমীপে নিরাপদে পৌছিলেন।

এইরূপে নগেনবাবুর পরিবার নিত্য-কৃপা লাভ করিলেও তাঁহার জেঠাইমা শ্রীশ্রীদেবের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু ঠাকুর যাহাকে অনুগ্রহ করিতেন, তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি এমন অবস্থায় পতিত হইতেন যে, ঠাকুরের কৃপা প্রার্থনা না করিয়া পারিতেন না। তাই, বৃদ্ধা একদিন আহ্নিক করিতে বসিয়া দেখিলেন যে, শ্রীশ্রীদেব

*ইঁহারই ঘনিষ্ঠ-আত্মীয় জয়নগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রমাপতি ঘোষ-মহাশয়ও শ্রীশ্রীদেবের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীদেবের সেবাদিতে ইঁহার বিশেষ নিষ্ঠা দৃষ্ট হয়।

তাঁহার সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বেতদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। প্রহারের তাড়ণায় তিনি অচৈতন্ত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন তাঁহার সন্তানগণ আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের মাতৃদেবীর অঙ্গে বেত্রা-ঘাতের চিহ্ন আছে। বৃদ্ধা ঘটনাটী বলিবার পর তাঁহাকে সকলে হুগলী লইয়া গেলেন। শ্রীশ্রীদেবের শ্রীচরণ-দর্শনান্তর তিনি ভাবের আবেগে লজ্জা-ভয় ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই ত, তুমিই আমায় মেরেছ!" ইহা শুনিয়া ঠাকুর 'হো' 'হো' করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পূর্ণর* মা. তুমি কি বল্‌ছ! আমি বেতো মানুষ—উঠ্‌তে পারি না—আমি কি কোরে তোমাকে মার্‌লাম্? অন্ত কেহ হ'বে।" তদুত্তরে বৃদ্ধা বলিলেন, "না, না, তুমিই মেরেছ—তুমিই মেরেছ!" যাহাহউক, পর দিবস শ্রীশ্রীদেব কৃপা করিয়া নগেনবাবুর জেঠাইমাকে শ্রীশ্রীচরণে আশ্রয় দানপূর্ব্বক তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন।

আত্ম-গোপনে বিশেষ পটুতা থাকিলেও অনেক সময় ঠাকুর ভাবোচ্ছ্বাসে অনেক কথা বলিয়া ফেলিতেন। ইহা হইতেই ভক্তগণ তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা ও অনুপম বিভূতির বিষয় বিশেষভাবে অবগত হইতেন। ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন,§ "অরণির মধ্যে যেমন অগ্নি, তেমনই এই বিশ্বের মধ্যে প্রতি ঘটে ও পটে চৈতন্তরূপে আমিই বিদ্যমান।" অন্ত একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "হিমালয়ের দুর্গম গহ্বরের মধ্যে যে কোন ক্ষুদ্র পিপীলিকা চলিতেছে তাহাও আমার দৃষ্টির পথে। সর্ব্বত্র আমার অব্যাহত দৃষ্টি।" আবার, তিনি স্বরচিত "বিবিধ তত্ত্ব" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "নানা পর্ব্বত হইতে কত নদ-নদী প্রবাহিত

*পূর্ণবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্তনীলরতন দেমহাশয়ও শ্রীশ্রীনিত্য-চরণাশ্রিত হইয়াছিলেন। ইঁহারও নিত্য-সেবাদিতে বিশেষ রতি লক্ষিত হইয়া থাকে।

§"একদিন দক্ষিণারঞ্জনবাবুকে বলিয়াছিলেন, 'জ্ঞান দক্ষিণা! রাধা-কৃষ্ণ এক অঙ্গে মিলিত বিগ্রহ'।"

হইয়া সমুদ্রে সম্মিলিত হইয়াছে। উদার (এই) মহাপুরুষ সমুদ্রতুল্য। তিনি (ই—নি) কেবল আর্য্যের নহেন। (এই) সেই মহাপুরুষ-সমুদ্রে পৃথিবীর সমস্ত মতরূপ নদ-নদীই সম্মিলিত হইয়াছে। (এই) সেই মহাপুরুষই সমস্ত সংশয় ভঞ্জনের নিদান। এই (সেই) মহাপুরুষ যে হরি চৈতন্যের বিকাশ। এই মহাপুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই বেদে পরমাত্মা ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।" ঠাকুরের এই নিত্য-বুদ্ধ স্বভাবের ও অব্যাহত দৃষ্টি ও শক্তির পরিচয় বিশেষভাবে পাইয়াছিলেন একদিন সরিষা-নিবাসী পূর্ব্বোক্ত নগেনবাবু (শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দে)। একবার তিনি শ্রীশ্রীদুর্গোৎসবের সময় মহাষ্টমীর দিন ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিবার জন্য নিত্য-মঠে গিয়াছিলেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। তিনি প্রসাদ পাইয়া প্রতিমা দর্শনের নিমিত্ত সহরের মধ্যে বাহির হইলেন। কিন্তু যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন ঠাকুর ঘর বন্ধ হইয়াছে। আর সে দিন শ্রীচরণ দর্শনের সম্ভাবনা নাই। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন; কেননা ঐ শুভদিনে তাঁহার আর একবার ঠাকুর দর্শনের ইচ্ছা ছিল। অভিমানে তিনি ঐ স্থানেই পড়িয়া রহিলেন—সঙ্কল্প করিলেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আর একবার শ্রীচরণ দর্শন না পাইবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ স্থান ত্যাগ করিবেন না। এই ভাবে শুইয়া থাকিতে থাকিতে নগেনবাবুর তন্দ্রা আসিল; এমন সময় হঠাৎ দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান। তিনি বলিলেন, "তোমার claimটা (দাবীটা) দু'বার দেখা.ত? দেখা ত হ'ল —এখন বিশ্রাম ক'রতে যাও—মহাষ্টমীর দিন আমার অনেক কাজ, গো—অনেক কাজ।" নগেনবাবু চমকিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু দেখিলেন, ঠাকুর ঘর পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধ আছে। তিনি দাঁড়াইলেন—চলিতে লাগিলেন; কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অধিক সুরাপানের ফলে সুরাপায়ীর পা যেমন অবশ হইয়া যায়, তাঁহার পাও তদ্রূপ হইল। তাই, তিনি নিত্য-মঠের প্রাঙ্গণস্থ কামিনী গাছের নীচে বসিতে বাধ্য হইলেন। সহসা তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা তিনি জীবনে কল্পনা করিতে পারেন

নাই। তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হইল 'অসংখ্য দুর্গা প্রতিমা, আর সেই প্রতিমাগুলিতে নিত্যগোপাল ; অসংখ্য দেবালয়, আর সেইগুলিতে নিত্য-গোপাল বিগ্রহ'। তিনি আরও দেখিলেন, 'তাঁহার সম্মুখে, আশে-পাশে ও উর্দ্ধদেশে নিত্যগোপাল বিরাজমান'! নগেনবাবুর আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, যিনি তাঁহার ইষ্টদেবতা সেই মহাষ্টমীর দিন তিনি নানারূপে, নানাভাবে ও নানাস্থানে নানাভক্তের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। এই অভাবনীয় দৃশ্য দর্শনে নগেনবাবু চমৎকৃত হইলেন এবং অবশেষে সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলেন যে, দুইজন নিত্য-ভক্ত তাঁহাকে প্রসাদ পাইবার জন্য ডাকিতেছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অপূর্ব্ব ভক্ত-বাৎসল্য নিত্য-লীলার নিত্য-সহচর—তিনি সদাসর্ব্বদা শিষ্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকিয়া তাঁহাদিগকে অতি আশ্চর্য্যভাবে রক্ষা করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। নগেন-বাবু একদা নিশাযোগে পাঁচগাঁ নামক গ্রামে তাঁহার আত্মীয়ের বাটীতে একটী ঘরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। এদিকে হঠাৎ ঐ বাটীতে আগুন লাগিয়া ঘরগুলি এক এক করিয়া দগ্ধ হইতে লাগিল। অবশেষে যে ঘরে নগেনবাবু ছিলেন, সেই ঘরও জ্বলিয়া উঠিল। ভক্তবর নিদ্রায় এত অভিভূত ছিলেন যে, বাহিরের গণ্ডগোল সত্ত্বেও তিনি চৈতন্য লাভ করিলেন না। ভক্তের ঐরূপ বিপদের সময় অতি দূরে হুগলীতে থাকিলেও, শ্রীশ্রীদেবের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাই, তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পিঠে চড় মারিয়া বলিলেন, "ওঠ্, পুড়ে মর্‌লি যে, এখনও ঘুমিয়ে আছিস্!" ঐ কথা শুনিয়া নগেনবাবু তাড়াতাড়ি বাহির হইলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই ঘরটী পুড়িয়া ভূমিসাৎ হইয়া গেল। নগেনবাবু শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের অদ্ভুত কৃপার কথা মনে করিবামাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল এবং পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর পরমোদার সমন্বয়বাদের প্রতিষ্ঠাতা। এইজন্য তাঁহার ধর্ম্ম-

প্রতিষ্ঠানে সমস্ত সম্প্রদায়ের পর্ব্বাহ উপলক্ষেই অল্প-বিস্তর উৎসবের আয়োজন হইত ও হয়। একবার শারদীয়া-পূজার প্রারম্ভে ভক্ত-সমাগম হইল। হঠাৎ জনৈক ভক্ত "ড্রাই কলেরা রোগে" ভীষণভাবে আক্রান্ত হইলেন। জীবনের আশা পর্য্যন্তও রহিল না। তাঁহার ব্যাধি যখন দুরারোগ্য হইল, তখন সে সংবাদ শ্রীশ্রীদেবের নিকটে পৌঁছিল। তাহা শুনিয়া ঠাকুর স্বহস্তে এক হাঁড়ি ঘোলের সরবৎ তৈয়ার করিয়া দিলেন। রোগী তাহা ব্যবহার করিবামাত্র পুনর্জ্জীবন লাভ করাতে ভক্তগণের আনন্দোৎসব অনুষ্ঠানের সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হইল। তাই, তাঁহারা পরমানন্দে প্রভাতির দ্বারা মহাষষ্ঠীকে আবাহন পূর্ব্বক আগমনী-গীতি আরম্ভ করিলেন।

ভক্তগণ বালভোগের প্রসাদ পাইলে, ঠাকুরের ঘর খোলা হইল। তাঁহারা শ্রীপাদপদ্মে ভূমিলুণ্ঠিত প্রণাম করিলেন। ঠাকুর যোগবাশিষ্ঠ শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। সকলে যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। জনৈক ভক্ত একটী পেন্‌সিল্ হাতে লইয়া গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর দুই একটী পংক্তি শুনিতেছেন, আর সমাধিস্থ হইতেছেন। সমাধি অন্তে আধ আধ অথচ সুস্পষ্ট স্বরে বলিতেছেন, "চিহ্ন দাও"। কখনও বা একটী বাক্যের অর্দ্ধাংশ বা এক চতুর্থাংশ পাঠ হইয়াছে—ঠাকুর সমাধিস্থ—পাঠক চিহ্ন দিতে হইবে অনুমান করিয়া থামিতেছেন। নবাগত ভক্তগণ ঠাকুরের এই অভূতপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাব দর্শনে বিস্ময়-সাগরে ডুবিয়া যাইতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছেন, "মহাপ্রভুর কথা শুনিয়াছি; তিনি "রা" বলিতেই অচৈতন্য হইতেন; এ যে ততোঽধিক দেখিতেছি!" গ্রন্থ পাঠককে আর অধিক পাঠ করিতে হইল না। এক পৃষ্ঠা পাঠ করিতে প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হইল। ভক্তদের প্রসাদ পাওয়ার সময় আগত দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আজ এই পর্য্যন্ত!" ভক্তগণ বুঝিলেন, ঠাকুর সকলকে বাহিরে যাইতে অনুমতি করিতেছেন। তাঁহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও একে একে প্রণামান্তে বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

এইরূপে মহাষষ্ঠী-নিশি অবসানে সপ্তমী তিথি আসিল ; ভক্তগণ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে কেহ কেহ ঠাকুরের সুকোমল কনক-কান্তি দেহ-খানি পুষ্প-মাল্যাদির দ্বারা বিভূষিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ বা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলেন। শ্রীমৎ কেশবানন্দমহারাজ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে অগ্রগামী হইলেন ; কিন্তু আনন্দাতিশয্যে হস্ত-প্রক্ষালনের কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলেন। ঠাকুর যখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, শ্রীমৎ কেশবানন্দমহারাজের হস্ত প্রক্ষালিত ছিল না, তখন তিনি শ্রীমৎ কেশবানন্দমহারাজকে প্রথমে তৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতে আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু সুচতুর ভক্ত দেখিলেন যে, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বপ্রথমে শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিবার আশা অপূর্ণ থাকিবে। তাহা ত তিনি করিতে পারিবেন না। এইজন্য শ্রীনিত্য-চরণে মস্তক রাখিয়া তিনি শ্রীমৎপ্রণবানন্দমহারাজকে পুষ্পাদি তাঁহার মস্তকে স্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে, তিনি (কেশবানন্দমহারাজ) মস্তক দ্বারাই অঞ্জলি অর্পণ করিবেন। ভক্তের এইরূপ পরাভক্তির নিদর্শন উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়া ঠাকুর আনন্দে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। এতদ্দর্শনে ভক্তগণেরও আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারাও অঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। এদিকে ঠাকুর মাতৃভাবে সমাধিস্থ হইলেন। কোন কোন ভক্ত সেই সময় তাঁহাকে সাক্ষাৎ দুর্গারূপে দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন।

পূজান্তে মধ্যাহ্ন-ভোগ সমাপন হইল। শ্রীশ্রীদেবের উপদেশে অনুপ্রাণিত ভক্তগণ সামাজিক জাতির গণ্ডিকে উপেক্ষা করিয়া এক পংক্তিতে পাশাপাশি উপবেশন করিলেন। কেহ প্রসাদ দর্শনে, কেহ বা স্পর্শনে, কেহ বা ভোজনে পুলকিত ও ভাবাবিষ্ট হইতে লাগিলেন। যে নিত্য-ভক্ত উচ্ছিষ্ট বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীদেবের উপদেশ ও শাস্ত্র-বাক্যানুসারে 'প্রসাদ* কখনও উচ্ছিষ্ট এবং যবন ও কুকুর

*প্রসাদ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীদেব বলিয়াছেন, "প্রসাদিত এ অন্নের অনন্ত মহিমা ! এ মহাপ্রসাদে কৃষ্ণ-কৃপার সুষমা ! ১। জানেন প্রসাদ-

কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট ও ভক্ষিত হইলেও অ পবিত্র হয় না', এইরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রসাদে অব্যভিচারিণী ভক্তি ও অটল বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ঐ

তত্ত্ব মহাদেব শিব, জানেন প্রসাদ-স্বাদ, প্রসাদ-প্রভাব; বিমলা পুরুষোত্তমে, প্রসাদ পান সুপ্রেমে, করেন প্রসাদে ভক্তি হর মনোরমা! ২। শ্রীমহা-প্রসাদে হয় সংসারে বিরক্তি, প্রসাদ প্রসাদে হয় শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি ; সুপবিত্র এ প্রসাদে, হেরি সুপ্রেম কুমুদে, (তাহা ত) সে সুপ্রেমে নিবেদিত (তাই) নাহি রে উপমা। ৩। চণ্ডাল, যবন, ম্লেচ্ছ প্রসাদ পরশিলে, দূষিত হয় না তাহা তাহারা খাইলে ; হয় না তাহা উচ্ছিষ্ট, সর্ব্বকালে তাহা শ্রেষ্ঠ, তাহার মহিমা কন শ্রীবিষ্ণু শ্রীরমা। ৪। বিবিধ শাস্ত্রে রয়েছে প্রসাদের তত্ত্ব, পবিত্র করে প্রসাদ প্রসাদে মহত্ত্ব ; করি প্রসাদে বন্দনা, তার মহিমা জানিনা ; কি কব আমি অজ্ঞান? প্রসাদ মহিমা সীমা? ৫!" আবার, প্রসাদের মহিমা শাস্ত্রে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"গঙ্গাতোয়ে শিলাদৌ চ স্পৃষ্টদোষোঽপি বর্ত্ততে। পরব্রহ্মার্পিতে দ্রব্যে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন বিদ্যতে॥ পক্কং বাপি ন পক্কং বা মন্ত্রেণানেন মন্ত্রিতম্। সাধকো ব্রহ্মসাৎ কৃত্বা ভুঞ্জীয়াৎ স্বজনৈঃ সহ॥ নাত্রবর্ণবিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্। ন কালনিয়মোঽপ্যত্র শৌচাশৌচং তথৈব চ॥ যথাকালে যথাদেশে যথা-যোগেন লভ্যতে। ব্রহ্মসাৎকৃতনৈবেদ্যমশ্নীয়াদবিচারয়ন্॥ আনীতং শ্বপচেনাপি শ্বমুখাদপি নিঃসৃতম্। তদন্নং পাবনং দেবি দেবনামপি দুর্ল্লভম্॥ কিং পুনর্ম্মনুজাদীনাং বক্তব্যং দেব-বন্দিতে॥ মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো-বাপান্যপাতকৈঃ। সকৃৎ প্রসাদগ্রহণাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ পরমেশস্য নৈবেদ্যসেবনাদ্ যৎ ফলং ভবেৎ। সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থেষু স্নানদানেন যৎ ফলম্। তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো ব্রহ্মার্পিতনিষেবণাৎ॥" ইত্যাদি। অর্থাৎ "গঙ্গাজল ও শালগ্রাম-শিলাদিতে স্পর্শদোষ সংঘটন হয় ; কিন্তু পরমব্রহ্মের প্রসাদ বস্তুতে স্পর্শদোষ সংঘটন হয় না। পক্কই হউক বা অপক্কই হউক, সাধক ব্রহ্মমন্ত্রে ব্রহ্মকে উৎসর্গ করিয়া আত্মীয়স্বজন সহ ভোজন করিবে॥ এইরূপ প্রসাদ গ্রহণ বিষয়ে বর্ণবিচার (ব্রাহ্মণাদি)

দেবতা-দুর্ল্লভ, মুক্তিপ্রদায়ী ও পাপ-ক্ষয়কারী বস্তু কাড়াকাড়ি করিয়া লইতে লাগিলেন। একজন আর একজনের মুখে প্রসাদ দিতে লাগিলেন—কেহ বা অন্য ভক্তের মুখ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইতে লাগিলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! প্রসাদ প্রাপ্তির পর আত্মহারা ভক্তগণ শুধু পাতা পর্য্যন্ত কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিলেন। অপর কতিপয় ভক্ত পরমার্থ ভ্রাতৃবৃন্দের ভুক্তাবশেষ এই উদ্দেশ্যে অতি যত্নে সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, যতদিন পারিবেন ঐ ভুক্তাবশেষ প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া কৃতার্থ হইবেন। বাস্তবিক, এইরূপ প্রসাদে নিষ্ঠা কেবলমাত্র পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রেই দেখা যায়—আর দেখা যায় নিত্য-ক্ষেত্রে: এখানে জাতি-ও-পদ-অভিমান নাই। যাঁহারা প্রসাদে এইরূপ নিষ্ঠা পোষণ করেন তাঁহারাই ধন্য! তাঁহাদের চরণে কোটী কোটী প্রণাম!

একদিন সন্ধ্যার পর ঠাকুর ঘরের দরজা খোলা হইলে, ভক্তগণ

উচ্ছিষ্টাদি, কালনিয়ম এবং শৌচাশৌচ নিয়ম নাই। যে কালে, যে দেশে, যে ভাবেই সংগৃহীত হউক না, ব্রহ্মে অর্পিত প্রসাদ বিচার না করিয়া গ্রহণ করিবে॥ হে দেবি! চণ্ডাল কর্ত্তৃক আনীত হইলেও, কুকুর মুখে পতিত হইলেও ব্রহ্ম-নিবেদিত প্রসাদ দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ। হে দেবি! মনুষ্যদিগের বিষয়ে আর কি বলিব? তাহাদের বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্রও নাই॥ মহাপাতকগ্রস্তই হউক বা অন্য কোন পাপগ্রস্তই হউক, একবার মাত্র প্রসাদ গ্রহণ করিলে, তৎসমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়; ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ব্রহ্মার্পিত বস্তু গ্রহণে যে ফললাভ হয়, শ্রবণ কর। সার্দ্ধ-ত্রিকোটি তীর্থস্থানে স্নানে ও দানে যে ফললাভ হয়, মানব ব্রহ্ম-নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সেই সমস্ত ফললাভ করিতে পারে।" ইত্যাদি। স্থানাভাব বশতঃ অন্যান্য শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করা গেল না।
'তিনি (ঠাকুর) একদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ৺প্রসাদ দর্শন করিবার পর ভাবাবেগে প্রসাদ-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন; অবশেষে সমাধিস্থ পর্য্যন্ত হইয়া গেলেন।'

একে একে গৃহে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। আর প্রশান্ত-মূর্ত্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল অভয়-হস্ত তুলিয়া করুণ-কোমল-কণ্ঠে কাহাকেও বলিতেছেন, "তোমার কথা আমার স্মরণ রইল," কাহাকেও বা বলিতেছেন, "নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন।" কোন কোন ভক্ত আনন্দের সহিত, কোন কোন ভক্ত ছলছল নেত্রে, কোন কোন ভক্ত বা আবেগ-পূর্ণ হৃদয়ে শ্রীশ্রীদেবের এই আশীর্ব্বাদ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেছেন। ঠাকুর ক্ষণে ক্ষণে মধুর-কণ্ঠে বলিতেছেন,—"নারায়ণ, নারায়ণ!"

পরমানন্দে পূজা সমাপ্ত হইল। এইবার আসিল ভক্তগণের বিদায়ের পালা। বিদায়ের সময় উপস্থিত হইলে, অনেক ভক্ত বিরহানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন—কেহ বা অবিরত নয়ন-বারি ত্যাগ করিতে লাগিলেন। গোপাল-বিরহে নিত্য-ভক্তের প্রাণে যে জ্বালা উপস্থিত হইত, তাহা কোন পার্থিব আত্মীয়ের বিচ্ছেদে কেহই কখনও অনুভব করেন নাই। ইহাই নিত্য-প্রেমের বিশেষত্ব। যাহাহউক, ভক্তগণকে অতীব সন্তপ্ত দেখিয়া নিত্যদেবের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস-বাণী দান করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি তোমাদের সকলের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত আছি। তোমরা সাধন-ভজন না করিলেও, যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয়, আমি তাহাই করিব। আমার ত আর পাতান সম্বন্ধ নয় যে, তোমরা আমাকে ভালবাসিবে, কি ভক্তি করিবে, তবে আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিব। যাহার ভক্তি আছে, সেও আমার যেমন, যাহার ভক্তি নাই, সেও আমার তেমন।" কোনও একদিন কথাপ্রসঙ্গে ভক্তগণ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার ইষ্ট কে?" তদুত্তরে ঠাকুর মধুমাখা কথায় বলিয়াছিলেন, "ওগো, আমি যে সদাসর্ব্বদা তোমাদের কথাই ভাবি—তোমাদের ছাড়া যে আর কাউকে জানিনা; ওগো, তোমরাই আমার ইষ্ট।" ভক্তগণের প্রতি শ্রীশ্রীদেবের এই অভয়-বাণী গহনে, কাননে, প্রান্তরে, সলিলে, দিগদিগন্ত ব্যাপিয়া প্রতিধ্বনিত হউক, যেন অনন্তকালেও উহার নিবৃত্তি না হয়! হে নিত্য-ভক্তবৃন্দ, তোমাদের

জয় হউক ! আর মধুমাখা-নিত্যনাম-শ্রবণে জগৎ মাতিয়া যাউক !

হুগলী-জেলার অন্তর্গত জীরাট-গ্রামের যে পরিবারের অনেকেই শ্রীশ্রীদেবের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, সেই নাগ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন নিত্য-ভক্ত ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ, এল্-এম্-এস্*। ইনি তৎকালে কাল্নায় চিকিৎসা-ব্যবসা করতঃ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীদেবের মহিমাও বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। ইঁহারই ঘনিষ্ঠ-আত্মীয় ও স্নেহ-ভাজন ছিলেন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ নাগ নামে জনৈক যুবক। ইনি ধর্ম্ম-ভাবাপন্ন হইলেও প্রথমে নিত্য-শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না ; কিন্তু নিত্য-লীলার মাধুর্য্যই এই যে, মহীয়সী-নিত্য-কৃপা-শক্তির প্রভাবে অবিশ্বাসী ও অশ্রদ্ধাবানের হৃদয়ও পরম বিশ্বাস ও পরম-প্রেমরূপা পরাভক্তির আকর হইয়া উঠিত। ইহার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। স্থানাভাব বশতঃ এস্থলে সে সমস্তের উল্লেখ সম্পূর্ণভাবে করা অসম্ভব। যাহাহউক, সত্যেন্দ্রবাবু যখন শুনিলেন যে, স্থানান্তরে পীড়িতা তাঁহার জনৈকা আত্মীয়ার অসুখের সংবাদ শ্রীশ্রীদেব হুগলী-মঠ হইতেই তাঁহার (সেই আত্মীয়ার) পুত্রকে জানাইয়াছেন, তখন ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রান্ত-ধারণা দূরীভূত হইল ; তখন ঠাকুর তাঁহার নিকট 'অন্তর্য্যামী'রূপে পরম-শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া উঠিলেন। তাই, তৎপ্রতি বিশেষভাবে

*ইনি জনৈক নিত্য-ভক্তের নিকট হইতে শ্রীশ্রীদেবের বিষয় শ্রবণান্তর তাঁহাকে নবদ্বীপ-ধামে দর্শন করেন এবং পরে স্বরগুনায় 'যোগিনী-মা'র বাটীতে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইঁহারই প্রমুখাৎ ঠাকুরের মাহাত্ম্য শ্রবণান্তর উক্ত নাগ-পরিবারের অনেকেই শ্রীশ্রীদেবের কৃপা লাভ করেন। ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণের পর তিনি সাধন-ভজনে রত হইলে অনুভব করিতেন যে, তাঁহার ললাট-দেশে নূতন একটী চক্ষুর সৃষ্টি হইত। তাহা তাঁহাকে দর্শন করাইত বর্ত্তুলাকারে অনেক দেব-দেবী-মূর্ত্তি। তিনি ও পূর্ব্বোক্ত সত্যনাথ বিশ্বাসমহাশয় "শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়" পত্রিকার সম্পাদকতা করিতেন।

আকৃষ্ট হইয়া সত্যেন্দ্রবাবু তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার চিরাদৃত সাত্বিক-ভাব বা ধর্ম্মভাব ও ব্রহ্মচর্য্য-নিষ্ঠার বিশেষভাবে পুষ্টি-সাধন করিলেন। তিনি এখন প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে দীক্ষিত ও ব্রতী হইলেন ও এই সময় শ্রীশ্রীদেবকে শ্যামারূপে ও গোপালরূপে দর্শন পর্য্যন্ত করিলেন। অতঃপর নিত্য-প্রেমের আতিশয্যে তাঁহার সংসার-প্রেম শিথিল হইয়া আসিল। তাই, তিনি বিষয়-সম্পদে, মান-সম্ভ্রমে, এমন কি, বিশেষ আসক্তির বস্তু আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পর্য্যন্ত স্বভাবতঃ উদাসীন হইয়া পড়িলেন; এবং প্রকৃত বৈরাগ্য-পথের পথিক হইবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীদেবের শরণাপন্ন ও পরে সন্ন্যাসাশ্রমী পর্য্যন্ত হইলেন। তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম হইল শ্রীমৎস্বামীহরিস্মরণানন্দ অবধূত। সন্ন্যাস-লাভের কিয়ৎকাল পর তিনি পর্য্যটনে রত হইলেন। এইরূপে তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন এবং ৺কাশী-ধামে শ্রীশ্রীদেবের কৃপায় তাঁহার অন্তরে জ্ঞানময়ী শাম্ভবী (কাশী)-শক্তির বিকাশ হওয়ায় তিনি নির্ম্মলানন্দে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। তিনি চিরদিনই শ্রীশ্রীদেবের সেবায় সুনিষ্ঠিত এবং বর্ত্তমানেও কলিকাতা-মহানির্ব্বাণ-মঠে তৎকার্য্যে বিশেষভাবে রত আছেন।

এক সময় সরিষা-নিবাসী নিত্য-ভক্ত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দেসরকার মহাশয় হুগলী-মঠে থাকাকালীন শ্রীশ্রীদেবকে দীনভাবে বলিয়াছিলেন, "বাবা! আমার জপ-ধ্যান ত কিছুই হয় না—আমার কি গতি হ'বে?" তদুত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "হ'বে, গো, হ'বে: সময় হ'লে সবই হ'বে। সেজন্য তুমি ভেবো না। তোমাদের কিছুই ক'র্‌তে হ'বে না—আমি তোমাদের জন্য সবই কোরে রেখেছি।" এই অভয়-বাণী শুনিয়াও ভক্তবর আশ্বস্ত হইলেন না। তিনি সর্ব্বদাই ভাবেন, "মন্ত্রও নিলাম, কিন্তু জপ-ধ্যান ত কিছুই ক'র্‌তে পার্‌ছি না—কি কর্‌লাম!" ইত্যাদি। ইহার কয়েকদিন পরে এক রাত্রে অন্যান্য ভক্তের ন্যায় সত্যেনবাবুও বিশ্রাম করিতেছেন; এমন সময় তাঁহার এরূপ জপ হইতে লাগিল যে, তাহার আর বিরাম নাই। তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল, "ইহাকেই

কি 'অজপা' জপ বলে ?" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার ধ্যানেরও স্ফুরণ হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ইহা গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। জপ ও ধ্যানের এই অসাধারণ অথচ গভীর রহস্যময় স্ফুরণে তাঁহার মস্তিষ্ক ভীষণভাবে আলোড়িত হইতে লাগিল। এই আলোড়ন তিনি কোনওক্রমেই সহ্য করিতে না পারিয়া, হস্ত দ্বারা সহস্রার মার্জ্জনা করিতে করিতে উঠিয়া পড়িলেন—ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি নানাপ্রকারে জপ-ধ্যান ছাড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু জপ-ধ্যান তাঁহাকে আর কিছুতেই ছাড়িতে চায় না! অনন্যোপায় হইয়া তিনি শ্রীশ্রীদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অধৈর্য্য অবস্থায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে রাত্রি কাটিয়া গেল—সত্যেনবাবুর আর বিশ্রাম হইল না! পরদিন ঠাকুর ঘর খোলা হইল। ভক্তবর মস্তকে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-চিত্তে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন; এমন সময় শ্রীশ্রীদেব 'হো' 'হো' করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কি সত্যেন, কেমন আছ? রাত্রে বিশ্রাম কেমন হ'ল?" ভক্তবর অতি নম্রভাবে বলিলেন, "বাবা! আমার আধার ত জানেনই—আমি ত চাইবই —আপনি কেন এরূপ ক'র্লেন?" অনন্তর তিনি শ্রীশ্রীচরণে প্রণত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অনুভব করিলেন যে, তাঁহার মস্তক বরফের ন্যায় শীতল হইয়া গেল।

একদিন (পাবনা-নিবাসী) ভক্তবর নারায়ণচন্দ্র ঘোষমহাশয় কথা-প্রসঙ্গে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বাবা! পুরশ্চরণ কাহাকে বলে?" তদুত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "অচৈতন্য মন্ত্রকে সচৈতন্য করার নামই পুরশ্চরণ। সাধারণ কুলগুরুদের* প্রকৃত ব্রহ্ম-জ্ঞান না থাকায়, তাঁহারা যে মন্ত্র দেন তাহা চৈতন্য ক'র্বার জন্য শাস্ত্রে পুরশ্চরণের বিধান আছে।

*"গুরু ও দীক্ষা" প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিয়াছেন, "মন্ত্র যেন কাষ্ঠ, সেই মন্ত্রের মধ্যস্থিত চৈতন্য যেন অগ্নি। কাষ্ঠ আর অগ্নি সংযুক্ত হইলে তবে ত রন্ধন হয়। সাধারণ কুলগুরু মন্ত্ররূপ কাষ্ঠ দেন, কিন্তু তার

তোমাদের ত সচৈতন্য মন্ত্র। উহা আর চৈতন্য ক'র্‌বার প্রয়োজন নাই।" ঠাকুরের উপদেশে একস্থানে উল্লিখিত আছে,—"পুরশ্চরণ=পুরঃ+চরণ; অর্থাৎ এমন মনোযোগের সহিত জপ করা হইবে যে, জপ করিতে করিতে মন বৈকুণ্ঠপুর বা পুরীতে বিষ্ণুলোকে প্রবেশ করিবে।"

এই সময় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মজুমদার নামক জনৈক ভদ্রলোক ধর্ম্মলাভেচ্ছু হইয়া গুরু সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এমন সময় তাঁহার জনৈক বন্ধু সন্ধান দিলেন যে, কাশীধামে তাঁহার (সেই বন্ধুর) গুরুদেব বাস করেন। কৃষ্ণবাবু অর্থাভাব বশতঃ বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মোগলসরাই ষ্টেশনে গাড়ীটী যখন থামিল, তখন এক রূপবান যুবক আসিয়া তাঁহাকে একখানি কাশীর টিকিট দিয়া তথা হইতে অদৃশ্য হইলেন! কাশীতে ট্রেন্ হইতে অবতরণ করিয়া কৃষ্ণবাবু বন্ধুর পরামর্শ অনুসারে তদীয় গুরুদেবের দর্শন করিলেন। সেই মহাপুরুষ কৃষ্ণবাবুকে জানাইলেন যে, তাঁহার গুরু তিনি নন্; তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

সঙ্গে চৈতন্যরূপ অগ্নি দিতে সক্ষম হন্ না।... মুক্তিদায়িনী শক্তির নাম মন্ত্র। প্রকৃত গুরু ব্যতীত অপরের মন্ত্র দিবার ক্ষমতা নাই। প্রকৃত গুরু স্বয়ং শিব।...কেবলমাত্র মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন ভগবানের কোন নাম জপ করিলে যোগাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। রত্নাকর কেবলমাত্র মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন 'মরা' শব্দ জপ কোরে যোগী হইয়াছিলেন। তিনি সচৈতন্য 'মরা' শব্দ প্রভাবে বিদেহ-কৈবল্য লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য রত্নাকরের গাত্রে বল্মিক হইলেও তিনি জানিতে পারেন নাই, তন্নিবন্ধন কোন কষ্ট বোধ করেন নাই।...যাঁহার ভিতরে পরমজ্ঞানদায়িনী পাপক্ষয়কারিণী দীক্ষাশক্তি আছে, তিনিই অদীক্ষিতকে তাহা দান করিতে পারেন।...অচৈতন্য পুরুষ গুরু হবার যোগ্য নন। তাঁহার উপদেশ কথায় জ্ঞান-চৈতন্যও হয় না।... মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যখন গৃহস্থ ছিলেন, তখন তিনি গৃহস্থ কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হন নাই। তাঁহার গুরু সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরী ছিলেন। প্রত্যেক গৃহস্থেরই উপযুক্ত সন্ন্যাসী গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

দেব—সন্ধান করিলেই তাঁহাকে পাইবেন। মজুমদার মহাশয় রাত্রে স্বপ্নে শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিলেন। তিনি আরও দেখিলেন যে, বিশ্বেশ্বর-লিঙ্গ ভেদ করিয়া গলিত-কাঞ্চন-বিনিন্দিত-বর্ণ-বিশিষ্ট শ্মশ্রুযুক্ত এক মহা-পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্তে ভক্তবর পরদিন বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তথায় নিত্য-ভক্ত নগেন্দ্র রায়মহাশয়ের সহিত তাঁহার দেখা হইল। কৃষ্ণবাবু নগেনবাবুর ঘরে একটী চিত্রপট দর্শন করিলেন। তাঁহার রূপ ও স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের রূপ একই প্রকারের। কৃষ্ণবাবু নগেন-বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ঐ মহাপুরুষ রায়মহাশয়ের গুরুদেব ও তিনি হুগলীতে বাস করেন। এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণবাবু হুগলীতে গমন-পূর্ব্বক নিত্য-মঠে প্রবেশ করিয়া ভক্তগণকে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীদেবের নিকট ঐ বিষয় নিবেদন করিবার পর, ঠাকুর বলিলেন যে, তাহার মা তাহার জন্য কাঁদিতেছেন—আগে মার সহিত দেখা করিয়া আসুক—পরে তাঁহার (ঠাকুরের) দর্শন লাভ করিবে। ভক্তবর নিত্যদেবের আদেশ পালন করিলেন। অনন্তর নিত্য-দ্বার তাঁহার নিকট অবারিত হইল। দর্শনান্তর তিনি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিলেন। ঠাকুর বারবার অট্ট-হাস্য করিয়া কৃষ্ণবাবুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। ঠাকুর বিধিনিষেধের ব্যবস্থাপক—তিনি ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহার যেরূপ অবস্থা তাঁহাকে তিনি সেইরূপ ব্যবস্থা দিতেন। গৃহস্থের নিকট পিতামাতা পরম-পূজ্য। তাঁহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিলে বা সন্তুষ্ট না করিলে, ভগবানের কৃপা লাভ করা সংসারী লোকের পক্ষে দুরূহ। তাই, ঠাকুর কৃষ্ণবাবুকে ঐরূপ ব্যবস্থা দিলেন। কিন্তু তিনিই মুমুক্ষু ব্যক্তিকে পরমার্থ লাভের জন্য পিতা-মাতাদি সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পূর্ণ নিঃসম্বন্ধ ও নির্ম্মম হইয়া একমাত্র শ্রীশ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হইতে উপদেশ দিয়াছেন। তাই বলি, ঠাকুর অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিতেন। অসুবিধা হইবে বলিয়া কাহাকেও "পাশ করার চেয়ে পাশ কাটান ভাল" এইরূপ উপদেশ প্রদান-

পূর্ব্বক উচ্চ-শিক্ষালভের বাধা দিয়াছিলেন ; আবার কাহাকেও উচ্চ-শিক্ষা অর্জ্জনের সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষার ব্যয়ভার পর্য্যন্ত বহন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি নিজেও সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও নানা শাস্ত্র ও প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দর্শন পর্য্যন্ত বিশেষভাবে পাঠ করিয়াছিলেন এবং ইংরাজী ভাষায় তাঁহার এরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, তিনি একজন সেই সময়ের গ্র্যাজুয়েটের ন্যায় উক্ত ভাষা অনর্গল বলিতে পারিতেন।

ঠাকুরের কৃপার তুলনা ও সীমা নাই। তাঁহার দয়ায় নাস্তিকও আস্তিকতা লাভ করিয়া মুক্তি পথের পথিক হইয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যবাবুর মতের ও স্বভাবের পরিবর্ত্তন ইহার একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই ভদ্রলোক শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের পরম-ভক্ত শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষমহাশয়ের পিস্তুতো ভাই ছিলেন। ইনি চুঁচুড়াতে সব্‌জজ্‌ ছিলেন। ঠাকুরের উপর ইঁহার স্বাভাবিক ভালবাসা থাকিলেও, ধর্ম্ম বিশ্বাস কম ছিল। তাই, তিনি ভূত-প্রেত যে আছে, তাহা ত মানিতেনই না, বরং বলিতেন; "ওসব hallucination (মনের ভ্রম)।" এইরূপ উক্তি করিবার কিয়দ্দিবস পর তাঁহার উপর খুব ভূতের উপদ্রব হইতে লাগিল। যখন তিনি খাইতে বসিতেন, তখন কোন লোকজন নাই—অথচ কোথা হইতে যেন ঢিল ও বিষ্ঠা তাঁহার পাতের নিকট আসিয়া পড়িত! নিতান্ত বিব্রত ও অনন্যোপায় হইয়া তিনি শ্রীশ্রীদেবের শরণাপন্ন হইলেন। ঠাকুর বলিলেন, "ওসব নাকি hallucination ?" যাহাহউক, ত্রৈলোক্যবাবু তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যখন তিনি অশ্বযানে গমন করিতেছিলেন, তখন ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ; কিন্তু ভূতের ঢিল সে অবস্থাতেও তাঁহাকে বিব্রত করিতে লাগিল। তাহাদের আক্রমণের সময় তিনি শ্রীশ্রীদেবের প্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন ; তথাপি প্রেতসমূহ ছায়া-রূপে তাঁহার মন্ত্র-জপ-পদ্ধতি অনুকরণ করিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে ছাড়িত না। যাহাহউক, ত্রৈলোক্যবাবু মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে মন্ত্রশক্তির নিকট প্রেতেরা পরাভব স্বীকার করিয়া তাঁহাকে

আর উদ্বেগ দিল না।

আবার ঠাকুর যে অধম-তারণ, পতিত-পাবন তাহারও ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত তাঁহার অলৌকিক-ঘটনা-পূর্ণ জীবনে দেখা যায়। হুগলীতে গোলাপ গয়লানী নামে এক বারবণিতা ছিল। সে এক সময় ঠাকুরের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিল। যিনি বিদ্যালঙ্কারে ভূষিত, চরিত্রবান্, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত অনেক সময় দেখা পর্য্যন্ত করেন নাই, সেই দীন-দয়াল ঠাকুর তাহাকে দীক্ষা দান করিলেন। কিন্তু ঠাকুরকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিলেও তাহার স্বভাবের বাহ্যতঃ বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিল না। সে নিত্যদেবকে জলমিশান দুধ দিত। অহেতুকী কৃপা-সিন্ধু নিত্যগোপালদেব জানিয়াও তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেন। একদিন সে মদ খাইয়া বাটীতে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। অন্তর্য্যামী সর্ব্বময় নিত্যগোপাল তাহা মঠ হইতেই জানিয়া দুইজন ভক্তকে তাহার গরুর সেবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। আবার সে একবার মদের সহিত অহিফেন সেবন করে; তাহাতে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে এবং তাহার জেল হয়। তাহার অভিমান আসিল বোধহয় এই মনে করিয়া, "ঠাকুর পতিতপাবন! কৈ পতিতকে ত তিনি দয়া ক'র্‌লেন না!" সে কথা ঠাকুরের অন্তরে প্রবেশ করিল। তিনি অন্য দেহ ধারণ করিয়া জেলে গমনপূর্ব্বক ঐ পতিত, সমাজচ্যুত, ঘৃণিত বেশ্যাকে খাওয়াইয়া আসিতেন। ইহা হইতে পতিতের প্রতি দয়ার উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের পার্থিব-লীলা যতই পর্য্যালোচনা করি, ততই তাঁহার ভক্তের প্রতি অত্যধিক-প্রেম দর্শনে চমৎকৃত হই। এক সময় শ্রীযুক্ত কালীধন দে নামে এক ধনাঢ্য যুবক বৈরাগ্য-পথের পথিক হইবেন বলিয়া ঠাকুরের নিকট আগমন করতঃ গৈরিক-বসন পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিলেন; এমন সময় তাঁহার পিতা আসিয়া পড়িলেন—উদ্দেশ্য পুত্রকে সংসারে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন। তিনি ঠাকুরের ঘরে কালীধনবাবুকে জড়াইয়া ধরিয়া খুব কাঁদিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ঠাকুর ততোঽধিক

কাঁদিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাহা দেখিয়া অবাক্; তাঁহারা ভাবিলেন, ঠাকুর মায়াধীন হইয়া বোধহয় ঐরূপ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিলেন না যে, মায়াধীশের লীলা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। অতঃপর কালীধনবাবুর পিতা তাঁহাকে লইয়া গেলে, ঠাকুর ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন, "কালীধনের পিতার কান্না দেখিয়া আমার মনে হইল, পার্থিব-পিতার নিজের সন্তানের উপর যদি এরূপ স্নেহ হয়, না জানি, পরম-পিতার সন্তানের উপর কত স্নেহ!" এই বলিয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন।

প্রত্যেক নিত্য-ভক্তই অনুভব করিতেন যে, শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। এমন কি, মাতৃভাবে আবিষ্টাবস্থায় কেহ কেহ তাঁহার কোলে পর্য্যন্ত স্থান পাইতেন। তন্মধ্যে স্বরশুনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, বরিশাল-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষ মহোদয় প্রমুখ ভক্তগণের আচরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে শ্যামা-বিষয়ক কীর্ত্তন হইতেছিল। তৎশ্রবণে পূর্ণবাবু এরূপ বিভোর হইয়াছিলেন যে, লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার (ঠাকুরের) কোলে উঠিয়া স্তনপান করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও মাতৃভাবে ভাবান্বিত হইয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে ভক্তদিগকে এইভাবে স্তন দান করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের হুগলী-অবস্থান-কালে এত অধিক ভক্ত-সমাবেশ হইতে লাগিল যে, প্রত্যহ প্রায় পঞ্চাশ-ষাট্ জন প্রসাদ পাইতেন। অথচ আয় খুব কম ছিল। এমত অবস্থায় লোক-বুদ্ধিতে মঠ চালান দুরূহ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইলেও ঠাকুরের কৃপাশক্তি প্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হইত। তাই প্রতি রোজ মঠের কলাগাছ হইতে পঞ্চাশ-ষাট্খানি বা ততোঽধিক পাতা কাটা হইলেও কি শীত কি গ্রীষ্ম কোন কালেই বাগানে পাতার অভাব হইত না। আবার বাগানের শাক্-সব্জী প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হইত; তথাপি কোন দিনই উহার অভাব বোধ হয় নাই। ফল-ফুলের গাছগুলিও যেন মঠের অভাব দূর করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। বাগানের দ্বারা এই সমস্ত কাজ হইত বটে; কিন্তু চা'ল, ডা'ল,

তেল, লবণ, কয়লা ইত্যাদি বাজার হইতে ক্রয় করিতে হইত। কোন কোন দোকানদার মঠবাসীকে বিশ্বাস করিয়া ধারেও দ্রব্যাদি দিতেন। কিন্তু যাঁহার যাহা পাওনা থাকিত, তিনি চাহিবামাত্র ঠাকুর তাঁহার দেনা শোধ করিয়া দিতেন। কেহ কিছু চাহিলেই তিনি প্রায়ই বালিশের নীচে হাত দিয়া টাকা বাহির করিতেন। ইহা দেখিয়া ভক্তগণ অবাক্ হইয়া ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন।

অতঃপর বাসন্তী-অষ্টমী-তিথিতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের শুভ-জন্মোৎসব উপলক্ষে চতুর্দ্দিক্ হইতে বহু ভক্ত সমাগত হইলেন। ঠাকুর আশ্রম ঘরের মধ্যস্থলে একখানি তক্তপোসে অমিয়মাখা-পরম-কমনীয়-রূপের জ্যোতিঃ ছড়াইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে কুড়ি-পঁচিশ জন ভক্ত উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময় শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল গোস্বামীমহাশয় প্রণামান্তর বিনীতভাবে তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে বহুরূপে এবং বহুভাবে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য ভক্তগণের মুখে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে শুনিয়াছিলেন। তথাপি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের প্রকৃত তত্ত্ব গোস্বামীমহাশয় সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "এবার যদি সুবিধা হয়, সে সম্বন্ধে জানিয়া লইব।" সেইজন্য অন্তর্য্যামী ঠাকুর যখন তাঁহাকে একটী গান গাহিতে বলিলেন, তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার তত্ত্ব বুঝিবার জন্য বাউল-সুরে নিম্নলিখিত গানটী ধরিলেন—

"কেন হে গৌরহরি, নদেপুর ত্যজ্য করি, হুগলী এলে।
কা'র ভাবে হ'য়ে মগন, কর্‌ছ সাধন, কেনই বা সে ভাব লুকালে,
(হয়েছ বিষম কড়া) হয়েছ বিষম কড়া,
দাও না ধরা, এমন ধারা কেন হ'লে ?
(কও হে কও সত্য ক'রে) কও হে কও সত্য ক'রে,
কাহার তরে আবার ফিরে গোপন হ'লে ?"
যদিও গোপন হ'লে ভাব লুকালে,

নাম ভাঁড়ালে, জীবের জীবন !
(তথাপি যায় নি ঢাকা) তথাপি যায় নি ঢাকা
নয়ন বাঁকা মহাভাব আর আর নয়ন জলে ॥
জয় শ্রীজ্ঞানানন্দ, দাও আনন্দ, আর কেন কর ছলনা ?
অন্নদা আর কতদিন কাটাবে দীন চলে যায় সে ভরসা পেলে ॥"

শ্রীশ্রীদেব তাঁহার এই গানটী শ্রবণ করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া দর-দর-ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেরূপ অশ্রুপতন পূর্ব্বে আর একদিন মাত্র ভক্তগণ দেখিয়াছিলেন ; আর এই দেখিলেন। চক্ষু মুদ্রিত, অথচ তাহা হইতে মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রুবিন্দু উছলিয়া পড়িতেছিল। নয়নের দুই প্রান্ত দিয়া গঙ্গা-যমুনার ধারা বহিয়া গণ্ড ও বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া আসন সিক্ত করিতে লাগিল। এইভাবে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর ঠাকুর অতি আর্ত্তস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি গোপন কোথায় ? তোমাদের কাছে আমার গোপন কোথায় ? আর আমি কড়া হ'লাম কিসে ? আমি কড়া নহি, গো, কড়া নহি ; আমি আখ (ইক্ষু), আমার উপর শক্ত, ভিতরে শক্ত নহে !" এই বলিয়া ঠাকুর আকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ অন্যান্য ভাবোদ্দীপক আরও অনেক গান গাহিয়া ঠাকুরকে আনন্দে মগ্ন রাখিয়াছিলেন। এই ভাবে রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকা অতিবাহিত হইল। অতঃপর শ্রীশ্রীদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা বিশ্রাম-ভবনে গমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীদেবের অহেতুকী-কৃপা-প্রসঙ্গে প্রায় অবশিষ্ট রজনী অতিবাহিত করিলেন।

এই ঘটনার পর নৃত্যগোপাল গোস্বামীমহাশয়ের ঠাকুর সম্বন্ধে সমস্ত সংশয় দূর হইল। তাই, তিনি অভ্রান্তরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, ঠাকুর মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভিন্ন অপর কেহই নন। সেইজন্য তৎপর দিন ঠাকুর যখন তাঁহাকে ডাকাইলেন, তখন তিনি সেই ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীশ্রীচরণ-সমীপে উপনীত হইবামাত্রই, ঠাকুরের জ্যোতির্ম্ময়-মূর্ত্তি-দর্শনে

স্তম্ভিত হইলেন, আর নড়িতে পারিলেন না। তদ্দর্শনে ঠাকুর অভয়-দান পূর্ব্বক তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। তিনি সেই আদেশ অনুসারে তাঁহার নিকটে গমনান্তর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। কত-ক্ষণ যে এইরূপ অবস্থায় ছিলেন, তাহা তিনিও জানিতে পারিলেন না। তৎপর ঠাকুর তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া উঠাইলেন এবং গোস্বামীমহাশয় আর্ত্তভাবে বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। "আমি ত বহুদিন তোমার সমস্ত ভার নিয়েছি" বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে নিশ্চিন্ত হইতে বলিলেন। ইহাতে নৃত্যগোপাল গোস্বামীমহাশয় প্রাণে পরমা শান্তি বোধ করতঃ ঠাকুরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আহা! শ্রীভগবান্ যখন মনুষ্যের ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন, তখন তিনি যদি সমস্ত সময় ঐশ্বর্য্য-ভাবেই থাকেন, তাহা হইলে লীলার মাধুর্য্য থাকে না—তাহা হইলে সাধারণ জীব তাঁহার নিকট যাইতেই সাহস করিতে পারে না। তাই, তিনি নর-রূপের অনুরূপ কার্য্য করেন; তাই, তিনি হাসি-কান্না-আহারাদির লীলা করেন। এই-জন্যই জীব তাঁহাকে 'তাহাদেরই একজন' মনে করিয়া তাঁহার সেবাদি করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। ঠাকুর বলিতেন, "নিরাকার যদি সাকার হইয়া তোমার নিকট না আসিতেন, তবে কেমন করিয়া তুমি তাঁহার সন্ধান পাইতে? তিনি আপ্তকাম হইয়া গ্রহণের ভাণ না করিলে তুমি তাঁহাকে কি দিয়া ধন্য হইতে? তাঁহার কিসের অভাব? কিন্তু তোমার সেবা লইবার জন্যই তিনি আপন অভাব দেখান: তাঁহার কিসের শোক, কিসের দুঃখ? কিন্তু তোমার দুঃখ দূর করিবার জন্যই তিনি সম-বেদনা দেখান।" আবার অনেক সময় তিনি ভক্তগণকে বলিতেন, "হ্যাঁ গা, ঐশ্বর্য্য-ভাবের চাইতে কি মাধুর্য্য-ভাব ভাল নয়?"

প্রকৃতপক্ষে নিত্য-লীলা গভীর-রহস্যময়ী; কেননা নিত্য-মঠ হুগলী-সহরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও স্থানীয় লোকের মধ্যে খুব অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিরই ঠাকুরের কৃপা লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কেবল তাহাই নয়;

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল
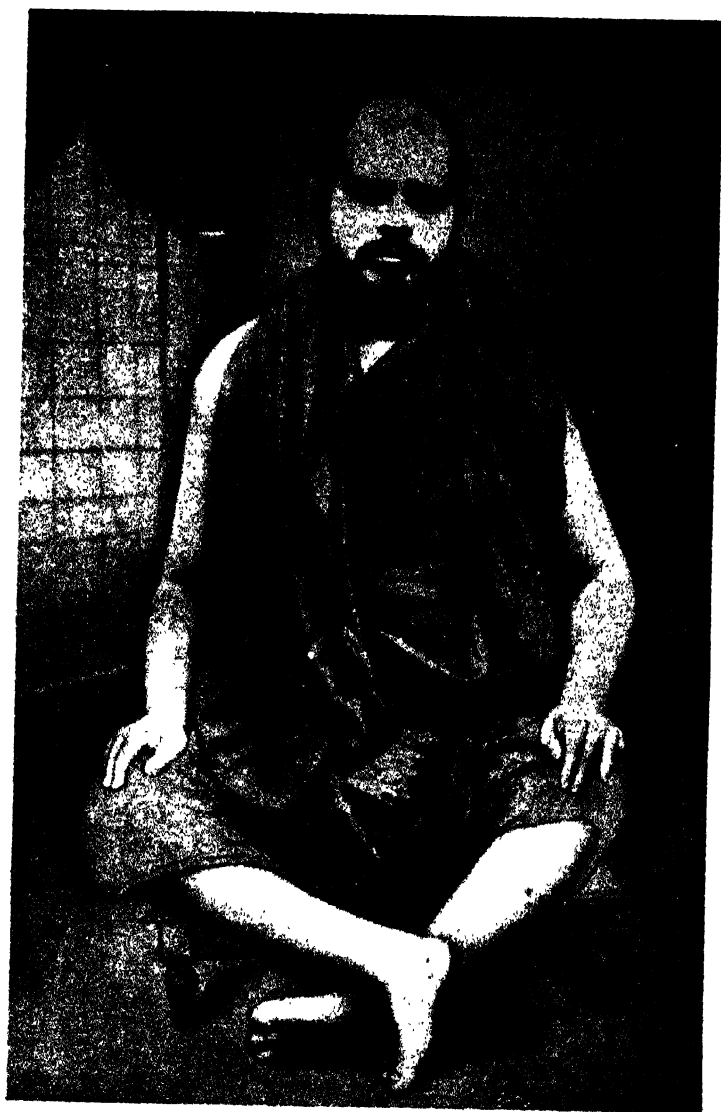
(যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব)

অনেকেই তদ্দর্শন লাভ তো করিতে পারেনই নাই ; বরঞ্চ স্থানান্তর হইতে পুরুষ-ভক্তের সহিত স্ত্রী-ভক্তবৃন্দের সমাগম, কালীবাড়ীতে 'মা'র' নিকট শাস্ত্রবিধান অনুসারে উৎসর্গীকৃত ও তথা হইতে বলিদানের পর আনীত সুপশু-দেহ বা মহাপ্রসাদ দর্শন এবং নানা বাদ্যসহ উচ্চৈঃস্বরে-কৃত-কীর্ত্তন-ধ্বনি ও ভাব-মত্ত-ভক্ত-কৃত চীৎকার-হুঙ্কারাদি শ্রবণে বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন অনেকে ঠাকুরের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনা করিতে পর্য্যন্ত পশ্চাৎপদ হন নাই। ইহাতে বিশেষ দুঃখ অনুভব করিয়া সত্যেনবাবু একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বাবা, এ কি ! কত দূর-দেশ হ'তে কত গণ্যমান্য ব্যক্তি এসেও শ্রীচরণাশ্রিত হ'চ্ছেন; আর নিকটের লোকদের এরূপ বিকৃত বা বিদ্বেষ-ভাব কেন ?" ইহা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "সত্যেন, এরা প্রদীপের কোল-আঁধারে প'ড়ে গ্যাচে।" কুৎসা-কারীগণ তাঁহাদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আরও সুবিধা পাইয়াছিলেন বিশেষভাবে (এই গ্রন্থে অষ্টাদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত) দুর্গোৎসবের সেই দিন যেদিন রংপুর-জেলার অন্তঃপাতি টেপার বিখ্যাত জমিদার নিত্য-ভক্ত শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ রায়চৌধুরীমহাশয় প্রচুর-অর্থ-ব্যয়ে তাঁহার মনেরসাধে একটী মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে তিনি কলিকাতা হইতে অন্যান্য অনেক দ্রব্যের সহিত কাঠের বাক্সে প্রচুর পরিমাণে সোডা-ওয়াটার, বরফ প্রভৃতি আনাইয়াছিলেন এবং ছয়টী সুপশু কালীবাড়ীতে বলি দেওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীদেবের আদেশে ঐগুলি প্রকাশ্যে সদর রাস্তা দিয়া ভক্তগণ (রক্তাক্ত কলেবরে) বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। রাত্রে তুমুল কীর্ত্তন হইয়াছিল। এই সমস্ত দর্শন ও শ্রবণপূর্ব্বক কুৎসা-কারীগণ ঠাকুরের বিরুদ্ধে অনেক অশ্রাব্য উক্তি করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীদেব কেবল যে এইভাবেই নিজের মাহাত্ম্য আবরণ দিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি তাঁহার সম্মুখে অনেক বোতল এমনভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাহা আগন্তুকের নিকট মদের বোতল বলিয়া মনে হইতে পারে এবং তিনি ঠাকুরকে সুরাপায়ী

মনে করিতে পারেন। ইহা ছাড়া তাঁহার (আগন্তুকের) নিকট ঠাকুর নিজেকে নানা-ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অনেকেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া চলিয়া যাইতেন। বিশেষ ভক্তিমান ও সুকৃতিবান্ লোক ব্যতীত অনেক সময় কেহ এসব আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার আশ্রয় লাভ করিতে সক্ষম হইতেন না। তবে তাঁহার ভুবন-মোহন রূপ-লাবণ্য দর্শনে দ্রষ্টামাত্রই যে চমৎকৃত হইতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয়না বলিয়া মনে করি; কেননা তিনি যেদিন হুগলী-বারের বিখ্যাত উকিল পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্রমহাশয়কে ভোট দিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন, সেইদিন তাঁহার বিশ্ব-বিমোহন-মূর্ত্তি-দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এমন কি, পূর্ব্বোক্ত কুৎসা-কারীদের মধ্যে একজন সেই 'মন্মথ-মন্মথ' রূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এমন অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি নিজের অন্যায় সম্পূর্ণরূপে অনুভব করতঃ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন এবং অবশেষে শ্রীশ্রীদেবের পাদস্পর্শপূর্ব্বক কৃত-অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই রূপের বর্ণনা যে কত ভক্ত কতভাবে করিয়াছেন তাহার স্বল্পাংশমাত্র এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অন্যান্য অনেক ভক্তের ন্যায় পাবনা-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীচরণ দে সরকারমহাশয় তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন, "...সে রূপের তুলনা নাই।... সাধক-নয়ন তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া পুনঃপুনঃ নির্ণিমেষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। কিবা আকর্ণ-বিস্তৃত-আনন্দ-ঢুলু-ঢুলু-পঙ্কজ-নয়নদ্বয়! একে ঈষৎ রক্তিম সর্ব্বাঙ্গীন আভা, তাহাতে আবার অরুণ-বসন সংযোজিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। পঙ্কজানন হইতে অমৃত-নিস্যন্দিনী বাণী নির্গত হইয়া উপস্থিত দর্শক-মণ্ডলীর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছিল। ...আমার উপর দৃষ্টি নিপতিত হইল। যেন আমি তাঁহার কত পরিচিত; কত আপনার।...শ্রীশ্রীদেবের তৎকালীন এই অশ্রুতপূর্ব্ব এবং অলৌকিক ভাব দর্শনে বোধ হইল যেন আমি সুধা-হ্রদে নিমজ্জিত রহিয়া এক একবার

অগণ্য তারকা-বেষ্টিত সুধা-নিধির বদন-সুধা পান করিতেছি—আর মনে মনে চিন্তা করিতেছি, 'দর্শনে এত না জানি স্পর্শনে বা কত।' এইরূপ জ্যোতিতে বিদগ্ধ না করিয়া কৌমুদী নিশার কৌমুদী রাশির ন্যায় স্নিগ্ধতা উপভোগ করায় ; ইহার অমল জ্যোতি শারদীয় পূর্ণ চন্দ্রমার ন্যায়। যে ভাগ্যবান্ পুরুষ এই রূপ একবার দর্শন করিয়াছেন, তিনি পাপ-তাপ-পূর্ণ সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা মুহূর্ত্তকালের মধ্যে বিস্মৃত হইয়া নির্ম্মল শান্তির অঙ্কে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে পারেন।···শ্রীশ্রীদেবকে দর্শন করিবার পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডের সম্মুখে জটাজুট-ধারী, বিভূতি-ভূষিত এবং গঞ্জিকা-সেবী সন্ন্যাসী ঠাকুর না জানি ভক্তবৃন্দের কতই বা ভীতি-উৎপাদক ; কিন্তু এক্ষণে দর্শনমাত্রেই আমার মন হইতে সে ধারণা বিদূরিত হইল! জটাজুট-ধারী এবং বিভূতি-ভূষিত নহেন। গঞ্জিকা সেবন ত দূরের কথা তাম্রকুটের পর্য্যন্ত সম্পর্ক নাই। কেবল সন্ন্যাসীর চিহ্ন কষায় বসন পরিহিত। আর দেখিলাম আড়ম্বরশূন্য, স্বভাবসুন্দর, সৌম্যমধুর, অত্যুজ্জ্বল গৌরমূর্ত্তি। অধিকন্তু তদীয় উপদেশাবলী দেশকাল-পাত্রভেদে সর্ব্বদেশের উপযোগী। এইজন্যই বোধহয় অধিকাংশ শিষ্যই পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত, সংস্কৃতশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চউপাধিধারী।··· বলিতে কি ভাই! শ্রীশ্রীদেবের আড়ম্বরশূন্য অপরূপ রূপ* আমার হৃদয় আকর্ষণ করিল। আমার বহুদিনের পোষিত শুষ্ক জড়-

*বাস্তবিকই শ্রীশ্রীদেবের সম্বন্ধে বলা যায়, তাঁহার "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।" তাই বোধহয় কুমিল্লার উকিল ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেন, বি-এল্, মহাশয়ও তদ্দর্শন লাভান্তর বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের দেহের বর্ণ কণক গৌর ও দেহের কান্তি অপূর্ব্ব ; একবার তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শন করিলে আত্মহারা হইতে হইত। তাঁহার মুখমণ্ডল দিব্যজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত ; চক্ষুর্দ্বয় স্নিগ্ধ, কমনীয় ও মনোহর ; তিনি প্রফুল্লবদন ও তাঁহার স্মেরানন মনোহর ; তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে ধীর, কোমল ও মধুর হাসি লাগিয়া রহিয়াছে। দেহ নবনীত-কোমল এবং

বিজ্ঞান তদীয় উপদেশামৃত বন্যায় ভাসিয়া গেল। তখন আর আমাতে আমি রহিলাম না।…শ্রীশ্রীদেবকে যখনই দর্শন করিতে গিয়াছি তখনই আমার নিকট নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছেন। কখন বা সুধা-ধবলিত ভগবান্ চন্দ্রচূড়ের ন্যায়, কখন বা অরুণরাগরঞ্জিত তপঃপরায়ণ কমল-যোনি-পিতামহের ন্যায়; কখন কখন বা এতদুভয় হইতে আরও কিছু বিভিন্ন অপরূপ ছটা! তাঁহার বীণাবিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠস্বর সর্ব্বজনপ্রীতিকর।"

এই স্থানে ঠাকুরের অপূর্ব্ব ভক্ত-বাৎসল্যের আর একটী দৃষ্টান্তরূপে আর একটী ঘটনা উল্লিখিত হইতেছে: পূর্ব্বোক্ত কালীধনবাবুর শ্রীযুক্ত বলাই পাল নামে এক মাতুল ছিলেন। শ্রীশ্রীদেবের কৃপা লাভ করিবার পরও তাঁহার পূর্ব্ব-কলুষিত চরিত্র সংশোধন হইয়াছিল না। কিন্তু শ্রীশ্রীদেবের মহিমাগুণে সেজনা তৎপ্রতি ইঁহার শ্রদ্ধার ব্যতিক্রম লক্ষিত হইত না; কেননা একদিন উষাকালে জনৈকা বারবণিতার গৃহ হইতে রাস্তায় বাহির হইবার পর তিনি দেখিলেন যে, একটী দোকানে 'অমৃতি' প্রস্তুত হইতেছে। ইহা দেখিবামাত্র তাঁহার শ্রীশ্রীদেবের কথা মনে হইল; যেহেতু ঠাকুর উহা বড় ভালবাসিতেন। তখন ভাবাধিক্য-বশতঃ তাঁহার দেহের অশুচি অবস্থার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উহা ক্রয়পূর্ব্বক ট্রেন্‌যোগে হুগলী-মঠে চলিলেন। ইপ্সিত স্থান প্রাপ্তির পর যখন মুক্তদ্বার নিত্য-প্রকোষ্ঠের সম্মুখে তিনি দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তাঁহার মনে হইল যে, তিনি ত অপবিত্র, অস্নাত অবস্থায়

সর্ব্বাঙ্গ প্রেমে ঢলঢল।… মধ্যে মধ্যে ঠাকুর অমৃত নিস্যন্দিনী মধুর ভাষায় নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া ভক্তদিগের প্রাণে বিমল আনন্দ সঞ্চার করিতেন। একাধারে এরূপ গভীর জ্ঞান এবং প্রেমের সমাবেশ দুর্ল্লভ। তাঁহার সমন্বয় তত্ত্ব সম্বন্ধীয় উপদেশাবলী শ্রবণ করিলে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি, পরমতাসহিষ্ণুতা ও সংকীর্ণতা দূর হইত। ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ মর্ম্মে প্রবেশ করিত।…"

আছেন। এখন তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উক্ত কক্ষের দ্বারেই দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না; এমন সময় পরম-কারুণিক ঠাকুরের স্নেহমাখা-দৃষ্টি বলাইবাবুর উপর নিপতিত হইল; এবং তিনি তাঁহাকে সাগ্রহে ডাকিলেন। কিন্তু পালমহাশয় নিজেকে বিশেষ অপবিত্র ও অপরাধী মনে করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে যেমন অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তেমনই আবার সরলভাবে সমস্ত বিষয় শ্রীচরণে ভক্তিভাবের সহিত নিবেদন করিলেন। ভক্তানুকম্পী, ভক্তবৎসল ঠাকুর কি আর স্থির থাকিতে পারেন! তিনি স্নেহান্ধ জননীর ন্যায় তাঁহাকে অভয়দান পূর্ব্বক ঐ অবস্থায়ই অম্লান-হৃদয়েই তৎপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে আদেশ দিলেন। বলাইবাবু তৎসন্নিধানে গমন করিলেই পরম দয়াল ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে স্বহস্তে আনীত অমৃতির পাত্রটী সাগ্রহে লইলেন এবং প্রাণ ভরিয়া উহা ভোজন করিতে লাগিলেন। অন্যদিন ঐ বস্তু অল্প মাত্রায় গ্রহণ করিলেও আজ তিনি উহা প্রায়শঃ নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। আহা! দৈনন্দিন-জীবনে আহার-বিহারে বিশেষ শুদ্ধাচার-সম্পন্ন ঠাকুর ভক্তের অন্তরের ভাব দর্শনে তাঁহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা পূর্ব্বক তাঁহার দেহের অশুচিতা আর কর্ত্তব্যের মধ্যে আনিলেন না। তাই বলি, ভক্তের সরল ভাবটীই ঠাকুরের হৃদয়গ্রাহী হইল। ইহার পর বলাইবাবুর চরিত্র-দোষ চিরতরে দূরীভূত হইল।

নিত্য-কৃপা-বারিতে যেমন বলাইবাবুর স্বভাবগত মালিন্য বিধৌত হইয়াছিল, তেমনই আলমবাজার-(বরাহনগর)-নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনী-মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকৃতিগত চণ্ডতা নিত্য-কৃপা-বহ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিল। বাস্তবিকই, যিনি এক সময়ে নানাভাবে সাধুমাত্রকেই উৎপীড়ন করিতেন এবং দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের পবিত্র কক্ষ হইতে মিষ্টান্ন অপহরণ পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিতেন, তিনিই যখন শ্রীনিত্য-চরণে আশ্রয় লাভ করিলেন, তখন কোথায় গেল তাঁহার দুর্দ্দান্ত স্বভাব, আর কোথায় গেল তাঁহার চৌর্য্য-প্রবৃত্তি! ঠাকুরের নিকট

দীক্ষা-গ্রহণের পর নিত্য-ভক্তি-প্রভাবে তাঁহার পাষাণ-হৃদয় যেন বিগলিত হইয়া গেল। তখন হইতে তিনি হইলেন নামে মাতোয়ারা। কথিত আছে যে, তিনি যখন প্রথম শ্রীশ্রীদেবকে দর্শন করেন, তখন নলিনীবাবু দেখিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন এক বিরাট মূর্ত্তি; তিনি ভীষণাদপি-ভীষণ; তাঁহার ভয়ঙ্কর তেজঃপুঞ্জ কলেবর ঐ দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতি লোকের হৃদয়ে ভয়ানক ভীতির সঞ্চার করিল। ইহাই বোধহয় হইল তাঁহার সংশোধনের কারণ। তিনি শ্রীশ্রীনিত্যদেবকে যেমন পরমব্রহ্ম বলিয়া পরম ভক্তি করিতেন, তেমনই তদীয় শিষ্যবৃন্দকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।

প্রকৃতপক্ষে, গম্ভীরা-লীলা-কালেও প্রেমেরঠাকুর সময়২ ভক্তগণের সহিত রসিকতার লীলাও বেশ করিতেন। জনৈক মধুর-ভাবাপন্ন ভক্তের বিষয় কৌতুক করিয়া তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,"ওগো! এর ঘোষাণীর (শ্রীরাধিকার) ভাব হ'য়েছে গো! ঘোষাণীর ভাব হ'য়েছে!" একদিন পূর্ব্বোক্ত বোতলগুলির দিকে লক্ষ্য করিয়া জনৈক ভক্ত বলিয়াছিলেন, "বাবা, ওগুলি সরিয়ে ফেলে দিলে হয় না?" রসের-নাগর ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন, "ওগো! আরও কিছু পেলে ভাল হয়। এই দেখে যে পালাবার সে পালাক্।" আবার উহার একটীতে হাত দিয়া সত্যেনবাবুকে বলিয়াছিলেন, "হাঁ গা সত্যেন! বল্‌তে পার এতে কি আছে?" সত্যেনবাবু জানিতে চাহিলে, 'যেভাবে বোতল হইতে মাতালে মদ খায়' রসিকতা করিয়া ঠাকুর সেইরূপ ঢং করিলেন এবং প্রথম বলিলেন "মদ"; তারপর বলিলেন,"না, সত্যেন, ওগুলি ওষুধের পাত্র। এরা আমার খুব সেবা করে।" (অর্থাৎ ওগুলি ঠাকুরের গোপনভাবে থাকিবার বিশেষ সহায়তা করে)। অপর একদিন সত্যেনবাবু কয়েকজন পরমার্থ-ভ্রাতার সহিত কিছু মিষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিয়া মঠে আগমন করতঃ দেখিলেন, তখন নিত্য-প্রকোষ্ঠ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাদের বাসের 'হল্' ঘরে ওগুলি শ্রীশ্রীদেবকে নিবেদন করিয়া দিয়া তাঁহারা প্রসাদ পাইলেন। অবশ্য

নিবেদন করিবার সময় তুলসীপত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। বলাবাহুল্য, ঐ কার্য্য সর্ব্বদর্শী ঠাকুরের দৃষ্টির বাহিরে সম্পাদিত হইতে পারে নাই। তাই, যখন ভক্তগণ শ্রীনিত্য-চরণ-দর্শনার্থ নিত্য-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "বেশ! তোমাদের বেলায় মিষ্টি, আর আমার বেলায় শুধু তুলসী, না!" ইহা শুনিয়া ভক্তগণ বিশেষ অপ্রতিভ হইলেন এবং মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন যে, সর্ব্বদর্শী ঠাকুরের দৃষ্টির বাহিরে আর কিছুই করিবার উপায় নাই। আহা! এইরূপ মাধুর্য্য-বিজড়িত ঐশ্বর্য্য-লীলা দর্শনে সকলেই যেমন বিশেষ আনন্দ সম্ভোগ করিতেন, তেমনই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। যাহাহউক, সুরেশবাবু নামে জনৈক নিত্য-ভক্তের স্বহস্তে প্রস্তুত ঢাকাই পরোটা অতি উপাদেয় হইত। এইজন্য তাঁহার উপাধি হইল 'পরোটা'; তাই তাঁহাকে 'সুরেশ-পরোটা' বলা হইত। ভক্তবর একদিন একটী মাল্য শ্রীঅঙ্গে ভক্ত্যুপহার দিতে উদ্যত হইলে শ্রীশ্রীদেব হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন; "ওগো! তোমার হাতের মালার চাইতে তোমার হাতের পরোটাই ভাল।" আবার, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র নামে শ্রীশ্রীদেবের একজন শিষ্য ছিলেন। তাঁহার হৃদয় ছিল যেমন সরল তেমনই উচ্চ এবং স্বভাবটীও ছিল অতি নিরীহ। এইজন্য ভক্তগণ তাঁহাকে একেবারে আপনার জনের ন্যায় খুবই ভাল-বাসিতেন। তাই, তিনি মঠে প্রবেশ করিলেই ভক্তগণ একটুমাত্র ইতস্ততঃ বোধ না করিয়া তাঁহার পকেটে যাহা কিছু থাকিত সে সমস্তই বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া লইয়া মিষ্টান্নাদি ক্রয় করতঃ ভোগ লাগাইতেন। ইহাতে ভক্তবরও মনে মনে খুবই আনন্দ বোধ করিতেন; কিন্তু বাহ্যতঃ কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। একবার ঐরূপ ঘটনা ঘটিবার পর তিনি গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন এত সরল ছিল যে, নিঃশঙ্ক-চিত্তে তিনি তথা হইতে শ্রীশ্রীদেবের নিকট ভক্তগণের সম্বন্ধে লিখিলেন, "শালাদের অত্যাচারে আমার পকেটে কিছু থাকবার যো নাই।" রসিক-চূড়ামণি প্রেমের ঠাকুর ভক্তগণকে পত্রখানি সম্পূর্ণ শুনাইয়া

বলিলেন, "হাঁ গা ! ক্ষীরোদ তোমাদের তবে কে হ'ল ?" তখন জনৈক রসিক-ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, সে আমাদের 'বোনাই' হ'ল।" এই ঘটনার পর হইতে ক্ষীরোদবাবু মঠে আগমন করিলে ভক্তগণ তাঁহাকে 'বোনাই' বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কত আমোদ আহ্লাদ করিতেন। এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদ অনেক হইত ; ইহাতে ঠাকুর বাধা দিতেন না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অবতার-মহাপুরুষগণের আচরণ গভীর-রহস্যময়। 'তাঁহাদের সাধারণ উক্তিও অনেক সময় এরূপ গম্ভীর-ভাবপূর্ণ হইয়া থাকে যে, তাঁহাদের অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দও তাহার তথ্য নিরূপণ করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন।'* শ্রীশ্রীঠাকুরের হুগলী-লীলা-কালের এইরূপ একটী ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জনৈক ভক্তের একটী ব্যাপারে লোভের প্রকাশ পাইয়াছিল ; ইহা জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীনিত্যদেব যেন ক্রোধোন্মত্ত হইয়া কর্কশ-ভাষায় তাঁহাকে বলিয়া উঠিলেন, "তোর জিব্ খোসে যাক্ !" যে পরম-কারুণিক শ্রীশ্রীনিত্যদেব তাঁহার আশ্রিতবৃন্দের কত মহা-মহা অপরাধ নিজ দয়া-গুণে অবলীলাক্রমে সতত মার্জ্জনা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে সামান্য কারণে ভক্তবরকে ঐরূপ ভীষণ অভিশাপ করিতে দেখিয়া উপস্থিত অন্যান্য ভক্তবৃন্দের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তাঁহারা অবাক্ হইয়া চাহিয়া

*নিম্নে প্রদত্ত লর্ড্ যীশুখৃষ্টের বাণী ও তৎসম্বন্ধীয় ভক্ত পিটারের প্রশ্ন ও যীশুখৃষ্টের উত্তরও উক্ত কথার পরিপোষক :

"...এবং তিনি (যীশুখৃষ্ট) সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "শুন এবং বুঝ যে, 'যা' মুখের ভিতরে যায় তা' মানুষকে কলুষিত করে না ; কিন্তু যা' মুখ হ'তে বার্ হয় তাই মানুষকে কলুষিত করে'।"...অনন্তর পিটার্ (উত্তরে) বলিলেন, "এই প্যারাবল্-(Parable =কথা ; উপদেশপূর্ণ গল্প ; উপমা)-টীর ভাবার্থ-টা আমাদের কাছে প্রকাশ ক'রে বলুন।" এবং যীশু বলিলেন, "তোমাদেরও কি এখনও বোধ (বা বুদ্ধিলাভ) হয় নাই ? তোমরা কি এখনও বুঝ না যে, যা'

রহিলেন : অন্তর্যামী ঠাকুর তাঁহাদের অন্তরের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া উচ্চ-হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, গা! আমি কি ব'লেছি? আমি বল্‌লুম্, 'তোর জিব্ খোসে যাক্।' 'জিব্' মানে কি গো? 'জিব্' মানে কি তোমরা কেবল 'জিহ্বা'ই বোঝ? বলি, 'জিব্' মানে কি 'জীবত্ব' হোতে পারে না? 'জিব্' শব্দের অর্থ যদি 'জীবত্ব' করা যায়, তা'হোলে আমি তা'কে কি বল্‌লুম্, গো? আমি যে তার 'জীবত্ব' খোসে যেতে বল্‌লুম্!" 'জীবত্ব খোসে যাওয়া' অর্থে 'জীবত্ব নাশ পাওয়া' বুঝিতে হইবে। বাস্তবিকই, জীবত্বই 'জন্ম-মরণ-রোগ-শোক-দুঃখ-সুখ'-রূপ অনিত্য-সংসারের কারণ। জীবত্বই মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে; জীবত্বই সমস্ত অনর্থের মূল; জীবত্বই তাহাকে ষড়্‌রিপুর বা সংসারের দাস ও তাহাতে ও অনিত্য-সুখে নানাভাবে আসক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই জীবত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিবার উদ্দেশ্যেই মানুষকে সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হইয়া নানাবিধ সাধন-ভজন করিতে হয়। এই জীবত্ব-মুক্তি-বা-জীবন্মুক্তি-লাভই পরমার্থ-লাভ। আহা! ভক্তগণ শ্রীশ্রীনিত্যদেবের যে উক্তিকে ভীষণ অভিশাপ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাহাতে যে করুণাময়ের পরম করুণার বা অহেতুকী-কৃপার

মুখের ভিতর (বা ভিতর দিয়ে) যায় তা' পেটের মধ্যে যায়, এবং তা' পায়খানায় নিক্ষিপ্ত হয়! কিন্তু যে সব জিনিষ মুখের ভিতর হ'তে বা মুখ থেকে বার্ হয় তা' অন্তরের (হৃদয়ের) মাঝ থেকে বার্ হয়; এবং এই সবই মানুষকে কলুষিত করে; যেহেতু অন্তর থেকে বার্ হয় কুচিন্তারাশি, হত্যা, পরদার-গমন, ব্যভিচার, চৌর্য্য, মিথ্যা-সাক্ষ্য, ঈশ্বরনিন্দা বা অপবিত্র ভাষা। এই সমস্ত জিনিষই মানুষকে কলুষিত করে; কিন্তু অধৌত হস্তে খাওয়াটা মানুষকে কলুষিত করে না।"... ('The Gospel Acc. To St. Mathew, Chap. 15' অর্থাৎ 'সাধু-ম্যাথুর গস্পেল (বা সুসমাচার বা খ্রীষ্টীয় প্রত্যাদেশ বা ধর্ম্মমত) ১৫শ অধ্যায়' হইতে উদ্ধৃত কতিপয় পংক্তির মৎকৃত বঙ্গানুবাদ)।

প্রকাশই সূচিত হইয়াছিল ! তাহা তাঁহারা না বুঝিতে পারিয়াই ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন ।

উল্লিখিত ঘটনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, কোনও ব্যক্তি (এমন কি কোনও অন্তরঙ্গও) যতই পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন হউন না কেন তিনি দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন না হইলে অবতার-মহাপুরুষগণের সমস্ত উক্তির গভীরতা ও মর্ম্মার্থ সব সময় সম্যক্‌রূপে অবধারণ করিতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত, কেবল যে তাহা ধারণা করিতেই পারেন না তাহা নহে ; তাঁহাদের মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণান্তর ভবিষ্যতে তাহা বিবৃত বা লিপিবদ্ধ করিবার সময়ও বক্তা বা লেখক (বিশেষ পণ্ডিত ও ভক্তি-মান্ হইলেও) তাহা সম্পূর্ণ অভ্রান্তভাবে বা যথাযথ প্রকাশ করিতে পারেন না। তাঁহার রচনাতে তাঁহার নিজের ভাব ও ভাষা অজ্ঞাত-সারে প্রবেশপূর্ব্বক উক্ত বাণীকে 'অপদ্রব্য বা ভেজালমিশ্রিত' করিয়া থাকে। লেখকের দিব্যজ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি না থাকায় ইহার অন্যথা হয় না। ইহা আমরা নিম্নলিখিত বাক্যাবলী হইতেও সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিব : *"...ঠাকুর। "আমি কি ব'লেছিলুম্ ?" মাষ্টার। "যে তাঁর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কোরে থাকে শ্রীভগবান্ তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। অভিভাবক যেমন নাবালকের ভার নেন্ এও সেইরূপ। আপনি আমাদিগকে আরও বলেছিলেন যে, কোনও ভোজের (বা উৎসবের) সময় কোনও ছেলেপেলে তার খেতে বস্‌বার জায়গা নিজে ঠিক কোরে নিতে পারে না ; তা' অন্যের ঠিক কোরে দিতে হয়।"

*শ্রীমকথিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের" সমস্ত খণ্ড না পাওয়ায় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমৎগুরুমহারাজ শ্রীশ্রীমৎস্বামী নিত্যপদানন্দ অবধূত মহারাজের রচিত শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের ইংরাজী জীবনীর ৩৩০—৩১ পৃষ্ঠায় 'দি গস্পেল্ অভ্ শ্রীরামকৃষ্ণ' ('The Gospel of SriRamKrishna', শ্রীমৎস্বামী নিখিলানন্দ-কৃত শ্রীমকথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র ইংরাজী অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত বাক্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ এখানে সন্নিবেশিত হইল।

ঠাকুর। "না, এ তো সব ঠিক বলা হ'ল না। আমি ব'লেছিলুম্ যে, ছেলেপেলের বাবা যদি তাকে হাত ধরে নিয়ে যায় তো সে পড়ে যায় না।"...

"...মাষ্টার। "আর চাতক পাখীর কথা (বলেছিলেন); সে বৃষ্টির জল ছাড়া কিছু খাবে না। আর জ্ঞান-যোগ ও ভক্তি-যোগের কথা (বলেছিলেন)।" ঠাকুর। "সে বিষয় আমি কি বলেছিলুম্?" মাষ্টার। "লোকের যতক্ষণ ঘড়ার জ্ঞান (বা অস্তিত্ববোধ) থাকে, ততক্ষণ তার 'আমি' জ্ঞান বা বোধ নিশ্চয়ই থাক্‌বে। যতক্ষণ লোকের 'আমি' জ্ঞান থাকে ততক্ষণ "আমি ভক্ত আর তুমি ভগবান্" এ বোধ সে ছাড়্‌তে পারে না।" ঠাকুর। "না, তা' তো না (অর্থাৎ আমি এরূপ বলি নি); ঘড়ার জ্ঞান লোকের থাকুক্ আর নাই থাকুক্ ঘড়া অন্তর্হিত হয় না বা চলে যায় না। লোকে 'আমি' বোধ ছাড়্‌তে (ত্যাগ করতে) পারে না। তুমি হাজার (বার) বিচার বা তর্ক কর্‌লেও এ যাবে না।"... মাষ্টার। "আর সেইদিন আপনি তোষামোদকারীদের কথা ঈশানকে বেশ ঠিকই বলেছিলেন। তারা মরাখেকো (বা মরার উপর বসা) শকুনির মত। আপনি একদিন পদ্মলোচনকেও তা বলেছিলেন।" ঠাকুর। "না, উলোর বামনদাসকে বলেছিলুম্।" (পৃঃ ৫৯০—৯১)।

আমাদের মনে হয়, শ্রীশ্রীনিত্যদেব সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতেন যে, অবতার-মহাপুরুষগণের বাণী যদি কোনও বিশেষ-পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন ভক্তও অত্যন্ত নিষ্ঠা ও মনোযোগের সহিতও শ্রবণ করিয়া তাহা সর্ব্বসাধারণের অবগতির (বা শিক্ষার) নিমিত্ত বিবৃত বা লিপিবদ্ধ করেন, তথাপি তাঁহার রচনায় বিশেষ ভ্রান্তি বা দোষ-ত্রুটী থাকিবেই; তাই, ইহা অপ-দ্রব্যমিশ্রিত (বা ভেজাল দ্বারা বিকৃতীকৃত) ঘৃতের ন্যায় কার্য্য করিবে। এইজন্যই বোধহয় তিনি নানা-তত্ত্ব-বিষয়ক তাঁহার উপদেশাবলী (বা সিদ্ধান্তসমূহ স্বরচিত গ্রন্থাবলীতে) স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাঁহার উপদেশাবলীর "সমুজ্জ্বল মৌলিকতা, পূর্ণ-সরলতা ও পূর্ণ-

বিশুদ্ধতা কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃতি দ্বারাও কলুষিত হয় নাই।" অতএব তাহা চিরনূতন ও চিরমধুর হইয়া রহিয়াছে। বাস্তবিক, তাহা বেদবাক্যবৎ পরম পবিত্র, হৃদয়স্পর্শী ও শিক্ষাপ্রদ। তাই, তাহা প্রকৃত সাধককে কুসংস্কারবর্জ্জিত, ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত ও জ্ঞানদীপ্ত করিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক-জীবনের প্রকৃত হিত ও উন্নতি সাধন করিতেছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

লীলা সংবরণ

"নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরং।
অলক্ষ্যং সর্ব্বভূতানামন্তর্ব্বহিরবস্থিতং ॥১৭
মায়াযবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ং।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা ॥"১৮॥

ভাঃ, ১ম স্কঃ, ৮ম অঃ।

[হে আদি পুরুষ! আপনাকে প্রণাম করি; আপনি স্বয়ং ঈশ্বর; প্রকৃতির অগোচর। আপনি অলক্ষিত ভাবে সর্ব্বভূতেরই অভ্যন্তরে ও বহির্দ্দেশে পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন। যেমন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, নাট্যধর-নটের বিচিত্র কার্য্য দর্শন করিয়াও নটকে চিনিতে পারে না; তদ্রূপ দেহাভিমানী অজ্ঞ জনগণও মায়া-যবনিকা দ্বারা আচ্ছন্ন আপনার সনাতন স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে অথবা আপনার এই লীলা বুঝিতে সমর্থ হয় না।]

অতঃপর ১৩১৭ সালে শারদীয়া পূজা উপলক্ষে রংপুরের অন্তর্গত টেপার জমিদার পূর্ব্বোক্ত অন্নদাবাবু ঠাকুরের বিশেষভাবে ভোগরাগের ব্যবস্থা করিলেন। ভোগ দিবার জন্য নূতন রূপার থালা, ঝটী প্রভৃতি

প্রস্তুত করাইলেন। নানাবিধ ভোগের সামগ্রীও সংগ্রহ করাইলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে বহু ভক্ত আগমন পূর্ব্বক এই উৎসবে যোগদান করিলেন। ভক্তগণ তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় শ্রীশ্রীনিত্যদেবকে মনের সাধে নানাবিধ ফুল-সাজে সজ্জিত করিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালের রাতুল পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীদেব একে একে নবাগত ভক্তগণের শারীরিক এবং পারিবারিক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া, "ভবে কে বলে কদর্য্য শ্মশান ?" এই গানটী শুনিতে চাহিলেন। ইহা শুনিয়া ভক্তগণের বুক কাঁপিয়া উঠিল। "সর্ব্বনাশ! ঠাকুর ত কোনও দিন শ্মশানের গান শুনতে চান্ নাই! আজ হঠাৎ শ্মশানের গান শুনবার সাধ হ'ল কেন? ঠাকুর কি তবে আমাদিগকে ফাঁকি দিবার সংকল্প ক'রছেন? সত্যসত্যই কি এই অদ্ভুত-সাকার-নিত্যগোপাল মূর্ত্তি আর দেখ্‌তে পা'ব না?"—এই চিন্তায় ভক্তগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কে জানে যে, প্রায় চারি মাস পরে সেই ভয়ানক শোকাবহ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবে? আজ কি ঠাকুর তাহারই ইঙ্গিত করিয়া রাখিলেন? যাহা-হউক, ঠাকুর যে গানটী শুনিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা কাহারও জানা না থাকায় গাওয়া হইল না। অবশেষে তাঁহার অনুমতিক্রমে অন্যান্য সঙ্গীত হইল। ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে কখনও ভাবাবিষ্ট, কখনও বা সমাধিস্থ হইতেছেন। আবার সময় সময় মধুর কণ্ঠে "নারায়ণ", "নারায়ণ" ধ্বনি করিতেছেন। এইভাবে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পরে ঠাকুর সুমধুর-স্বরে বলিলেন, "আজ এই পর্য্যন্ত।" তখন ভক্তগণ প্রণামোন্তর ঠাকুর ঘরের বাহিরে গেলেন।

শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা সমাপ্তির পর যশোহর-জেলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায় নামে জনৈক ভক্ত ভীষণভাবে (এশিয়াটিক্) কলেরা-রোগে আক্রান্ত হইলেন। এ সংবাদ শ্রীশ্রীদেবের নিকট পৌঁছিল। তিনি কেন যেন অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন—আবার বলিয়া উঠিলেন, "হাগা-মোতার দাস জীব—সে আবার বলে, 'আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম'!" বলা-

বাহুল্য, মণীন্দ্রবাবু প্রায়ই ভক্তগণের সঙ্গে বেদান্ত লইয়া তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। যাহাহউক, ভক্তের আর্ত্তি দেখিয়া ভক্তবৎসল ঠাকুরের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি উচ্ছ্বাসের সহিত পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "মা, মণীন্দ্র আমার মার এক ছেলে—তা'কে রক্ষা কর, মা!" এদিকে মণীন্দ্রবাবুর ব্যাধি ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠিল—তিনি দৃষ্টিশক্তি পর্য্যন্ত হারাইলেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিত্য-ভক্ত শ্রীযুক্ত চণ্ডীবাবু রোগীর জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। ঠাকুর বুঝিলেন, ব্যাধি দুরারোগ্য হইয়া পড়িয়াছে—ডাক্তারবাবু আর মণীন্দ্রবাবুর চিকিৎসা করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু যাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ভক্তের পক্ষে তাহাই সম্ভব-পর করা ছিল ঠাকুরের ভক্ত-বাৎসল্যের একটী বিশেষ অঙ্গ। তাই, ডাক্তারবাবুর চিকিৎসায় কোনও শুভ-ফলই হইল না দেখিয়া, ঠাকুর তাঁহার কম্পাউণ্ডার্ শ্রীযুক্ত বরদাবাবুকে হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ দিতে বলিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বরদাবাবুর চিকিৎসায় মৃতপ্রায় রোগী পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। কিন্তু ভক্তগণ বেশ অনুভব করিতে পারিলেন, মণীন্দ্র-বাবুর আরোগ্য লাভ হইল ঠাকুরের অশেষ কৃপায়—ইহাতে চিকিৎসকের কোনও কৃতিত্বই ছিল না। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা মণীন্দ্রবাবুর চোখ খুলিয়া দিল। তিনি ঠাকুরের অসীম মাহাত্ম্য এবং তত্ত্বোপদেশের গৌরব সম্যক্-রূপে উপলব্ধি করিলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই হঠাৎ জনৈক ভদ্রলোক নিত্য-মঠে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার দুইজন ভক্ত ছিলেন। উপস্থিত ভক্ত-গণের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে চিনিতেন না। তাঁহারা তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ ও বিমনা দেখিলেন—তিনি সময় সময় নিজে নিজেই বিড়্ বিড়্ করিতে লাগিলেন; আবার আশ্রম-বৃক্ষের দিকে চাহিয়া কি যেন বলিতে লাগিলেন! কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উত্তর দেন। কিন্তু তিনি মঠে পৌঁছিবার পরই ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য যেন অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ জানাইলেন যে, ঠাকুর-

ঘরের দরজা সন্ধ্যার সময় খোলা হইবে। ইহা শুনিয়া তিনি কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন—আবার পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "কৈ? দরজা কখন্ খোলা হ'বে? এখনও কি সময় হয় নাই?" এই ভাবে তিনি অধীর হইয়া নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার আচরণ দেখিয়া অনেকেই তাঁহার বিষয় জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। অনুসন্ধানের পর তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, তিনি একজন উচ্চ-শিক্ষিত ভদ্রলোক—বাড়ী কলিকাতায়—নাম শ্রীযুক্ত ভূপতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়। তিনি শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের একজন পরম ভক্ত, অথচ শ্রীশ্রীনিত্যদেবে তাঁহার নিষ্ঠা অগাধ। তিনি উভয়কেই কেবল দর্শন করেন নাই, তাঁহাদের সঙ্গও বিশেষভাবে করিয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া (তাঁহাকে অনুসন্ধান করিবার জন্যও) শ্রীমৎ প্রণবানন্দমহারাজ ভূপতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি পরমহংসদেবকেও দেখেছেন—আমাদের ঠাকুরকেও দেখেছেন। তাঁ'দের সম্বন্ধে কিছু বলুন।" তৎ-শ্রবণে ভক্তবর কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ রহিলেন—যেন ভগবচ্চিন্তা-রাজ্যের কোন্ সুদূর দেশ হইতে চিন্তাধারাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক খুব আস্তে আস্তে বলিলেন, "দেখুন, আপনারা সাগরে আছেন—গোষ্পদের জন্য লালায়িত কেন? আমার গুরু পরমহংসদেব আমাকে নিত্যগোপালের হাতে সমর্পণ ক'রে গ্যাচেন; আমাকে পতির হাতে সমর্পণ ক'রে গ্যাচেন। ইনি যে কত বড় তা আমাকে পরমহংসদেব বুঝিয়ে দিয়েছেন।" এই-মাত্র বলিয়া তিনি পুনরায় গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ভক্তগণের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ইনি একজন ধর্ম্ম-জগতের অতি-উচ্চ-অবস্থার লোক—সংসারীর বেশে থাকিলেও বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈরাগ্যবান্—সর্ব্বদা তন্ময়া-বস্থায় দিব্যানন্দে কালাতিপাত করিতেছেন। কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল যে, তিনি বহুদিন ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করেন নাই। (রংপুর জেলার অন্তর্গত) কাঁকিনার রাজার দৌহিত্র জ্ঞানবাবুর নিকট হইতে শ্রীশ্রীদেবের ঠিকানা পাইয়া তিনি শ্রীনিত্য-চরণ-দর্শন-লালসায় মঠে

আসিয়াছিলেন। ভক্তগণ তাঁহার ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। ইতি-মধ্যে ঠাকুর-ঘর খোলা হইল। ভূপতিবাবু আত্মহারা হইয়া শ্রীনিত্য-চরণে প্রণত হইলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীদেব তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসান্তর বলিলেন, "ভূপতিবাবু, এখন গান গাইবার অভ্যাস আছে ত?" ভূপতি-বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে, হাঁ। অনুমতি করেন ত করি।" ঠাকুর কহিলেন, "সুবিধা হ'লে একটী হোক্।" অতঃপর ভূপতিবাবু ভাব-বিগলিত-কণ্ঠে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। শুনিবামাত্র ঠাকুর সমাধি-মগ্ন হইলেন। তখন ভাবাবেগে ভূপতিবাবুরও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল—তিনি আর গান গাহিতে পারিলেন না—একবার ঠাকুরের দিকে তাকান, আবার প্রণাম করেন। এইভাবে বহু সময় অতিবাহিত হইল। অতঃপর ঠাকুর ব্যুত্থান লাভ করিয়া ভক্তবরকে বলিলেন, "সুবিধা হয় ত আর একটী গান হোক্।" তিনি তদনুসারে আর একটী গান আরম্ভ করিলেন। এবারেও পূর্ব্বের ন্যায় ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন এবং ভূপতিবাবুরও ভাবাবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল; তিনিও পূর্ব্ববৎ শ্রীশ্রীদেবকে বারবার প্রণাম করিতে লাগিলেন; কতবার যে প্রণাম করিলেন, তাহা আর কে গণনা করিবে? এইরূপে দুইটী গানেই প্রায় তিন ঘণ্টা অতীত হইল। তখন ভূপতিবাবুরও মনে পড়িল যে, কার্য্যবশতঃ রাত্রি দশটার ট্রেন্ তাঁহাকে ধরিতেই হইবে। এখন তিনি কি করিবেন? ভক্তবর যেন উভয় সঙ্কটে পড়িয়া গেলেন। একদিকে তাঁহার শ্রীশ্রীদেবের শ্রীচরণ ছাড়িয়া যাইতে মন সরিতেছে না, অন্যদিকে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি তাঁহাকে সময়মত ট্রেন্ ধরিবার প্রেরণা দিতেছে। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া তিনি বিদায় লওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি-লেন। কিন্তু মন যে মানে না। তাই, তিনি চোখের জল মুছিতে মুছিতে ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি রওনা হইয়া গেলে জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীদেবকে বলিলেন, "ওঁকে দেখে পাগল ব'লে মনে হয়।" ইহাতে ঠাকুর বলিলেন, "না, গো, না—উনি কাজের পাগল—ওঁর দিব্যোন্মাদ অবস্থা।"*

---

*পরবর্ত্তী কালে ভূপতিবাবু মাঝে মাঝে সভক্ত "শ্রীশ্রীগুরুপীঠে"

ঐ রাত্রে নিত্য-কক্ষে উপবিষ্ট ভক্তবৃন্দের মধ্যে ছিলেন পাবনা-জেলার অন্তঃপাতি প্রসিদ্ধ-ভারেঙ্গা-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র (জিতু) রঞ্জন রায়। নিত্যানুরাগের আতিশয্যে যে সমস্ত বিশেষ-সঙ্গতি-ও-মর্যাদা-সম্পন্ন যুবকের সংসার-প্রীতি ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল ইনিও ছিলেন তাঁহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। ইনি যৌবনের প্রারম্ভেই দেশের সেবায় রত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময় শ্রীশ্রীদেবের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলে 'শ্রীনিত্য-চরণ-যুগল' হইল তাঁহার 'স্বদেশ'। এখন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি এই 'স্বদেশে'র সেবাতেই আত্ম-নিয়োগ করিলেন। ইঁহার যেমন ছিল স্বাস্থ্য, তেমনই ছিল বৈরাগ্য, তেমনই ছিল শ্রীনিত্য-চরণে অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা-ভক্তি ও অচল বিশ্বাস। ইঁহারই বিষয় এই গ্রন্থের ২৮১ পৃষ্ঠায় সপ্তম-পংক্তির শেষাংশ হইতে পঞ্চদশ-পংক্তি পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে। ইঁহার ঠাকুরকে প্রণাম করিবার জন্য কলিকাতা-মহানির্ব্বাণমঠে যাইতেন। আহা! তখন তাঁহার কি অপূর্ব্ব ভাবের প্রকাশ পাইত! তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া একবার মন্দির হইতে বাহির হইতেন, আবার ফিরিয়া ফিরিয়া প্রণাম করিবার জন্য মন্দিরের ভিতরে ঢুকিতেন—যেন কিছুতেই প্রণাম করিবার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইত না! ভক্তবর মধ্যে মধ্যে তাঁহার শিষ্য-দিগকে তথায় বলিতেন, "ওরে, তোরা শুধু এখানে এসে প্রণাম ক'র্‌বি ও প্রসাদ পাবি ; আর তোদের কিছুই ক'র্‌তে হ'বে না। এই মঠের প্রতি ধূলিকণাতে মুক্তি ছড়ান আছে!"

বলাবাহুল্য, ভূপতিবাবু কলিকাতা-মহানির্ব্বাণমঠে গেলেই ভক্তগণের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইত এবং সময় সময় কথাবার্ত্তাও চলিত। কথা-প্রসঙ্গে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীপরমহংসদেব ছিলেন আমার 'গুরু', আর শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব ছিলেন আমার "ইষ্ট"।" তিনি নিজ জীবন-চরিত বিবৃত করিবার সময় স্বীয় ভক্তগণকেও বলিয়াছিলেন, 'নিত্যগোপালদেব যে কত বড়, তাহা আমাকে পরমহংসদেব বুঝাইয়া-ছেন।" ইনিই ভক্তগণের নিকট 'ভাই ভূপতি' নামে পরিচিত ছিলেন।

নিকট হইতেই শ্রীশ্রীদেবের মহিমা অবগত হইয়া অনেকেই তদীয় শ্রীপাদ-পদ্মে আশ্রয় লাভ করতঃ কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ইহাঁর নিত্য-মাহাত্ম্য-ও-গুরু-তত্ত্বানুভূতিও ছিল গভীর। এক সময় শ্রীশ্রীদেব ইহাঁকে বলিয়াছিলেন, "জিতুরঞ্জন, তোমার এমন সময় আস্‌ছে যখন তুমি নানা দেবদেবী দর্শন ক'র্‌বে।" তদুত্তরে ভক্তবর বলিয়াছিলেন, "আমি যে দেবতা (অর্থাৎ ঠাকুর) দর্শন কর্‌ছি এ দেবতা ছাড়া অন্য দেবতা দর্শন ক'র্‌তে চাই নে।" কি অপূর্ব্ব নিত্য-নিষ্ঠা! এই নিষ্ঠা-ভিত্তির উপরই নিত্য-সর্ব্বস্ব ভক্তবৃন্দের ধর্ম্ম-জীবন-হর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। কলিকাতা-মহানির্ব্বাণমঠ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে ইনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং কথিত আছে যে, ইহাঁর অঙ্কিত নক্‌সা অনুসারেই উক্ত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। বলাবাহুল্য, ইনি* যৌবনেই সন্ন্যাসাশ্রমী হইয়াছিলেন। ইহাঁর এই আশ্রমের নাম ছিল শ্রীমৎ স্বামী মহেশ্বরানন্দ অবধূত। বর্ত্তমানে ইহাঁর পবিত্র-দেহ তদর্থে তদ্ভক্তগণকর্ত্তৃক কলিকাতার অনতিদূরে নির্ম্মিত 'গোরে-মঠে' সমাহিত আছেন।

*ইনি ছিলেন পূর্ব্বোক্ত কুমুদবাবু (শ্রীমৎ স্বামী গোপালানন্দ অবধূত) ও দক্ষিণাবাবুর (শ্রীমৎ স্বামী নিত্যানন্দ অবধূতের) কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বলাবাহুল্য, ইহাঁরা তিনজনেই ত্যাগ-পথের পথিক হইয়াছিলেন: এবং তিন-জনই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। এই বয়সেও শ্রীমৎ গোপালানন্দ মহারাজ কীর্ত্তনে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়া থাকেন।

এই সময় পাবনা হইতে হুগলীমঠে সমাগত শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন লাহিড়ী,এম্‌-এ, বি-এল্‌, ডাঃ শ্রীযুক্তহরিশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ শ্রীযুক্তপার্ব্বতী-নারায়ণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুহৃৎনারায়ণ চৌধুরী, (গুপ্তিপাড়া-নিবাসী) ডাঃ শ্রীযুক্ত কানাইলাল সেন প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীদেবের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মোহিনীবাবু ছিলেন Philosophy-ইর (দর্শন-শাস্ত্রের) এম্‌-এ। ইনি যেদিন দীক্ষা লাভ করেন সেদিন নিত্য-কক্ষে বেলা প্রায় ১১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত শ্রীনিত্য-মুখে অপূর্ব্ব বেদান্ত-তত্ত্ব-মীমাংসাদি শ্রবণে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীদেব নানাস্থান হইতে নিজগণকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত জীরাট-গ্রামের সুপরিচিত নাগ-পরিবারের নাম এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা এক সময়ে খুব সঙ্গতি-সম্পন্ন ছিলেন। তাই, ইঁহারা খুব জাঁকজমকে দুর্গোৎসব করিতেন। কালক্রমে শারদীয়া-পূজা উপলক্ষে ইঁহারা ব্যয় সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হন। যাহাহউক, নাগ-বংশে পুরুষানুক্রমে দেবী-পূজা উপলক্ষে বলি প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন। অবস্থার বিপর্য্যয় বশতঃ এই পরিবারের জনৈক নিত্য-ভক্ত ব্যয়-সাপেক্ষ বলিয়া উক্ত পূজায় বলি বন্ধ করিয়া দিবার সঙ্কল্প করেন এবং তদ্বিষয়ে ঠাকুরের অনুমতি প্রার্থনা

যাহাহউক, নিত্য-মহিমা যেমন পূর্ব্বোক্ত অনেক ভক্তের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম, তেমনই তাহা অবগত হইয়াছিলাম হুগলী-নিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন শী, শান্তিপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ প্রামাণিক ও গভর্ণমেণ্টের প্রাক্তন কর্ম্মচারী (বরিশাল-নিবাসী) শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয়গণের নিকট হইতেও। আশুবাবুর জামাতা ও বিশেষ স্নেহাস্পদ সিভিল্ সার্জ্জিয়ন্ ডাঃ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবিনোদ সিংহ মহোদয়ও শ্রীনিত্য-চরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক বালীগঞ্জে নিজ আলয়ে বাস করিতেছেন। বলাবাহুল্য, নিত্য-ভক্তগণের নিত্য-নিষ্ঠা-দর্শনে আমি চমৎকৃত হইয়াছি। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি,তাঁহাদের সকলের দর্শনাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণও এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। বাস্তবিকই, নিত্য-নিষ্ঠার প্রভাবেই বৃদ্ধ বয়সেও (রেলওয়ে আফিসের প্রাক্তন ও অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী) নিত্য-ভক্ত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ও যুবকের ন্যায় উদ্যম ও উৎসাহের সহিত কলিকাতা-মহানির্ব্বাণ-মঠে শ্রীশ্রীদেবের সেবা-পূজাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, যে সমস্ত নিত্য-ভক্ত বাহ্যতঃ নানা-বৈষয়িক-কার্য্যে-ব্যাপৃত-অবস্থায় দৃষ্ট হন (স্বাভাবিক-বা-মজ্জাগত-নিত্য-নিষ্ঠা বশতঃ) তাঁহাদেরও অন্তরে সর্ব্বাবস্থায়ই নিত্য-চিন্তার অবাধ স্ফুরণ হইতে থাকে বলিয়া মনে করি।

করেন। ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঠাকুর আর্য্যশাস্ত্র-বিহিত সমস্ত অনুষ্ঠানেরই যথোপযুক্ত স্থান দিতেন। এইজন্য 'যখন উক্ত বংশে পূর্ব্ব-পুরুষ হইতে বলি-প্রদানের ব্যবস্থা আছে, তখন বংশধরগণের উক্ত প্রথা মান্য করা অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্য; তাহা অমান্য করিলে প্রত্যবায় হইবে' বলিয়া সমন্বয়াবতার ঠাকুর আদেশ করিলেন, "অন্ততঃ সন্ধি-পূজায় একটী বলি দিতেই হ'বে।" অদ্যাপি উক্ত পরিবার এই নিয়ম নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীদেবের সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত 'মহাপ্রসাদ' ও সন্ধি-পূজায় নিবেদিত সমস্ত সামগ্রী নিত্য-মঠে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। যাহাহউক, এই নাগ-বংশোদ্ভব পূর্ব্বোক্ত সত্যেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠতাতের এক পুত্রের নাম ছিল শ্রীযুক্ত আশুতোষ নাগ। ইঁনি চরিত্র-বান্, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি আস্থাবান্ হইলেও, শ্রীশ্রীদেবের উপর প্রথমে ইঁহার আদৌ শ্রদ্ধা ছিল না; কথিত আছে যে, তিনি শ্রীনিত্য-চরণাশ্রিত তাঁহার এক খুল্লতাতের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে তাঁহার অন্তরে আঘাত দিবার জন্য তাঁহার পরম-শ্রদ্ধাস্পদ, প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের চিত্রপটে বিশেষ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পর্য্যন্ত পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন না। কিন্তু ঠাকুরের অহেতুকী-কৃপায় আশুবাবুর তৎপ্রতি 'বিশেষ অবজ্ঞা' পরবর্ত্তীকালে 'বিশেষ প্রেমে' পরিণত হইয়াছিল। যাহাহউক, পরম-পবিত্র চিত্রপটের 'সম্মুখে দেহের পশ্চাদ্ভাগ রাখিয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া কপট প্রণামপূর্ব্বক' আশুবাবু তাঁহার (উক্ত প্রতিকৃতির) অবমাননা করিলেন বটে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার অন্তরে ভীষণ ভীতির সঞ্চার হইল কৃত-অপরাধের কথা-স্মরণে। আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। ইহার কিয়দ্দিবস পর শ্রীনিত্যপদাশ্রয়প্রাপ্ত সত্যেনবাবুর গৃহে শ্রীশ্রীনিত্যদেবের একখানি প্রতিকৃতি দর্শনে তাঁহার (আশুবাবুর) বিপরীত ভাবের প্রকাশ পাইল। এখন কোথায় গেল তাঁহার বিদ্রূপ আর কোথায় গেল তাঁহার অবজ্ঞা। এখন তিনি নিত্য-প্রেমে যেন মাতোয়ারা হইয়া নিজের দেহ-মন-প্রাণ সেই প্রাণের ঠাকুরকে মনে মনে

সমর্পণ পূর্ব্বক তদ্দর্শন-লালসায় অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং অতি শীঘ্র হুগলী-মঠাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তদনন্তর অভীষ্ট-স্থলে পৌছিবার পর যখন তিনি নিত্য-কক্ষে নীত হইলেন, তখন অপরূপ-নিত্য-রূপ-দর্শনে তিনি (জীবনে প্রথম) নতজানু হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন ; তখন তিনি ভাববিহ্বল-চিত্তে শ্রীনিত্য-পদে চিরতরে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক পূর্ণ-কাম হইলেন এবং পরমানন্দ লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি শ্রীশ্রীদেবের নিকট দীক্ষিত হইলেন এবং তদাদেশক্রমে গৃহে গমনান্তর (নিত্যার্পিত-চিত্ত হইয়া) কিয়ৎকাল বিষয়-কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। বাস্তবিকই তিনি নানাভাবে নিত্য-মাহাত্ম্য ও নিত্য-প্রেম অনুভব করতঃ আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থা লাভ হইলে কাহারও বিষয়-বাসনা বা সংসারে অনুরাগ থাকিতে পারে না। তাই, ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, ভজন-নিষ্ঠ আশুবাবু নিত-প্রেমাবেশে অচিরাৎসন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেন। এইসময় তাঁহার নাম হইল শ্রীমৎস্বামী শ্যামসুন্দরানন্দ অবধূত। বলাবাহুল্য, এখন হইতে তাঁহার নিত্য-সেবায় ও নিত্য-ভজনে রতির আতিশয্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। সন্ন্যাস-গ্রহণের কিয়ৎকাল পর তিনি শ্রীশ্রীদেবের আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক পদব্রজে পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শ্রীধাম-বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কথিত আছে যে, প্রয়াগ-তীর্থে "ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করিবামাত্র শ্রীমৎ শ্যামসুন্দরানন্দ মহারাজের অপূর্ব্ব দিব্যাবস্থা লাভ হইয়াছিল। তাঁহার স্পষ্ট উপলব্ধি হইয়াছিল যে, তাঁহার দেহটী যেন শোলার ন্যায় হাল্কা হইয়া গিয়াছে ; ত্রিবেণীর ত্রিধারার পুণ্য-প্রবাহ প্রবল-বেগে তাঁহার অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে ! তখন আনন্দের আতিশয্যে তাঁহার নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল !" এইরূপে পর্য্যটন-কালে নিত্য-কৃপাশক্তির প্রভাব বিশেষভাবে অনুভব করতঃ তিনি চমৎকৃত হইয়া-ছিলেন। আহা ! নিত্য-প্রেমের কি মহিমা ! যিনি ছিলেন নিত্য-দ্বেষী তিনি এখন তৎপ্রভাবে হইলেন নিত্য-গত-প্রাণ ! যাহাহউক, ইনিই পরবর্ত্তীকালে নলহাটী-মহানির্ব্বাণমঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে

সশিষ্য তথায় অবস্থান পূর্ব্বক নিত্য-মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন।

আশুবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হারাধন নাগ পর্য্যন্ত অদ্ভুতভাবে শ্রীশ্রীদেবের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। তিনি একবার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। ডাক্তারবাবুরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে তাহার কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না; এমন সময় রোগী রাত্রে হঠাৎ তাঁহার মা'কে জানাইলেন যে, ঠাকুরের ৺প্রসাদ পাইলেই তিনি আরোগ্য লাভ করিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ৺প্রসাদ-প্রাপ্তির পর তিনি রোগমুক্ত হইলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীদেবের শ্রীপাদ-পদ্ম দর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে হুগলী-মঠে লইয়া গেলেন। এইবার তিনি প্রত্যক্ষভাবে ঠাকুরের কৃপা লাভ করিলেন। সেই দিন নিত্য-প্রকোষ্ঠে কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে তিনি শ্রীশ্রীদেবকে "কালীকৃষ্ণ"-রূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীনিত্য-চরণ-ছায়ায় আশ্রয়-প্রাপ্ত ভক্তবৃন্দের আধ্যাত্মিক-জগতে বিশেষ-উন্নতি-ব্যঞ্জক ভাবাদি সন্দর্শনে অনেকের স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে যে, ইঁহারা কঠোর সাধন-ভজনাদির দ্বারা ঐরূপ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, ভজন-বিঘ্নকর গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকিয়াও অনেকে অদ্ভুত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থের অনেক স্থলেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিকই, এ সমস্ত উন্নত-অবস্থা বা নানাভাবে তদ্দর্শন ও তন্মাহাত্ম্যাদি-জ্ঞান শ্রীশ্রীদেবের অহেতুকী কৃপাতেই তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন। তাই, ২৪-পরগণা-জেলার অন্তর্গত সরিষা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বসু মহোদয় সংসারাশ্রমী হইয়াও আসন-বদ্ধাবস্থায়ই কেবল যে উর্দ্ধে উঠিতেন ও তাঁহার ভাবাবেশের সময় অঙ্গে যে অপূর্ব্ব ভঙ্গীসকল দৃষ্ট হইত তাহা নহে; 'ভগবানের নাম শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার আসন-বদ্ধ-শরীর উর্দ্ধাধঃক্রমে (as a pea-cock বা ময়ূরের ন্যায়) অনবরত ঘূর্ণায়মান হইত।' ঠাকুরের কৃপায় তদুপদিষ্ট প্রাণায়াম সাধন করাতে তিনি অপূর্ব্ব, অপার্থিব আনন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন;-

কিন্তু এই সাধন অত্যধিক মাত্রায় করায় তাঁহার মস্তিষ্ক তাহা সহ্য করিতে পারিল না; এবং উন্মত্তের অবস্থা তাঁহাতে প্রকাশ পাইতে লাগিল; এমন সময় ঠাকুর তাঁহাকে ঐরূপ প্রাণায়াম করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি মস্তিষ্কের স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন।

বাস্তবিকই, ঠাকুরের অহেতুকী-কৃপায় হরিশবাবুর যেমন অপূর্ব্ব অবস্থা লাভ হইয়াছিল, তেমনই তৎপ্রভাবে অদ্ভুত-ভাবাবেশাদি হইত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের। ইনি ছিলেন পূর্ব্বোক্ত রামলাল-বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র। অন্তর্যামী ঠাকুরের নিকট হইতে 'অভিলষিত-মন্ত্র' লাভ করিবার পর তাঁহার এরূপ ভাব-সমাধি প্রভৃতি হইত যে, তাঁহার দেহ কখনও অত্যধিক দীর্ঘতা, কখনও বা কূর্ম্মাকার প্রাপ্ত হইত; আবার সংকীর্ত্তনে ভাবাবেশে তিনি যেরূপ অদ্ভুত নৃত্য করিতেন, তেমনই সময় সময় 'তাঁহার অস্থি-সন্ধি-সমূহ শ্লথ হইয়া যাইত'। তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাসাদি দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইতেন।

প্রকৃতপক্ষে, অহেতুকী-কৃপা প্রকাশপূর্ব্বকই একদিন (বা কতদিন) হুগলীর মঠেও অনেক ভক্তকে একই সময় শ্রীশ্রীদেব নানারূপে দর্শন-দানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন; তিনি প্রত্যেকের চক্ষেই নিজ ইষ্টরূপে বিরাজ করিয়াছিলেন। তাই, পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন রায় মহাশয় ঠাকুরকে "নিতাই-গৌর" এবং টাঙ্গাইল-নিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় "অর্দ্ধনারীশ্বর"-রূপে* দর্শন করিয়াছিলেন। আবার, একদিন এইরূপ কৃপা-শক্তি-দর্শনের ভাগ্য হইয়াছিল (অন্যান্য অনেক ভক্তের ন্যায়) শ্রীযুক্ত কুমুদবাবুর মাতাঠাকুরাণীরও। এই নিত্য-নিষ্ঠাযুক্তা ভদ্রমহিলা একদিন হুগলী-মঠে ভোগ-রন্ধন-কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন। রন্ধন-কার্য্য ও শ্রীশ্রীদেবের ভোগ-দান-কর্ম্ম সমাপনান্তে অনেক ভক্ত ৺প্রসাদ পাইবার

*পূর্ব্বোক্ত ক্ষিতীশ পাইন (বি-এ, বি-টি) মহোদয়ও ঠাকুরকে একদিন ঐরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

ফলে তৎকৃত সমস্ত খেচরান্নই নিঃশেষিত হইয়াছিল। তখনও কতিপয় ভক্তের ৶প্রসাদ পাওয়া হয় নাই। এ অবস্থায় বৃদ্ধা বিশেষ উদ্বিগ্না হইয়া পড়িলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি ঠাকুরের নিকট উহা বিবৃত করিলেন। তখন কৃপা-সিন্ধু ঠাকুর ঈষৎ-হাস্য-যুক্ত-মুখে অন্নের হাণ্ডাটী তাঁহার নিকট আনিতে বলায় তিনি তাহাই করিলেন; আর ঠাকুর তৎপ্রতি দৃষ্টি-প্রসাদ করিয়া হাণ্ডাটী যেইমাত্র স্পর্শ করিলেন তৎ-ক্ষণাৎ তাহা খেচরান্নে পূর্ণ হইয়া গেল! এতদ্দর্শনে বৃদ্ধা চমৎকৃতা হইয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্তা হইলেন।

বাস্তবিকই, ঐ অহেতুকী-কৃপা-প্রকাশেই যশোহর-নিবাসী শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ নন্দী, বি-এল্, মহোদয় জীবনে প্রথম ঈষৎ-আলো-যুক্ত নিত্য-প্রকোষ্ঠে সন্ধ্যাকালে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিয়াছিলেন যে, নিত্য-দেহ হইতে প্রকাশিত এক দিব্য-জ্যোতি সমস্ত কক্ষটীকে আলোকিত করিয়া-ছিল। এতদ্দর্শনে তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। ঐ অহেতুকী-কৃপা-প্রকাশেই কালীঘাট-নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কোঙার ঠাকুরের মস্তকে ছয়মাস যাবৎ চূড়া দর্শন করিয়াছিলেন, বালক কালো ঠাকুরকে "হরিহর"-রূপে দর্শন করিয়াছিলেন ও টাঙ্গাইল-নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঠাকুরের নিকট দীক্ষাগ্রহণের সময় তাঁহাকে ইষ্ট-রূপে দর্শন করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার উচ্চ-শিক্ষিত কিন্তু কুতার্কিক, অবিশ্বাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রিয়শঙ্কর সেন নিত্য-মাহাত্ম্যানুভব করতঃ ভাব-বিগলিত-চিত্তে অর্দ্ধঘণ্টাকাল ক্রন্দন করিয়াছিলেন এবং পাণ্ডিত্যাভিমান পদদলিত করিয়া ঘরের মেজেতে গড়াগড়ি পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। আহা! যিনি এক সময়ে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তিনিই শ্রীশ্রীনিত্য-পদে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক (অন্যান্য কতিপয় বিদ্রূপকারীর ন্যায়) নিত্য সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিলেন! নিত্য-কৃপার কি মহিমা! ইহা পুনঃ পুনঃ বর্ণনা করিয়াও তৃপ্তি হয় না। এই কৃপা যে কত লোকের জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছিল তাহার বিশদ্ বর্ণনা এই সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনীতে

লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। এই কৃপা প্রাপ্ত হইবার পর বরিশাল-নিবাসী খ্যাতনামা বক্তা ও লেখক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের (শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের) এক সময়ে কেবলমাত্র যে সংসারে বিশেষ বৈরাগ্য আসিয়াছিল, কেবলমাত্র যে বৃন্দাবনে 'মাধুকরী' করতঃ তিনি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং কেবলমাত্র যে তিনি শ্রীশ্রীদেবের সম্বন্ধে বিশেষ অনুভূতিসকল লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে ; ঐ বিক্রমশালী বাগ্মী নিত্য-কৃপায় মধুর ভাব-বা-রাধাভাব-লাভে স্ত্রীস্বভাবসম্পন্ন হইয়া ঠাকুরের নিকট পত্র লিখিবার সময় নিজেকে "দাসী শরৎ" বলিয়া উল্লেখ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি হুগলী-মঠে আসিলে তাঁহার দেহ স্ত্রীদেহের ন্যায় কমনীয়তাযুক্ত লক্ষিত হইয়াছিল।

এইরূপে যখন নানাস্থান হইতে ভক্ত সমাগম হইতে লাগিল, তখন জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর থানার অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ-বারাসত-গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র নামে জনৈক যুবক শ্রীনিত্য-কৃপা-প্রার্থী হইয়া হুগলী-মঠে উপস্থিত হইলেন। ইঁহার হৃদয় ছিল সরল। নিত্য-প্রকোষ্ঠে ঠাকুরের দর্শন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে হইল, শ্রীশ্রীদেব প্রত্যক্ষ পরমদেব এবং তাঁহার চির-পরিচিত। ঠাকুরের মনোহর রূপ ও সুমধুর বাক্য জ্যোতিষবাবুকে তৎপ্রতি আরও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিল। তখন ভক্তবরের সমস্ত চিন্তা দূরীভূত হইল এবং তিনি যেন পরমাত্মত্ব লাভ করিলেন। শীঘ্রই তিনি দীক্ষালাভ করিলেন এবং সেই শুভ-দিনে নিত্য-কক্ষে তিনি বহুক্ষণ নিত্য-সঙ্গ-সুখ-সম্ভোগে ও নিত্য-কথামৃত-পানে বিভোর হইয়া ছিলেন। অতঃপর তিনি বেলগাছিয়া মেডিক্যাল্ স্কুলে ভর্ত্তি হইবার পর শ্রীশ্রীদেবের দর্শন পুনরায় লাভ করিলে কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর Gray's Anatomy-ইর (গ্রে সাহেবের এ্যানাটমির) দুইটী পাতায় লিখিত বিষয় উদ্ধৃত করিয়া অধ্যাপকের ন্যায় ইংরাজীতে অনর্গল lecture (লেক্‌চার্) দিলেন। এতৎশ্রবণে জ্যোতিষবাবু চমৎকৃত হইলেন; কেননা ইহাতে শ্রীশ্রীদেবের ইংরাজী ভাষায় বিশেষ অধিকার ও অদ্ভুত

স্মৃতিশক্তিরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। ইহার কিয়ৎকাল পর ভক্ত-বরের বৈরাগ্য-পন্থা অবলম্বন করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল; এবং ঠাকুরের কৃপায় নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি শ্রীশ্রীদেবের শরণাপন্ন হইলেন। অতঃপর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার চিরপুষ্ট আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসের নাম হইল শ্রীমৎ স্বামী কালীপদানন্দ অবধূত। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ মহাদেবের ন্যায় রজতাভ দর্শন করিয়াছিলেন এবং পরে পরিব্রাজকতা অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে নিজের সম্বন্ধে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "যেখানেই যাও—একাধারে এমন শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধভক্তি ও শুদ্ধপ্রেম কোথায়ও দেখ্‌তে পাবে না।" বলাবাহুল্য, ভক্তবর জীবনে নানাভাবে নিত্য-কৃপার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি হৃদয়ঙ্গম করতঃ চমৎকৃত হইয়াছেন।

যে সময় আমি উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে বিভ্রান্ত হইয়া শান্তির অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলাম, সেই সময় দৈবাৎ একদিন কলিকাতা-মহানির্ব্বাণমঠে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথায় অজ্ঞাত-কুল-শীল আমাকে যিনি নিজ দয়াগুণে প্রথমতঃ শ্রীচরণে আশ্রয় দানপূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়াছিলেন ও তদনন্তর আমার ন্যায় দীন-হীনকে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত পর্য্যন্ত করতঃ পরম-শান্তি-পথের পথিক করিয়াছেন, তিনিই পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিত্যপদানন্দ অবধূত মহারাজ। বলাবাহুল্য, এই পরম-কারুণিক শ্রীশ্রীগুরুদেবের শিক্ষাপ্রভাবেই এই কাঙ্গাল ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালদেবের মহিমা অবগত হইয়াছে। তাই, সে তদীয় শিষ্যবৃন্দকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করিতে জানিয়াছে এবং কীর্ত্তনে তাঁহাদের মধুর ভাবাবেশ ও নৃত্য,ও তাঁহাদের নিত্য-সেবা-নিষ্ঠা প্রভৃতি দর্শনে সে চমৎকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সকলেই আমার পূজার্হ হইলেও আমার গুরুদেব "মম-সর্ব্বস্ব" ও "সর্ব্বোত্তম"*। তাই, তাঁহার নিত্যানুভূতি ও নিত্য-দর্শনাদিও আমার

---

*এই গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ঠাকুরের উপদেশ ও ২২৮ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত শিব-বাক্য পাঠেই এ বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে।

পরম ভক্তির বস্তু। তাই, তাঁহার শ্রীচরণ বিশেষভাবে পূজা করা আমার অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্য। কিন্তু এই পূজার উপচার, নিত্য-মহিমা-ব্যঞ্জক তাঁহার নিত্য-প্রেম-ময় জীবনের ঘটনাবলী, সংগ্রহ করা বহুদিন পর্য্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া ছিল; কেননা তিনি ঐ সমস্ত প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টার ফলে সম্প্রতি তাহা কথঞ্চিৎ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। স্থানাভাব বশতঃ এই গ্রন্থে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হওয়ায় অংশতঃ উল্লেখ করিবার প্রয়াস পাইতেছি। বাস্তবিকই, দীর্ঘকাল তৎসঙ্গ-সুখ-সম্ভোগে কৃতার্থ আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমার নিত্য-গত-প্রাণ গুরু-দেব নিত্য-সমন্বয়-তত্ত্ব-বিরোধী কোনও তত্ত্বই গ্রহণ করেন না; এবং নিত্য-মত ব্যতীত অন্য কোনও মতের অপেক্ষা রাখেন না। ইঁহার নিত্য-তত্ত্ব বা সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-তত্ত্বের অপূর্ব্ব মীমাংসা-শক্তি, বিচার-বুদ্ধির বিশেষ সূক্ষ্মতা ও প্রাখর্য্য ও বাঙ্‌নৈপুণ্য দর্শনেও আমি চমৎকৃত হইয়াছি। প্রকৃতপক্ষে, দীক্ষার সময় ও পরে ঠাকুরের নিকট তিনি যে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনে একমাত্র চালক হইয়া আছে। তদবধি তিনি কোনও দিনই অন্য কাহারও নিকট কোনও ধর্ম্ম-বিষয়েই উপদেশ বা অনুমতি লইবার প্রয়োজন আদৌ বোধ করেন নাই। তদবধি তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা হইয়া আছে যে, তাঁহার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে সর্ব্বশক্তিমান্ ঠাকুর নিজ দয়াগুণেই তাহা তাঁহাকে প্রদান করিবেন।

শ্রীশ্রীদেবের উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস। তাই, জীবনের নানা দুর্দ্দৈব তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে নাই। শ্রীশ্রীদেবের শ্রীচরণাশ্রয়-লাভের পূর্ব্বে তিনি স্বদেশ-সেবী (বা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মতে রাজদ্রোহী) ছিলেন বলিয়া সন্ন্যাসাশ্রমী হইবার পর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট্ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করতঃ নির্জ্জন-কারাবাস প্রভৃতিতে রাখিয়াছিল। কিন্তু অব্যভিচারিণী-নিত্য-ভক্তির আবাস-স্থল তাঁহার হৃদয়কে নানা অসুখ-অসুবিধা-বিপত্তিও টলাইতে পারিয়াছিল না। ঐ সময়ও তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় নানা

অনুভূতি ও নানা দর্শনাদি লাভ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন ও নিত্যানন্দ-সম্ভোগেই কালাতিপাত করিয়াছিলেন। দীক্ষার সময় তিনি শ্রীশ্রীদেবের নিকট কাম ও অহঙ্কার নাশের প্রার্থনা বিশেষভাবে করায় এই দুই ভীষণ রিপু তাঁহার সাধন-জীবনে তাঁহাকে বিব্রত করিতে পারে নাই।

মদীয় গুরুদেবের ঠাকুরের মাহাত্ম্য-প্রচারেও অপূর্ব্ব নিষ্ঠা! এতদুদ্দেশ্যেই তিনি কলিকাতা-মহানির্ব্বাণমঠে অবস্থান-কালে নানা পন্থা অবলম্বন করিতেন। এতদুদ্দেশ্যেই তিনি প্রথমতঃ শ্রীশ্রীদেবের "ভক্তি-যোগ-দর্শনে"র ইংরাজী অনুবাদ ও তদনন্তর তাঁহার জীবনী ইংরাজীতে প্রকাশপূর্ব্বক দেশ-বিদেশে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের বহুল প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। এতদুদ্দেশ্যেই তিনি শ্রীশ্রীদেবের রচিত "সাধক-সহচর, সাধক-সুহৃৎ, উদ্দীপনী, সাধনা ও মুক্তি, সিদ্ধান্তদর্শন, সিদ্ধান্তসার ও অধ্যাত্মতত্ত্ববোধ" নামক গ্রন্থসমূহের ইংরাজী-অনুবাদ করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যেই তিনি 'নিত্য-সঙ্গীত-লহরী' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়া নানা-স্থান-বাসী ভক্তবৃন্দকে নিত্য-কীর্ত্তনে উৎসাহিত করিতেছেন। এতদুদ্দেশ্যেই তিনি নবদ্বীপ-মহানির্ব্বাণমঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বাস্তবিকই, ইনি সম্পত্তি-সম্পন্ন, প্রভাব-শালী জমিদারের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া অত্যন্ত সুখের ক্রোড়েই লালিত-পালিত হইয়াছিলেন; এবং নানা ধনাঢ্য পরিবারের সহিতও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাই, জন্মাবধি সাংসারিক সুখ-ভোগের সুবিধা ইনি পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শৈশবে ইনি ভীষণ ব্যাধির কবলে নিপতিত হইলে চিকিৎসকের কঠোর বিধান ও ৺বাবা বৈদ্যনাথের নিকট মানসিক ছিল বলিয়া ইহাঁকে সেই সময় হইতে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়মাধীনে অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিতে হইয়াছিল। এইজন্য ব্রহ্মচর্য্য-নিষ্ঠা স্বভাবতঃ ইহাঁর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সুতরাং উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইবার পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্ম-বিদ্যা-গায়ত্রী-জপে ইহাঁর বিশেষ অনুরাগ জন্মিল। অতএব জন্মাবধি বিশেষভাবে বিষয়ীর সংস্রবে থাকিলেও এবং স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ

করিলেও তাঁহার মজ্জাগত ব্রহ্মচর্য্য-প্রবৃত্তি, ভজন-নিষ্ঠা ও ত্যাগ-ভাব তাঁহার অন্তঃকরণকে সর্ব্বপ্রকারে ভোগ-বিলাস-বিমুখী করিয়া রাখিল।

এই ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ ভগবদ্ভক্ত ১২৯০ সালে ১লা অগ্রহায়ণ পূর্ব্বোক্ত ভারেঙ্গা-গ্রামের চৌধুরী-জমিদার-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নাম ছিল শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চৌধুরী। ইঁহার পিতা ৺শ্রীযুক্তশশীকুমার চৌধুরী মহাশয় পাবনা সহরে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ ছিল অতি উচ্চ ও কোমল। শ্রীযুক্ত শরৎকুমারের মাতা ৺শ্রীযুক্তা মাতঙ্গিনী দেবী* বিশেষ বুদ্ধিমতী, ভক্তিমতী ও সাধ্বী রমণী ছিলেন। সাধন-ভজন-কীর্ত্তনাদিতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। স্বধর্ম্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠা থাকিলেও তিনি অন্য কোনও ধর্ম্মের প্রতিই বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন না। তিনি প্রায়ই বাড়ীতে সংকীর্ত্তন করাইতেন ও হরিলুট দিতেন। সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়াও তিনি নিয়মিতভাবে ভগবচ্চিন্তা করিতেন। বাস্তবিকই, আদর্শ-চরিত্রা মাতৃদেবী স্বীয় মধ্যম পুত্রের হৃদয়ে শৈশবে যে ভক্তি-বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্ত্তী-কালে নিত্য-কৃপা-যোগে

*ইঁহার শেষজীবনে মদীয় গুরুদেবে বিশেষ শ্রদ্ধা পর্য্যন্ত লক্ষিত হইত; কেন-না ইঁহার নিকট হইতে ৺শ্রীযুক্তামাতাঙ্গিনীদেবী তদ্‌গৃহী-গুরু-প্রদত্ত স্বীয়-ইষ্ট-মন্ত্র'চৈতন্য' করিয়া পর্য্যন্ত লইয়াছিলেন। ইনি একদা আমার জনৈক পরমার্থ-ভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, বাবা, তোমাকেই বলি, শ্রীমান্ শরৎকুমার সংসার ত্যাগ ক'রে আস্‌বার পর আমি প্রত্যহ রাত্রে ছাদের উপর তা'র বাসের ঘরে খোল-করতালের শব্দ শুন্‌তে পেতাম্। ...ও তো এখন আমার ছেলে নয়; ও আমার এখন 'গুরু'। ...ও একেবারে আলাদা ভাবের হ'য়ে গেল। ·· আমি জান্‌তাম্ যে, ও বিয়ে ক'র্‌বে না—সংসারে থাক্‌বে না। ...মনে মনে জান্‌তাম্, ও সংসার ছেড়ে ভালই ক'রেছে। তথাপি রাতে ওর জন্য ব'সে ব'সে কাঁদ্‌তাম্। ইত্যাদি।" বলাবাহুল্য, ইঁহারও বিশেষ নিত্য-ভক্তি ছিল। তিনটী স্বর্ণ-তুলসীপত্র পর্য্যন্ত দিয়া ইনি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের পূজা করিয়াছিলেন।

পরমপ্রেমরূপা-পরাভক্তি-বৃক্ষাকার ধারণ করতঃ কত ব্যথিত হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করিতেছে, কত লোককে প্রেম-ভক্তি-ধনে ধনী করিতেছে ও সংসার-মায়া-মুক্ত করিতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ৺শ্রীযুক্তামাতঙ্গিনী দেবী প্রায়ই বাটীতে 'হরিলুট' ও হরিসংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতেন। এই কীর্ত্তনে গায়কগণ একটী পদ ধরিতেন, "সবে হুঙ্কারিয়া ছিন্ন কর মায়ারই বন্ধন, 'জয় হরির জয়' ব'লে রে ইত্যাদি।" এই পদটী পরমভক্ত শ্রীযুক্ত শরৎকুমারের অত্যন্ত হৃদয়-স্পর্শী হইত ; তিনি তখনই মায়াময়-সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্যই যেন প্রাণপণে চীৎকার করতঃ সুর-তালের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া পদটী গাহিতেন। সেই সময় তাঁহার শিক্ষক মহাশয় (পাবনা-জিলাস্কুলের প্রসিদ্ধ হেড্ পণ্ডিত ৺শ্রীযুক্ত তারিণী বিদ্যা-নিধি মহোদয়) শিক্ষান্তে অনেক সদুপদেশ দান করিতেন ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য-রচিত 'মোহ-মুদ্গর', চাণক্য-রচিত কতিপয় সারগর্ভ শ্লোকের বিশদ্ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে কণ্ঠস্থ করাইতেন। ইহাও ভক্তবরের স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ভাবের, স্বাভাবিক ত্যাগ-ভাবের পুষ্টিসাধন করিয়াছিল।

যথাকালে তাঁহার উপনয়ন-সংস্কার হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উক্ত সংস্কারে সংস্কৃত হইবার প্রাক্কালেই তিনি গায়ত্রী-জপে সুনিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাই, যখন ব্রহ্মজ্ঞান-লাভেচ্ছু, সুসংস্কার-ও-সুশিক্ষা-সম্পন্ন সাধকপ্রবর (মহাত্মা শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণগোস্বামীপ্রভুপাদের বিশেষ বন্ধু) ৺শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ চৌধুরী মহোদয় তাঁহার আচার্য্য-গুরুরূপে তদীয় কর্ণকুহরে গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তখনই শ্রীযুক্ত শরৎকুমার অনুভব করিয়াছিলেন যে,উক্ত মন্ত্রের সহিত একটী শক্তি যেন তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিল। এই সময় হইতে (দিবানিদ্রাত্যাগ-সন্ধ্যাকৃত্য-সংযমাদি) ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর-নিয়ম-পালনে ও 'Plain living and high thinking'-এ (অনাড়ম্বর-জীবন-যাপন ও উচ্চ-চিন্তায়) তাঁহার স্বাভাবিক নিষ্ঠা দৃঢ়তর হইতে লাগিল। বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনায় কাহারও সংকীর্ণভাব (বা সাম্প্রদায়িকতা) প্রকাশ পাইলে তিনি অতি-

যুক্তিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা সমন্বয়-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। ইহা শুনিয়া তাঁহারা বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন ও তাঁহার সুবুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তিনি যেমন ছিলেন পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত, গুরুজনে শ্রদ্ধাবান্ ও বিনয়ী, তেমনই ছিলেন তেজস্বী। আবার, তাঁহার অন্তর ছিল যেমন সরল, তেমনই কোমল, আবার তেমনই সবল। তাই, কপটাচারিতা বা কুটিলতা বা অশিষ্টাচার দেখিলে তিনি 'বজ্রাদপি কঠিন' হইতেন। ইহাতে তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বিশেষ প্রীতি ও সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, এমন কি, ভয়ও করিতেন।

বলাবাহুল্য, তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ উদারভাব ছিল। ছাত্র-জীবনেই এই ভাবের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছিল (কয়েকখানি পুরাণ, গীতা, জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, দুই একখানি উপনিষৎ, বাইবেল্, অভ্ দি ইমিটেশন্ অভ্ ক্রাইষ্ট্, অশ্বিনী দত্তমহাশয়ের ভক্তি-যোগ, শঙ্করাচার্য্যের মোহ-মুদ্গর প্রভৃতি) কতিপয় ধর্ম্ম-গ্রন্থ-পাঠে। তাই তিনি ভাবিতেন, "ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভ না হইলে কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। সেইরূপ ব্রাহ্মণেরই তো সন্ন্যাসে অধিকার হইয়া থাকে। তবে, সেই জ্ঞান যাঁহার ভিতরে উদিত হয় তিনি ব্রাহ্মণ-জাতির অন্তর্গত না হইলেও তিনি ব্রাহ্মণের ন্যায় সন্ন্যাসে অধিকার লাভ করিতে পারেন বা সন্ন্যাসীও হইতে পারেন।"

বাস্তবিকই, তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ভাবের প্রকাশ নানা ভাবেই পাইত। ধর্ম্মমূলক যাত্রা-অভিনয়াদি শুনিতে তিনি অত্যন্ত ভাল-বাসিতেন। তাই, একদিন তিনি "শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ" যাত্রা শুনিতে গিয়া-ছিলেন। তথায় তিনি দেখিলেন, "প্রাণতুল্য সহোদর নিশুম্ভকে নিহত ও সৈন্যগণকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শুম্ভাসুর শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীকে বলিল, "...তুমি গর্ব্ব করিও না; যেহেতু তুমি অতি গর্ব্বিতা হইয়াও পরবল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছ।" দেবী কহিলেন, "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥ অর্থাৎ 'রে দুষ্ট! এই জগতে আমি অদ্বিতীয়া; আমি ভিন্ন আমার সহায়ভূত

দ্বিতীয় আর কে আছে? এই দেখ, আমারই বিভূতিরূপা (অংশস্বরূপা) ইহারা আমাতেই প্রবেশ করিতেছেন'।" এই দৃশ্য দর্শনেই শ্রীযুক্ত শরৎকুমার এত 'তন্ময়' হইয়া গেলেন যে, তিনি 'দুর্গাময়' জগৎ দেখিতে পাইলেন এবং 'ঐক্যতত্ত্ব' উপলব্ধি করতঃ দিব্যানন্দে বিভোর হইয়া গেলেন। আবার, "সত্যকথা কলিকালের তপস্যা" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উক্তি পাঠান্তর তিনি হাসি-ঠাট্টা করিয়াও মিথ্যাকথা বলিতে পারিতেন না। এতদ্ব্যতীত, উপনয়ন-সংস্কারের পর ধর্ম্মলাভার্থ তিনি নিভৃতে আসন-প্রাণায়াম-ত্রাটকাদি পর্য্যন্ত অভ্যাস করিতেন। এই সময় তাঁহার দীক্ষা-গ্রহণেরও প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কিন্তু 'শ্রীভগবান্ স্বয়ং দীক্ষা না দিলে তিনি কোনও অচেতন পুরুষ বা অজ্ঞানী, সংসারী লোকের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন না' এই দৃঢ়-সঙ্কল্প তাঁহাকে কুল-গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র-গ্রহণ-কার্য্য-বিমুখ করিল। শ্রীভগবান্‌কেই গুরু-রূপে প্রাপ্তির জন্য তিনি ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ইহার উপর তিনি পাবনা ইন্‌স্টিটিউশন্ ও পাবনা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সাধকপ্রবর ৺শ্রীযুক্তগোপালচন্দ্র লাহিড়ী,বি-এ, মহাশয়ের নিকট গীতা-পাঠে বিশেষভাবে উপকৃত হইলেন। তাই, তিনি সম্যক্‌-রূপে উপলব্ধি করিলেন যে, দুরত্যয়া মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায় আত্ম-জ্ঞান-লাভ। এই দিব্যগুরুরূপা-ও-আত্মজ্ঞান-লাভেচ্ছু যুবকের ব্যাকুল প্রার্থনা শ্রীভগবানের নিকট পৌঁছিল; কেননা এই সময় পূর্ব্বোক্ত উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত তিনি দৈবাৎ তাঁহার বাল্যবন্ধু পূর্ব্বোক্ত জিতেন্দ্ররঞ্জন রায় মহাশয়ের সহিত দেখা হইলে তাঁহার মুখে "গুরুজ্ঞানানন্দদেবে"র নাম ও মাহাত্ম্য শুনিলেন। শুনিবামাত্র নামটী যেন তাঁহার 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল, আকুল করিল মন-প্রাণ'। তখন তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তখন তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলেন, "স্বয়ং ভগবান্‌ই জীবের কল্যাণার্থ 'গুরুজ্ঞানানন্দ'-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।" তদবধি তাঁহার রসনা অবশে

ঐ নাম জপিতে লাগিল এবং মহানন্দে তিনি তাঁহার বাল্য-বন্ধুকে (বা ধর্ম্ম-বন্ধুকে) জানাইলেন যে, তিনি শীঘ্রই হুগলী-নিত্য-মঠে শ্রীনিত্য-চরণাশ্রয় লাভার্থ যাইবেন। ইহাতে শ্রীযুক্ত জিতু রায়মহাশয়ও খুবই আনন্দ লাভ করিলেন। আহা! সেই সময় নিত্য-ভক্তবৃন্দ পরস্পর পরস্পরকে দেখিলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। তাঁহাদের যেমন ছিল 'নিত্য-প্রেম', তেমনই ছিল 'ভ্রাতৃ-প্রেম'। এ প্রেম জগতে দুর্লভ। যাহাহউক, শ্রীযুক্ত জিতু রায় শ্রীযুক্ত শরৎকুমারকে পরমপবিত্র নিত্য-পদ-রজ দান করিয়া পরম বন্ধুর কাজ করিলেন। ইতিমধ্যে পাবনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বাগ্‌চি, এম্-এ, মহোদয়কে নিত্য-কৃপা-লাভার্থ উক্ত মঠে গমনোন্মুখ দেখিয়া শ্রীযুক্ত শরৎকুমার তদর্থে শ্রীশ্রীদেবের একখানি 'চিত্র-পট' আনিবার কথা তাঁহাকে বিশেষভাবে বলিয়া দিলেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত বাগ্‌চি মহাশয়ের নিকট ঐ অপূর্ব্ব-চিত্র-পট-প্রাপ্তির পর শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি যেন অপলক-নেত্রে সেই অপরূপ-রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন, আর ভাবিলেন, "ইনিই কি সেই নিত্যগোপাল যাঁহাকে রামকৃষ্ণ ভাবোচ্ছ্বাসে বলিয়াছিলেন, 'নিত্য, তুইও এসেছিস্? আমিও এসেছি'? তবে কি ইঁহাদের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন, দিব্য সম্বন্ধ আছে? ইত্যাদি।" বলাবাহুল্য, এখন এক অপূর্ব্ব নিত্যানুভূতি ভক্তপ্রবরের হৃদয়ে নিত্য-দর্শন-ও-নিত্য-কৃপা-লাভের আকাঙ্ক্ষা 'আরও অদম্য' করিয়া তুলিল। তাই, তিনি সেই বৎসর শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী-পূজার পূর্ব্ব দিবস সকালবেলা চির-বাঞ্ছিত নিত্য-মঠ প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীদেবের শ্রীচরণ-দর্শন লাভ করিতে না পারায় বিশেষ দুঃখ অনুভব করিলেন। যাহাহউক, সন্ধ্যার সময় নিত্য-কক্ষে প্রবেশান্তর শ্রীশ্রীদেবকে দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তবরের নয়ন-অলি নিত্য-মুখ-পদ্ম-মধু-পানে রত ও মত্ত হইল। আহা! তিনি উক্ত প্রকোষ্ঠের একপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক অনিমেষ-নয়নে তাঁহার অপরূপ-রূপ-লাবণ্য নিরীক্ষণ করতঃ নয়ন-মন সার্থক করিতে লাগিলেন। বয়াত্তর-

করযুক্ত-মহাভাবমগ্ন শ্রীশ্রীনিত্যদেবের ঢুলু-ঢুলু-নয়নদ্বয়-শোভিত শরচ্চন্দ্র-সদৃশ বদনমণ্ডল ও তাঁহার তপ্ত-কাঞ্চন-সদৃশ উজ্জ্বল-বর্ণ দর্শনে তিনি দেহ-গেহ সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর 'চিরকুমার' শরৎকুমার 'নিত্য-কুমার' হইবার আকাঙ্ক্ষায় নতজানু হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে বিনীতভাবে শ্রীশ্রীদেবকে বলিলেন, "বাবা, আমায় কৃপা করুন।" তাহা শুনিয়া ঠাকুর হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে কি গো! সে কি গো!" কিন্তু পরক্ষণেই তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তোমার কথা আমার বিশেষ স্মরণ রহিল।" শ্রীশ্রীদেবের এই উক্তি শ্রবণ করিয়াও ভক্তবরের যেন তৃপ্তি হইল না। তাই, তিনি তদবস্থাতেই উপবিষ্ট রহিলেন। ইহাতে ভক্তগণ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার আর চিন্তা নাই; এখন প্রণাম পূর্ব্বক বাহিরে চল।" ভক্তবর তাহাই করিলেন।

তৎপর দিবস ১৩১৬ সালের শুভ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা। তদুপলক্ষে স্থানীয় ও বহিরাগত বহু ভক্ত হুগলী-নিত্য-মঠে মিলিত হইয়াছেন। সকলেই ঠাকুর-দর্শনের জন্য ব্যগ্র ও আনন্দে মগ্ন। আহা! শ্রীযুক্ত শরৎ-কুমার যেমন ভুবন-মোহন-নিত্য-রূপ-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তেমনই নিত্য-ভক্ত, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ, নিত্য-মঠ ও তৎসংশ্লিষ্ট যাহা কিছু তৎসমস্তই তাঁহার নয়ন-মনকে আকর্ষণ করিতেছিল। যাহাহউক, শ্রীশ্রীদেবের নির্দ্দেশক্রমে ভক্তবর গঙ্গাস্নান সমাপন পূর্ব্বক নিত্যাহ্বানের প্রতীক্ষায় রহিলেন। আহ্বানও আসিল। তাই তিনি উৎফুল্লচিত্তে নিত্য-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশান্তর দর্শন করিলেন সেই প্রেমের ঠাকুরকে মনোহর ভাবে ও মনোহর বেশে; একে 'বিম্বজিনি সুরঙ্গ অধরে' মৃদু-মধুর হাসি, তাহাতে আবার পরিধানে রক্তিমাভ পট্টবাস (চেলী)। আহা! ইহাতে ঠাকুর সিন্দুরে আবৃত ভানুবৎ শোভা পাইতেছিলেন। বাস্তবিকই, শ্রীশ্রীদেব তখন ভক্তবরের নিকট তক্ত-পোসের উপর আসীনা জগদম্বা-জগদ্ধাত্রীবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। নিত্য-রূপছটা কক্ষটীকে পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়াছিল। ভক্তবর পরে

জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সেইদিন জনৈকা "পাগ্‌লী" শ্রীশ্রীদেবকে ঐ বস্ত্রে সজ্জিত করিয়াছিলেন। যাহাহউক, ঠাকুরের নির্দ্দেশক্রমে ভক্তবর তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন। বলাবাহুল্য যে, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যদেব ভক্তবরের অতিবর্ণাশ্রমী-যোগীবৎ আধ্যাত্মিক জীবনে বিশেষ উন্নত অবস্থা এবং আত্মজ্ঞান-লাভের ঐকান্তিকী ইচ্ছা দর্শনে তাঁহাকে একেবারে 'ব্রহ্মমন্ত্রে' দীক্ষিত করিলেন। বাস্তবিকই, স্বয়ং ভগবান্ যাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমেই ব্রহ্মমন্ত্র-দান* করেন তাঁহার ভাগ্যের কথা আর কি বলিব! তাঁহার নিকট পরমাত্ম-জ্ঞান-রাজ্যের দ্বার যে উন্মুক্তই থাকে সে কথা বলাই বাহুল্য। যাহাহউক, শ্রীশ্রীদেব ভক্তবরকে মন্ত্র-প্রদানান্তর সাধন-ভজন-প্রণালী ও সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতে করিতে বরাভয়-মুদ্রা-শোভিত হস্তে সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত শরৎ-কুমার অপলক-নেত্রে সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন পূর্ব্বক চমৎকৃত হইলেন। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে সাকার-পূর্ণ-পরব্রহ্ম উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার মনে হইল, "ঐ প্রেমের ঠাকুরই আমার প্রাণের ঠাকুর; তাঁহাকে দর্শন করিলে তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না; তাঁহাকে ভক্তি করিলে পরম-প্রেম-রজ্জু দ্বারা ভক্তের চিত্ত তৎপদে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হইবেই; এবং এই প্রেমের বন্ধনই ভক্তের সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে চিরতরে শ্রীশ্রীনিত্য-শরণাগত করিয়া তুলিবেই।" ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীদেব বীণা-বিনিন্দিত মধুর-স্বরে "নারায়ণ", "নারায়ণ" উচ্চারণ করতঃ সমাধি হইতে ব্যুত্থান লাভ করিলেন। আহা! শ্রীশ্রীদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করিবার সময় ভক্তবরের অন্তরে একটী অপূর্ব্ব

*'ব্রহ্মমন্ত্র-লাভের অধিকারী কে হইতে পারেন এবং ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক কি প্রকারে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিতে পারেন এবং আধ্যাত্মিক জগতে তাঁহার কিরূপ অবস্থা'—এ সমস্ত বিষয় এই গ্রন্থের ৪৬—৪৭ পৃষ্ঠা পাঠেই অবগত হওয়া গিয়াছে।

অথচ অদম্য ভাবের স্ফুরণ হইল। এই ভাব তাঁহাকে সঙ্কল্প করাইল, "আজ হ'তে দেহ-মন-প্রাণ সবই ঠাকুরের। ইহা দ্বারা যে কোন কার্য্য সম্পাদিত হইবে তাহা তদর্থেই কৃত হইবে।" দীক্ষালাভ অবধি তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থ কেবলমাত্র শ্রীশ্রীদেবের সেবা-ভোগাদি-কার্য্যে বা নিত্য-ভক্ত-সাহায্যার্থে ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত আসক্তি—সমস্ত সংশয়—সমস্ত কর্ম্মবন্ধন চিরতরে ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি অনুভব করিলেন যে, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার দেহ-মন-প্রাণময় হইয়া বিরাজ-মান আছেন। যাহাহউক, ব্রহ্ম সম্বন্ধে আরও কিছু উপদেশ প্রদান-পূর্ব্বক ঠাকুর তাঁহাকে বাহিরে যাইতে অনুমতি করিলেন। সেই সময় শ্রীযুক্ত শরৎকুমার শ্রীপদে প্রণামপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন যে, ঠাকুর ছাড়া যেন তাঁহার আর কিছু না থাকে। তাহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, "যাহার ধর্ম্মভাব দেখ তাহাকে আমার কথা বলিতে পার।"

বাস্তবিকই, শ্রীযুক্ত শরৎকুমারের চিরপুষ্ট বৈরাগ্যভাব আজ আকুমার সন্ন্যাসী, অদ্ভুতজ্ঞান-অদ্ভুতভক্তি-অদ্ভুতপ্রেম-অদ্ভুতবিবেক-অদ্ভুত-বৈরাগ্য-সম্পন্ন নরাকার-পরব্রহ্ম নিত্যগোপালদেবের আশ্রয় লাভান্তর প্রবলতর হইয়া উঠিল। এই সময় একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরই তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান হইলেন। তাঁহার সেবাই ভক্তবরের প্রধান কর্ত্তব্য হইল; কারণ তিনি 'শ্রীশ্রীগুরুগীতা' পাঠে অবগত ছিলেন, "শ্রুতি-স্মৃতি-মবিজ্ঞায় কেবলং গুরুসেবয়া, তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তাঃ, ইতরে বেশধারিণঃ॥" অর্থাৎ "নাহি করে যারা শ্রুতি-স্মৃতি-অধ্যয়ন। ভক্তিভরে শুধু করে শ্রীগুরু-সেবন॥ প্রকৃত সন্ন্যাসী বটে সেইসব ধীর। শুধু বেশ-ধারী যারা পড়ে মাত্র চার॥" আবার এই সন্ন্যাস-তত্ত্ব মহাত্মা অর্জ্জুনকে বুঝাইবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "জ্ঞেয়ঃ সঃ নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি। নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥" অর্থাৎ "হে মহাবাহো, যাহার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, যাহার হৃদয়ে হিংসা, দ্বেষ নাই এবং যে শীতোষ্ণ-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু তাহারই নিত্য সন্ন্যাস লাভ হইয়াছে।

সেই সংসার-বন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্ত হইয়া থাকে।" প্রকৃতপক্ষে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার এই ভাবেই সংসারে কালাতিপাত করিতেন। বাল্য-কালেই যখন তিনি "ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুঃ ন দাতা, ন পুত্রর্ণপুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা। ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব ; গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী" ইত্যাদি স্তোত্র ও "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়-মতীব বিচিত্রঃ, কস্য ত্বং বা কুতঃ আয়াতঃ তত্ত্বং চিন্তয় সততং ভ্রাতঃ" ইত্যাদি মোহমুদ্গর-শ্লোকাবলী প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলেন, তখন তিনি সংসারের অনিত্যতা ও ভগবানের নিত্যতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া-ছিলেন। সত্য সত্যই তাঁহার হৃদয়ে সংসারাসক্তি, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি আদৌ ছিল না। যাঁহারা সে সময়ে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাই ইহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিকটে তিনি একজন অসাধারণ, তেজস্বী পুরুষ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। তিনি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-ঋতুতে সমানভাবেই থাকিতে পারিতেন। এই সমস্ত কারণেই তিনি নরাকার-পরব্রহ্ম গুরুজ্ঞানানন্দদেবের কৃপা লাভান্তর অনায়াসেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

হুগলী-নিত্য-মঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে যোগাভ্যাসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। যোগ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীদেব তাঁহাকে (কিছু কিছু) উপদেশ দিয়াছিলেন, যথা, "যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং" (অর্থাৎ "জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যই যোগ")। শাস্ত্রানুসারে শ্রীশ্রীগুরু-দেবই পরমাত্মা—শ্রীশ্রীগুরুদেবই শিব ; তিনি জগৎ-সুন্দর-মূর্ত্তিতে সর্ব্বদা বরাভয়-করে শিষ্যের সহস্রদল-কমলে বাস করেন। তাঁহার সহিতই শ্রীযুক্ত শরৎকুমার জপ করিবার সময় মিলিত হইয়া তন্ময় হইয়া থাকিতেন। এই মিলনকে যোগ বলা হয়। বলাবাহুল্য, কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি জাগ্রতা হইলেই সাধকের এই অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। এই মিলনাবস্থায় বা যুক্তাবস্থায় তিনি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সম্ভোগ করিতেন। এই অবস্থা হইতে বাহ্য-ভাবে আসিলেও তিনি যোগস্থ হইয়াই উদাসীনবৎ দৈনন্দিন জীবনের কর্ত্তব্য

করিয়া যাইতেন। তাঁহার এই আচরণ গীতার একটী শ্লোকদ্বারা সমর্থিত। সে শ্লোকটী এই "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥" অর্থাৎ "হে ধনঞ্জয়! ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইয়া যোগস্থ হইয়া তুমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। সমত্বই (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবই) যোগ বলিয়া উক্ত হয়॥" সে সময় তাঁহার সুস্বাদু খাদ্যাদিতেও রুচি ছিল না এবং সর্ব্বদাই তাঁহার মানসে জপ হইত বলিয়া স্বল্পাহারেই তাঁহার উদর পূরণ হইত। ইহাতে তাঁহার দেহ কৃশ হইলেও অন্তরে তাঁহার পরমানন্দ ছিল। সেইজন্য সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। তাঁহার সাধন-জীবনও ছিল আড়ম্বর-শূন্য। তিনি সাধন-ভজন এত গোপনে করিতেন যে, তাঁহার দীক্ষার বিষয় পর্য্যন্ত তাঁহার পরমার্থ ভ্রাতা ব্যতীত অন্য কেহই জানিতেন না। তবে সংসারে তাঁহার ঔদাসীন্য দর্শনে তাঁহার পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বিশেষচিন্তিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে বিবাহ-সূত্রেবন্ধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। তিনি এই সময় তাঁহার মাতৃদেবীকে অনেক শাস্ত্র-বাক্য বলিয়া তাঁহার চিত্তে শান্তি আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেন।

শ্রীযুক্ত শরৎকুমারের দীক্ষা লাভের পর তাঁহার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভাদুড়ী, বি-এল্, উকিল মহোদয় শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লাভান্তর মুগ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু (ঠাকুরের মাহাত্ম্য যথাযথ অবগত না হইয়া) তিনি ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব নহেন ভাবিয়া ভাদুড়ী মহাশয় তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। এই কথা আশুবাবুর মুখে শুনিবামাত্র শ্রীযুক্ত শরৎ-কুমার যুক্তিদ্বারা তাঁহার ভ্রম অপনোদন করেন। বলাবাহুল্য, আশুবাবু তাহার অল্পদিন পরেই হুগলী-নিত্য-মঠে পুনরায় গমন করেন। এইবার নিত্য-মাহাত্ম্য তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইল; কেননা তিনি নিত্য-কক্ষে সেদিন যে দিব্য-মূর্ত্তি দর্শন করিলেন তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় শ্রীঅঙ্গ আশুবাবুর চক্ষে দিব্য-যজ্ঞ-সূত্রে সুশোভিত অবস্থায় দৃষ্ট হইল। এতদ্দর্শনে

ভাদুড়ীমহাশয়ের জাত্যভিমান দূরীভূত হইল এবং শ্রীনিত্য-চরণে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

সেই সময় পূজাবকাশে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার পুনরায় হুগলী-মঠে গমনান্তর শ্রীনিত্য-চরণ-ছায়ায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করেন। তখন একদিন তিনি নির্জ্জনে শ্রীশ্রীদেবকে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে অন্তর্য্যামী, সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্মমন্ত্র-প্রভাবে সাধকের আত্মজ্ঞান লাভ হয়। সেই আত্মজ্ঞান বশতঃ তাহার মায়া-ভ্রান্তি বিদূরিত হয়। তাই তখন সে স্বভাব-সন্ন্যাসের* অবস্থা লাভান্তর সংসার ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসী হইয়া থাকে। স্বভাবে সন্ন্যাসী না হইলে কেবল বৈধি-সন্ন্যাসে কি হইবে?" এতৎশ্রবণে ভক্তবর শ্রীশ্রীদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানান যে, তাঁহার যেন শ্রীযুক্ত শরৎকুমারের উপর কৃপা-দৃষ্টি থাকে। অতঃপর ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, "তোমার কথা আমার স্মরণ থাকিবে।" এই সুমধুর বাণী ভক্তবরকে পরমাতৃপ্তি প্রদান করিয়াছিল; কেননা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন যে, শ্রীশ্রীদেবের স্মরণে থাকিলেই তাঁহার পরমার্থ লাভ হইবেই।

এই সময় প্রায় প্রত্যহই শ্রীশ্রীদেবের শ্রীচরণ-দর্শন-লাভ হইত। ভগবদ্বিষয়ক যখন যে ভাবের কীর্ত্তন বা অন্ত সঙ্গীত হইত, ঠাকুর তখন সেই ভাবেই ভাবান্বিত হইয়া গভীর-সমাধি-মগ্ন হইতেন। সেই সময় অনেক নিত্য-ভক্ত তাঁহাকে সেই-রূপ-ও-কান্তি-বিশিষ্ট হইতে দর্শন করিয়াছেন। একদিন নিত্য-ভক্ত হরিবাবু ঠাকুরের আদেশে নিত্য-গীতির "শবরূপে মহাদেবে" ইত্যাদি সঙ্গীতটী এরূপ ভাবোচ্ছ্বাসে গাহিয়া-

---

*সন্ন্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক স্থলেই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে (শাস্ত্র-বাক্যসহ) শ্রীশ্রীদেবের উপদেশাবলীর কিয়দংশ এই গ্রন্থের ৩৫—৩৭, ৩৯—৪০, ৪৫—৪৭, ৪৯—৫১, ১—৪, ৫৫—৫৬, ৬৪—৬৫, ৭৯—৮০ ও ১৪৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা পাঠেই ইহার তথ্য বিশেষ ভাবেই অবগত হওয়া গিয়াছে।

ছিলেন যে, তৎশ্রবণে ঠাকুর বহুক্ষণ সমাধি-মগ্নাবস্থায় ছিলেন। সেদিন শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঠাকুরকে 'সাক্ষাৎ কালী' বলিয়া বোধ করিয়া গভীরভাবে মগ্ন হইয়াছিলেন। এইরূপে ভক্তবর শ্রীশ্রীদেবকে নানা সময়ে শিব-রাম-কৃষ্ণ-দুর্গা প্রভৃতি রূপে দর্শন করিলেও 'শ্রীশ্রীনিত্যগোপালই তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব' ছিলেন ও আছেন! বলাবাহুল্য, তিনি যে পূর্ণ-পরব্রহ্ম-নারায়ণ তাহা ভক্তবর প্রথমেই অনুভব করিয়াছিলেন ; আর নিত্য-কক্ষে প্রবেশান্তর যতক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় তিনি অবস্থান করিতেন ততক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তিনি নীরবে অনিমেষ-নয়নে নিত্য-রূপ দর্শন করিতে থাকিতেন। নিত্য-রূপ-দর্শন-লাভ অবধি জগতে অন্য কোনও রূপই তাঁহার নয়ন আকর্ষণ করিত না ; বাস্তবিকই, নিত্য-সম্বন্ধীয় যাহা কিছু তাহাই তাঁহার এত মনোরম হইয়াছিল যে, অন্য কোনও দিকে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত না। নিত্য-ভক্তের প্রতিও তাঁহার প্রেম হইয়াছিল অত্যধিক। তাহার প্রকাশ নানা ভাবেই পাইত। 'ভ্রাতা-ভগ্নী' বলিতে তিনি তাঁহাদিগকেই বুঝিতেন। এককথায়, নিত্য-সম্বন্ধ-বন্ধনের দৃঢ়তায় তাঁহার অনিত্য-সংসার-বন্ধন একেবারে শিথিল হইয়া গিয়াছিল।

যাহাহউক, যে ঘটনার চিন্তা পর্য্যন্ত নিত্য-সর্ব্বস্ব ভক্তবরের মনে স্থান পাইত না সেই হৃদয়-বিদারক ঘটনা (অর্থাৎ শ্রীশ্রীদেবের অনন্ত-সমাধি*) ঘটিবার দিনই তিনি (শ্রীশ্রীদেবের গুরুতর অসুখের সংবাদ পাইয়া) নিত্য-মঠে পৌছিয়াছিলেন। তখন তাঁহার ন্যায় নিত্য-নিষ্ঠ ভক্তের যে কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয় ; তাহা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না বা বর্ণনা করিতে লেখনী অসমর্থ। তবে, দারুণ-শোকানলে তাঁহার চিত্ত দগ্ধ হইতে থাকিলেও তিনি তৎসময়োচিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে কোনও ত্রুটীই করেন নাই। তাই, তিনি তৎপর দিবস প্রত্যুষে তিনজন নিত্য-ভক্ত সমভিব্যাহারে মনোহরপুর-আশ্রমে (বর্ত্তমান কলিকাতা-মহা-নির্ব্বাণমঠে) গমনান্তর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং

*এ সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে :

আশুবাবুর।

শ্রীশ্রীদেবের ভোগের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। অতঃপর রাত্রি ১০টার সময় পরম-পবিত্র শ্রীনিত্য-দেহ উক্ত স্থানে নীত হন এবং শ্রীশ্রীদেবের ভোগাদির সুব্যবস্থা করা হয়। তৎপর দিবস রাত্রি ১০টার সময় তাঁহাকে পুষ্প-মাল্য-চন্দনে বিভূষিত করতঃ ভক্তগণ যথারীতি সুসমাহিত করিলেন।

অনন্তর শ্রীযুক্ত শরৎকুমার শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়েই কর্ম্মস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নিয়মিতরূপে তিনি দৈনন্দিন জীবনের কর্ত্তব্য বাহ্যতঃ করিতে লাগিলেন বটে ; কিন্তু নিত্য-ভক্তগণের সহিত শ্রীশ্রীদেবের নাম-কীর্ত্তনে ও লীলা-প্রসঙ্গে তিনি বিভোর হইয়া থাকিতেন। এই সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি একটী বাটী পর্য্যন্ত ভাড়া করিয়াছিলেন। তথায় সুসজ্জিত শ্রীশ্রীদেবের শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভক্তগণ জপ-ধ্যান-কীর্ত্তন-পাঠ-উৎসবাদি অবাধে ও সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এই সময় কতিপয় ধর্ম্মভাবাপন্ন যুবক তাঁহার সংস্রবে নিত্য-ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের দুরারোগ্য ব্যাধি হইলে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার একদিন নিজ কক্ষে সাধন-ভজনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণের আবেগে তদ্ব্যাধির কবল হইতে ভক্তটীর নিষ্কৃতির জন্য শ্রীশ্রীদেবের নিকট প্রার্থনা করিবার সময় নিবেদন করিলেন, "ঠাকুর, তাহার ব্যাধিটী না হয় আমাকেই দিন এবং সে আরোগ্য লাভ করুক।" অতঃপর শ্রীযুক্ত শরৎ-কুমারের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। তিনি আর আসনে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তখন তিনি বাধ্য হইয়া বহির্গমন পর্য্যন্ত করিলেন ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ঘটনার পর হইতেই ভক্তটী আরোগ্যের পথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। এই ভক্তকেই অন্য একদিন শ্রীযুক্ত শরৎকুমার সন্ধ্যার পর সদর রাস্তার উপর সাদরে স্নেহালিঙ্গন করায় ভক্তটী হঠাৎ অবশ এবং অচেন পর্য্যন্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে ঐ অবস্থায় অতি সাবধানতার সহিত তাঁহার একজন বন্ধুর বাটীতে লওয়া হইয়াছিল এবং তথায় তাঁহাকে পুনরায় প্রকৃতিস্থ করা হইয়াছিল। বাস্তবিকই, নিত্য-কৃপা ও নিত্য-মহিমা

শ্রীযুক্ত শরৎকুমারের মধ্য দিয়া যে কত প্রকারে প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে তাহা আমার (মনোহর হওয়ায়) বিশদভাবে বিবৃত করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও স্থানাভাববশতঃ সে ইচ্ছাকে সংযত করিতে হইতেছে। এই সমস্ত অবগত হইয়া এবং শ্রীশ্রীগুরুমুখেও অন্যান্য অনেক নিত্য-ভক্তের অনুভূতি ও অবস্থার বিষয় শ্রবণেও নিত্য-মাহাত্ম্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার সুবিধা পাইয়া জীবন সার্থক করিয়া আসিতেছি। যাহাহউক, শ্রীশ্রীগুরু-দেব আমার যখন নিত্য-প্রেমে এইভাবে মাতোয়ারা ও তন্ময় হইয়া দিনাতিপাত করিতেছিলেন এবং তাঁহার সংসার-ত্যাগের (অদম্য) ইচ্ছা যখন প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল, তখন তিনি মাঝে মাঝে কলিকাতা-মহানির্ব্বাণমঠে আসিয়া কিয়ৎকাল অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীদেবের সেবা কায়মনোবাক্যে করিতেন। তখন তাঁহার পূর্ব্বোক্ত (বাল্যবন্ধু ও) পরমার্থ-ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীমৎ মহেশ্বরানন্দ মহারাজ ও শ্রীমৎ নিত্যানন্দ মহারাজ তাঁহার বৈরাগ্য-ভাব-দর্শনে তাঁহাকে সংসার-ত্যাগের জন্য পুনঃ পুনঃ বলিতেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় লাভ করিবার পর হইতে কোনও দিনই নিত্য-বাক্য, নিত্য-উপদেশ ও নিত্য-অনুমতি ব্যতীত অন্য কাহারও বাক্য, উপদেশ ও অনু-মতির অপেক্ষা রাখিতেন না ও রাখেন না; তাই তিনি দৃঢ়তা অথচ বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে বলিতেন, "ভাই, বাল্যকাল হ'তেই তো মায়া-ময় সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হ'বার তীব্র ইচ্ছা পোষণ ক'রছি ; কিন্তু ঠাকুরের নির্দ্দেশ ছাড়া আমার সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হ'চ্ছে না।" তাঁহার এই কথা শ্রবণে তাঁহারা নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিতেন। বলাবাহুল্য, শাস্ত্রাদি-পাঠে তাঁহার অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীগুরুকৃপায় যখনই যাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তখনই তিনি সন্ন্যাসের অবস্থা লাভ করতঃ কৃতার্থ হন। যাহাহউক, সর্ব্বাবস্থায়ই তিনি জপ-ধ্যান-আত্ম-চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন ; অথচ কর্ম্মস্থলেও তাঁহার কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইত না। কিন্তু গভীর আত্ম-চিন্তায় যিনি সদাই নিষ্ঠিত থাকেন, তিনি আর চাকরী

কতদিন করিতে পারেন? একদিন তদ্ধ্যানে বিভোর অবস্থায় তিনি কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে গমন করিবার সময় অবশ হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিলেন। তাই, তখন তিনি শিক্ষকতা-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করাই স্থির করিলেন; এমন সময় একদিন গভীর-রহস্যময়ভাবে হঠাৎ দুই খণ্ড বৈরাগ্যোপযোগী বস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তিনি অনুভব করিলেন যে, অন্তর্যামী ঠাকুর তাঁহার মনের অবস্থা অনুসারেই এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। তখন আর বিলম্ব না করিয়া তিনি কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতা-মহা-নির্ব্বাণমঠে গমনান্তর কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ এক মনে এক প্রাণে শ্রীশ্রীঠাকুর-সেবায় নিষ্ঠিত হইলেন। ইহার কিয়দ্দিবস পর তিনি শ্রীশ্রীদেবের নির্দ্দেশ অনুসারে সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করেন এবং শ্রীমৎ নিত্যপদানন্দ অবধূত নাম লাভ করেন।

ঐ সময় কলিকাতা-মহানির্ব্বাণমঠের চতুর্দ্দিকে বন-জঙ্গল ও পচা-ডোবাদি থাকায় তথায় যেমন ছিল মশার উপদ্রব, তেমনই ছিল ম্যালে-রিয়ার অত্যাচার। তাই, কঠোর-বৈরাগ্যাবলম্বী শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুমহারাজ অচিরাৎ ম্যালেরিয়ার কবলে নিপতিত হইলেন; তাহা হইবেনই বা না কেন? তাঁহার না ছিল উপযুক্ত গাত্রাচ্ছাদন-বস্ত্র, না ছিল মশারি। তাহাতে আবার অতি কদর্য্য চট্-খণ্ড-পরিবেষ্টিত টঙ্গের নীচে আর্দ্র মেজের উপর অতি কুৎসিৎ অথচ নীচু তক্তপোসের উপর তিনি শয়ন করিতেন। ইহাতে রাত্রে তিনি এত শীতার্ত্ত হইতেন যে,তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইত। তাই, তিনি অনেক সময় উপবেশনপূর্ব্বক রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। ম্যালেরিয়া জ্বর বলিয়া শেষ রাত্রেই ইহার বিরাম হইত। এইজন্য প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক স্নান করতঃ তিনি উচ্চৈঃস্বরে প্রভাতী-কীর্ত্তন করিতেন। অনন্তর তিনি শ্রীশ্রীদেবের সেবায় রত হইতেন। ঐ অবস্থায়ই অনেক সময় তাঁহাকে রন্ধন-কার্য্যে পর্য্যন্ত ব্যাপৃত হইতে হইত। বাস্ত-বিকই অসাধারণ নিত্য-নিষ্ঠা ও বৈরাগ্য না থাকিলে এত কষ্ট সানন্দে বরণ করতঃ কে চলিতে পারে?

অনন্তর শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুমহারাজ পদব্রজে নবদ্বীপ হইয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত বজ্‌রাপুর-গ্রামে গমনান্তর শ্রীশ্রীদেবের লীলা-স্থলগুলি দর্শন করেন এবং তিনি যে যে স্থানে মহোৎসবাদি করিয়াছিলেন সেই সেই স্থানে শ্রীশ্রীমৎ মহারাজও মহোৎসব ও তুমুল কীর্ত্তনাদি করেন। তখন তাঁহার সঙ্গেছিলেননিত্য-ভক্ত শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দমহারাজ ও শ্রীমৎকেশবানন্দমহারাজের শিষ্য শ্রীমৎ নিত্যস্মরণানন্দ দাদা। অতঃপর তিনি তারকেশ্বর ও হুগলী-মঠ দর্শন পূর্ব্বক গয়া হইয়া কাশীধামে গমন করেন। তথায় তাঁহার বিশেষ-জপ-নিষ্ঠ পরমার্থ-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় মহাশয় তখন উক্ত ধামে (রংপুর জেলার অন্তঃপাতি পূর্ব্বোক্ত টেপার জমিদার) নিত্য-ভক্ত শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহোদয়ের তত্রত্য বাটীতে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। বলাবাহুল্য, অবিনাশবাবুর বাসাতেই মদীয় গুরুদেব আশ্রয় লইলেন। তথায় একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে তাঁহার বাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে তিনি মনের আনন্দে প্রায় পঞ্চদশ দিবস সাধন-ভজনাদি করতঃ অতি-বাহিত করিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় প্রত্যহই তিনি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের সন্ধ্যা-আরত্রি দর্শন করিতেন। একদিন নিত্য-ধ্যান-যোগ-নিষ্ঠ নিত্য-পদানন্দ মহারাজ আরত্রি-দর্শন-কালে বিশ্বনাথের স্থানে দর্শন করিলেন ভুবন-মোহন নিত্য-রূপ। একে সেই অনুপম, অদ্ভুত-লাবণ্যযুক্ত, অপূর্ব্ব-দিব্য-রূপ, তাহাতে আবার নিত্য-মুখে মৃদু-মধুর হাসি। ইহা নিরীক্ষণ করিয়া তিনি আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। বহু সময় এইভাবে অতিবাহিত হইলে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং বিশ্বনাথকে পুনঃ পুনঃ প্রণামপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর তিনি অযোধ্যা-হরিদ্বার-হৃষিকেশ-দেরাদুন হইয়া বৃন্দাবন-ধামে গমন করেন। তথায় শ্রীমৎ হরিস্মরণানন্দ মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভয়েই 'কুসুমসরোবরে' কিয়ৎ-কাল অবস্থানপূর্ব্বক কঠোর সাধন-ভজন করেন এবং শ্রীমৎ হরিস্মরণানন্দ মহারাজের নিকট শ্রীশ্রীদেবের যে শ্রীমূর্ত্তি ছিলেন তাঁহাকেই সুসজ্জিত করতঃ তাঁহারা সেই বৎসর শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা-তিথি-উৎসব তথাতেই অনুষ্ঠান

করেন। উক্ত কার্য্যে শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ মহারাজও বিশেষভাবে সাহায্য করেন। অতঃপর শ্রীমৎ নিত্যস্বরূপানন্দ মহারাজ ও তৎপর শ্রীমৎ হরিপদানন্দ মহারাজের সহিত শ্রীধামে তাঁহাদের মিলন হয়। তাঁহারা তখন যে স্থানে ছিলেন তখন সে স্থান ঠাকুরের নাম-কীর্ত্তনে মুখরিত করিয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীশ্রীঝুলন-পূর্ণিমা দর্শনপূর্ব্বক মদীয় গুরুমহারাজ ও শ্রীমৎ নিত্যস্বরূপানন্দ মহারাজ ৮৪ ক্রোশ বৃন্দাবন পরিক্রমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বর্ষাণ-গ্রামে 'মান-মন্দির' নামক একটী উদাসী-আশ্রমে তাঁহারা কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং অনেক নিত্য-ভক্তের সহিত তথায় তাঁহাদের মিলন হয়। এই স্থানে 'নানক সাহেবের' জন্মতিথিতে নিত্য-ভক্তগণ তুমুল কীর্ত্তন করেন। বলাবাহুল্য, নিত্যগোপাল-নামে কীর্ত্তন শেষ হয়। সেই দিন শ্রীশ্রীদেবের কৃপায় জীবনে প্রথম শ্রীশ্রীমদ্ গুরুদেব কীর্ত্তনে ভাবোন্মত্তাবস্থায় সুমধুর নৃত্য করেন। তিনি নামরসে সেদিন ডুবিয়া গিয়াছিলেন। মান-মন্দিরে শ্রীমতী রাধারাণী মান করিয়া অবস্থান করিতেন বলিয়া ঐ স্থান শ্রীশ্রীমৎ নিত্যপদানন্দ মহারাজকে* শ্রীমতীর বিষয় স্মরণ করাইয়া দিত। তাই, স্থানটী তাঁহার

*বলাবাহুল্য, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্গুরুদেব চিরদিনই ইঁহার আত্মীয়-স্বজনগণের বিশেষ স্নেহ ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাই, ইঁহার নিত্য-শ্রদ্ধা তাঁহাদের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়া আছে। তাই, কেবল যে ইঁহার পিতা-মাতাই ইহা লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন তাহা নহে; পাবনা-জজ্-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিশেষ-আইনজ্ঞ উকিল ইঁহার অগ্রজ ৺শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চৌধুরী, বি-এল্, মহোদয় পর্য্যন্ত ইঁহার সংসার-ত্যাগের পর ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানে ও কীর্ত্তনে বিশেষভাবে অনুরক্ত হন এবং শ্রীশ্রীদেবের নামে অশ্রু-বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিতেন। কিন্তু, এ সমস্ত বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বে রুচি ছিল না। ইঁহার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রীযুক্তশিশিরকুমার চৌধুরী, বি-এ, মহোদয় বর্ত্তমানে কলিকাতা-হাই-কোর্টের রুল্-সেক্শনের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে নিযুক্ত আছেন। ইনি ও ইঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা কমলাবালা

মনোরম হইয়াছিল। যাহাহউক, শ্রীধাম-পরিক্রমাদি শেষ করিয়া পুনরায় কলিকাতা-মহানির্ব্বাণমঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নির্জ্জনতা-প্রিয় তিনি তথায়

চৌধুরীমহাশয়া ও তাঁহাদের কন্যাত্রয়ও পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ গুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ৺শ্রীযুক্তা নীরোদবাসিনী ভাদুড়ী মহাশয়া অল্প বয়সে একটী কন্যা-সন্তান লাভের পর বিধবা হন। তদবধি তিনি পিতৃ-পরিবার-সেবায় বিশেষভাবে নিষ্ঠিতা হন। অতঃপর মদীয় গুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক জীবনের শেষ-কালে দেহ-মন-প্রাণ শ্রীশ্রীগুরু-সেবায় নিয়োজিত করেন। তাঁহার সেবা-নিষ্ঠা-দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইতেন। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনিত্য-নাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে তিনি শ্রীশ্রীরাস-পূর্ণিমার দিন নবদ্বীপ-মহানির্ব্বাণমঠে শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-ছায়ায় দেহত্যাগ করেন। তাঁহার কন্যা ও জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র ও জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রীও শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছেন। ইহাঁর মধ্যমা ভগ্নী ৺শ্রীযুক্তা সুভাষিণী চৌধুরী মহাশয়ার পাবনা-জেলার অন্তর্গত হরিপুর-গ্রাম-নিবাসী ও পাবনার ভূতপূর্ব্ব উকিল ৺শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। ইনি একটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া অকালে কাল-কবলে নিপতিতা হইয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র চৌধুরী, বি-এস্‌সি, জি-ডি-এ, আর্-এ, এফ্-সি-এ, মহাশয় বর্ত্তমানে একজন চার্টার্ড্ একাউন্ট্যান্ট্। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা প্রীতিকণা চৌধুরী মহাশয়া মদীয় গুরুমহারাজের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, ইহাঁরা এবং ইহাঁদের সন্তানাদিও বিশেষ বিনয়ী ও শ্রীশ্রীঠাকুরে ও শ্রীশ্রীগুরুদেবে বিশেষ ভক্তিমান্। ৺শ্রীযুক্তাসুভাষিণী দেবীর কনিষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছিল পূর্ব্বোক্ত ভারেঙ্গা-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্তী, বি-এ, (বর্ত্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত। ইহাঁর নাম শ্রীযুক্তা সুধীরা চক্রবর্ত্তী। ইনিও আমাদের পরমার্থ-ভগ্নী ও গুরুদেবে বিশেষভাবে অনুরক্তা। ইহাঁদের ও

একটী আলো-বাতাস-শূন্য, সর্পবাসোপযোগী কুৎসিৎ কুটীরকে নিজ বাস-গৃহ-রূপে* বরণ করিলেন। তথায়ও শীতকালে উপযুক্ত গাত্র-বস্ত্রাদির অভাবে তাঁহাকে অত্যন্ত কষ্টে রাত্রি যাপন করিতে হইত। এই সময়ই তিনি ও শ্রীমৎ হরিপদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীদেবের রচিত গ্রন্থমহারাজ 'সর্ব্ব-ধর্ম্ম-নির্ণয়-সারের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। পাণ্ডু-লিপিটী অতি মনোযোগের সহিত পাঠপূর্ব্বক তাঁহারা প্রথম সংস্করণের অনেক ভুল সংশোধন করেন এবং তাহাতে "সন্ন্যাস"-শীর্ষক উপদেশাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছিল না দেখিয়া তাঁহারা সেগুলিও দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করেন।

এই সময় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব একদিন রাত্রির শেষ-যামে নিম্নে বিবৃত অদ্ভুত স্বপ্নটী দর্শন করিয়াছিলেন। স্বপ্ন হইলেও উহা তাঁহার নিকটে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল: "রুদ্ধদ্বার মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে স্ল্যাবের উপর শ্রীশ্রীঠাকুর পশ্চিমাস্য হইয়া এবং শ্রীশ্রীপরমহংসদেব পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে (বারেন্দায়) বহু-ভক্ত-বেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট আছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সকলকে বলিতেছেন, "তোরা কি খাবি? কমলালেবু

ইঁহাদের সন্তানাদিরও শ্রীশ্রীদেবে বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। ৺শ্রীযুক্ত হেমন্ত-বাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা সুশীলাবালা চৌধুরী মহাশয়াও মদীয় গুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। ইনিও বিশেষ ভক্তিমতী রমণী। ইঁহার, শ্রীযুক্তা সুধীরা দেবীরও শিশিরবাবুরপুত্র-কন্যাগণও পিতা-মাতার ভক্তিভাব বিশেষ-ভাবে লাভ করিয়াছে। এক কথায় ৺শ্রীযুক্ত শশীকুমার চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই এবং তাঁহার দৌহিত্রাদিও চরিত্রবান্, অন্তঃকরণবান্, শিষ্টাচারী ও ধর্ম্মভাবাপন্ন। ইঁহারা সকলেই নিত্য-শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন বলিয়াই আমাদের বিশেষ প্রশংসা-ভাজন হইয়া আছেন।

*অতঃপর বহুদিন তিনি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সেই সময় নব-নির্ম্মিত ও অসম্পূর্ণ মন্দিরের বারেন্দায় রাত্রে শয়ন করিতেন। শীতকালে প্রায়শঃ তাঁহাকে স্বরচিত কন্থাদ্বারা গাত্র আচ্ছাদনপূর্ব্বক থাকিতে হইত।

খাবি ?" শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব ধূলি-ধূসরিত-অঙ্গে গভীর-ভাব-মগ্নাবস্থায় আছেন। তাঁহার মধ্য হইতে দিব্য-জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। তাঁহার পরিহিত মলিন বস্ত্রখানি কোনও প্রকারে তাঁহার জানুদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া আছে। করুণামাখা-ঢুলু-ঢুলু নয়নযুগল হইতে অশ্রু নিঃসৃত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত করিতেছে। সেই অপূর্ব্ব-অবধূত-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেব কৃতার্থ হইলেন এবং নিত্য-পদযুগল ধারণ করতঃ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "কাঁদ্ছিস্ কেন ?" এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রন্ধন-শালার দিকে চলিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহার তিনটী স্ফোটক হওয়ায় তাঁহার যাইতে কষ্ট হইতেছিল। ...তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেই ভক্তগণ ভোগের ব্যবস্থা করিলেন। তিনিও আহার সমাপন করিয়া বাহিরে গেলেন এবং শ্রীশ্রীগুরুদেব জলের গাড়ু লইয়া তাঁহার হস্ত-প্রক্ষালনের জল দিলেন। শ্রীকুঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে শ্রীশ্রীমৎ মহারাজ শ্রীশ্রীদেবের অন্যান্য সন্ন্যাসী-শিষ্যবৃন্দকে ঠাকুরের প্রসাদ লইবার জন্য ডাকিলেন এবং তাঁহার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "এই চাবিটী তুমি রাখ। তোমরা না আস্লে ত আমি যেতে পারব না"।" ইহার পরই শ্রীশ্রীগুরুদেব জাগ্রত হইয়া দেখিলেন যে, রজনী প্রভাত হইয়াছে। এই সময় বৃটিশ-গভর্ণমেন্ট অমূলক সন্দেহে শ্রীমৎ মহানন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ মহেশ্বরানন্দ মহারাজ ও শ্রীমৎ নিত্যপদানন্দ মহারাজকে অন্তরীণ করে। কিন্তু ঠাকুর মদীয় গুরুদেবকে চাবি কেন দিলেন তাহা ঠাকুরই জানেন। যাহাহউক, অন্তরীণ অবস্থায় তিনি বাঁকুড়া-জিলার অন্তর্গত কোতলপুর-গ্রামে দুই বৎসর কাল অবস্থান করেন।

নির্জ্জনতাপ্রিয় শ্রীমৎ নিত্যপদানন্দ মহারাজ কোতলপুরে জপ-ধ্যান-সাধন-ভজনের বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া এবং অনেক অপূর্ব্ব অনুভূতি লাভ করিয়া উপলব্ধি করিলেন যে, এ ব্যাপারে শ্রীশ্রীদেবের বিশেষ কৃপা নিহিত আছে। সেই সময় শাস্ত্রের অনেক নিগূঢ়-তত্ত্ব এবং উজ্জ্বল

অক্ষরে লিখিত অনেক দেব-দেবীর মন্ত্র তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইত। এইসব কারণে এবং অগাধ নিত্য-নিষ্ঠা সতত তাঁহার অন্তরে বিরাজ করায় এই বিশেষ-কষ্টজনক-অবস্থাতেও তিনি পরমানন্দেই ছিলেন। এই সময় শ্রীরামলাল তেওয়ারী নামে জনৈক-অবধূত-শিষ্য ঘটনাক্রমে তাঁহার সেবা-কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। মদীয় গুরুদেবের উপর ইহাঁর বিশেষ ভক্তি প্রকাশ পাইত। তাই, তিনি আহারাদি প্রস্তুত করিয়া অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতি ধৈর্য্য-সহকারে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেন; কেননা অধিকাংশ সময় জপ-ধ্যান-পাঠ-কীর্ত্তনাদিতে তন্ময় তাঁহার অনেক সময় বাহ্য-খেয়াল থাকিত না। আবার খেয়াল আসিলেও অনেকক্ষণ পর তিনি বুঝিতে পারিতেন 'তিনি কোথায় আছেন, তাঁহার নাম-ধাম কি ইত্যাদি'। এই সময় দেহ-প্রাণময় ঠাকুরকে দর্শনপূর্ব্বক তিনি বিভোর হইয়া থাকিতেন। এই অবস্থাতেও কোতলপুরে তিনি স্বপ্নে একবার ঠাকুর ও পরমহংসদেবকে দর্শন করেন। সে সময় তুমুল কীর্ত্তন হইতেছিল। তাঁহারা উভয়ে ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে-ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজও নৃত্য করিতেছিলেন। সে সময় তাঁহার বাহ্য-খেয়াল ছিল না। তাঁহার যখন চৈতন্য হইল, তখন তিনি ভূমিতে পতিত হইয়া ছিলেন এবং ঠাকুর তাঁহার বক্ষের উপর পতিত হইয়া ছিলেন। ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এই নে সিদ্ধি নে।" ইহাতে শ্রীমৎ মহারাজ শ্রীশ্রীদেবকে বলিয়াছিলেন, "এইরূপ ভাবে আপনি আমার বক্ষে চিরদিন যেন বিরাজ করেন।" তদুত্তরে ঠাকুর বলেন, "তা' ত আছিই।" অনেক সময় এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইলে তিনি নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। কোতলপুরে অবস্থান-কালে তাঁহার অনেক দিব্য-দর্শন হইত। কিয়ৎকাল তিনি দেহা-ভ্যন্তরে সুদিব্য ষট্‌চক্র দর্শন করেন এবং প্রত্যেক চক্রে জ্যোতির্ম্ময়-নিত্য-গোপাল-রূপ দর্শন করিতেন। ইহাতে তাঁহার অঙ্গ পুলকিত হইত এবং তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন।

এই সময় কোতলপুর থানার এ্যাসিষ্ট্যান্ট্ সব্ ইন্‌স্‌পেক্‌টর্ অভ্ পুলিশ্ তাঁহার নিকট শ্রীশ্রীদেবের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে অবগত হইয়া এক দিন তাঁহার বাসায় মধ্যাহ্নে ঠাকুর-ভোগের ও সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন। সেইদিন কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দর্শন লাভ করায় শ্রীশ্রীগুরুদেব এত ভাবোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন যে, রাত্রি দুই টার পূর্ব্বে তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছিলেন না। ভক্তগণ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের প্রিয়-নিকেতন তাঁহার দিব্য-ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে ঠাকুর বোধে বহু কলসীর জলে স্নান করাইয়াছিলেন।

প্রয়োজন বোধে এইস্থানে উল্লিখিত হইতেছে যে, বাল্যকাল হইতেই শ্রীশ্রীগুরুদেবের দৃঢ়সংস্কার ছিল'শ্রীভগবান্‌কে কায়মনোবাক্যে আরাধনাকরিলে তিনি নিজ দয়াগুণে ভক্তগণকে দেখা দিয়াও থাকেন এবং তাঁহাদের সহিত কথোপকথনও করিয়া থাকেন'। তিনি ঠাকুর শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের কৃপা লাভ করিবার পর তাহা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন ও অনুভব করিয়াছিলেন। সেইজন্য যখনই কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেন, "শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করা যায় কি ?" তখনই তদুত্তরে তিনি নিঃসংশয়-চিত্তে দৃঢ়তার সহিত বলিতেন, "হাঁ নিশ্চয়ই তাঁহাকে দর্শন করা যায় এবং যেমন তুমি আমার সঙ্গে কথা ব'লছ এইরূপ ভাবেই তাঁহার সহিতও কথা-বার্ত্তা বলা যায়।"

যাহাহউক, উক্ত তেওয়ারী মহাশয় অনেক দিন হইল বিশেষভাবে শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন, "প্রভু, আমার স্ত্রীকে দীক্ষা দান ক'র্‌তে হ'বে।" কিন্তু নানাপ্রকারে তিনি তেওয়ারী মহাশয়ের এই প্রার্থনা পূরণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার বাঁকুড়া-জেলারই অন্তর্গত হাত্‌না-গ্রামে যাইবার কথা হয়। ইহা শুনিয়া একদিকে যেমন তেওয়ারী মহাশয় পুনঃ পুনঃ শ্রীপদে মিনতি জানাইতে লাগিলেন, অন্যদিকে তাঁহার স্ত্রীও তেমনই দীক্ষা-লাভের জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভক্তদ্বয়ের প্রাণের প্রার্থনা শ্রবণে

ও ব্যাকুলতা দর্শনে শ্রীশ্রীমৎ মহারাজের কোমল অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি তেওয়ারী মহাশয়কে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "ঠাকুরের ইচ্ছা হ'লে আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'বে।" তদনন্তর শ্রীশ্রীদেবের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তিনি তেওয়ারী মহাশয়কে বলিলেন, "যে দিন ছাত্‌না রওনা হ'ব সেদিন আপনাদের বাড়ীতে আহারাদি ক'র্‌ব ; আর তৎ-পূর্ব্বে শ্রীমান্‌ গোবিন্দ ও আপনার স্ত্রীর অভীষ্ট-বস্তু প্রদান করা হ'বে।" বলাবাহুল্য, সেইদিন নির্দ্দিষ্ট সময় ভক্তদ্বয় অভীষ্ট-বস্তু লাভ করতঃ কৃতার্থ হইলেন ; আর শ্রীশ্রীমৎ মহারাজও নিশ্চিন্ত হইয়া ছাত্‌না-গ্রামে যাত্রা করিলেন।

নিত্য-নিষ্ঠিত-চিত্ত শ্রীশ্রীগুরুদেব তন্ময়তাবশতঃ সর্ব্ব সময়ই অনুভব করেন যে, শ্রীশ্রীদেবই তাঁহার দেহ-প্রাণময় হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার কোনও বিষয়ে কোনও সময়েই নিজের স্বাতন্ত্র্য অনুভূত হয় না। তিনি নিজের ইচ্ছায় কোনও কর্ম্মই করেন না। শ্রীশ্রীদেব তাঁহা দ্বারা যখন যাহা করান, তখন তিনি তাহাই করিয়া থাকেন। ঠাকুর হইতে তিনি নিজের পৃথক্‌ অস্তিত্ব কদাপি অনুভব করেন না। তাই, নিত্য-ময় তিনি যখন দীক্ষা দান করেন, তখনও তিনি বেশ উপলব্ধি করেন যে, শ্রীশ্রীদেবই উক্ত কার্য্য করিতেছেন। অতএব সেজন্য তিনি কোন অহঙ্কারই পোষণ করেন না।

পূর্ব্বোক্ত তেওয়ারী মহাশয়ের মদীয় গুরুদেবের উপর যে অগাধ ভক্তি ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তিনি শ্রীশ্রীমৎ মহারাজের সেবা-কার্য্য অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত করিতেন ও তাঁহাকে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, "আমি তো সংসারে ডুবেই গিয়েছিলাম। আমার গুরুদেব এই মূর্ত্তিতে (অর্থাৎ শ্রীশ্রীনিত্যপদানন্দ-মূর্ত্তিতে) আমাকে জ্ঞান দিয়ে উদ্ধার ক'র্‌ছেন। ইনি একজন যোগী-পুরুষ—জ্যোতিঃ-পুরুষ—মহাপুরুষ। আমি যখন তাঁর ঘরের জোর বাহির হ'তে খুলি, তখনই ঘরের ভিতরে একটী আলো দেখ্‌তে

পাই—নানা সুগন্ধ আমার নাকে ঢুকে। ...(কাঁদিতে কাঁদিতে) তোমার কপালটা ভালই। এমন মহাপুরুষের পাদপদ্মে যে তোমাকে দিতে পার্‌লাম্ এতেই আমার খুব আনন্দ বোধ হ'চ্ছে। এইজন্য আমি কাঁদ্‌ছি।"

শ্রীশ্রীবাসুলীদেবীর মন্দির-শোভিত, ভক্তবর-চণ্ডিদাস-রামীর লীলা-পূত ছাত্‌না-গ্রামে প্রেরিত হইবার পর শ্রীশ্রীগুরুদেবকে তথায় অল্পদিনমাত্র অবস্থান করিতে হইয়াছিল; কেননা বৃটিশ্‌ গভর্ণমেণ্ট্‌ তাঁহার নির্দ্দোষতা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া তাঁহাকে সত্বরে অন্যায়-দণ্ড-মুক্ত করিয়া দেয়। যাহাহউক, উক্ত গ্রামে উক্ত ভক্তদ্বয়ের মিলন-স্থল, সুরক্ষিত পুষ্করিণীর পূত-নির্ম্মল বারিতেই তিনি প্রত্যহ স্নান করিতেন। বলাবাহুল্য, মুক্ত হইবার পর তিনি প্রাণ-প্রিয় কলিকাতা-মহানির্ব্বাণমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় দীর্ঘকাল অবস্থানপূর্ব্বক নানাভাবে প্রাণ ভরিয়া শ্রীশ্রীদেবের সেবা-কার্য্যাদি অনুষ্ঠান করতঃ গত ১৯৩৭ সালে শুভ-অক্ষয়তৃতীয়া-তিথিতে তিনি নবদ্বীপ-মহানির্ব্বাণমঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখানে নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীদেবের সেবা-পূজা, পাঠ-কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং তৎকৃপায় অনেক সাধু-ভক্ত-সমাগমও হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগুরুকৃপা লাভ করিবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা-কাহিনী-পাঠে অবগত হইয়াছিলাম যে, তিনি মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের ন্যায় নৃত্য করিতেন। ইহা কুত্রাপি দর্শন না করায় উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। বলাবাহুল্য, শ্রীশ্রীনিত্য-লীলা-পাঠে ভাবাবেশে ঠাকুরের (শ্রীশ্রীমহাপ্রভুবৎ) নৃত্য-কাহিনী, শ্রীঅঙ্গে অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবের প্রকাশ, গম্ভীর সমাধি প্রভৃতির বিষয় অবগত হইয়া কল্পনা-নেত্রে তাহা দর্শন করিয়া থাকি। এই সমস্ত যে অন্য কোনও দেহে প্রত্যক্ষ দর্শন করিব তাহাপূর্ব্বে ভাবিতে পারি নাই; কিন্তু জীবনে প্রথম কলিকাতা-মহানির্ব্বাণমঠ-মন্দিরে শ্রীশ্রীমৎ মহারাজের ভাবাবেশে হুঙ্কার-চীৎকার, অঙ্গ-মোটন, কম্পন ও সমাধি ও তদনন্তর নৃত্যাদি দর্শন করি। কীর্ত্তন-শ্রবণে তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবাবেশাদি

দৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীভগবানের যে কোনও নামাদি-কীর্ত্তনে মনোযোগী তাঁহার অল্পসময়েই আবিষ্টাবস্থাপ্রাপ্তিপ্রভৃতি আমাকে চমৎকৃত করিয়াছে। কলিকাতা-মঠে, নবদ্বীপ-মঠে ও জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত মথুরাপুর এলাকার অন্তঃপাতি ও পাবনা ও বর্দ্ধমান জেলার নানাস্থানে নানা ভক্তের গৃহে ভাবাবেশে তৎকৃত সুমধুর নৃত্যাদি ভক্তিমান্ দ্রষ্টামাত্রকেই আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিল। মথুরাপুরে জনৈক ভক্তের বাটীতে শ্রীশ্রীশ্যামা-সঙ্গীত-শ্রবণে আবিষ্ট তাঁহার কেবলমাত্র নৃত্য নয় অদ্ভুত লম্ফ পর্যান্ত ও হুঙ্কার-ধ্বনি দর্শকবৃন্দের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। নবদ্বীপ-মঠে যে কতদিন এই সমস্ত লীলা হইয়াছে তাহা আর কি বলিব! এখানে একদিন তিনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-বিষয়ক কীর্ত্তন ভাবের আবেশে শ্রবণ করিতে করিতে অবশেষে স্থির ও নবদ্বীপে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহবৎ দণ্ডায়মান হইয়া অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধ (প্রায় ৭০ বৎসর) বয়সেও কীর্ত্তনে তিনি আবেশে যুবকের ন্যায় অদ্ভুত নৃত্য করিয়া থাকেন। যাঁহাদের নিত্য-ভাবাবেশ, নিত্য-সমাধি, নিত্য-নৃত্য প্রভৃতি দর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই তাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুদেবের ও শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য অনেক শিষ্যের নৃত্যাদি দর্শনে উক্ত নিত্য-লীলা, ও নিত্য-শক্তি ও নিত্য-মহিমা প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি করিবার সুবিধা পাইয়াছেন বলিয়া মনে করি।

যেমন শ্রীশ্রীদেবের মাহাত্ম্য-শ্রবণান্তর পাবনা হইতে অনেক ভদ্র-সন্তান তৎকৃপালাভার্থ হুগলী-মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তেমনই ভারেঙ্গা-নিবাসী জনৈক যুবক স্বপ্নে ঠাকুরের নিকট হইতে মন্ত্র লাভ করতঃ তথায় গমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের কৃপা লাভ করিবার পূর্ব্ব হইতেই মদীয় গুরুদেব ইঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত অমূল্যমোহন চৌধুরী। ইঁহারও ভাবটী সুন্দর। ইনিও ঠাকুরের নামে মাতোয়ারা হইয়া যান। ইনি সার্জ্জিয়ন্ জেনারেলের আফিসে চাকরি করিতেন। ইনি ছিলেন চন্দননগর-নিবাসী নিত্য-ভক্ত শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের

সহকর্ম্মী। ইঁহারা উভয়েই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করতঃ নিত্য-চিন্তায় কালাতিপাত করিতেছেন।

এই সময় পাবনা-জেলার অন্তর্গত শাঁখিয়া পোষ্ট আফিসের অধীনস্থ সৈদপুর-গ্রাম হইতে শ্রীনিত্য-পদাশ্রয়-প্রার্থী হইয়া হুগলী-মঠে আসিয়াছিলেন তান্ত্রিক-ক্রিয়া-রত জনৈক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত বনবিহারী চক্রবর্ত্তী। ইনি চিকিৎসা-ব্যবসা করিতেন। বর্ত্তমানে ইনি সপরিবার নবদ্বীপধাম-বাসী হইয়া আছেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিত্য-ভক্ত ডাক্তার শ্রীযুক্তসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রীশ্রীদেবের মাহাত্ম্যের বিষয় শ্রবণান্তর ইঁহার শ্রীনিত্য-চরণ-দর্শনাদির আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। তদনন্তর ইনি নিত্য-মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অতঃ-পর শ্রীশ্রীদেবের আদেশ অনুসারে একদিন যখন তিনি একাকী নিত্য-কক্ষে প্রবেশ করেন, তখন ঠাকুরকে তিনি ইষ্টরূপে দর্শন করতঃ কৃতার্থ এবং আত্ম-বিস্মৃত হন। এইভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে তিনি প্রকৃতিস্থ হন। তখন ঠাকুর তাঁহার মন্ত্র 'চৈতন্য' করিয়া দিয়া তাঁহাকে তাহা মনে মনে জপ করিবার আদেশ দেন। ইঁহার নিত্য-নিষ্ঠা ইঁহার একমাত্র পুত্র ডাক্তার শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী ও নাবালক পৌত্র শ্রীমান্ বিনয়-ভূষণ চক্রবর্ত্তীতে সংক্রামিত হওয়াতেই তাঁহারা এবং বিধুবাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা হেমলতা চক্রবর্ত্তী মহাশয়া মদীয় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। বনবিহারীবাবুর মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি শ্রীশ্রীদেবের দ্বারা দীক্ষিতা না হইলেও বিশেষভাবে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীদেবের নিকট অবিশ্বাসী কুতার্কিকও যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই আবার বিশেষ ভক্তিভাব লইয়াও অনেকে যে তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই ভাবের আবেগে রংপুর হইতে নিত্য-মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন পূর্ব্বোক্ত ডাঃ শ্রীযুক্ত বিশ্ব-বন্ধুবাবু, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গুহ ঠাকুর্তা মহাশয় (শ্রীমৎ নিত্যদাস মহারাজ)

প্রভৃতি। ইহাঁদের পরে আর এক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেছে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য। মৈমনসিংহ জেলায় ইহাঁর জন্মস্থান হইলেও মাহিগঞ্জ (রংপুরে) ছিল ইহাঁর কর্ম্মস্থল। এখানে তিনি পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের বিশেষ স্নেহভাজন হওয়ায় তাঁহার নিকট শ্রীশ্রীদেবের ৬প্রসাদ মধ্যে মধ্যে পাইতেন; কিন্তু নিত্য-ভক্ত চারুবাবুর হৃদয়স্পর্শী, ভাবোদ্দীপক নিত্য-সঙ্গীত তাঁহার অন্তরে নিত্য-অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি বিশেষভাবে জাগ্রত করিল। অতঃপর ঠাকুরের কৃপায় ও পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়ের সহায়তায় ধর্ম্মপ্রাণ বিনয়বাবু সমস্তবাধা অনায়াসে অতিক্রমপূর্ব্বক ৬দুর্গাপূজার মধ্যে হুগলী-মঠে গমন করিলেন। তথায় যাইবার পরই তিনি শ্রীপদে শ্রদ্ধাঞ্জলিপ্রদান ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক ঠাকুরের বিশেষ দৃষ্টি-প্রসাদ লাভ করিলেন। সেইদিনই জ্ঞানানন্দ-বিষয়ক তৎকৃত (স্বরচিত) ভাবময় সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে ঠাকুর সমাধি-মগ্ন হইলেন। এদিকে কমল-নয়নদ্বয় হইতে অবিরলধারে প্রবাহিত বারি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য সৃষ্টি করিল। ভক্তবর সেই বিশ্ব-বিমোহন রূপ ও অদ্ভুত মহাভাব অবাক্ হইয়া অপলক-নেত্রে দর্শন করিতে লাগিলেন। ভক্তবরের মনে হইল ঠাকুর যেন তাঁহার কত আপনার! তাই, দীক্ষা-গ্রহণের পর কর্ম্মস্থলে পুনরায় যাইবার সময় তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। এই সময় ঠাকুরের মাহাত্ম্য তাঁহার ভিতর দিয়া বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল; কেননা এই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তন্নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা-পদ্ধতি, ব্যবস্থাদি ও তন্নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগে ভক্তবর আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার অপূর্ব্ব অনুভূতি সকল লাভ হইয়াছিল। বলাবাহুল্য, তিনি শ্রীশ্রীদেবের বিশেষ স্নেহ ও কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনে ও কর্ম্ম-জীবনের উপরও অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শ্রীশ্রীদেবের আচরণে তাঁহাকে তিনি যেমন প্রেমের ঠাকুর তেমনই অন্তর্য্যামী সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইহাঁর

নিত্যানুরাগ এখনও বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ইঁহার গভীর-ভাব-পূর্ণ-কীর্ত্তন শ্রোতৃমাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইঁহার সুশীলা, ভক্তিমতী স্ত্রী শ্রীযুক্তা কুমুদকামিনী দেবীও ঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় লাভান্তর তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। এই সময় (পূর্ব্বোক্ত) শ্রীযুক্তঅবিনাশ রায় মহাশয় নামে আর একজন পরম-ধার্ম্মিক লোক শ্রীশ্রীদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুর নিজদয়াগুণে তাঁহাকে দিয়াছিলেন অদ্ভুত জপ-নিষ্ঠা। সতত-জপ-পরায়ণ এই ভক্ত আসনে উপবেশনপূর্ব্বক জপ করিতে করিতে কাশীধামে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের শিষ্যগণের শ্রীশ্রীগুরু-দেবে নিষ্ঠা-বিশ্বাস-নির্ভরতা যে অতুলনীয় তাহা আমরা বিশেষভাবেই অবগত হইয়াছি। বলাবাহুল্য, ইহার প্রভাবেই অনেকেই বিশেষ উপার্জ্জনক্ষম, সঙ্গতি-সম্পন্ন বা বিদ্যা-ধন-সম্পন্ন ও সমাজে বরেণ্য হইয়াও ভোগবাসনা-বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন এবং কঠোর-বৈরাগ্য-জীবন বরণ করিয়াছিলেন। তাই, উচ্চ-শিক্ষাদি লাভ করিয়াও পাবনা-হাসানপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘোষ, বি-এ, মহাশয় সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ শ্রীশ্রীদেবের সেবা ও নানা-তীর্থ-পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন যেমন বিদ্বান্, তেমনই বিচারবান্, তেমনই বিচক্ষণ ও তেমনই দীন-ভাবা-পন্ন। তাঁহার শিষ্টাচার ছিল আদর্শস্থানীয়। তাঁহাকে দেখিয়া কেহই মনে করিতে পারিতেন না যে, তিনি উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসের নাম হইয়াছিল শ্রীমৎ স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ অবধূত। তাঁহার নিত্যানুভূতিও ছিল গভীর। তিনি শ্রীশ্রীদেবের রচিত "সর্ব্বধর্ম্ম-নির্ণয়-সার" নামক 'গ্রন্থমহারাজের' অতি মধুর ইংরাজী অনুবাদ করতঃ অমর-কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার নাম পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে।

অনেক নিত্য-ভক্তের আচরণ দর্শনে ও তাঁহাদের অনেকের বিষয় শ্রবণে আমার স্বতঃই মনে হয় যে, তাঁহারা বাহ্যতঃ নানা বৈষয়িক বা সাং-সারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও সতত-নিত্য-ধ্যান তাঁহাদের স্বভাবগত।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে অদ্ভুতভাবে ইহার বিশেষ প্রকাশ দৃষ্ট হইয়াছে। আহা! পূর্ব্বোক্ত মোহিনীবাবু যখন পাবনা-জেলার অন্তঃপাতি সাহাজাদপুর-গ্রামের উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা-কার্য্য-নিযুক্ত ছিলেন, তখন একদিন দৈবাৎ তাঁহাতে শ্রীশ্রীদেবের আবেশ হইয়াছিল! এই সময় তাঁহার হাব-ভাব-দর্শনে ও বাণী শ্রবণে সকলে বিস্ময়ে ও আনন্দে অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি সুবিজ্ঞ পণ্ডিতের ন্যায় সংস্কৃতে ও ইউরোপ-বাসীর ন্যায় ইংরাজীতে নানা কথা বলিয়াছিলেন। ভক্তবর এই ভাবে এক সপ্তাহ কাল যাপন করিয়াছিলেন। উক্ত আবেশের শেষ দিন তিনি তত্রত্য দর্শকবৃন্দকে বলিয়াছিলেন, "আজ আমাতে শ্রীরাধার দশম-দশা প্রকটিত হ'বে। তোরা যে পদ গান কর্ব্বি তা' যেন তদ্ভাবানুযায়ী হয়। আমার এ দিব্য-দশা। এতে তোদের কোনও চিন্তার কারণ নাই। এই তো শেষ দশা হ'বে। এ তিন ঘণ্টাকালও থাকৃতে পারে, আবার তিনদিনও থাকৃতে পারে।" তদ্দশা-দর্শনে চমৎকৃত গায়কগণ তদ্বাণী অনুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন। নিত্যাবেশে ভক্তবরের দেহে অপূর্ব্ব-ভাব-লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই অবস্থাতেই তিনি বলিয়াছিলেন, "এখানে মোহিনী ছাড়া আমার আর কোনও শিষ্য নাই। এর আধারে দশম-দশার সমস্ত ভাবের বিকাশ হ'তে পার্‌বে না; কারণ এ আধারে সে সব সহ্য হ'বে না।" বাস্তবিকই, তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে সকলে ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, মাষ্টারমহাশয় বোধহয় মানব-লীলা সংবরণ করিবেন। তাই, তাঁহারা কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর ভক্তবর পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই সময় নদীয়া-রাইচড়া-নিবাসী নিত্যভক্ত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র নন্দী মহাশয় গভর্ণমেণ্টের চাকরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস-আশ্রম বরণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোরী ও শ্রীমৎ গুরুগৌরবানন্দ নামে পরিচিত। একখানি কন্থামাত্র লইয়া স্বামিজী পদব্রজে সমস্ত ভারত পর্য্যটন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীদেবের বিষয়ে তাঁহার অনুভূতিও

বিশেষ ছিল। এই অবধূত মহারাজ তিনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত পাণিহাটী-গ্রামে শ্রীশ্রীনিত্যদেবের পরম-পবিত্র জন্মস্থানে "কৈবল্য-মঠ" স্থাপনপূর্ব্বক ঠাকুরের সেবা করিয়া গিয়াছেন। উক্ত মঠ-নির্ম্মাণাদি-কার্য্যে বিশেষভাবে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন তদীয় পরমার্থ ভ্রাতা শ্রীৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ অবধূত। ইনি মেদিনীপুর-নিবাসী বসুকুলোদ্ভব পূর্ব্বোক্ত নিত্য-ভক্ত শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্রবাবুর পুত্র। স্বল্প বয়সেই ইহাঁর পিতাঠাকুর মহাশয় ইহাঁকে শ্রীনিত্য-পদে সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধহয় ইনি যৌবনের প্রারম্ভেই ত্যাগ-পথের পথিক হইতে পারিয়াছিলেন। ইহাঁরও নিত্য-নিষ্ঠার পরিচয় বিশেষভাবেই পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত মোহিনীবাবুর সহপাঠী ছিলেন টাঙ্গাইল-নিবাসী জনৈক যুবক। ইহাঁর নাম ছিল শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ইনিও যৌবনেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাঁর এই আশ্রমের নাম বর্ত্তমানে শ্রীমৎ স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূত। ইহাঁর নাম ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি নিত্য-সেবায় প্রথমতঃ কলিকাতা-মহানির্ব্বাণমঠে বিশেষভাবে নিযুক্ত ছিলেন এবং বর্ত্তমানে তদুদ্দেশ্যেই ভাগলপুর-জেলায় কহলগাঁতে একটী মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টায় আছেন।

বাস্তবিকই, যে পরম নিত্য-প্রেম নিত্য-ভক্তবৃন্দকে পরম-বৈরাগ্য-পথের পথিক করিয়াছিল বা করিয়া রাখিয়াছে নিত্য-ধ্যানে, নিত্য-জ্ঞানে, নিত্য-দর্শনে ও নিত্য-গৌরবে তন্ময়তা তাহার অঙ্গীভূত। ঐ নিত্য-প্রেমই টাঙ্গাইল-কালিহাতী-নিবাসী (ভীষণ রাজ-দ্রোহী) পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত প্রিয়শঙ্কর সেন মহাশয়কে সন্ন্যাস-নিষ্ঠ করিয়াছিল। তাঁহার তেজস্বিতা ও বাক্‌পটুতার নিকট অনেকেই মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী মহানন্দ অবধূত নাম গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমী হইয়া-ছিলেন। তাঁহার জনৈক সন্ন্যাসী শিষ্য শ্রীমৎ নিত্যকিশোরানন্দ দাদা নদীয়া-জেলার অন্তঃপাতি ভেড়ামারা-গ্রামে তাঁহার নামে 'মহানন্দ-মঠ' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ; কিন্তু উক্ত গ্রাম পাকিস্থানের অধীনস্থ হওয়ায় এই

মঠ এখন অচল হইয়া গিয়াছে।

যৌবনেই যাঁহারা সংসার ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস-পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই অন্যতম ছিলেন বরিশাল-কুশাঙ্গল-বাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ পাল। ইঁহার রচিত অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ পূর্ব্বোক্ত "শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়" মাসিক পত্রিকায় দৃষ্ট হয়। ইঁহার সন্ন্যাসের নাম হইয়াছিল শ্রীমৎ স্বামী নিত্যগৌরবানন্দ অবধূত। শ্রীশ্রীদেবের জন্ম-লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া তদীয় অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনীর অনেক অংশ প্রভূত কষ্ট বরণপূর্ব্বক ধৈর্য্যসহকারে ইনি সংগ্রহ করিয়া সম্প্রদায়ের যে কি সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। ইনি জ্ঞানানন্দ-মহিমা-প্রচারার্থ বর্দ্ধমান-কালনাতে 'জ্ঞানানন্দ-মঠ' স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং এইখানেই ইঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত আছেন।

প্রকৃতপক্ষে, শ্রীশ্রীদেবের সন্ন্যাসী-শিষ্যবৃন্দের অনেকের সংস্রবে আসিয়া তাঁহাদের অপূর্ব্ব-তত্ত্ব-স্ফুরণ-ও-তত্ত্ব-মীমাংসা-দর্শনে আমি চমৎকৃত হইয়াছি। প্রকৃত আত্ম-জ্ঞান ধনে ধনী না হইলে তাঁহাদের তত্ত্ব-মীমাংসায় ওরূপ নৈপুণ্য দৃষ্ট হইত না। বলাবাহুল্য, এই আত্ম-জ্ঞান তাঁহারা শ্রীশ্রীদেবের কৃপাতেই লাভ করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই, শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ-দয়াগুণে যাঁহাকে যে ভাবে যখন সন্ন্যাস দান করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে আত্ম-জ্ঞান প্রদানপূর্ব্বকই তাহা দান করিয়াছেন। তাহা না হইলে, তাঁহাদের মুখে অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত-বাক্য-শ্রবণে এবং তাঁহাদের অদ্ভুত জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম, অদ্ভুত বিবেক-বৈরাগ্য ও অদ্ভুত ভাব-সমাধি দর্শনে এত লোক তাঁহাদের শরণাপন্ন হইতেন না, তাঁহাদের আশ্রিতবর্গের মধ্য হইতেও অপূর্ব্ব নিত্য-ভক্তির প্রকাশ নানা ভাবে পাইত না এবং তাঁহারা শ্রীশ্রীদেবের মহিমারও নানাভাবে বহুল প্রচার করিতে সমর্থ হইতেন না।

যাহাহউক, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণান্তর শ্রীশ্রীদেবের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে করিতে তাহাতে "সাধক-সন্ন্যাসী" শব্দটী লক্ষ্য করিলাম। অতঃপর আমি

মদীয় গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, " 'সাধক-সন্ন্যাসী'র আবার অর্থ কি ?" কেননা আমার ধারণা ছিল যে, জ্ঞান না হইলে তো কেহই সন্ন্যাসী হইতে পারেন না। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "যাঁহাদের সংসার ভাল লাগে না অথচ প্রকৃত জ্ঞান লাভও হয় নাই সদ্‌গুরু তাঁহাদিগকে আত্ম-জ্ঞান-লাভার্থ ব্রহ্মমন্ত্র প্রদানান্তর সাধন-ভজনের উপদেশ দান করিয়া থাকেন ; এইরূপ সাধনাকে সন্ন্যাস-সাধনা এবং এইরূপ সন্ন্যাস-সাধনায় যাঁহারা আত্ম-জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত রত থাকেন তাঁহাদিগকে 'সাধক-সন্ন্যাসী' বলা হয়। অনন্তর তাঁহারা যখন জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহারা 'সিদ্ধ-সন্ন্যাসী বা প্রকৃত সন্ন্যাসী' হইয়া থাকেন। বলাবাহুল্য, যাঁহারা সদ্‌গুরুর কৃপায় আত্ম-জ্ঞান-লাভান্তর সংসার ত্যাগ করেন তাঁহারাও 'সিদ্ধ-সন্ন্যাসী বা প্রকৃত সন্ন্যাসী' পদবাচ্য। তাই, ঠাকুর বলিয়াছেন, '…অবস্থায় যখন সন্ন্যাসী করিবে, তখনই সন্ন্যাসী হইতে পারিবে। তখনই গার্হস্থ্য স্বভাবতঃ পরিত্যক্ত হইবে…'।"

এই সময় ঠাকুর প্রায়শঃ নিভৃতেই থাকিতেন। কদাচিৎ তাঁহার দর্শন লাভ হইত—তিনি হয় কীর্ত্তনে মত্ত, না হয় সর্ব্বদা ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। তখন একদিন হুগলী জেলার অন্তর্গত দ্বারহাট্টা-(চাঁদবাটী)-নিবাসী শ্রীযুক্ত দাশরথি বেদান্তশাস্ত্রী-বেদান্তভূষণ-কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ঠাকুরের যোগৈশ্বর্য্য-দর্শনে একটী ভাবোদ্দীপক স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন ; তাহা পাঠে ভাবুকমাত্রেরই প্রাণে ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের মহিমা প্রকাশ পায়। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্রীদেবের মাহাত্ম্য বিশেষভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে সমাধি-মগ্নাবস্থায়ই প্রথম দর্শন করেন এবং নিত্য-দেহের নিত্য-সাথী মনোহর রূপ-লাবণ্য যেমন তাঁহার নয়ন-মৃগীকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তেমনই নিত্য-কক্ষে তৎকালে বিরাজমান পুণ্যগন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। দীক্ষালাভের কিয়ৎকাল পর তিনি পুনরায় হুগলী-মঠে উপস্থিত হইলে নিত্য-দেহে তিনবার ইষ্ট-

মূর্ত্তি সন্দর্শনে তিনি বিস্ময়ে ও ভাবের আবেগে অচেতন হইয়া বহুক্ষণ পড়িয়াছিলেন। তৎপরদিন নিশাগমে শ্রীঅঙ্গ-মার্জ্জনকালে তাহা প্রথমতঃ দর্শন ও তদনন্তর স্পর্শন দ্বারা 'অভ্রবিমণ্ডিত' অনুভব করতঃ ভাবোচ্ছ্বাসে অশ্রু বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে ও অন্য প্রকারেও নিত্য-মাহাত্ম্য ভক্তপ্রবরের বিশুদ্ধ-চিত্তে প্রকটিত হওয়ায় তিনি শ্রীশ্রীদেবকে কেবল যে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বমঙ্গলময় বলিয়া জানিয়াছিলেন তাহা নহে; তাঁহাকে তিনি তাঁহার 'জীবনের সাথী' পর্য্যন্ত বোধ করায় কৃত-কৃত্য হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহার নিত্য-নিষ্ঠা তাঁহার সন্তানাদিতেও বিশেষভাবে সংক্রামিত হইয়াছে। এইজন্যই তাঁহারা এই সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাঁহার ন্যায় সদ্ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন।

পণ্ডিতপ্রবরেরই অগ্রজ ছিলেন শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। (খুব সম্ভব) ঐ অঞ্চলে ইনিই প্রথম ঠাকুরের কৃপালাভ করেন; কিন্তু ইঁহার ধর্ম্ম-পিপাসা থাকিলেও, ইনি পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বনের ইচ্ছা পর্য্যন্ত অন্তরে পোষণ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু প্রকৃত ভক্তসঙ্গপ্রভাবে তাঁহার জীবনে অপূর্ব্বপরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছিল এবং তিনি নিত্য-কৃপা-লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহারই সংশ্রবে বারহাট্টা অঞ্চলের অনেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ঠাকুরের আশ্রিত হইয়াছিলেন। যে ভক্তের অনুগ্রহে শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন হুগলী-জেলার অন্তঃপাতি আলাবস্থয়া-গ্রাম-নিবাসী ও শিবপুর-ওয়ার্কসপের বড়বাবু। ইঁহার নাম ছিল শ্রীযুক্ত অন্নদা-প্রসাদ বসু। ইনি এত নিত্য-ধ্যান-নিষ্ঠ ছিলেন যে, তিনি কর্ম্মস্থলে গমন-পথে পর্য্যন্ত একদিন ভাবাবেশের কবলে নিপতিত ও অন্য একদিন মল-ত্যাগাগারে গভীর-সমাধি-মগ্ন হইয়াছিলেন।

যাহাহউক, শ্রীযুক্ত মন্মথবাবুর সঙ্গ-লাভান্তর বারহাট্টার নিকটবর্ত্তি দলপতিপুর-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী; কিন্তু খুব

নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ; তাঁহার ঠাকুরে অটল বিশ্বাস ও ভক্তি। তিনি নিত্য-দেহে প্রথমতঃ ইষ্টমূর্ত্তি-দর্শন পূর্ব্বক পরে নিত্য-মহিমা আরও বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। একদিন ঠাকুর তাঁহাকে নিভৃতে বলিতে লাগিলেন, "এমন স্থান আছে যেখানে গেলে কমান দাগলে শোনা যায় না—শরীরে ধাতু (নাড়ী) থাকে না ; সেখানে 'ধ্যান-ধাতা-ধ্যেয়' নাই —'জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়' নাই।" আহা ! শেষের বাণীটী উচ্চারিত হইবার পরই শ্রীশ্রীদেব নির্ব্বিকল্প-সমাধি-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ শ্রীদেহ অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিল। গ্রীবা হইল অতিশয় দীর্ঘ ও বক্র ; ইহা হংস-গ্রীবাবৎ প্রতীয়মান হইল ! ভক্তবর এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে যেমন চমৎকৃত হইয়াছিলেন, তেমনই দীক্ষার দিনে শ্রীশ্রীদেবের উক্তি-শ্রবণে তাঁহাকে অবতার বলিয়া জানিয়াছিলেন। সেইদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ভাগবতে আছে—'অবতারাহ্যসংখ্যেয়াঃ হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ'।... আমি নিত্য, আমার দেহ নিত্য।"

উক্ত মন্মথবাবুর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল নামে জনৈক বন্ধু ছিলেন। তালদহ গ্রামে তাঁহার বসবাস ছিল। তিনি যখন ঠাকুরের নিকট দীক্ষালাভ করেন, তখন শ্রীশ্রীদেব তাঁহাকে সাধন-ভজনের উপদেশ দান কালে তপঃ-প্রভাব অবগতির দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেন। ইহার পর তিনি হুগলী-মঠে একটী বৃক্ষমূলে জপ-ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎ-কাল পরেই তিনি এরূপ ধ্যান-মগ্ন হইয়া গেলেন যে, তিনি যেন অন্য জগতে চলিয়া গেলেন। তথায় তাঁহাকে লইয়া গেল অশ্রুতপূর্ব্ব একটী ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশপূর্ব্বক। তখন কোথায় গেল তাঁহার দেহবোধ আর কোথায় গেল নিত্য-মঠ। এই অবস্থায় অনেক সময় চলিয়া গেল। অতঃপর যখন তিনি বাহ্যজ্ঞানলাভ করিলেন, তখনতিনি দেখিলেন যে সন্ধ্যার অবসান হইয়াছে এবং নিত্য-প্রকোষ্ঠে সমবেত ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তনে পর্য্যন্ত রত হইয়াছেন। উপেন্দ্রবাবু সুরাপানে অবশাঙ্গ ব্যক্তির ন্যায় উক্ত প্রকোষ্ঠে গমনান্তর ঠাকুরের কৃপায় পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেন।

শ্রীশ্রীদেবের কৃপাশক্তির প্রভাব তালদহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষাল মহাশয়ের উপরও বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তাই, তিনি যে দিন ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হন, সেই দিনই বহিরাগত হইলে দেখিতে পাইলেন, জগৎ 'মন্ত্রময়'। তদ্দর্শনে তিনি ভাবাবেশে উন্মত্তবৎ হইয়া পড়িলেন। তিনি অতিদ্রুতগতিতে মঠোদ্যানের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণকরিতে লাগিলেন। এইভাবে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। অতঃপর সন্ধ্যা অতীত হইলে নিত্য-কক্ষে প্রবেশান্তর তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার নিত্য-ভক্তির প্রকাশ পাইত নানাভাবে। সঙ্গীত বা নিত্য-নাম তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, তাঁহার প্রাণ আকুল হইত; ভাবাবেশে অবিরত নয়ন-বারি বহিত এবং পুলক, কম্পনাদির (সাত্ত্বিক-ভাবের) প্রভাবে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন। এই ভক্ত যখন কলিকাতায় একটী আফিসে চাকরি করিতেন, তখন তাঁহার বেতন ছিল মাত্র ৮০৲ টাকা। এক শনিবারে তিনি আফিস হইতে হুগলী-মঠে গমনপূর্ব্বক তাঁহার বেতনের কিয়দংশের (অর্থাৎ ১০৲) দ্বারা শ্রীশ্রীদেবের ভোগরাগাদি দিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। তৎশ্রবণে শ্রীমৎ গোবিন্দানন্দ মহারাজ জানাইলেন যে, উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহার্থে অন্যূন ৪০৲ টাকার প্রয়োজন হইবে। তাই, শ্রীযুক্ত ঘোষাল মহাশয় অবশিষ্ট ৩০৲ টাকা শ্রীশ্রীদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন। শ্রীভগবান্ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন; অতএব ৪০৲ টাকা ব্যয়েই পরদিন ভোগরাগাদি সুসম্পন্ন হইল। অতঃপর হরিচরণবাবু সোমবারে কলিকাতায় স্বীয় কর্ম্মস্থলে গমনের পর নিত্য-কৃপার আরও একটী অপূর্ব্ব নিদর্শন সন্দর্শনে চমৎকৃত হইলেন ও ভাব-বিগলিত-চিত্তে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বাস্তবিকই, আফিসের কাজ আরম্ভ হইবার কিয়ৎক্ষণ পর বড়বাবু ভক্তবরকে জানাইলেন যে, সাহেব স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাঁহার জন্য ৩০৲ টাকা বোনাস্ অনুমোদন করিয়াছেন এবং উহা তখনই তাঁহাকে সহি করিয়া লইতে হইবে। নিত্য-কৃপার এই অপূর্ব্ব বিকাশ প্রত্যক্ষতঃ দর্শন করতঃ তিনি অবশ হইয়া পড়িলেন।

হরিচরণবাবুর কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারীও ঠাকুরের কৃপা বিশেষ-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি একদা স্বগৃহে প্রস্তুত কিঞ্চিৎ ঘৃত ঠাকুর ভোগের নিমিত্ত হুগলী-মঠে স্বহস্তে লইয়া যাইবেন, স্থির করিলেন। তাঁহার বাসস্থান হইতে উক্ত মঠ সতর ক্রোশ দূরে অবস্থিত হইলেও তিনি পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ক্লান্তি বোধ হওয়ায় চন্দননগরের সমীপবর্ত্তী স্থানে একটী জলাশয় ও তৎপার্শ্বে একটী বৃক্ষসন্দর্শনে তিনি ইহার মূলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন; এমন সময় জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার হাতে ছিল একটু মিষ্টি ও একঘটী জল। সে তদ্দ্বারা তাঁহার ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিবার সময় যাহা বলিল তাহা শুনিয়া তিনি অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমি ঘৃতটুকু হুগলী-মঠে পৌঁছাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত জলগ্রহণ করিব না—এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। ইহা এই আগন্তুক জানিল কেমন করিয়া!" যাহাহউক, তাহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বিপিনবাবু বাধ্য হইয়া মিষ্টিটুকু ও জল গ্রহণ করিলেন। অতঃ-পর তাহার কথা অনুসারে তন্নির্দ্দিষ্ট দোকানের মালিককে তিনি ঘটীটী ফেরৎ দিতে গেলে দোকানদার বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল; কেননা 'ঘটীটী কে বা কখন কাহার নিকট হইতে লইয়া তাঁহাকে দিয়াছিল' সে ইহার রহস্য ভেদ করিতে পারিল না। ভক্তবরও সবিস্ময়ে সমস্ত ঘটনা তাহার নিকট বিবৃত করিয়া চকিত-চিত্তে নিজ লক্ষ্য-স্থল-প্রাপ্তির নিমিত্ত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তিনি হুগলী-মঠে পৌঁছিলেন; এদিকে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা কেহই শ্রীশ্রীদেবকে না জানাইলেও সর্ব্বদর্শী ঠাকুরের প্রাণ ভক্তের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিল। তাই, তিনি তদীয় রুদ্ধদ্বার-কক্ষ হইতেই উচ্চ-কণ্ঠে তৎপ্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন এবং তৎপ্রবেশ-পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিলেন। ভক্তবর ভগবৎ সমীপে নীত হইলেই ভক্তানুকম্পী প্রেমের ঠাকুর আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া বিপিনবাবুকে বলিলেন, "ঐ ভাবে কি

প্রতিজ্ঞা ক'র্‌তে আছে ?" এইবার ভক্তের চমক্ ভাঙ্গিল। তিনি সম্যক্‌-রূপে অনুভব করিলেন যে, তাঁহার প্রাণের দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যদেবই সেই আগন্তুকের রূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণার্থ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অতঃপর বিপিনবাবুকে অনতিবিলম্বে ভাত দিবার জন্য ঠাকুর জনৈক ভক্তকে আদেশ করিলেন; তিনি দেখিলেন, ভাতের হাঁড়িশূন্য হইয়া গিয়াছে এবং সেকথা তিনি ঠাকুরকে নিবেদন করিলে ঠাকুর রোষ-কষায়িত-লোচনে হাঁড়িটী তাঁহার নিকট আনিতে বলিলেন। উহা তৎসমীপে আনীত হইলে তাহা তাঁহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া ঠাকুর দেখাইয়া দিলেন যে,উহাতে অনেক ভাত আছে। ভক্তবর ঐপ্রসাদ বিপিন-বাবুকে দিলেন। তিনিও আনন্দে উহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

যাহাহউক, শ্রীশ্রীদেবের অনেক গৃহস্থ শিষ্যেরও অপূর্ব্ব দিব্য-দর্শন ও নিত্যানুভূতি লাভ হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে ঐ আশ্রমে রাখা ঠাকুরের ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আহা ! গার্হস্থ্যাশ্রমী হইয়াও শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু সাধন-ভজনে কিরূপ নিষ্ঠিত ছিলেন ! তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত দাশরথি পণ্ডিত মহাশয়ের অবস্থা সম্বন্ধে যে ঠাকুর বলিয়াছিলেন "তোমার অন্তর সন্ন্যাস" তাঁহার অবস্থায়ও ইহা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীশ্রীদেবের কৃপায় তিনি ছিলেন গৃহস্থ-বেশধারী সন্ন্যাসী; তাহা না হইলে কি প্রকারে তিনি সমস্ত রাত্রি সাধন-ভজন করিয়া অতিবাহিত করিতে পারিতেন ? একদা তমসাবৃত-নিশাযোগে একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার ইষ্টমন্ত্র উজ্জ্বল জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ খদ্যোৎ বা নক্ষত্রাকারে তাঁহার সম্মুখে উত্থিত ও ভাসমান হইতে লাগিল; আর তাহারই মধ্যে প্রথমতঃ এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্য-মূর্ত্তি ও তৎপর ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজ করিতে লাগিল ! সেই রাত্রে তিনি গৃহাভ্যন্তরেই যাপন করেন এবং যখন যেখানেই ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হন, তখন সেইখানেই সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় থাকেন।

বিপিনবাবুর সহিত বারহাট্টা-নিবাসী আর একজন যুবক নিত্য-মঠে

গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চন্দ্র। তিনি পরে শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ অবধূত নাম গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমী হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে কলিকাতায় তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের মশলার দোকানে কার্য্য করিতেন। এই সময় তিনি একদিন স্নান করিবার নিমিত্ত হাওড়ার (পূর্ব্ব) পুলের নিকটস্থ জগন্নাথ ঘাটে গমন করেন। মস্তক নিমজ্জিত করিয়া একবার স্নান করিবার পর তিনি এক অপূর্ব্ব-রূপ-সম্পন্ন মহাপুরুষ দর্শন করিলেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের বর্ণ গলিত-কাঞ্চনবৎ; তাহাতে আবার দিব্যজ্যোতিঃ, দিব্য-কান্তি ও দিব্য-লাবণ্য বিরাজ করিতেছিল। সেই মহামানব কাষ্ঠপাদুকা-শোভিত-পদে অপর পার হইতে গঙ্গাবক্ষে অবতরণপূর্ব্বক মন্দগতিতে অক্ষয়বাবুর দিকে আগমন করিতে লাগিলেন। অক্ষয়বাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে এক দৃষ্টে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। সেই পরম-পুরুষ তাঁহার নিকটস্থ হইলে তাঁহার হস্তে একটী বিল্ব-পত্র প্রদান পূর্ব্বক গঙ্গা-নিমজ্জিত অবস্থায় উহা তাঁহার মুখে পুরিবার আদেশ দিলেন। অক্ষয়বাবুও অবিচারে তাঁহার আদেশ পালন করিয়া যখন মস্তক উত্তোলন করিলেন, তখন সেই অপরূপ রূপ আর তাঁহার নয়ন-গোচর হইল না। তখন তিনি হৃদয়ের দারুণ জ্বালায় ক্রন্দন করিতে করিতে অচেতন হইয়া ভূপতিত হইলেন। তাঁহার তদবস্থা দর্শনে তাঁহার পরিচিত ঘাটের পাণ্ডা তাঁহাকে একখানি শকটে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার বাসস্থানে লইয়া গেলেন। তখন তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। এদিকে অক্ষয়বাবুর নয়নযুগল হইতে অবিরল-ধারায় আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। এই ভাবে আটদিন অতিবাহিত হইল। এই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় অক্ষয়বাবু দিবাভাগে তাঁহার অভীষ্ট দেবতার দর্শন লাভ করিতে পারিতেন না; কিন্তু প্রত্যহ রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় সেই মহামানব তাঁহাকে দর্শন ও সঙ্গদানপূর্ব্বক সুধামাখা কথায় তাঁহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা ও অভয়-দান করিতেন; এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নানা স্থান ভ্রমণ পর্য্যন্ত

করিতেন। অক্ষয়বাবুকে লইয়া তিনি কোনদিন কাশীধামে, কোনদিন নিমতলার শ্মশানে, আবার কোনদিন বা কালীঘাটে গমনপূর্ব্বক কত অদ্ভুত বস্তুসকল দর্শন করাইতেন। এদিকে তাঁহার স্বজনবর্গ তাঁহার জীবন-নাশের আশঙ্কা করিয়া বলপ্রয়োগপূর্ব্বক লৌহশলাকা দ্বারা তাঁহার দন্ত-পংক্তির মধ্য দিয়া মুখ-বিবরে দুগ্ধ প্রবেশ করাইবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এমন সময় তাঁহার মুখ-গহ্বরে একটী দ্রব্য তাঁহাদের নয়ন-গোচর হইল। তদ্দর্শনে তাঁহারা নিশ্চয় করিলেন যে, উহাই তাঁহার তদবস্থাপ্রাপ্তির কারণ। তাই, তাঁহারা উহা (পূর্ব্বোক্ত বিল্ব-পত্রটী) বাহির করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তথাপি তিনি অচেতন হইয়াই পড়িয়া রহিলেন। তখন জনৈক আত্মীয় পুনঃ পুনঃ তাঁহার মুখ-বিবরে নিজ উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার শুচিতা কলুষিত হইল এবং তৎসঙ্গে সেই অপূর্ব্ব অবস্থারও অন্তর্ধান হইল। অক্ষয়বাবু তখন বাহ্য-চৈতন্য লাভান্তর দেখিলেন যে, তাঁহার মুখ-গহ্বরে সংরক্ষিত সেই বিল্ব-পত্রটী নাই। ইহাতে তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি তন্নিকটস্থ আত্মীয়গণকে তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিতে পারিলেন, তাহাতে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন এবং বিশেষভাবে শোকার্ত্ত হইলেন; কিন্তু সেই অপূর্ব্ব দর্শনাদির স্মৃতি তাঁহার অন্তরে জাগরূক ছিল। এইভাবে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইবার পর অক্ষয়বাবু নিত্য-ভক্তসঙ্গে সেই মহামানবের দর্শন পুনর্ব্বার লাভ করিয়া ভাব-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; আর তাঁহার বাক্য সরিল না; নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল এবং দেহ শিহরিয়া উঠিল। অতঃপর প্রকৃতিস্থ হইলে তিনি শ্রীচরণে প্রণত হইলেন। তৎপরদিবস ঠাকুর দীক্ষাদানের সঙ্গে তাঁহাকে ইষ্টরূপে দর্শন দানে কৃতার্থ করিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ ঐরূপে শ্রীশ্রীদেবকে দর্শনপূর্ব্বক আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে ঠাকুরের শরীর ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল। আর শরীরেরই বা কি দোষ? শরীরের না করিলেন তিনি নিজে যত্ন, না

করিতে দিলেন অন্য কাহাকেও। তদীয়* শিষ্য বরদা-ষ্টেটের জজ্ শ্রীযুক্ত বালাজী প্রদত্ত মহামূল্য মখমল-শয্যা যত্নাভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে : 'ঠাকুর সামান্য একটী মাদুরের উপর শয়ন করিয়া থাকিতেন ; তাহাও আবার ছারপোকায় পরিপূর্ণ ছিল' ; ছারপোকা মারিবার আদেশ ছিল না। একবার কোন ভক্ত অতি কষ্টে তাঁহার বালিশের ছারপোকা মারিয়াছিলেন ; কিন্তু ঠাকুর আর সে বালিশ ব্যবহার করিলেন না। মশক সম্বন্ধেও ঐ ব্যবস্থা ছিল। ভক্তগণ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন—মশক রক্তপান করিতেছে ; আর ঠাকুর আস্তে আস্তে মশকটীর কাছে আঙ্গুল নাড়িতেছেন। ঠাকুর বুঝি ইঙ্গিতে বলিতেছেন,—" 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' এইভাবে সাধনীয়।" ঠাকুর অধিকাংশ সময় বসিয়া থাকিতেন তক্তপোসের উপর বিছান মাত্র একটী মাদুরের উপর। তাহার ফলে তদীয়দক্ষিণপা'র কনিষ্ঠঅঙ্গুলিতে কড়াপড়িয়া ক্ষতহইয়াছিল। আর তাহাতে আরসোলা, ছারপোকা, পিঁপড়ে নিরাপদে বাস করিতেছিল। নিজে ? ভুলে তাড়া করিতেন না, কোন ভক্ত তাড়া করিতে গেলে তাঁহাকেই বরং তাড়া দিয়া উঠিতেন। কোন ভক্ত ঔষধ লাগাইতে গেলে, 'আজ নয়, কাল'বলিয়া তিনিতাঁহাকে বিদায়করিতেন। ভক্ত আদেশলঙ্ঘনেরভয়ে বেশী পীড়াপীড়ি করিতে পারিতেন না। শ্রীভগবান্ কি উদ্দেশ্যে কি করেন তাহা সামান্য জীব আমরা কি করিয়া বুঝিব ?

একদিন ঠাকুর একটু দুগ্ধ পান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—দুগ্ধের পাত্রটী মুখের নিকট লইয়া গিয়াছেন--অধর দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র—এমন সময় শুনিলেন যে, কোন কারণ বশতঃ জনৈক ভক্তের আহার হয় নাই। ঠাকুরের আর দুগ্ধ পান করা হইল না—ধীরে ধীরে মুখ হইতে

*টেপার জমিদার পূর্ব্বোক্ত অন্নদাবাবু নিত্য-প্রকোষ্ঠ সুসংস্কার করতঃ মার্ব্বেল-পাথরের দ্বারা পর্য্যন্ত বাঁধাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু ঠাকুর 'তাঁরই টাকার খুব দরকার' বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন না।

পাত্রটী নামাইলেন—ভক্তটীর নাম করিয়া বলিলেন, "তার ভাল আহার হয় নাই—এই দুধটুকু তা'কে দাও।"

কোন কিছু খাবার পাইলে তাহা তিনি ভক্তদিগকে না দিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন না। এমন কি, তিনি অসুস্থ হইলে কেহ যদি সরু চাউল দিত,তদ্দ্বারা প্রস্তুত অন্নপর্য্যন্ত তিনি সকলকে বণ্টনকরিয়া দিয়া অতিসামান্য অংশই নিজে ব্যবহার করিতেন। আহা! সামান্য একটু মোচা সিদ্ধও তিনি একা খাইতে পছন্দ করিতেন না: বলিতেন, "একলা খাইব, সুখ না পাইব।" ইহা হইতে স্নেহের নিদর্শন আর কি হইতে পারে? এত করিয়াও কি তিনি ভক্তগণকে ভালবাসিতে পারেন নাই! তাই কি তিনি এক সময়ে কাঁদিতে কাঁদিতে ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন,—"তোমরা ত আমাকে যথেষ্ট ভালবাস; আমি তোমাদিগকে ভালবাসিতে পারিলাম না!" ভক্তগণ সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর, তুমি যদি ভালবাস্তে না পার্লে, তবে কে আর আমাদিগকে ভালবাস্বে? তোমার ভালবাসার, তোমার স্নেহের এক কণিকাও এতদিনে কোথাও খুঁজে পেলাম না! আমরা ভাগ্যহীন, অপদার্থ—তা না হ'লে, এমন অপার্থিব বস্তু পেয়েও যত্ন ক'র্তে পার্লাম না!"

ভক্তগণ তাঁহাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও সাধ্যমত তাঁহার সেবার ত্রুটী করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের সাধ্য কি যে, ঐ দেব-দেহের যথোপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষা করেন! তিনি নিজগুণে তাঁহার অহেতুকী কৃপায় যতটুকু করাইয়া লইয়াছেন ভক্তগণ তাহাতেই কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নবদ্বীপে অবস্থান-কালে ঠাকুর ভক্ত নবীনবাবুর দুরারোগ্য বহুমূত্র রোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহা গুরুতর হইয়া উঠিল। একে এই ব্যাধির উৎপীড়নে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল, তাহার উপর শ্রীঅঙ্গে একটী স্ফোটক উৎপন্ন হইল। বহুমূত্র রোগ থাকিলে স্ফোটক সাধারণতঃ মারাত্মক হইয়া উঠে। কিন্তু ঠাকুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নির্ব্বিকারভাবে অবস্থান করিতে-

লাগিলেন। ক্রমশঃ উহা সাংঘাতিক হইয়া উঠিল ; এমন কি, পচনের উপক্রম হইল। ভক্তগণ এ বিষয় পূর্ব্বে বিন্দুমাত্র অবগত ছিলেন না। ইতিমধ্যে অনৈক ভক্ত হঠাৎ উহা জানিতে পারিয়া, অন্যান্য ভক্তগণের নিকট তদ্বিষয় প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা শুনিবামাত্র অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। সেই সময় উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে দুই একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকও ছিলেন। তাঁহারা উহা পরীক্ষাপূর্ব্বক বলিলেন, "এখন স্ফোটকের যেরূপ অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তা'তে অস্ত্রোপচার (অপারেশন্) ক'র্‌তেই হ'বে।" ঠাকুর তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিলেন। নিত্য-ভক্ত রাজকুমারবাবু ইহা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "ঠাকুর, ও দেহে ত এখন আমাদের অধিকার—আমাদের জিনিষ আপনি নষ্ট ক'র্‌তে চাচ্ছেন কেন?" ভক্তের ক্রন্দনে ঠাকুরের প্রাণ গলিয়া গেল—তিনিও কাঁদিয়া উঠিলেন। সমবেত ভক্তমণ্ডলী এ দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারিলেন না—তাঁহারাও কাঁদিতে লাগিলেন।

ভক্তবর এইপ্রকারে প্রাণের আবেগ জানাইলে, ঠাকুর অগত্যা 'অপারেশন্' করাইবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু যখন ভক্তগণ কলিকাতা হইতে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-চিকিৎসক আনিতে চাহিলেন, তখন তিনি নিষেধ করিয়া বলিলেন, "যজ্ঞেশ্বর ও সতীশ অস্ত্র করুক।" বলাবাহুল্য, তিনি ভক্তের চিকিৎসাই পছন্দ করিতেন। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরবাবু এই নিদারুণ কার্য্য কি করিয়া করিবেন তাহা ভাবিয়া আকুল হইলেন। অগত্যা ঠাকুরের যন্ত্রণা লাঘব করিবার জন্য বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি এই হৃদয়-বিদারক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। তবে, তিনি ঠাকুরকে বিশেষভাবে নিবেদন করিলেন, "এইরূপ কঠিন অপারেশন্ ক্লোরোফরম্ ছাড়া করা যা'বে না।" তাহাতে ঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি ব'সে থাক্‌ব—তোমরা অপারেশন্ কর—কোনও অসুবিধাই হ'বে না।" কিন্তু ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "ক্লোরোফরম্ ব্যতীত তাঁহারা কিছুতেই ও কাজ ক'র্‌তে সাহস করেন না!" ইহা শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাদিগকে ক্লোরোফরম্ করিবার

অনুমতি দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও ঠাকুরকে কোনক্রমেই তাঁহারা সংজ্ঞাহীন করিতে পারিলেন না। বাস্তবিকই, যিনি চিন্ময় চৈতন্যদেব তিনি কি কখনও অচৈতন্য হইতে পারেন? সূর্য্য কি কখনও কিরণশূন্য হইতে পারেন? অগ্নি কি কখনও দাহিকা-শক্তি-বিহীন হইতে পারেন? যাহাহউক, ঠাকুর সংজ্ঞাহীন না হইলেও, যজ্ঞেশ্বরবাবু তদবস্থাতেই সেই ভীষণ স্ফোটক অস্ত্র করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় ঠাকুর আবেগ ভরে বলিতে লাগিলেন, "এই ত দেহের অবস্থা! এই নিয়ে আবার এত অহঙ্কার! এই অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হোয়ে জীব নিত্যবস্তু ভুলে আছে!" অপারেশন্ শেষ হইলে, ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "একটা শিরা কেটে ফেলেছে।" তাহা শুনিয়া ভক্তগণ "হায়! হায়!" করিয়া উঠিলেন এবং "এবার আমরা ঠাকুরকে হারাইলাম!" বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

'অপারেশনের' পর হইতেই ঠাকুরের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। কয়েক দিনের মধ্যে উহা এত গুরুতর হইল যে, ভক্তগণ তাঁহার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িলেন। এই সময় ঠাকুর মুহুর্মুহুঃ জলপান এবং বমন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া জনৈক ভক্ত বলিলেন, "আপনি এরূপ বমি ক'র্‌ছেন কেন?" তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "আমি ভেতর পরিষ্কার কোরে ফেল্‌ছি।" যাহাহউক, এই সময় শ্রীশ্রীদেব অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে তাঁহার পরম পবিত্র দেহের সমাধি দিবার যেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা জানাইলেন। তৎশ্রবণে ভক্তগণ তাঁহাদের প্রাণ হইতে প্রিয়তম, পরম-প্রেমাস্পদ শ্রীশ্রীদেব হইতে অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদের কথা ভাবিয়া শোকে মুহ্যমান এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার কোনরূপ ত্রুটী যাহাতে না হয় সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেন। সেইজন্য তাঁহারা দিবারাত্র আহার-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সন ১৩১৭ সালের ৭ই মাঘ, শনিবার, কৃষ্ণা-সপ্তমী তিথি

আসিয়া পড়িল। আজ কি ভীষণ দুর্দ্দিন! আজিকার ঊষা যেন বিষাদের এক করুণ সঙ্গীত বুকে ধরিয়া সমাগত। সর্ব্বত্র বিষাদের এক করুণ ছবি। ঊষার সোনার রঙে, তরুণ রবির অরুণ-কিরণে, দিনের আলোকে আজ যেন আর সে প্রভা নাই। বৃক্ষে, লতায় সে শ্রী নাই। বিহঙ্গের সঙ্গীতে সে স্বর নাই। নদীর গানে কান্নার শব্দ, বাতাসের বুকে দীর্ঘশ্বাস। প্রকৃতির মুখে শোকের কালো ছায়া।

কুণ্ডলী আশ্রমে একটী ঘরের মধ্যে শ্রীশ্রীদেব শুইয়া আছেন। চারিদিকে ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন। কাহারও মুখে কথাটী নাই। সকলেই ম্রিয়মান। এক একবার সেই শ্রীমুখের দিকে চাহিতেছেন—আর তাঁহাদের চোখ সজল হইয়া উঠিতেছে! কেহ বা সেই রাজীব চরণদু' খানি ধরিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন। ঠাকুরও মিষ্ট কথায় তাঁহাদিগকে কত বুঝাইতেছেন, কত সান্ত্বনা দিতেছেন; আবার বলিতেছেন, "ওগো, তোমরা যে আমায় কত ভালবাস; আমি যে তোমাদিগকে ভালবাস্‌ব ব'লে এসেছিলাম; কিন্তু তেমন্ ক'রে তো ভালবাস্‌তে পার্‌লাম না; তোমাদের কাছে যে ঋণী র'য়ে গেলাম!" পুনরায় কহিতেছেন, "আহা! এরা যে আমার কত আদরের, কত যত্নের—আমার রাব্‌ড়ীর বাটীর মাছি; এরা যেন গুয়ের গামলায় গিয়ে না বসে।" হায়! সেই ভক্ত-বৎসলের ভক্তের জন্য কত মমতা—কত আকুলতা! ভক্তই যেন তাঁহার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন। ভক্তই যেন তাঁহার সর্ব্বস্ব। কখনও ব্যাকুল আগ্রহে তিনি বলিতেছেন, "ওগো, তোমরা কি দু'দশ বছর অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না; আমিও যে, গো, তোমাদের ছেড়ে থাক্‌তে পারি নে!" বলিতে বলিতে সেই পরম করুণাময়ের দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল। এ করুণার কি তুলনা আছে!

"যাঁহাদের মুখ চাহিয়া সেই ভক্তের ভগবান্ সাধের নিত্যধাম ছাড়িয়া এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি কি সেই প্রিয়ভক্তগণের অনুমতি না লইয়া যাইতে পারেন! তাই, এই কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়াও যাইতে

পারিতেছিলেন না। লীলাময়ের অদ্ভুত লীলা-মাধুর্য্য কে বুঝিবে ?' ডাক্তার যজ্ঞেশ্বরবাবু এইটুকু চিন্তা করিয়াই মনে মনে বলিলেন, "প্রাণের দেবতা, আমরা অনুমতি দিলাম, আপনি যাইতে পারেন।" অন্তর্যামী তাহা বুঝিলেন, ও বলিলেন, "আঃ ! বাঁচ্‌লাম !" একটু পরে দুই হাত বাড়াইয়া বলিতেছেন,—"ওই সূর্য্যদেব আসিতেছেন, দরজা খুলিয়া দাও।" 'সুর-লোক-বিহারিণী জাহ্নবী আসিয়াছেন' বলিয়া গঙ্গাজলের ঘটীধারণ করিতেছেন—আবার বলিতেছেন, "ঐ গণপতি আসিতেছেন।" শ্রীশ্রীদেবের এই সমস্ত উক্তি হইতে ভক্তগণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সেই সময় তাঁহার নিকটে নানা দেবদেবী আগমন করিতে লাগিলেন।

শোকে-দুঃখে জ্ঞান হারাইয়া ভক্তগণ আজ শ্রীশ্রীদেবকে খাওয়াইবার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু খাদ্যদ্রব্য সব প্রস্তুতই ছিল। ঠাকুর বলিলেন, "কই, আজ ত নিত্যগোপালের ভোগ দিলে না !" শুনিয়া ভক্তেরা অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন এবং তাড়াতাড়ি খাদ্যসমূহ আনিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিলেন। আজ ভক্তগণের যে এ ভুল সেও সেই নিত্য-মায়াবীর মায়া; আর ভোগেরকথা স্মরণ করাইয়া দেওয়াও 'শ্রীনিত্যের' নিত্য ভোগ ব্যবস্থার ইঙ্গিত। তিনি হরিবাবুকে বলিয়াছিলেন, "হরি, পুকুরে জল, আর গাছে নারিকেল আছে ; আর যা সহজে মিল্‌বে তাই দিয়েই শ্রীনিত্যের সেবা চালা'বে। আমার ভোগের জন্য তোমরা ঘুরে ঘুরে বেড়া'বে ; দুঃখে-কষ্টে তোমাদের মুখ মলিন হ'বে, সে আমি সইতে পার্‌ব না।" লীলা সংবরণের পূর্ব্বে ভক্তগণকে তথা জগদ্বাসীকে তিনি এই শেষ-বাণী দিয়া গিয়াছেন,—**"জাগো ! জাগো !! জেগে থাক ! মোহনিদ্রায় অভিভূত থেকো না ! সংসার বড় ভীষণ স্থান !"** রাত্রি* যখন দশটা পাঁচ মিনিট, তখন নিজের

*রাত্রির শেষ যামে চুনীবাবু (নিত্য-ভক্ত হরিবাবুর বন্ধু) ঊর্দ্ধে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শন করিলেন। তাহা অনেক স্থান আবৃত করিয়া ছিল। তন্মধ্যে এক দিব্য, জ্যোতিষ্মান্ রথ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল—সেই

দক্ষিণ হস্তের উপর মস্তক রাখিয়া শ্রীশ্রীদেব অনন্ত-শয়নে শায়িত হইলেন। তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্তের কব্জী পর্য্যন্ত গাঢ় নীলবর্ণ ও হস্ততল ফণার আকার ধারণ করিয়াছিল—যেন অনন্তদেবের ফণার উপরে মস্তক রাখিয়া তিনি অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিলেন।

আহা! ভক্তগণ যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, অবশেষে তাহাই হইল! যাঁহার সহিত বিচ্ছেদের কথা ভাবিতে গেলেও ভক্তগণ শোকান্বিত হইতেন, আজ সেই জীবন-বল্লভ বিহনে তাঁহাদের যে কি দশা হইল, তাহা কে কল্পনা করিতে পারে—কে বর্ণনা করিতে পারে? যাঁহার মুখপানে একবার চাহিলে তাঁহারা রোগ-শোক-দুঃখ-যন্ত্রণা মুহূর্ত্তমধ্যে বিস্মৃত হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেন, আজ সেই নয়নরঞ্জন, হৃদয়নিধিকে হারাইয়া আর কি তাঁহারা স্থির থাকিতে পারেন? যে নিত্য-রূপ হেরিয়া তাহার সহিত তুলনায় জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত শোভা তাঁহারা তুচ্ছ বোধ করিয়াছিলেন, আহা! সে নিত্য-রূপ কি তাঁহারা আর এ জন্মে দেখিতে পাইবেন না? ঠাকুর যে তাঁহাদিগকে কত ভালবাসিতেন—ঠাকুর যে তাঁহাদিগকে কত আদর করিতেন—ঠাকুর যে তাঁহাদিগকে কত যত্ন করিতেন, আজ তাঁহাদের তাহাই মনে পড়িতে লাগিল। ঠাকুরের সেই সুমধুর বাণী, ঠাকুরের সেই সমাধি-মণ্ডিত মূর্ত্তি, ঠাকুরের সেই অপূর্ব্ব ভাবাবেশ, ঠাকুরের সেই আবেশে মধুর নৃত্য, ঠাকুরের সেই প্রাণ-কাড়া

রথে উপবিষ্ট ছিলেন ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যদেব—তাঁহার দুই পাশে শূন্যে দুই জন দিব্যাঙ্গনা দুইটী পুষ্পমাল্য হস্তে বিরাজ করিতে লাগিলেন। রথটী নিত্য-মঠের সন্নিকটে অবতরণ করিল এবং মঠের উত্তর-পশ্চিম কোণে কচু-বন দলিত করিয়া উহা শ্রীশ্রীদেবের সহিত ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল। অতঃপর চুণীবাবু ভক্তগণকে উক্ত কচুবনের নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, রথচক্রের নিষ্পেষণে কচুবন বিদলিত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার উপর দুইটী শুভ্র পুষ্পমাল্য শোভা পাইতেছে! বলাবাহুল্য, ঐ মাল্য দুইটী চুণী-বাবু পূর্ব্বে আকাশে সেই দেব-বালাদ্বয়ের হস্তে দেখিয়াছিলেন।

হাসি—সমস্তই আজ তাঁহাদের চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল! তাই, কেহ কেহ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, কেহ কেহ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন, কেহ কেহ ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কেহ কেহ স্তম্ভিত, নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন, কেহ কেহ চরণ ধরিয়া পড়িয়া রহিলেন, কেহ কেহ অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। অনেকে আবার তখন 'নিত্য-নাম' সার করিয়া "ভজ শ্রীনিত্যগোপাল গুরু জ্ঞানানন্দ। শিব কালী সীতারাম শ্রীরাধে গোবিন্দ॥" বলিয়া কীর্ত্তনে মাতিয়া গেলেন। আহা! নিত্য-মঠের আজ সে শোভা কোথায় গেল! আজ কি সেই সাধের, সাজান বাগান শুকাইয়া গেল—আজ নিত্য-বাগানের তরুলতার সেই নৃত্য, সেই মাতোয়ারা ভাব কোথায় গেল! আজ তাহারাও নিত্য-বিহনে মলিন, ম্রিয়মান! অলিকুল ত আর গুণ্ গুণ্ রবে মধু আহরণ করিতেছে না! পাখীরাও আর কূজন করিতেছে না—তাহারা শাখার উপরে নতমুখে মুদিত-নয়নে বসিয়া আছে—নিত্য-শোকে তাহারাও আকুল। শোক-জর্জ্জরিত ভক্তবৃন্দ আজ শোকার্ত্তনয়নে যে দিকে চাহিতেছেন, সেই দিকেই কেবল বিষাদের বিকট-মূর্ত্তি দেখিতেছেন!

এদিকে তুমুল কীর্ত্তনে নিত্য-মঠ মুখরিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাহার মধ্যে তো সে আনন্দ-ধ্বনি নাই—যেন বিষাদের কণ্ঠ বাজিতে লাগিল।

যাহাহউক, লীলা সংবরণের পর তাঁহার দিব্য-দেহের যে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা ঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভক্তগণ সেই তুমুল কীর্ত্তনের মধ্যে তাঁহার অপার্থিব দেহ ভক্তিপূর্ব্বক একটী নূতন কাষ্ঠাধারে রক্ষা করিয়া ষ্টেশনে লইয়া গেলেন। তথায় মালগাড়ীর একটী প্রকোষ্ঠ গঙ্গাজলে বিধৌত করিয়া তন্মধ্যে তাঁহাকে অতি যত্নে স্থাপিত করিলেন। কীর্ত্তনও চলিতে লাগিল—ট্রেণও চলিতে লাগিল। কয়েক ঘণ্টার পর গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিল। সেখান হইতে ঠাকুরের দিব্য-দেহ ভক্তবাহিত শকট যোগে কলিকাতা-

মনোহরপুকুরস্থ* মহানির্ব্বাণমঠে নীত হইলেন; পরে তাঁহাকে একটী তাম্রাধারে সুরক্ষিত করিয়া ঐ মহানির্ব্বাণমঠের পুণ্যভূমিতে সমাহিত§ করা হইল।

---

*কালীঘাটের কালীক্ষেত্রকে পঞ্চক্রোশী বলা হয়। সেই পঞ্চক্রোশীর অন্তর্বর্ত্তী বর্ত্তমান মনোহরপুকুর পূর্ব্বে মনোহরপুর নামে পরিচিত ছিল; কেননা এই মনোহরপুরই কালীঘাটের কালীমার বিহার স্থান ছিল। তাই, শ্রীশ্রীদেব তাঁহার দিব্য-দেহের সমাধি দিবার যোগ্যতম স্থান নির্ব্বাচন করিলেন মনোহরপুরস্থ মহানির্ব্বাণমঠ। তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে এই পরম পবিত্র সমাধি স্থানের নামকরণ হইয়াছে 'শ্রীশ্রীগুরুপীঠ'। গুরুপীঠ সর্ব্বতীর্থময়। ইহার মহিমা অতুলনীয়। পূর্ণ পরব্রহ্মের চিন্ময় দেহের অংশমাত্র ভারতবর্ষের ৫২ বাহান্ন স্থানে পতিত হওয়ায় উহাদের প্রত্যেকটী সর্ব্ব-পাপ-নাশী মহাপীঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু যে গুরুপীঠে সেই (নিত্যগোপাল-রূপী) পূর্ণ পরব্রহ্মের সমগ্র চিন্ময় দেহ সমাহিত আছেন, তাঁহার মাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়—তাঁহার গৌরব অসীম।

§ঠাকুরের আদেশ অবিচারে পালন করা নিত্য-গত-প্রাণ নিত্য-ভক্তগণের গুরু-নিষ্ঠার বিশেষ লক্ষণ। তাই, তাঁহারা তদাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার পরম পবিত্র দেহ তন্নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমাহিত করিলেন। কিন্তু উক্ত কার্য্য কলিকাতা কর্পোরেশনের আইন-বিরুদ্ধ। আইন অমান্যকারী-দের (অর্থাৎ কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে যাহারা সমাধি দিয়াছিলেন তাঁহাদের) প্রত্যেকের ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা জরিমানা দিবার নিয়ম। যাহাহউক, সমাধিদান কার্য্য সমাপ্তির প্রায় একমাস পর কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ কালীঘাট-মহানির্ব্বাণমঠের ১৬ জন ট্রাষ্টীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আরম্ভ করিলেন। এই সংবাদ ট্রাষ্টী-মহোদয়গণের কর্ণগোচর হইল। 'কি প্রকারে ৮০০০৲ আট হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবেন' ইহা ভাবিয়া ভক্তগণ চিন্তাকুল হইলেন। কিন্তু ভক্তবৎসল ঠাকুর জনৈক ভক্তকে রাত্রে স্বপ্নযোগে আদেশ করিলেন, "কর্পোরেশনের সম্মান রক্ষার জন্য ১৲ এক টাকা জরিমানা দিও।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জজ্ রায় দিলেন, উক্ত

বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীনিত্য-ভক্তবৃন্দ সেই পরমপবিত্র সমাধির উপর একটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীশ্রীদেবের রচিত "সাকারপূর্ণ পরব্রহ্ম জ্ঞানানন্দরূপী ভগবান্ নিত্যগোপালের ধ্যান-পূজা-কবচাদি নিত্য-উপাসনা-বিধি" অনুসারে সেবা পূজাদি-করিতেছেন। উহা "শ্রীশ্রীগুরুপীঠ" নামে পরিচিত। শ্রীশ্রীগুরুপীঠ-নির্ম্মাণের জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, সে অর্থ সার্থক। অর্থের এরূপ অর্থব্যয়ই চিত্ত-প্রসন্নতা-লাভের একমাত্র উপায়। "শ্রীশ্রীগুরুপীঠ"-নির্ম্মাতা শ্রীশ্রীনিত্য-ভক্তবৃন্দ, তোমাদের জয় হউক !

ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের পার্থিব-লীলাকালে শ্রীধাম নবদ্বীপ, হুগলী ও অন্যান্য স্থানে তিনি যে কত ব্যক্তিকে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও বৈরাগ্যের বন্যায় ভাসাইয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা মাদৃশ অভাজনের পক্ষে অসম্ভব। ভক্তগণের মধ্যে তাঁহাকে কেহ শ্রীদুর্গারূপে, কেহ শ্রীকালীরূপে, কেহ শ্রীরামরূপে, কেহ শিবরূপে, কেহ শ্রীমহালক্ষ্মীরূপে, কেহ শ্রীহরিহররূপে, কেহ শ্রীদত্তাত্রেয়রূপে, কেহ শ্রীকৃষ্ণরূপে, কেহ বুদ্ধরূপে, কেহ শঙ্করাচার্য্যরূপে, কেহ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে, কেহ শ্রীরাধারূপে, কেহ শ্রীযীশু-রূপে (আবার কেহ বা এক সময়ে নানারূপে) দর্শন করিয়াছেন। এককথায়, ভক্তগণের সম্মুখে তিনি এক কালে বিশেষ বিশেষ রূপে বিরাজ-মান হইয়াছেন ; কখনও বা কোন ভক্ত সে সকল রূপ একত্রেই দর্শন করিয়াছেন।* তাঁহার এইরূপ ঐশ্বর্য্য-লীলা যে কেবল তাঁহার প্রকট অবস্থাতেই তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন তাহা নহে ; এখনও অনেকে দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দরূপী ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব নরাকার পূর্ণ পরম ব্রহ্ম। তাঁহাতেই সর্ব্বভাব, সর্ব্ব-শক্তি ও সর্ব্বরূপই বিরাজিত। তাঁহাতে সমস্তই সম্ভব।

ট্রাষ্টীগণকে ১৲ এক টাকা জরিমানা মাত্র দিতে হইবে! তাই বলি, শ্রীশ্রীদেবের মহিমা অপার !

*এ বিষয়ের বিশেষবিবরণ শ্রীশ্রীদেবের লিখিত "দিব্যদর্শন" নামক গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থানাভাববশতঃ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব।

"রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে সংহৃত্য চাত্মমহিনোপরতঃ স আস্তে॥"

ভাঃ, ৯ম শ্লোঃ, ১১স্কঃ, ৩১শৎ অঃ।

[হে রাজন্! সেই পরমপুরুষের পক্ষে দেহধারী মানবগণের মধ্যে আবির্ভাব, বা তিরোভাব হওয়া (জন্ম পরিগ্রহ করা বা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া) কেবল ঐন্দ্রজালিক নটের ন্যায় মায়ারই অনুকরণ মাত্র। তিনি নিজে দেহের রচনা করতঃ স্বয়ংই তাহারই অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং কিছুকাল লীলাদি করিয়া স্বয়ংই তাহার উপসংহার করতঃ নিজ মহিমাতেই নিজে বিরাজ করিতেছেন।]

দেব! তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু; সকলের মনোবাঞ্ছা কেমন অন্তরাল হইতে পূর্ণ করিতেছ! তোমার এই শ্রীনিত্যধর্ম্মের নিত্যবিরাজ ক্ষেত্র, সার্ব্বজনীন, উদার ধর্ম্মমতের উদ্ভব প্রদেশ, জাগতিক সর্ব্বধর্ম্মের মহামিলনতীর্থ, শ্রীশ্রীমহানির্ব্বাণমঠে শ্রীশ্রীগুরুপীঠে তোমার মধুর শ্রীনিত্যগোপালনাম দিবানিশি এরূপ ধ্বনিত হউন, যেন জগৎ জুড়িয়া "জয় জ্ঞানানন্দ শ্রীনিত্যগোপাল, তোমার জয়!" এই সুমধুর উচ্চধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইতে থাকে!

দয়াময়, তোমাকে আমরা না চাহিলেও তুমি দিবানিশি আমাদিগকে চাহিতেছ! তোমার কথা মনে না আনিলেও তোমার ইচ্ছায় তোমার কৃপায় তাহা ফুটিয়া উঠিতেছে। অতএব তোমার নিকট আমরা আর কি প্রার্থনা করিব, বল! তবে একটী প্রার্থনা এই, যেন তোমার শ্রীচরণে আমাদের অচলা ভক্তি থাকে; আমরা যেন আত্মসুখ চাহি না; যেন ধন, মান ও যশ কিছুই চাহি না; যেন চাহি কেবল তোমার নাম করিতে—শুধু এখন নহে—তখন নহে—এ জনমে নহে—জীবনে মরণে—জনমে জনমে—যেন তোমার প্রতি আমাদের অহেতুকী ভক্তি থাকে! যখন যেভাবে রাখ না, যেন তোমার কথাটী আমাদের মনে থাকে। সংসারের তাপ-জ্বালায় শান্তি দিতে একমাত্র "তুমি"—তোমাকে হৃদয়ে জাগরূক

দেখিলে আমাদের চির আনন্দ—নিত্যানন্দ ; তাই বলি :—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতু ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥"
"কদৈকান্তমনো ভূত্বা নিত্যং ভাবয়িতুম্ ক্ষমঃ।
কদা ত্বদ্দাসদাসানাং দাসদাসত্বমাপ্নুয়াম্।
প্রভো সর্ব্বাপরাধো মে ক্ষমাস্তাং স্বানুকম্পয়া" ॥৫৩

তাঁহার আদেশ

(১) "মনোহরপুরে 'গুরুপীঠের' জন্য তিন থাক্ বেদী হইবে। উপর থাকের পশ্চাদ্ভাগে তাম্রফলক সংলগ্ন থাকিবে। সেই তাম্রফলকে সকল দেবদেবীর বীজ অঙ্কিত থাকিবে। সেই ফলকের উর্দ্ধে প্রণব, মধ্যে গুরু-বীজ। তৎপরে মণ্ডলাকারে সর্ব্বদিকে অন্যান্য বীজ সকল থাকিবে। বেদীর উর্দ্ধ থাকে একটী তাম্র কিম্বা পিত্তলের বাক্সে আমার বর্ণনা সমস্ত সাধন পদ্ধতি ও আমার রচিত গ্রন্থগুলি থাকিবে। তৎপর থাকে আমার প্রতিমূর্ত্তি, নিম্ন থাকে আমার পাদুকা থাকিবে।"

(২) "মনোহরপুর আশ্রমে (মহানির্ব্বাণমঠে) প্রতি বৎসর দুইটী পর্ব্ব হইবে। একটী 'গুরুপূর্ণিমা' উৎসব ও অপরটী আমার 'জন্মোৎসব'। আমার দেহত্যাগ উপলক্ষে কোন প্রকাশ্য উৎসব করা হইবে না। মনোহরপুরের গুরুপীঠে সর্ব্ব দেবদেবীরই পূজা হইতে পারিবে। আর্য্যদিগের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই ঐ পীঠে পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিতে পারিবেন। ঐ পীঠ ম্লেচ্ছ, যবন প্রভৃতি কোন নীচ জাতি স্পর্শ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা গৃহের বহির্দ্দেশ হইতে ঐ পীঠে অর্চ্চনা করিতে পারিবেন।

শেষ উপদেশ

(১) "আমার শিষ্যগণের প্রতি আমার এই শেষ উপদেশ যে তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকিবে। তাহাদের মধ্যে কেহ বিপদে পড়িলে

অন্য সকলে তাহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবে। যদ্যপি কাহারও কোন কষ্ট হয়, তবে তাহাকে সাহায্য করিবে। পৃথিবীর যাবতীয় লোককে ভ্রাতৃভাবে দেখিবে। অনাথ আতুর দেখিলে সাহায্য করিবে। পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিবে না। সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমানভাবে ভক্তি বিশ্বাস রাখিবে।"

(২) "জাগো, জাগো, নিয়ত জাগো!

এসংসার অতি ভীষণ স্থান! এখানে খুব সাবধানে থাকতে হয়।"

(৩) "ভাই বল, বন্ধু বল, কেউ কারো নয়রে, মণি, কেউ কারো নয়। সব তাদের নিজের স্বার্থের জন্য তোমায় চায়।"

ভবিষ্যদ্বাণী

(১) "আমি কলিতে যে মত প্রচার কর্চ্ছি, সত্যযুগে, ত্রেতাতে, দ্বাপরে পুনঃ প্রবল হবে। আমি আবার সে (সব) সকল যুগে জন্মাব।"

(২) "ভবিষ্যতে জগতে সমস্ত জাতি এক জাতি হইবে! সমস্ত জাতি এক ধর্ম্ম মানিবে। তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহারো প্রতি কাহারো বিদ্বেষ থাকিবে না।"

(১) "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত!

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥"

গীতা, ৬২ শ্লোঃ, ১৮শ অঃ।

[অতএব হে ভারত! সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহারই শরণ লও। তাহা হইলে তাঁহার প্রসাদে পরমা শান্তি ও নিত্যধাম স্বরূপ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে।]

(২) "অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।

ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" ॥৩৬

ভাঃ, ১০ম স্কঃ, ৩৩শং অঃ।

[জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি মনুষ্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বিবিধ ক্রীড়া (লীলা) করিয়া থাকেন, যাহা শুনিয়া জীবগণ তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হন (জীবের মতি তাঁহার প্রতি অগ্রসর হয়)!]

(৩) "জন্ম গুহ্যং ভগবতো য এতৎ প্রযতো নরঃ।
সায়ং প্রাতর্গৃণন্ ভক্ত্যা দুঃখগ্রামাদ্বিমুচ্যতে" ॥২৯

ভাঃ, ১ম স্কঃ, ৩য় অঃ।

[যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে ভগবানের এই অনির্ব্বচনীয় জন্ম বৃত্তান্ত নিত্য প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভক্তিপূর্ব্বক কীর্ত্তন বা পাঠ করেন, তিনি এই দুঃখ-বহুল সংসার হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন।]

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব জয়যুক্ত হউন!

শ্রীশ্রীনিত্য-সাঙ্গোপাঙ্গ-ভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন!

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-চরিতামৃত জয়যুক্ত হউন!

শ্রীশ্রীসর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় বা নিত্যধর্ম্ম জয়যুক্ত হউন!

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"

ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ! হরিঃ ওঁ!

ওঁ তৎসৎ!

ওঁ! ওঁ!! ওঁ!!!

সমাপ্ত

ভগবান্ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের রচিত

পরমোদার সমন্বয়-ধর্ম্মমতের গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃত কতিপয় উপদেশ

১। ধর্ম্ম ত বহু নয়। আমি ত জানি একই ধর্ম্মই আছে। নানা সাম্প্রদায়িক মত সেই একই ধর্ম্মের নানা শাখা প্রশাখা।

২। জগতে এমন কোন ধর্ম্ম নাই, যে ধর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয় না।

৩। ধর্ম্মই স্বয়ং ঈশ্বর। সমস্ত ধর্ম্ম একই ঈশ্বর হইতে বিকশিত হইয়াছে।

৪। সমস্ত ধর্ম্মেরই নিগূঢ় তাৎপর্য্য অতিমহান্। স্বয়ং ঈশ্বরই ধর্ম্মরাজ।

৫। ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি যে কথা বলেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য এবং আদরণীয়।

৬। যিনি ভগবান্ সম্বন্ধীয় সকল মত স্বীকার না করেন, তিনি প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা বোঝেন নাই। তাঁহাকে প্রকৃত ধার্ম্মিকও বলা যায় না।

৭। দিব্যজ্ঞান সম্ভূত যে কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক যে কোন যুগে যে কোন মত প্রচারিত হইবে, তাহা মান্য করা কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তির কল্পিত ধর্ম্মমত অবশ্য অগ্রাহ্য করি।

৮। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এক বিষয়ে নানা সময়ে নানা মহাত্মা নিজ নিজ মতানুযায়ী নানা কথা বলিয়া গিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে মত, আমরা তাহাই গ্রহণ করিব।

৯। নানা মুনির নানা মত. তাঁহাকে ডাকিবার নানা উপায় মাত্র। ঠিক্ ঠিক্ চলিলে সকল মতেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

১০। ইংরাজ রাজ্যের সকল স্থানের প্রহরীগণের একপ্রকার বেশ নহে। ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যের সকল সাম্প্রদায়িক সাধুগণের একপ্রকার বেশ নহে।

১১। সকল সাধুকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করিবে। কারণ তুমি জান না তাঁহাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট।

১২। সকলজাতির সকল শ্রেণীর সাধুকেই মান্য করি। সাধু বিধাতার বিধি-ব্যবস্থা প্রচারক। জীবের ন্যায় অন্যায়ের মীমাংসা কর্ত্তা। সাধুর অবমাননা করিলে ভগবানের অবমাননা করা হয়।

১৩। নানা সময়ে নানা মহাত্মা কর্ত্তৃক ঈশ্বরোপাসনার নানা উপায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই সকল উপায়ের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত যে কোন উপায় অবলম্বন করা হইবে তদ্দ্বারাই ঈশ্বর প্রাপ্ত হইবে।

১৪। কোন সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া ভক্তিভাবে ভগবান্‌কে ডাকিলেই উদ্ধার হইবে।

১৫। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মা। ভক্তিভাবে তাঁহার যে প্রতিমূর্ত্তিতে আরাধনা করিবে সেই প্রতিমূর্ত্তি থেকেই তাঁহার প্রকাশ দেখিবে।

১৬। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্। ব্যাকুল ভাবে ডাক্‌লে দেখা দিবেনই।

১৭। ঈশ্বরের প্রত্যেক নামই মন্ত্র। ঈশ্বরের যে কোন নাম একাগ্রতার সহিত জপ করিবে সেই নামেই মনের ত্রাণ হইবে।

১৮। সকল ধর্ম্মেই প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের আবশ্যক হয়। বিশ্বাসই ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রধান কারণ।

১৯। আর্য্যধর্ম্ম অনুসারে যাহাকে বিশ্বাস বলা হয়, খৃষ্টান ধর্ম্মে তাহারই নাম 'ফেথ্'। মুসলমান্ তাহাকেই 'ঈমান্' বলেন।

২০। চারিপ্রকার ফলের চারিটী আঁটী একসঙ্গে পুঁতিলে চারিটীই পরস্পর সংলগ্ন হইয়া একই বৃক্ষই হইয়া থাকে। আধ্যাত্মযোগ বলে ঐ প্রকারে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করা যাইতে পারে।

২১। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া আচার্য্যগণ নানা সময়ে নানা মত প্রচার করিয়াছিলেন। সেইজন্য সকল মতের ঐক্য নাই।

২২। সকল মতই সত্য। সকল মত দ্বারাই ঈশ্বর পাওয়া যাইতে পারে।

২৩। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ হইয়াছে, যে সকল হইতেছে ও হইবে সে সকল আমি গ্রাহ্য ও মান্য করি।

২৪। অভেদবাদীর পক্ষে ধর্ম্মসম্প্রদায়ও এক, ধর্ম্মও এক, ঈশ্বরও এক।

২৫। এক স্থানে যাইবার অনেক পথ আছে। অথচ সেই পথগুলিকে এক পথে পরিণত করা যায় না। সকল মতের উদ্দেশ্য ঈশ্বর হইলেও সকল মতগুলিকে এক করা যায় না।

২৬। ঈশ্বর প্রেরিত কোন প্রচার কর্ত্তাই পূর্ব্বের কোন মত নষ্ট করিতে আসেন না। যাঁহারা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন মতের বিরুদ্ধে কোন কথা কন, তাঁহারা ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ নন্।

২৭। সকল সম্প্রদায় ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকই ঈশ্বরের মহিমা প্রচারক।

২৮। ধর্ম্ম সম্প্রদায় এক (এবং) ধর্ম্মও এক আর ঈশ্বরও এক।

২৯। জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মই ঈশ্বরোদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেজন্য জগতের কোন ধর্ম্ম লোপ করিতে নাই।

৩০। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এক মতকে উজ্জ্বল করিবার জন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অন্যান্য মতের নিন্দা করিবে না।

৩১। জগতে যে শাস্ত্রে যে ধর্ম্ম সংক্রান্ত উত্তম নিয়ম আছে তাহাই গ্রহণ করিবে।

৩২। জগতের সকল শাস্ত্র পড়িয়া যিনি সার গ্রহণ করিতে পারেন তিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক।

৩৩। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন ধর্ম্মে যাঁহার অবিশ্বাস তিনিই ঈশ্বরের নিকট অপরাধী। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সর্ব্বধর্ম্মই উৎকৃষ্ট।

৩৪। সর্ব্বধর্ম্ম রক্ষা করে যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাঁরই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী কোন ধর্ম্ম নষ্ট করেন না।

৩৫। সর্ব্বধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার ক্ষমতা নারায়ণ ভিন্ন অপর কাহারও নাই।

৩৬। নানা ভক্ষ্য। ক্ষুধা এক। প্রত্যেক ভক্ষ্য দ্বারাই ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে পারে। নানা শাস্ত্র। নানা মত। ঈশ্বর এক। প্রত্যেক মতেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩৭। এক মনোভাব নানা ভাষায় নানাপ্রকার শুনিবে। যে সকল ভাষা জানে সেই এক ভাবই বোধ করিবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা মতের নানাপ্রকার আচরণ। ফল এক। ঈশ্বরীয় নানা মূর্ত্তি দেখ বোধে এক।

৩৮। পরমেশ্বর এক। সেই একের নানা রূপ, গুণ, নাম ও শক্তি আছে।

৩৯। এক পরমেশ্বর আকারে, রূপে ও নামে অসংখ্য। কিন্তু তাঁহার সকল আকার, সকল রূপ, আর তিনি অভেদ। ফলের শাঁস, খোসা ও আঁটী, আকারে, রূপে ও নামে এক নয় অথচ তিনে অভেদ।

৪০। শাঁস, খোসা ও আঁটীর সমষ্টি ফল হইলেও, ঐ তিন আর ফল অভেদ হইলেও, ফলের শাঁস, খোসা ও আঁটী বলি। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ও সর্ব্বশক্তি অভেদ হইলেও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তি বলি।

৪১। ঈশ্বর ভক্তের অভিলাষ পূরণার্থে এক রূপ হইতে কত রূপ হন।

৪২। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা, ভক্তিভাবে তাঁহার যে প্রতিমূর্ত্তিতে আরাধনা করিবে সেই প্রতিমূর্ত্তি থেকেই তাঁহার প্রকাশ দেখিবে।

৪৩। ঈশ্বর মানবীয় নানা বেশে নানা সাধুভক্তকে নানা বেশে দেখা দিয়াছিলেন ও দেন ও দিবেন।

৪৪। উদার সম্পন্ন সিদ্ধ পুরুষদিগের সম্মুখে ঈশ্বর নানা মূর্ত্তি ধারণ করেন।

৪৫। ঈশ্বরের যে সমস্ত প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করা যায়, সেই সমস্ত প্রতিমূর্ত্তি হইতে সময়ে সময়ে ঈশ্বর কত সিদ্ধগণকে দর্শন দিয়াছিলেন। সেই সকল সিদ্ধগণ ভবিষ্যবংশের উপকারের জন্য সেই সকল প্রতিমূর্ত্তিতে ঈশ্বরের আবির্ভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৪৬। পরমেশ্বর একই সময়ে পুরুষ প্রকৃতি হইতে পারেন।

৪৭। পরমেশ্বরের অনন্ত রূপ। তাঁহার প্রকৃত ভক্ত যখন যে সময়

তাঁহার যে রূপের ধ্যান করেন, তিনি সেই রূপ দেখিতে পান।

৪৮। সকল ভক্তই একপ্রকার রূপ দর্শন করেন না। যে ভক্ত তাঁহার নিজ ভাব অনুসারে ঈশ্বরের যে রূপ দর্শন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি ঈশ্বরের সেই রূপই দর্শন করিয়া থাকেন। একই ঈশ্বরের যেমন বহু রূপ আছে, তদ্রূপ একই ঈশ্বরের একই বাক্যের বহু অর্থ আছে। একই ঈশ্বরের বহু রূপ যেমন সত্য, তদ্রূপ একই বাক্যের বহু অর্থও সত্য। সেজন্য গীতার নানা মহাত্মা নানা অর্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের সকল অর্থই সত্য।

৪৯। শাস্ত্র সকলের উক্তি দূষিয়া যিনি (তাঁহার) উক্তি প্রকৃত বলিবেন, তিনি নিজেই ভ্রান্ত।

৫০। পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় সকল মতে যখন তোমার সমান শ্রদ্ধা হইবে, তখন তুমি প্রকৃত আস্তিক হইবে। এখন তুমি আস্তিকও নও, নাস্তিকও নও।

৫১। তাঁহার সাকারত্বে নানাত্ব। নিরাকারত্বে একত্ব। সিদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরীয় বহু সাকার এক বোধ এবং দর্শন হয়। এইপ্রকার বোধ এবং দর্শনকে সাকারে অদ্বৈত জ্ঞান বলা যায়। মহাসিদ্ধাবস্থায় সাকার নিরাকার অভেদ জ্ঞান হয়। এইপ্রকার জ্ঞান অতি দুর্লভ।

৫২। শেষে অর্থাৎ মহাসিদ্ধাবস্থায় সকল জাতি এক জাতি হয়, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় এক সম্প্রদায় বোধ হয়, সকল ধর্ম্ম এক ধর্ম্ম বোধ হয়, সকল জীবাত্মা এক জীবাত্মা বোধ হয়, সকল শাস্ত্র এক শাস্ত্র বোধ হয়, সকল সাম্প্রদায়িক ঈশ্বরই একেশ্বর বলিয়া বোধ হয়।

৫৩। দেবনাগরী 'ক' ও বঙ্গভাষার 'ক' আকৃতিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কিন্তু উভয়ই 'ক'। শিব কৃষ্ণ রূপে বিভিন্ন, স্বরূপে কোন ভেদ নাই।

৫৪। ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ উপাধিতে জানা যায়, তিনিই শক্তি ও শক্তিমান্ উভয়ই। তিনি সৎ শক্তিমান্, তিনি চিৎ ও আনন্দ এই দুই শক্তি।

৫৫। ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। তিনি যখন ঈশ্বর তখন সাকার, সগুণ ও সক্রিয়।

৫৬। ব্রহ্ম চির নির্গুণ ও চির সগুণ নহেন। তিনি চির নিরাকার এবং চির সাকার নহেন। তিনি স্বেচ্ছায় আবশ্যক মতে উভয়ই হন।

৫৭। ব্রহ্ম অদ্ভুত সাকার ও অপরূপ নিরাকার। ব্রহ্ম অদ্ভুত অপরূপ সাকার। অথচ তিনি ইচ্ছা করিলে আকাশের ন্যায় নিরাকার ও আমাদের ন্যায় সাকারও হোতে পারেন।

৫৮। আমাদের অদ্বৈত মতে পরমেশ্বর এক। পরমেশ্বর এক ব্যতীত দুই অথবা বহু নহেন। সেই পরমেশ্বরের অনন্ত নাম, অনন্ত রূপ, অনন্ত গুণ, অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত ক্রিয়া।

৫৯। অদ্বৈতমত—আমাদিগের অদ্বৈতমত। সেইজন্য আমরা এক পরমেশ্বরই স্বীকার করি, আমাদের অদ্বৈতমতে শিব, শক্তি, বিষ্ণু, সূর্য্য এবং গণেশ একই। শিব যে পরমেশ্বরের বিকাশ, শক্তিও সেই পরমেশ্বরের বিকাশ, সূর্য্যও সেই পরমেশ্বরের বিকাশ, বিষ্ণুও সেই পরমেশ্বরের বিকাশ, গণেশও সেই পরমেশ্বরের বিকাশ।

৬০। আমি কেবল এক সম্প্রদায়ের লোক নই, আমি সকল সম্প্রদায়ের লোক। আমার ইষ্ট যেমন বহুরূপী, আমিও তেমন বহুসম্প্রদায়ী। আমার ইষ্ট যখন শিব হন আমি তখন শৈব, তিনি যখন বিষ্ণু হন আমি তখন বৈষ্ণব, তিনি যখন অন্য কোন সাম্প্রদায়িক হন, আমিও তখন সেই সাম্প্রদায়িক হই।

৬১। অগ্রে বৈষ্ণবত্ব, শাক্তত্ব, শৈবত্ব, গাণপত্যত্ব, ব্রহ্মত্ব ভুলে এক হবে। পরে খৃষ্টানত্ব, মুসলমানত্ব ভুলে এক হবে।

৬২। সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রের অগ্রে সামঞ্জস্য করে, পরে পৃথিবীর শাস্ত্র এক কর।

৬৩ জগতে নানাপ্রকার রুচির নানা লোক রহিয়াছেন বলিয়া নানা সম্প্রদায় হইয়াছে।

৬৪। মনুষ্য বহু। প্রত্যেক মনুষ্যের রুচি স্বতন্ত্র। নানা মানুষের নানাপ্রকার খাদ্য, নানাপ্রকার পরিচ্ছদ, নানাপ্রকার কথোপকথনে রুচি এবং আনন্দ। এমন কি প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক মনুষ্য স্বতন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকের ধর্ম্ম প্রবৃত্তিও একপ্রকার নহে, একজন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মতের সৃষ্টি হইয়াছে। সেইজন্য ভগবান্‌ও নানারূপ হন। তাঁহার সাকারত্বে নানাত্ব। নিরাকারত্বে একত্ব।

৬৫। ঐ আলয়ের অনেক দ্বার রহিয়াছে, উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে একটী দ্বার দিয়াই প্রবেশ করিতে হইবে। ঈশ্বরপুরীরও অনেক দ্বার। সেই পুরীর এক একটী দ্বার যে এক এক সাম্প্রদায়িক মত। ঈশ্বর-পুরীতে প্রবেশ করিতে হইলে যে কোন সাম্প্রদায়িক রূপ দ্বার দ্বারাই প্রবেশ করা যায়।

৬৬। প্রত্যেক আর্য্যশাস্ত্রের মাহাত্ম্যই প্রায় একপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং কাহাকে শ্রেষ্ঠ এবং কাহাকে অশ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট বলিব? সর্ব্বধর্ম্ম শাস্ত্রই সচ্চিদানন্দ বিষয়ক এবং সচ্চিদানন্দের উদ্দেশ্যে বিরচিত হইয়াছে। সকল শাস্ত্রেই হরির কথা আছে। সুতরাং সকল শাস্ত্রই আমাদের প্রণম্য, বন্দনীয় এবং পূজ্য। অত্যুত্তম আম্রেরও ত্বক্ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হয়। আমরা জগতে সকল শাস্ত্রের সারগ্রাহী যেন হই।

৬৭। সকল ধর্ম্ম প্রচারকদিগকে তোমার নিজের মতে আনিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি তোমার বিদ্বেষ না থাকে। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও প্রতি যদ্যপি তোমার বিদ্বেষ অথবা ঘৃণা হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে ঈশ্বরের অবমাননা করা হইবে। কারণ সকল সম্প্রদায়ই ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে! কারণ সকল সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকই ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

৬৮। একজন মুসলমান্‌কে, একজন খৃষ্টান্‌কে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসায়ে আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসায়ে একসঙ্গে উপাসনা করালে সকল সম্প্রদায়

এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্রে দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।

৬৯। ধর্ম্ম সমাজের জীবন। ধর্ম্ম সমাজকে সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলায় রাখেন। আস্তিকতাময় ধর্ম্ম। আস্তিকতার অভাব যার ধর্ম্মেরও অভাব তার।

৭০। নিয়ত ধর্ম্মচর্চ্চা এবং সাধুসঙ্গ কখনও বিফল হয় না। ইহ জন্মেই তাহার হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। নানাশাস্ত্রে নিয়ত ধর্ম্মচর্চ্চা ও সাধু-সঙ্গ করার জন্য পরলোকে যে সমস্ত ফলভোগ হইবার কথা উক্ত হইয়াছে সে সমস্তই সত্য।

৭১। "...অনেক আর্য্যশাস্ত্রমতে যিনি ব্রহ্ম, যিনি পরমেশ্বর, যিনি ঈশ্বর, যিনি ভগবান্‌, যিনি নারায়ণ, যিনি শ্রীকৃষ্ণ, যিনি চতুর্ভুজ বিষ্ণু, যিনি শক্তি, যিনি শিব, যিনি গণেশ এবং যিনি সূর্য্য প্রভৃতি, যিনি পুরুষ এবং প্রকৃতি; যিনি নিরাকার, সাকার এবং আকার; যিনি নানা অবতার এবং যিনি নানা আর্য্যশাস্ত্রমতেই আরও কত প্রকার, তিনিই মুসলমানের আল্লা, তিনিই মুসলমানের খোদা, তিনিই য়িহুদী প্রভৃতি কয়েকটী প্রাচীন জাতির জেহোভা, তিনিই খ্রীষ্টানের গড্‌। তাঁহার আরও কত নাম আছে, তাঁহার আরও কত আখ্যা আছে, তাঁহার আরও কত উপাধি আছে। তাঁহার অনন্ত নাম, তাঁহার অনন্ত গুণ, অনন্ত রূপ এবং অনন্ত শক্তি। নানা দেশীয় নানা ভাষাদ্বারা, নানা দেশীয় নানা শাস্ত্রে তিনিই বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই বর্ণিত হইতেছেন এবং পরে তিনিই বর্ণিত হইবেন...।"

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দদেব কর্ত্তৃক
অতি সরলভাষায় রচিত
দিব্যজ্ঞানপ্রসূত সমন্বয়-মূলক অপূর্ব্ব মীমাংসা গ্রন্থাবলী

ক্রম	গ্রন্থ	মূল্য
১।	চৈতন্ত বা সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয় সার (৩য় সংস্করণ) ...	১৲
২।	সাধক সহচর (৩য় সংস্করণ) ...	।৵৹
৩।	উদ্দীপনী (২য় সংস্করণ) ...	৵৹
৪।	সাধনা ও মুক্তি (২য় সংস্করণ) ...	৵৹
৫।	অধ্যাত্ম তত্ত্ববোধ ...	।৹
৬।	সিদ্ধান্ত সার ...	৵৹
৭।	ভক্তিযোগ দর্শন (১ম ভাগ) ...	॥৹
৮।	সিদ্ধান্ত দর্শন (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ভাগ একত্র) ...	১।৹
৯।	ভ্রান্তি দর্পণ বা নিত্যদর্শন (বাঁধাই) ...	২॥৹
	ঐ (অবাঁধা) ...	২৲
১০।	পাতঞ্জল দর্শন ও মণিরত্নমালা (মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ)	।৶৹
১১।	শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত ও সাধক সুহৃদ্ ...	॥৶৹
১২।	প্রার্থনা গীতা (১ম ভাগ) ...	।৶৹
১৩।	ঐ (২য়, ৩য় ভাগ একত্র) ...	॥৶৹
১৪।	নিত্য গীতি (১ম ভাগ) ...	১৲
১৫।	ঐ (২য়, ৩য় ভাগ একত্র) ...	১।৶৹
১৬।	বিবিধ তত্ত্ব ...	১।৹
১৭।	যোগ দর্শন ...	॥৹
১৮।	আশ্রম চতুষ্টয় ...	৸৹
১৯।	পদ্যাবলী ...	১।৹
২০।	পূজা (১ম, ২য়, ৩য় ভাগ একত্র) ...	।৶৹
২১।	কবিতা কুসুমমালা ...	৸৶৹

মূল্য

২২। স্তব রত্নাকর (১ম, ২য় ভাগ) ও
প্রার্থনা কুসুমাঞ্জলি (১ম, ২য়, ৩য় ভাগ একত্র) ... ৷৵০

২৩। প্রভাবতী (দৃশ্যকাব্য) ... ৷৵০

২৪। যবন বৈরাগী ও অপরাধ ভঞ্জন (দৃশ্যকাব্য) ... ।৴০

২৫। দিব্যদর্শন (১ম, ২য় খণ্ড একত্র) ... ৷৶০

২৬। সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্ঞানানন্দরূপী ভগবান্ নিত্যগোপালের
ধ্যান পূজা স্তব কবচাদি নিত্য উপাসনাবিধি (দক্ষিণা) ।০

১। নিত্যধর্ম্ম পত্রিকা (১৩০৬—১৩০৭ সাল) মূল্য ১৲

২। শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়—মাসিক পত্র
১ম হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ—২৲ সম্পূর্ণ—১২৲

৩। শ্রীশ্রীগুরুপুষ্পাঞ্জলি—শ্রীশম্ভুনাথ বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-রচিত ।০

প্রাপ্তিস্থান—**মহানির্ব্বাণমঠ**, ১১৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

—:•:—:•:—

নবদ্বীপ (নদীয়া) **মহানির্ব্বাণমঠ** হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

Works by Srimat Swami Nityapadananda Abadhut Maharaja, Founder-President of Nabadwip Mahanirvan Math :

1. Guru Jnanananda Deva's work on 'Bhakti-Yoga', Translated into English—Style very simple— Re. 1-8.

Highly admired by Dr. S. Radhakrishnan, Dr. George Howells (Principal), Principal K. Bhattacharyya, M.A., P. R. S., Dr. S. N. Das Gupta, M. A., Ph. D. (Cal. & Cantab), Professor Rai Bahadur K. N. Mitter, M. A., Dr. B. M. Barua, M. A., D. Litt (London), and other scholars and The Basumati, বাঙ্গালার কথা, আত্মশক্তি, আনন্দবাজার পত্রিকা, The Amrita Bazar Patrika, Liberty, Advance, Prabuddha Bharata, Forward (of Calcutta), The Hindu of Madras, The Philosophical Quarterly of

Amalner (Bombay), The Theosophist of Adyar (Madras), The Vedanta Kesari of Mylapur (Madras), The Leader of Allahabad and so on as the outcome of intensive meditation, supreme Self-realization, divine knowledge and divine wisdom.

2. Sri Sri Nitya Gopal—An English Biography of the Yogacharya Sri Srimat Guru Jnanananda Abadhut (Bhagawan Sri Sri Nitya Gopal) Deva. Price Rs. 3-8.

Highly admired by the Nation, Jugantar, The Amrita Bazar Patrika, Ananda Bazar Patrika, Calcutta, The Bombay Chronicle, Bombay, The Hindusthan Times, New Delhi, Swades Mitran, Madras and scholars like Dr. Mahendranath Sarkar, M. A., Ph. D., Rai Bahadur K. N. Mitra, M. A., Dr, S. K. Banerjee, M. A., Ph. D., Dr. M. Bhattacharya, M. A., B. L., P. R. S., Ph. D., Professor A. C. Mukherjee, M. A., Dr. B. L. Atreya, M. A. D. Litt., S. L. Dar, M. A., LL. B., Dr. N. V. Banerjee, M. A., Ph D. (London), Dr. C. Kunhan Raja, M. A., D. Phil (Oxon), Principal N. V. Dandehar, Sir Maurice Linford Gwyer, G. C. I. E., K. C. B., K. C. S. I., D. C. L., LL. D., Lord Zetland.

3. English renderings of some works by the Yogacharya entitled সিদ্ধান্ত দর্শন, সাধক সহচর, সাধক সুহৃৎ, সিদ্ধান্তসার, উদ্দীপনী, সাধনা ও মুক্তি ও অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-বোধ। (In preparation)

4. নিত্য-সঙ্গীত-লহরী—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র-লিখিত পরিচায়িকা-সমেত ও আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকা ও প্রণবে উচ্চ-প্রশংসিত। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল চরিতামৃত—শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দ পরিব্রাজকাবধূত সঙ্কলিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৩৷৹ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—মহানির্ব্বাণমঠ, নবদ্বীপ, নদীয়া।